দুইখান কথা

চিন্তা শীল

অক্ষর পাবলিকেশানস্
প্রধান কার্যালয় : 'সঞ্জীব ভিলা' জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা-৭৯৯০০১
কলকাতা কার্যালয়: ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলকাতা-৭০০০১২

dui khan katha

a collection of analytical political views

by chinta shil

দুই খান কথা ঃ চিন্তা শীল

ISBN No-978-93-84079-06-2

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ২০১৪

প্রচ্ছদ ঃ ইমানুল হক

অলংকরণ ঃ ভোলা ময়রা

অক্ষর সংস্থাপন ও মুদ্রণ ঃ ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স, জে বি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা

□

অক্ষর পাবলিকেশনস্-এর পক্ষে শুভব্রত দেব কর্তৃক জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা,

আগরতলায় নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র ঃ 'বইঘর' ও অক্ষর সেলস্ কাউন্টার ঃ জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা-৭৯৯০০১

অক্ষর পাবলিকেশানস্, সঞ্জীব ভিলা, জে বি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা -৭৯৯০০১

email : jraksharpub@gmail.com

visit us : www.aksharagartala.com

দূরভাষ:০৩৮১-২৩০-৭৫০০/২৩২-৪৫০০/০৯৪৩৬১২১১০৯

মূল্য □ ৩০০ টাকা

উৎসর্গ

সত্যদ্রষ্টা শিক্ষক ‘বাবা’

(প্রয়াত অনন্তকৃষ্ণ ধর, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী)

এবং

রাজ্যের সংবাদ-মাধ্যমের কর্মী বন্ধুদের উদ্দেশে

মজার মোড়কে

মজার মোড়কে গভীর কথা বলার জন্য ক্ষমতা চাই। এই অস্ত্রটি অনধিকারীর হাতে পড়ে স্রোফ ভোঁতা হয় না, হাস্যকরও হয়ে দাঁড়ায়। 'চিন্তা শীল'-এর কলম 'দুইখান কথা' সেই পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ।

সেলুনে ক্ষৌরকাব কী করেন ? চুলদাড়ি নিখুঁতভাবে ছেঁটে একজন ব্যক্তিকে ফিটফাট চেহারায় রাখেন। সমাজ ও দেশকে ঠিকঠাক চেহারায় রাখার লক্ষ্যে ধারালো কলম ধরেছেন আমার স্নেহভাজন ও দক্ষ সাংবাদিক সমীর ধর। যখন দেখা হয়, ত্রিপুরা সম্পর্কে আরও জানার জন্য ওকে ব্যতিব্যস্ত করি। ক্লান্তিহীন সমীর কখনও নিরাশ করে না। বরং, সেই কথাবার্তার আসরকে বৈচিত্রসন্ধানী রাখার জন্য দুরন্ত গণসঙ্গীতও গেয়ে ওঠে।

'চিন্তাচরণ শীল' মানুষটি অবশ্যই চিন্তাশীল। সাধুভাষার কথোপকথনের মোড়ক ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ। এমন লেখা সবাইকে খুশি রাখার দায় নিয়ে চলে না। তবে, সমালোচকরাও মনে মনে মানেন, লেখাটা কিন্তু ভাল। আমার ধারণা সমীরের লেখা সেই জায়গায় উঠতে পেরেছে।

ভূমিকা লিখতে পেরে গর্বিত। কারণ, সহকর্মী হিসেবে সমীর ধরকে পেয়েও আমি গর্বিত।

কলকাতা
১৬.০১.২০১৪

অশোক দাশগুপ্ত
সম্পাদক, আজকাল

মানিক সরকার

মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা

অভিমত

'চিন্তা শীল' একটি ছদ্মনাম। প্রকৃত লেখক হচ্ছেন শ্রী সমীর ধর। তিনি ত্রিপুরার একজন স্বনামধন্য সাংবাদিক। সমীর ধর একই সাথে জনসংস্কৃতি আন্দোলনের সামনের সারির অন্যতম কর্মী ও সংগঠক। লেখালেখি ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সমীর ধরের কৃতিত্ব ও সাফল্য সম্পর্কে সকলেই জানেন।

সমীর ধর 'আজকাল' প্রত্রিকায় কর্মরত একজন সাংবাদিক। 'আজকাল' পত্রিকার দৈনিক যে সংস্করণ ত্রিপুরা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয় শ্রীধর বর্তমানে তার প্রধান দায়িত্বে রয়েছেন। এই সংস্করণের 'আজকাল ত্রিপুরা' পাতায় প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে 'চিন্তা শীল' নামের আশ্রয়ে একটি বিশেষ কলাম গত বেশ কিছু সময় ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। অনেকের মতো আমিও 'আজকাল' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। স্বাভাবিকভাবেই 'চিন্তা শীল'-এর লেখা আমার পাঠ থেকে সাধারণত বাদ যায় না। তবে এটা স্বীকার করতেই হয়, মাঝে মধ্যে কোনও সপ্তাহের লেখা নানা কারণেই হয়ত পড়ে ওঠা সম্ভব হয় না। এই না পড়ার অসম্পূর্ণতা বা ঘাটতি সময়-সময় পুষিয়ে দেন শ্রীমতী পাঞ্চালী তাঁর পাঠলব্ধ উপলব্ধি থেকে।
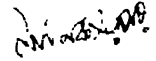
'চিন্তা শীল'-এর লেখা অনেকটা রম্য-রচনার মতো। মার্জিত হাস্যরসে ভরা। কিন্তু এর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে থাকে প্রবহমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়বস্তুর সমাহার। বিশেষ ঢং-এ সহজ-সরল বিশ্লেষণ। পাঠককে চিন্তার খোরাক জোগায়। বিতর্কিত, বিভ্রান্তিকর ও অস্পষ্ট বিষয়ে পথের দিশা দেখায়। তথাকথিত নিরপেক্ষতার আলখাল্লা গায়ে জড়িয়ে যে লেখক, সাংবাদিক বা সাহিত্য-কর্মীরা একসাথে গাছ ও তলারটা সংগ্রহ ও ভোগ করতে চান 'চিন্তা শীল' সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নন। 'চিন্তা শীল' নিজের শ্রেণী-চেতনার

উপর ভিত্তি করে যে বিষয়বস্তুর উপর কলম ধরেছেন সেখানে অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যয়ী ভাষায় নিজের মতামত ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। 'চিন্তা শীল'-এর মত বা বিশ্লেষণের সাথে পাঠক আপনি সহমত পোষণ করবেন কি না সেটা সম্পূর্ণ আপনার বিষয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত যা দেখেছি 'চিন্তা শীল' নিজের কাছে পরিষ্কার থেকেই নির্ভীকভাবে কলম ধরতে অভ্যস্ত। এখানেই 'চিন্তা শীল'-এর স্বাতন্ত্র্য ও বাহাদুরী।

এ যাবৎ 'চিন্তা শীল'-এর কলমে লিখিত ও প্রকাশিত লেখাসমূহ একসাথে করে বই-এর আদলে ছেপে প্রকাশ করার বর্তমান প্রয়াস নিঃসন্দেহে ইতিবাচক এবং অভিনন্দনযোগ্য।

লেখক ও প্রকাশককে ধন্যবাদ। পাঠকরা পড়ে আনন্দ পেলেই লেখক ও প্রকাশকের প্রয়াস সার্থক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বিনীত

(মানিক সরকার)

২২ জানুয়ারি, ২০১৪

সুদীপ রায় বর্মন
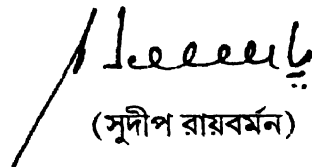
বিরোধী দলনেতা, ত্রিপুরা বিধানসভা

শুভেচ্ছা-বার্তা

একজন সমাজ সচেতন মানুষ তথা রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে ‘দুই খান কথা’ শীর্ষক কলামের আমি একজন নিয়মিত পাঠক। আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, ‘দুই খান কথা’ পুস্তক আকারে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় সংবাদপত্র হচ্ছে এমন একটা মাধ্যম যা জনমত গঠনে এবং স্বচ্ছ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রকে দিশা দেখাতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু ‘দুই খান কথা’ শীর্ষক কলামের একজন নিয়মিত সচেতন পাঠক হওয়ার সুবাদে এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়, বামপন্থী চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে এই কলামে যে রাজনৈতিক মতামত প্রতিফলিত হয়ে থাকে, যা অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ও বাস্তবতার অনুরূপ নয়। ফলে পৃথিবীর প্রাচীন ও বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি সঠিক রাজনৈতিক মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি এই কলামে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। আশা রাখব, ভবিষ্যতে এই উপলব্ধিকে সামনে রেখে ‘দুই খান কথা’ তার নিজস্ব পরিমণ্ডলের বাইরে সার্বিক ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে স্থান দেবে। আমি ‘দুই খান কথা’র সাফল্য কামনা করি।

শুভেচ্ছা সহ

(সুদীপ রায়বর্মন)

৩১ জানুয়ারি, ২০১৪
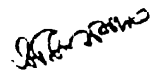
অনিল সরকার

ভাইস চেয়ারম্যান, রাজ্য যোজনা পর্ষদ

সংবাদ-সাহিত্যে অভিনব সংযোজন

২০১১-তে 'আজকাল'-এর এক বিশেষ কলমে আমি প্রথম চিন্তা শীল-কে দেখি। 'দুই খান কথা'-র অবয়বে, সাধু ভাষায়, স্বাদু শব্দচয়নে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার যাবতীয় মূঢ়তা ও ভন্ডামীর বিরুদ্ধে সরস মন্তব্য ও তীক্ষ্ণ আক্রমণ আমাকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে। কারণটা এই যে, লেখালেখি এবং সংবাদপত্রে আজকাল রম্যরচনার হাসি ও গভীর বিশ্লেষণাত্মক আঘাত প্রায় গরহাজির। এই প্রেক্ষাপটে চিন্তা শীল-এর আবির্ভাব আমাকে খুবই আশ্বস্ত করেছে। এ পর্যন্ত চিন্তা শীল-এর দেড়শো-র কাছাকাছি 'দুই খান কথা' রম্যরচনা আমাদের রাজ্যে রসিক পাঠকদের মনোরঞ্জন করে আসছে। চিন্তা শীল-এর রচনায় একদিকে বিনোদন, অন্যদিকে প্রতিবাদ প্রতিরোধের তীব্র-তীক্ষ্ণ ও অপ্রতিরোধ্য স্খলন সকলকে সর্বদা খুশি না করলেও মুগ্ধ ও নন্দিত নিশ্চয়ই করেছে। অক্ষর প্রকাশন চিন্তা শীল-এর 'দুই খান কথা' লেখা সংগ্রহ ও সঙ্কলিত করে ত্রিপুরার সংবাদ-সাহিত্যে একটি অতি নব সংযোজন করলেন।

আমি আশা করবো, সংকলিত চিন্তা শীল কারও কাছে বিনোদন, কারও জন্য আক্রমণ হয়েও সব মিলিয়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের অভিনব সংযোজন হিসেবেই গণ্য হবে।

১২ জানুয়ারি, ২০১৪

(অনিল সরকার)

ড. ব্রজগোপাল রায়

বিশিষ্ট লেখক ও প্রাক্তন মন্ত্রী

২৭ জানুয়ারি, ২০১৪

প্রসঙ্গ ঃ চিন্তা শীলের দুইখান কথা

২০১১ সালের ১৮ জুলাই 'আজকাল' ত্রিপুরার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে জনৈক চিন্তা শীলের 'দুইখান কথা' স্বমহিমায় বিরাজিত দেখে হঠাৎ চমকে উঠলাম। স্বভাবতই লেখাটির দিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হল। লেখার কায়দা এবং রীতি অনুসরণ করে ভাবতে শুরু করলাম কে এই চিন্তা শীল? দেখলাম লেখায় সস্ত্রীক চিন্তা শীলের অস্তিত্ব হাজির। লেখার ধরণ ধারণ দেখে মনে হল, লেখকের আসল নাম আড়ালে রেখে ছদ্মনামের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। আবার মনে হল লেখকের নামের সঙ্গে একটা পদবীও রয়েছে। লেখাটির শিরোনামে আছে 'সুশীল হইতে সাবধান'! চিন্তা ভাবনা করে মনে হল এটি রাজনৈতিক রম্যরচনা। রঙ্গ ব্যঙ্গের ভিতর দিয়ে লেখক তাঁর বক্তব্যকে মানুষের মনে গেঁথে দেবার চেষ্টা করেছেন। ভাবনার গভীরে পৌঁছলে মনে হতে লাগল লেখক লেখার সরস হাল্কা চাল বজায় রাখার জন্য কল্প-কথারও আশ্রয় নিচ্ছেন। তবে কল্প কথার বাড়াবাড়ি নয়, বর্ণনীয় বিষয়কে প্রাণবন্ত করে তুলবার জন্য যতটা প্রয়োজন ততটা। হঠাৎ দেখে মনে হয়েছিল লেখার এ রীতিতো আমার অপরিচিত নয়। এ ধরনের লেখা প্রাচীন ইংরাজি সাহিত্যে আছে, আমাদের বঙ্গসাহিত্যেও আছে। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র থেকে আরম্ভ করে অনেকেই তাঁদের কালের সমাজ ব্যবস্থায় নানা স্খলন পতন লক্ষ্য করে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে এগুলোকে লোক-লোচনের সামনে এনেছেন। তীক্ষ্ণ তীব্র সমালোচনার এবং প্রতিবাদের এটি একটি রীতি। কবিতায়ও কৌলীন্য প্রথাকে ব্যঙ্গ করে লেখা হয়েছে —

> "বৃদ্ধ ধাঙ্গার আছেন দেশে করেন যারা সদগতি
> কামড় তাদের অর্দ্ধরাজ্য পরের ধনে লাখপতি।"

মনে হল এহো বাহ্য। লেখায় প্রতিবাদ আছে, সে সঙ্গে ভালমন্দ সমালোচনাও আছে। আছে মিথ্যার প্রতিবাদে আসল সত্যটাকে তুলে ধরা। বঙ্কিম সাহিত্যের দিকে তাকিয়েই মনে পড়ল সেই অহিফেন-সেবী কমলাকান্ত চক্রবর্তীর কথা। এতক্ষণে বুঝে গেলাম—চিন্তা শীল মশাই কমলাকান্তের মতোই বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে আত্মগোপন করে আছেন। পরক্ষণে মনে হল দুনিয়াতে কত নামইতো আছে হঠাৎ করে লেখক 'চিন্তা শীল' হতে গেলেন কেন? চিন্তা করতে করতে বুঝলাম সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষানীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে যিনি আলোচনা সমালোচনা করবেন তাঁর চিন্তাশীল না হয়ে উপায় আছে? বুঝলাম—লেখক সর্বক্ষণ চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। তবে চিন্তা থেকে শীল কথাটাকে আলাদা করলেন কেন? তারও একটি উদ্দেশ্য আছে। শীল একটা পদবি। অভিধানে এই শীল বিভিন্ন নামে বা অর্থে পরিচিত। সেগুলো হল সাধুতা, ভব্যতা, শিষ্ঠতা, ভদ্রতা, ক্ষৌরকার, নাপিত ইত্যাদি। আমাদের সমাজে শীল বা নাপিতকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক বলেই বিবেচনা করা হয়। গল্পে আছে নাপিতের 'ষোলচোঙ্গা বুদ্ধি'। আবার সংস্কৃত সাহিত্যে বলা হয়েছে, নরানাং নাপিত ধূর্ত। মানুষের মধ্যে নাপিত সবচেয়ে ধূর্ত। বুদ্ধিবলে তারা সমস্ত রহস্যের গোড়ায় গিয়ে পৌঁছতে পারে। পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি কারও জাতিগত বৃত্তি বা পেশা সম্পর্কে কথা বলছি না— তাঁদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই রস-সাহিত্যের বিচার করতে গিয়ে এসব প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। কাউকে কোন রকম আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে নয়।

যাকগে, চিন্তা মশাইকেও দেখছি অনেক রাজনৈতিক সামাজিক ব্যাধি বিষয়ে আলোচনা সমালোচনা করছেন। এগুলো করতে যথেষ্ঠ বুদ্ধি খরচ করতে হয়। সম্ভবত এ সব কারণেই লেখক বা সমালোচককে চিন্তাশীল হতে হয়, আবার চিন্তা করার ক্ষেত্রে শীলের মতোই ধূরন্ধর হতে হয়।

দুই খান কথা-র রীতিপদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনে পড়ে যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা। বঙ্গাদর্শনের জন্য রচিত কমলাকান্তের দপ্তরে (১২৮০-১২৮২ বঙ্গাব্দের মধ্যে) হিউমারের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। হিউমারের স্বভাবসিদ্ধ গুণ জীবনের তীক্ষ্ণ মৌলিক বিশ্লেষণ। রচনা হবে কল্পনার বিশুদ্ধ হাস্যকিরণ-সম্পাতে ভাস্বর। গভীর চিন্তাশীলতা, জীবনের করুণ রিক্ততা ও বঞ্চনার আবেগ-কম্পিত উপলব্ধির সঙ্গে হাস্যোদ্দীপক লীলায়িত অথচ সূক্ষ্ম সংযম বোধ এবং নিয়ন্ত্রিত কল্পনা-বিলাসের অপূর্ব সমন্বয়। দুই খান কথা-র প্রসঙ্গে বলা যায়, অসাধারণ দৃষ্টিকেন্দ্র থেকে জীবনের পর্যবেক্ষণ এবং তার

প্রচলিত গতির মধ্যে সূক্ষ্ম অসঙ্গতির কৌতুককর আবিষ্কার চিন্তা শীলের আলোচনাকে গতিশীল করে তুলেছে, তবে ভব্যতার রীতি মেনেই করা হয়েছে সমালোচনা। প্রতিপক্ষের আলোচনা যখন সত্যের ধারে কাছে না থেকে পরিপূর্ণ মিথ্যাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে তখন শীলমশাই অত্যন্ত কৌশল করে আসল সত্যটিকে উপস্থাপিত করে মিথ্যার বেলুনকে চুপসে দিয়েছেন। রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এখানে কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাত করার প্রচেষ্টা নাই।

২০১১ -এর ১৮ জুলাই থেকে প্রতি সোমবারেই 'দুইখান কথা' প্রকাশিত হতে থাকে আজকাল ত্রিপুরায়, প্রায় নিয়মিতভাবে। কেন? ফেল হিরো, ও নদীরে, প্রিটেস্ট, ঠাকুরমার ঝুলি, ঝাঁপ-ঝাঁপান্ত, টিনের তলোয়ার, খোলাচিঠি, যাই বলিতে নাই, শিক্ষক দিবস, সম্মেলনে সি পি এম, তোবা মুফতি সায়েব, দুর্গা ও গান্ধীজি, চলতা রহে-সহ আরও অনেক মূল্যবান লেখা এ পর্যন্ত আজকাল ত্রিপুরার পৃষ্ঠা আলোকিত করেছে। সম্প্রতি এ সব লেখাকে দু'মলাটের মধ্যে আটকাবার প্রচেষ্টা চলছে। এ প্রসঙ্গেই চিন্তা শীলের আসল নামটি অবগত হওয়া গেল। তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রিয় সাংবাদিক সমীর ধর। সমীর ধরের প্রবন্ধ, আলোচনা, সাংবাদিকতা এবং অন্যান্য লেখালেখির সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। তাঁর চিন্তা-র স্রোত বিচিত্র পথগামী। বিশেষ করে রাজনীতির অঙ্গান-কে যারা নানা-ভাবে কলুষিত করে চলেছেন তাদের বিরুদ্ধে তিনি সমালোচনার ক্ষুরধার তরবারি ধারন করেছেন। লিখতে গিয়ে আমার বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তিনি। তাঁর সমালোচনা শুধু কংগ্রেসি বা সুশীল সমাজের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে নয়। শিক্ষাঙ্গানে আজ যে বিপনন শুরু হয়েছে এবং আমাদের সমাজ দিনের পর দিন উৎসন্নে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে চিন্তা শীল লেখনী ধারণ করেছেন। দ্রবমূল্যের উর্দ্ধগতির কারণ আবিষ্কার করে এ বন্ধ্যা রাজনীতির ছিন্নমস্তা রূপটিও তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর লেখায়। তার পাশাপাশি আসল সত্যটিও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। চিন্তা শীলের চিন্তারাশি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে আমাদের দেশের বর্তমান আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারনা পাওয়া যাবে। যে বচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা বেশি দিন ধরে রাখা যাবে না। চিন্তা শীলের প্রতিটি রচনাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর বহুল প্রচার আবশ্যক। এ সব রস-রচনায় ত্রিপুরার রাজনীতির গতি-প্রকৃতির একটা স্পষ্ট ধারনা পাওয়া যাবে। রাজনীতির নামে কীভাবে নানা কৌশলে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করে কোন কোন ব্যক্তি বা দল মানুষকে প্রতারিত করছে এ সব জানতে হলে চিন্তা শীলের

লেখাগুলো অবশ্যই পড়তে হবে। রাজনৈতিক বিভ্রান্তির হাত থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে গেলেও এ সব লেখা পড়া দরকার। আজকাল সমাজে এবং রাজনীতিতে কীভাবে আবিলতা এসে যাচ্ছে – জনপ্রিয় মতবাদ কীভাবে কাদের দ্বারা কলুষিত হচ্ছে চিন্তা শীলের রচনা সে দিকেও পাঠকদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছে।

সংস্কৃতে একটি শ্লোকের উল্লেখ আছে, যেখানে বায়ু এবং সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি সেখানেও প্রবেশ করতে সক্ষম। চিন্তা শীলের বুদ্ধি সত্যের অকুণ্ঠ প্রকাশেই নিয়োজিত। তিনি নিজে ভেবেছেন, আমাদেরও ভাববার সুযোগ করে দিয়েছেন।

লেখকের কথা

এটা লেখার কথা 'চিন্তা শীল'-এর। কিন্তু, তাঁর দেখা নেই। কলমটাও দেখছি আমারই পকেটে। তাঁর কিছু কথা তাঁর হয়ে বলার এই অনধিকারচর্চা সে কারণেই। এটা প্রথম কৈফিয়ৎ, আমার।

দ্বিতীয় কৈফিয়ৎ 'চিন্তা'-র। বই হবে ভেবে তো লেখা নয়। দায়বোধ এবং সময়ের চাবুকে, মূলত রাজ্য-রাজনীতির ধারাবাহিক রম্য-ভাষ্য এগুলো। দুই সোমবারের মাঝের ছয়-সাতদিনে মাথা তোলা নতুন কোনও বিষয় নিয়ে। সংকলনে সব এক সঙ্গে আসায় কিছু কিছু পুনরুল্লেখ চোখে লাগা স্বাভাবিক। কিন্তু, এখন আর উপায় কী!

আজকাল-এর আগরতলা সংস্করণে 'আজকাল ত্রিপুরা' নামে অতিরিক্ত চারপাতার ক্রোড়পত্র থাকে। প্রতিদিন। ২০১১-র ১৮ জুলাই তাতেই 'দুই খান কথা' এবং 'চিন্তা শীল'-এর জন্ম। প্রসঙ্গ হারানো কয়েকটা বাদ দিয়ে এখানে সংকলিত ২০১৩ পর্যন্ত। শুরু থেকেই পাঠক-প্রিয়তায় চিন্তা আপ্লুত, কৃতজ্ঞ। বহু বিদগ্ধ পাঠকও চিঠিতে, টেলিফোনে এগুলো বই আকারে ছাপতে অনুরোধ করে আসছেন। ইচ্ছে যে জাগেনি তা নয়, কিন্তু দ্বিধা আর সংশয়ের শেকল ছেঁড়া অসম্ভব ভেবে 'চিন্তা' কিংবা আমি গা করিনি। প্রায় এক বছর ধরে অক্ষর প্রকাশন-এর কর্ণধার শ্রী শুভব্রত দেব সেই শেকল ধরে এমন টানাটানি করে চলেছেন যে, শেষ পর্যন্ত সেটা ছিঁড়েই ফেলেছেন। মূলত তাঁরই উদ্যোগে এই সংকলন। তাকে এবং অক্ষর-এর সব কর্মীর কাছে এ জন্য কৃতজ্ঞ। প্রকাশিত লেখাগুলো নিজের ব্যক্তিগত সংগ্রহ ঘেঁটে বার করে দিয়েছেন ত্রিপুরায় আজকাল-এর বিজ্ঞাপন-কর্ণধার শ্রী নারায়ণ সরকার। তাঁকেও কৃতজ্ঞতা। নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়েছেন শ্রীমতী পিয়ালি চৌধুরি, কবি শ্রী দিলীপ দাস, বন্ধু শ্রী কৃষ্ণ সাহা, শ্রী টুনিলাল পাড়ে, আজকাল-এর সহকর্মীরা এবং আরও বহু বন্ধু-মানুষ। সবার নাম উল্লেখ করতে না পারায় ক্ষমাপ্রার্থী। এঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

ইমানুল হক। চিন্তা শীল-এর বিশিষ্ট বন্ধু। ভোলা ময়রা। ফনী মোদক) রাজ্যের জনপ্রিয় কার্টুন শিল্পী। দুজনেই দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে চমৎকার প্রচ্ছদ ও কার্টুন এঁকেছেন। প্রচ্ছদে সহায়তা করেছেন শিল্পী পুষ্পল দেব। এঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই আজকাল সম্পাদক শ্রী অশোক দাশগুপ্ত, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক সরকার, বিরোধী দলনেতা সুদীপ রায় বর্মন, প্রিয় কবি শ্রী অনিল সরকার এবং বিশিষ্ট লেখক ড. ব্রজগোপাল রায়। তাঁদের ভূমিকাপত্র সংকলনটিকে অনেকখানি উচ্চতা দিয়েছে।

সবশেষে, এই গ্রন্থ পাঠক-সমাদর পেলে খুশি হবো।

বিনীত,
সমীর ধর

৩১ জানুয়ারি ২০১৪
আগরতলা

বিষয় সূচী

২০১১
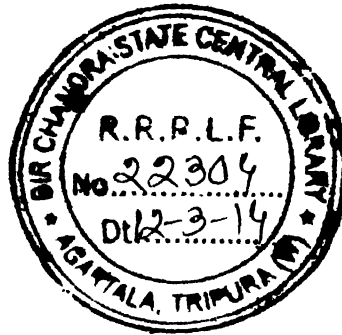
সুশীল হইতে সাবধান!

কড়-কড়-কড়াৎ করিয়া ডিমগুলি ফাটিতেছে। আর ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে বাচ্চা-ডাইনোসরদের ভয়াল মুখ!

খবর পাইলাম, এখন আর বিমানভাড়া খরচা করিয়া কলিকাতায় যাইতে হইবে না। আমাদের আগরতলাতেই 'সুশীল এজেন্সি' খোলা হইয়াছে। কী চমৎকার! কাহার আগে কে 'সুশীল'-এর খাতায় নাম লেখাইবেন, তাহার নিমিত্ত হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। যাহার গাল যত বড়, অর্থাৎ একসঙ্গে যিনি যত গালি কুলকুচা করিয়া ফুড়ুৎ করিয়া মানিকবাবুদের দিকে ছুঁড়িয়া মারিতে পারিবেন, তিনিই হইবেন তত বড় সুশীল! তেরো সালের আগে কোনও 'ফের-অ' না পড়িলে কোনও একটা 'চেয়ারম্যান', এমনকি বাংলার ব্রাত্যবাবুর মতো উচ্চশিক্ষামন্ত্রীও হইবার চান্স খাড়া!

মনে ভাবিলাম, ক্ষুর-এর ধার গিয়াছে। এইবার কলম চালাই। কতরকম পেশার লোকজন কলম ধরিতেছে! আমিও ধরিলে ক্ষতি কী! পিতৃপুরুষের পেশা ছাড়িয়া চিন্তাচরণ শীল-এর 'চিন্তা-শীল' হইবার ইহাই মওকা। কী বলিলেন? 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' লইয়া লিখিতে হইবে? কেন, রাজ্যের অধিকাংশ পত্রপত্রিকায় প্রতিদিন হাজার হাজার শব্দ লিখা হইতেছে, অধিকাংশ টিভি ছেনাল (মাফ করিবেন, ইংরাজি শব্দ বাংলায় লিখিতে ভুল হইতে পারে)-এ সাত দিন ধরিয়া দিবারাত্র একটানা রিপিটারিপিট দেখানো হইতেছে। তবুও মন ভরিতেছে না? কেহ বলিতেছেন, জালিয়ানওয়ালাবাগ, কেহ কহিতেছেন তিয়েন আনমেন স্কোয়্যার! কেহ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের জেরক্স ছবি দেখিতেছেন, কেহ বা নন্দীগ্রাম আঁকিতেছেন। মানিক সরকারকে হিটলার মুসোলিনি ইয়াহিয়া তালিবান বলিতেছেন! তবুও বুঝিতে পারিতেছেন না? আরে মশাই, ১০-১১ জুলাই আগরতলায় যাহা ঘটিয়া গেল, তাহাকেই বাংলায় 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' বলে। বেশ তো, বিশ্বাস না হয় 'রিওয়াইনড' করিয়া দেখুন! বুঝিবেন, বাম সরকার, থুড়ি, মানিক সরকার কতকাল আগে হইতে পরিকল্পনা করিয়া এই সন্ত্রাসের নীল নকশা প্রস্তুত করিয়াছেন!

শিক্ষা-শিক্ষা করিয়া মাথা খারাপ করিয়া দিতেছিল বাম সরকার। এত

ইস্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা — কোনও মানে হয়? উদয়পুরে অর্থবই ছাড়া শস্তায় পাঠ্যবই চাহিয়া পুলিসের গুলি খাইয়া ছাত্র কানু দে মরিয়াছিল আমাদের মহান জোট-রাজত্বে। এখন হইতেছে কী? আমরা কোনও ইস্যুই পাইতেছি না। এইটুকুন শহরে দুইটা মেডিক্যাল কলেজ? কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, নিট, পলিটেকনিক, ফিশারি কলেজ, কৃষি কলেজ, ফার্মাসি কলেজ, প্যারামেডিক্যাল কলেজ? মহকুমায় মহকুমায় আই টি আই! চলিতেছেটা কী! সব শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত হইলে আমাদের দশা কী হইবে? সরকার জি-নেট নামক বেসরকারি সংস্থার সহিত চুক্তি করিল। পি পি পি মডেলে ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ চলিতেছিল। কিন্তু এক ..ময় জি-নেট পাততাড়ি গুটাইয়া চলিয়া যাওয়ায় এই মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ হইবার মুখে পড়িল। সবাই বলিল, বিরোধী নেতা রতনলাল নাথও বলিলেন—হায় হায়, মেডিক্যাল পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের কী হইবে? তাহাদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করিতে সরকারকেই কিছু করিতে হইবে (তখন তাঁহার পুত্রও ওই কলেজে পড়িতেছেন)। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিলেন— আমরা থাকিতে মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ হইবে না। সরকার 'সোসাইটি' গড়িয়া দিলেন। ঋণ দিলেন। সোসাইটি নিজেব নিযমে প্রতি বছর ভর্তির জন্য পরীক্ষা লইতে লাগিল। কলেজ চলিল। বিরোধী নেতার পুত্র পাস করিলেন। সম্ভাব্য পুত্রবধূও সম্ভবত পাস কবিয়া সাবিলেন। আন্দোলনেব ডাক উঠিল তাহার পব!

— হা রে রে রে রে' 'ভর্তি পরীক্ষা হইতে দিব না। অঘটন ঘটাইয়া ছাড়িব। দায়ী থাকিবে সরকার'। আমাদেব বিরোধী নেতা অত্যন্ত সৎ, পবিত্র, গণতন্ত্রী, অক্লান্ত তথ্য-পরিসংখ্যানসন্ধী! তিনি বিলক্ষণ জানেন, মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এম সি আই) অনুমোদিত কোর্সের ভর্তি পরীক্ষা একবার বন্ধ করিয়া দিতে পাবিলে মেডিক্যাল কলেজটি পুরোপুরি বন্ধ হইবার পথ সুগম হইবে। দলেরই অনেক নেতা নিজেদেব ছেলেমেয়েদের ভর্তি পরীক্ষার হলে পৌঁছাইয়া দিলেন (কেন পৌঁছাইবেন না? রতনবাবুর ছেলে ডাক্তার হইতে পারিলে পীযূষবাবুর মেয়ে কেন পারিবে না?) রতন নাথবাবুর নেতৃত্বে পরীক্ষা বন্ধ করিতে প্রথমে অহিংস জমায়েত। পরে মঠ চৌমুহনির দিক হইতে পুলিসের ওপর অহিংস হামলা! অহিংস ইটবৃষ্টি। সেই ইট কুড়াইয়া পাল্টা ছুঁড়িলে 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' — ইহা কে না জানে! পুলিস তাহাই করিল! আহত রক্তাক্ত হাবিলদারকে মাটিতে ফেলিযা কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীরা অহিংস লাঠি চালাইতে লাগিল দেখিযা টি এস আর তাহাদের হিংসাশ্রয়ী লাঠি চালাইল। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের দৃষ্টান্ত প্রাপ্তি ঘটিল। ১১ জন সাংবাদিক (মূলত চিত্রসাংবাদিক) আহত হইলেন। তাহাদের মধ্যে তিন জনের গায়ে লাঠি লাগিলেও বাকি আট জনই নাকি আঘাতপ্রাপ্ত ইটের ঘাযে। কাহার ইটে, কে বলিবে? অহিংস ইট, না হিংসাব ইট? নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিলেন ৯৮.২ শতাংশ পরীক্ষার্থী।

একটাও লাশ পড়িল না। নন্দীগ্রাম হইল না। উঠতি সুশীলরা হাসপাতালে একজনও সাংবাদিক

ভর্তি না হওয়ায় চটিয়া গেলেন। কিন্তু মিডিয়া-মালিকরা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের ওপর 'ভয়াবহ বীভৎস অবর্ণনীয়' রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ধারাবিবরণী দিতে লাগিলেন। লাশ না পাইলে ২০১৩-র স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইবে! পর পর 'আন্দোলন' জ্বালিয়া তুলিতেছেন আমাদের সুবল-সুদীপ রতনলালরা! কিন্তু লাশ পড়িতেছে না! লাশের শূন্যস্থান পূরণ করিতে ১১ জুলাই শান্তিপূর্ণ মৌন মিছিল হইতে থানায় অহিংস আক্রমণ হইল। অহিংস পেট্রল ঢালিয়া শান্তিপূর্ণ আগুনে পুলিস, টি এস আরের গাড়ি পর পর পোড়ানো হইল। অহিংস ইট-পাথর-লাঠি আর আগ্নেয়াস্ত্রে অতিরিক্ত পুলিস সুপার-সহ বহু নিরাপত্তকর্মীকে জখম করা হইল। শহর জুড়িয়া চরম অরাজকতা থামাইতে পুলিস-টি এস আর-সি আর পি এফ লাঠি চালাইল, গুলি চালাইতে বাধ্য হইল। এবং অবশেষে লাশ মিলিল এক নিরীহ ব্যবসায়ী যুবকের। যাহার গুলিতেই মরুক, মরিয়াছে তো! অতএব রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস! রাজভবনে চলো! পত্রপত্রিকা-টিভি ছেনাল (ইংরাজি শব্দের...ক্ষমা করিবেন)-এ 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' ছাড়া আর কিছু নাই। কিছু মালিক-সম্পাদক তাঁহাদের একান্ত কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থ করিতে কর্মরত সাংবাদিকদের বড় অংশকে বিভ্রান্ত করিতে পারিলেন। ভুলাইয়া দিলেন, এই সাংবাদিকদেরই তাঁহারা যখন-তখন ছাঁটাই করেন, মাসের পর মাস বেতন-ভাতা আটকাইয়া দেন, একটা সামান্য নিয়োগপত্র পর্যন্ত দেন না। আপাতত ইহারা আর মালিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবে না। আহা, কী শান্তি! ১০-১১ জুলাইয়ের ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত হইতেছে, সাংবাদিকদের আহত হইবার ঘটনারও ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের আদেশ হইয়াছে। অভিযুক্ত পুলিস অফিসারদের যার যার দায়িত্ব হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দোষী প্রমাণ হইলে সাজা হইবে। তবুও 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস'-এর ঢক্কানিনাদ চলিবে। চালাইয়া যাইতেই হইবে। ২০১৩ পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

কী বলিতেছেন? ইহাকেই 'মিডিয়া-সন্ত্রাস' বলে? কোনও মন্তব্য করিব না। তবে, দুই খান কথা আছে। সিপি এম নেতারাও শুনুন। এক. মিডিয়া-সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য সাধারণ কর্মরত সাংবাদিক কিংবা চিত্রসাংবাদিকরা দায়ী থাকেন না। 'মিডিয়া-সন্ত্রাস' রচনা, পরিকল্পনা ও রূপায়ণের নেপথ্যে থাকে গভীর ষড়যন্ত্র আর টাকা। দুই. ঘোলা জলে পুঁটি মাছেরা খাবি খায়। কে, কী কেন---সব গোলাইয়া যায়। কিন্তু ময়লা থিতাইয়া পড়িতেই জল সাফ হয়। তখন সকলের চেহারাও সাফ সাফ হইয়া যায়! কেবল সুশীলদের চেহারা ছাড়া। তাহাদের সহজে চিনা যায় না। তাহাদের রঙবদলের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা আছে কিনা! তাই সুশীল হইতে সাবধান!

(প্রকাশ: ১৮.০৭.২০১১)

যাই বলিতে নাই

বঙ্কিমবাবু 'হায় লাঠি তোমার দিন গিয়াছে' বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন সেই কবে! কিন্তু, লাঠির দিন এখনও যায় নাই। এতকাল কেবল আন্দাজ লাগাইতে পারি নাই। নৃপেন-দশরথ-মানিকবাবুদের পুলিসকে এতদিন 'বৃহন্নলা' বলা হইতে। তাঁহাদের আমলে পুলিসের কত শত লাঠির বাঁশ যে ঘুণে খাইয়া ফিনিশ করিয়াছে, কে হিসাব দিবে! হাতের লাঠি হাতেই থাকিত, কাতুকুতু দিলেও লাঠি নড়িত না। পড়িত না। পুলিসের বড়কর্তাকে কতবার সম্পাদকীয় কলমে শাড়ি পিন্ধাইয়া ঘরে বসানো হইয়াছে! এইবারও সেই লাঠি চলিত কি, যদি টি এম সির পরীক্ষা বানচালে ইট না পড়িত? হাবিলদার রক্তাক্ত না হইত? পুলিসের পিঠে লাঠি পড়িতেই পুলিসের লাঠির ঘুম ভাঙিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'মিথ্যা' প্রমাণিত হইলেন। ভাল হইল কী মন্দ হইল, স্বল্প বুদ্ধিতে বলিতে পারি না। তবে দরকারে ব্যবহার না হইলে ইহা পুলিসের হাতে থাকিবে কেন? এক মাস্টারবাবুকে চিনিতাম, যিনি শ্বশুরবাড়ির যৌতুক হিসাবে বাইসাইকেল পাইয়াও চালাইতে না জানায় ইহা হাতে ধরিয়া সঙ্গে লইয়া ঘুরিতেন! বহুকাল বহু কষ্টে তিনি সাইকেল চালনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। লাঠি কহিল, দ্যাখো রে নয়ন মেলে, আমার দিন যায় নাই।

ধুত্তোরিকা! কী লিখিতে কী লিখিলাম। ভাবিতেছিলাম 'চিঠি'র কথা, আসিয়া পড়িল লাঠি। কোথায় চিঠি আর কোথায় লাঠি! ইন্টারনেট, মোবাইলের যুগে বঙ্কিমী ঢঙে বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল—'হায় চিঠি তোমার দিন গিয়াছে'। কিন্তু গিয়াছে কই? দেখিতেছেন না, একখানা চিঠির পানেই এখন আকুল নয়নে তাকাইয়া রহিয়াছেন রাজ্যের মানুষজন। এই চিঠি লিখিয়াছেন আর কেহ নহেন স্বয়ং বিরোধী দলনেতা রতনলাল নাথ মহাশয়। একুশে জুলাই প্রধানমন্ত্রী সিং-কে তিনি চিঠি দিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের বিরুদ্ধে। বলিয়াছেন, মানিক সরকার লোকটি বড়ই গোঁয়ার, দাম্ভিক। বাংলা, কেরলে বামেরা উৎখাত হইবার পর ত্রিপুরায় বিরোধীদের যাবতীয় 'পতিবাদ-প্রতিরোধ' অঙ্কুরেই বিনাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন মানিক সরকার। লাঠির জোরে।

রতনলাল আরও লিখিয়াছেন, 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী

হস্তক্ষেপ করুন।' কে না জানে, এই চিঠি পাইবামাত্র প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরায় 'হস্তক্ষেপ' করিবেন। রাজ্যপালের মাধ্যমে রতনেরা যে 'রাষ্ট্রপতি শাসন' চাহিয়াছেন, কালবিলম্ব না করিয়া, প্রধানমন্ত্রী তাহার নিমিত্ত রাষ্ট্রপতির নিকট কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সুপারিশ পাঠাইয়া দিবেন! কারণ, বিচক্ষণ মনমোহনজি বিরোধী নেতার সাঙ্কেতিক বার্তা সহজেই ধরিয়া ফেলিবেন। ১০-১১ জুলাই বহু কষ্টেসৃষ্টে যে 'পরিস্থিতি' সৃষ্টি করা গিয়াছিল, তাহা যে বিরোধীদের 'নিয়ন্ত্রণের বাইরে' দ্রুত চলিয়া যাইতেছে, তাহা প্রধানমন্ত্রীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া হাপুস নয়নে হস্ত পাতিয়া 'হস্তক্ষেপ' প্রার্থনা করিয়াছেন রতনলাল। ইন্টারনেটে কিংবা মোবাইলে এই সাঙ্কেতিক বার্তা বোঝানো যাইত কি! তাহা ছাড়া 'হ্যাকিং' অথবা আড়ি পাতিবার জন্য কোথায় কোন রুপার্ট মার্ডকরা ঘাপটি মারিয়া রহিয়াছে কে জানে! শুনিতেছি এবং পত্রিকায় পড়িতেছি, বিরোধী নেতা সর্বত্র মিটিংয়ে বলিয়া বেড়াইতেছেন, 'ত্রিপুরার দিকে দিকে আগুন জ্বলিতেছে। ডরাইবেন না। আমরা আসিয়া পড়িতেছি!' কেবল শ্রোতাকুল, পাঠককুল ভাবিয়া পাইতেছেন না, কী করিয়া তাঁহারা আসিয়া পড়িতেছেন!

'দিকে দিকে আগুন' কোথায় দেখিতেছেন রতনলাল! তিনি কি জাগ্রত রহিয়াছেন? নাকি ঘোরে রহিয়াছেন? ১১ জুলাই শহরে পুলিসের কিছু গাড়িতে তাঁহারা আগুন লাগাইয়াছিলেন বটে! কিন্তু তাহা তো নিভিয়া গিয়াছে। ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন। টি এম সি লইয়া বাংলার টি এম সি (তৃণমূল কংগ্রেস) ঢঙে সব লন্ডভন্ড করিবার 'শেষ সংগ্রাম'! কিন্তু, কী করিলেন? পরীক্ষা ঠেকাইতে পারিলেন না। ভর্তিও আটকাইতে পারিলেন না। এখন টি এম সি 'ইস্যু'-টার কী হইল? ছাত্র-দরদ, কলেজ-প্রীতি কোথায় হাওয়া হইল! আপনি দেখিতেছি ইস্যুটাই বেমালুম ভুলিয়া গিয়েছেন! একটা লাশ পাইতেই টি এম সি-র কথা নাই? দুই-তিন জন পত্রিকা মালিকের সহিত ঘোঁট পাকাইয়া সাংবাদিকদের একাংশকে রাজভবন অবধি লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু, কী কাকতালীয়, রাজ্যের অ্যাসেমব্লির নতুন ভবন উদ্বোধন হইতে না হইতেই সাংবাদিকদের সেই বিপ্লবী 'অ্যাসেমব্লি' ভ্যানিশ হইল। ওই দুই-তিনজনকে 'স্বার্থান্বেষী' চিহ্নিত করিয়া আটানব্বই শতাংশ সাংবাদিক 'অ্যাসেমব্লি' হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। চিন্তাশীল গত সোমবার তো এই স্বার্থান্বেষীদের কথাই বলিয়াছিল!

সবই যে 'নিয়ন্ত্রণ-এর বাইরে' চলিয়া গেল রতনলালবাবু! প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নিজেই আপনার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া চরম বিরক্ত, ক্ষুব্ধ। আবার কবে কোথায় আগুন জ্বালিবেন মনে মনে ইহাই জপিতেছেন, সন্দেহ নাই! কিন্তু দুই খান কথা আছে। না স্যার, আপনাদের চুলা প্রস্তুত হয় নাই! হইবেও না। লাকড়ি কয়লা শুকানো নাই। শুকাইবেও না। সবই তো ভিজা। বামফ্রন্ট আর মানিক সরকারের প্রতি সহানুভূতিতে ভিজা রাজ্যবাসীর অন্তরে আগুন জ্বালাইবেন কী করিয়া! কখনও জ্বালাইয়া তুলিতে পারিলেও সেই আগুন স্থায়ী হইবে না।

বরং অশান্তির আগুন জ্বালানোর পথ ছাড়িয়া উন্নয়নের বাতি জ্বালানোতেই বিরোধীদের গৌরব বাড়িবে। গণ-আস্থা মিলিবে। হাতজোড় কবিয়া বলিলেই লোকে ৮৩-৯৩ ভুলিয়া যাইবে না। আপনারা শান্তিশৃঙ্খলা রাখিবেন. উন্নয়ন করিবেন— কেহ ইহা আজও বিশ্বাস করে না। সহসা করিবেও না। এখন যাহা করিতেছেন, তাহাতে আপনার প্রতি বিতৃষ্ণা আর ভীতি আরও বাড়িতেছে।

তবুও ' আসিতেছি' বলিতেছেন? বলিতে থাকুন। কারণ, বিদায়ের কালেও যাই বলিতে নাই!

(প্রকাশ ঃ ২৫.০৭.২০১১)

ঝাঁপ-ঝাঁপান্ত

সপ্তাহে একদিনের একখান লেখায় দুই খান কথা! মন ভরে না। পেটও চলে না. ভাল মন্দ খাইতে না পারিলেও চলিত। কিন্তু বলিতে না পারিয়া পেট ফুলিয়া উঠিতেছে। চান্স নাই। কী করিব — বন্ধ সেলুনটার ঝাঁপ তাই আবার খুলিয়া দিয়াছি। ক্ষুরও ধরিয়াছি। সারাদিন চুল দাড়ি কাটিতে কাটিতে মনের খুশিতে বকবক করি। বাধা দিবার কেহ নাই (দিলে, বলা যায় না, অসাবধানে কানটান কাটা যাইতে পারে)। সেলুনে পত্রিকা দপ্তরের নিয়ম চলিবে না। হেথায় কাটাকুটির অথবিটি কেবল চিন্তাচরণের।

সেদিন চুল কাটিতেছি - ' এক রিটায়ার্ড যাত্রা-অভিনেতা গলা কাঁপাইয়া 'সিরাজদৌল্লা' শুনাইয়া গেলেন। আহা হা!' নবাব আলিবর্দি খাঁ, তোমার আদেশ আমি ভুলিনি জনাব! তুমি বলেছিলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কভু বিশ্বাস কোরো না .। মন বলিল — সত্যই, আজিকার দিনেও বিশ্বাস বড় বিষম বস্তু! কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ রাজা-কে বিশ্বাস করিয়া ফাঁসিবার মুখে দিল্লি। চারিদিকে অকাল-বৈশাখী ছাইয়া যাইতেছে। দুর্যোগের ঘনঘটা দিল্লির অম্বরে। চিদম্বরমের চিত্তে নাই শান্তি। স্বস্তি নাই মনমোহনজির মনেও। রাজা বলিয়াছেন. এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার কোটি টাকার স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারির বোঝা কেবল তাহাকেই বহিতে হইবে কেন? টু-জি লাইসেন্স বন্টনে ওই 'টু — জি' (চিদম্বরমজি এবং মনমোহনজি) সব জানিতেন! পরে রাজা সাহেব কিয়ৎ ঢোঁক গিলিলেও মূল কথার আমূল পরিবর্তন করেন নাই। চুলে গোদরেজ কলপ লাগানো শেষ হইতেই রিটায়ার্ড যাত্রা-অভিনেতা বলিলেন, 'মনমোহনজির স্ব-পদ থাকিয়াও নাই (যাহা না থাকিয়াও আছে — সোনিয়াজির) বিপদও নাই। কিন্তু চিদম্বরম জানেন, তিনি ফাঁসিলে সহজে নিস্তার নাই। তাই স্থানান্তরে এবং প্রসঙ্গান্তরে ছুটিতেছেন। বাংলাদেশ যাইবার আগে ত্রিপুরায় আসিয়া কংগ্রেস নেতা কর্মীদের বলিলেন, 'এইবারই শ্যাষ সুযোগ বাম হটাইবার। ঐক্যবদ্ধভাবে এখনই ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে'। বুঝিলেন না চিন্তাভাই, অফেন্স হইল বেস্ট ডিফেন্স!'

মাথা ঝাঁকাইয়া বুঝিবার ভান করিলাম! তেমন বুঝিলাম না। তবে, ঝাঁপাঝাঁপি তো সেই কবে হইতেই চলিতেছে। সকলেই স্বঘোষিত কমান্ডার ইন-চিফ! নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠীর

মতন। কখন কোন নেতা কত তলার ছাদ হইতে ঝাঁপ দিবেন কেহই আগাম অনুমান করিতে পারেন না। এক নেতা আসর জমাইয়া তুলিলেই অন্য গোষ্ঠীর আরেক নেতা সম্পূর্ণ অন্য সুরে গাহিয়া উঠিতেছেন। জায়গা বড়ই সীমিত। কোথায় গিয়া কী লইয়া আন্দোলন করিবেন বাহির করা কী সঙ্কট! বর্ণমালার 'অ' কিংবা 'ক' হইতে শুরু করিয়া পরপর খুঁজিতে হয়। যেমন অ-আ-ই পার করিয়া 'উ'-তে 'উগ্রপন্থী' শব্দ মিলিল। ধুস্ —জমিবে না। কোথায় যে সব কর্পূরের মতন মিলাইয়া গেল! আহা-রে! কী দিন ছিল। প্রতিদিন ধুড়ুম-ধাড়ুম! ফটা-ফট্ ফটা-ফট্। রক্ত, লাশ, আতঙ্ক, ফুলের মালা! তারপর চাই-চাই মিছিল! সেই নানা রঙের দিনগুলি সব শ্যাষ! উগ্রপন্থী ভাইসকল, তোমরা কোথায়। আবার জাগিয়া উঠ! না —'উ'-তে বেশি সময় থামিয়া থাকা চলিবে না। 'উন্নয়ন' আসিয়া পড়িলে রক্ষা নাই! 'ক'-তে 'কেলেঙ্কারি' শব্দটা মন্দ নয়। কিন্তু বাম সরকারের মন্ত্রীগুলানের মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি নাই। মারিয়া খাইতে জানে না। মাত্র পাঁচ বছরে আমরা দেখাইয়াছি মারিং-মেধা কাহারে কয়। কেলেঙ্কারি কাহাকে বলে। আগুন খাইয়া কী করিয়া হজম করিতে হয়! জমি, জলের পাইপ, টিন কত কিছু হজম করিয়াছি। আর চিদম্বরমজি, কেলেঙ্কারির কথা তুলিতেই লোকে দিল্লিব দিকে আঙুল তুলিয়া দেখায়! না— 'ক'-তেও হইবে না। 'গ'-তে গণতন্ত্র? শুনিতে চমৎকার। বামফ্রন্টের আমলে গণতন্ত্র বলিতে কিছুই নাই। সব দলতন্ত্র। স্বৈরতন্ত্র। কিন্তু, কেমন যেন আন্-সুরা শুনাইতেছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত, পুরপরিষদ, ভিলেজ কমিটি, এ ডি সি এমনকি ল্যাম্পস প্যাকসেও নিয়মিত ভোট হয়। নিয়মিত বামেরাই জিতিয়া থাকে, আর আমরা আরও নিয়মিত পরাজিত, বিধ্বস্ত হই। বাদ দ্যান, আমাদের জোট-রেকর্ডের খাতা মেলিয়া ধরিলেই তো 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা'!

'ছ'-তে ছাত্র, হ্যাঁ ঠিক। ছাত্র-যুবদের আগে ধরিতে হইবে। কলেজগুলিতে বিপ্লব ঘটাইবার কত আয়োজন শেষমেশ নিভিয়া গেল। 'ভ' -তে ভিকিপ্রসাদকে 'বিপ্লবী' সাজাইয়া সুদীপরা ঝাঁপাইলেন। বেশ জমিয়া উঠিল। ২৩ মে ত্রিপুরা বন্‌ধের নামে যা যা ঘটানো হইল, উল্টা ফল ফলিল। সমীর-সুদীপ দেখিলেন, দলের ভিতরেই ধাড়ি ইঁদুরেরা বেড়া কাটিতেছে। পা ফেলিতে যাইতেই পায়ের নিচে দলবন্ধুরা কাঁটা বিছাইয়া দিতেছেন। আরেক স্বঘোষিত 'ভাবি কান্ডারি' সুবল ভৌমিক 'ভ'-তে ভূমি সুরক্ষার নামে জমজমাট মেলোড্রামা শুরু করিয়াছিলেন। প্রথমে বিরোধিতা করিলেও পরে পাশে দাঁড়াইয়া সুবল-দিলীপের পিঠ চাপড়াইলেন সভাপতি সুরজিৎ। ভ্রূকুটি করিলেন সমীর-সুদীপ। পুলিস আন্দোলন-এর 'ট্রেড মার্ক' কপালে মারিয়া কোথা হইতে প্রবীর দাসচৌধুরিকে কংগ্রেস ভবনের সামনে অনশনে বসাইয়া দেওয়া হইল। যোগবাবা রামদেব-এর অনশন-কাণ্ড ভঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের টোট্‌কা-র অতিকিঞ্চিৎ মাত্রা প্রয়োগ করিল রাজ্য সরকার। স্বস্তি মিলিল উদ্বিগ্ন রতনলালের। তিনি দেরি না করিয়া ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ লইয়া ঝাঁপাইলেন। ১০-১১ জুলাই জব্বর জমিল। লাশও মিলিল। কিন্তু, ফ্রিজে ঢুকিয়া রহিলেন কংগ্রেস সভাপতি।

মাথা ঠান্ডা রাখিতে। পিছনের বেঞ্চ হইতে সুবল ভৌমিক একটা মোক্ষম আবিষ্কার করিলেন ঠিক এই ক্রান্তিকালে। সাংবাদিকদের ডাকিয়া কহিলেন —আসলে ১০-১১ জুলাইয়ের সমগ্র ঘটনাই মানিক সরকারের পূর্বপরিকল্পিত। কেন? প্রবীর দাস চৌধুরির অনশনের ফলে পুলিসের মধ্যে যে 'সিপাহী বিদ্রোহ' ঘটিতে যাইতেছিল, তাহা হইতে সকলের দৃষ্টি ঘুরাইয়া দিতে এবং পুলিসের সহিত কংগ্রেসের সম্পর্ক খারাপ করিতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই চক্রান্ত! ইহা নতুন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক আবিষ্কার নহে? সুবল ভৌমিক আসলে কী কহিতে চাহিলেন? ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ লইয়া এই আন্দোলন এবং পুলিসের ভূমিকা সবটাই হইল 'গট-আপ'! মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সহিত গোপনে হাত মিলাইয়া এই আন্দোলন করা হইয়াছে। ইহা গভীর যড়যন্ত্র! প্রবীরের অনশন (এবং আমার ভূমি সুরক্ষা আন্দোলন) হইতে অন্য দিকে দৃষ্টি ঘুরাইতে রতনলাল নাথের টি এম সি আন্দোলন! জনান্তিকে সমীর -সুদীপ হাসিলেন! সুবল ভৌমিক নিজের এই 'ভারী' বক্তব্যকে হালকা করিতেই কি পরে আবার সাংবাদিক সম্মেলন করিলেন? এইবার কী বলিলেন তিনি? 'রাজ্যের প্রত্যেক টি এস আর জওয়ানকে মুখ্যমন্ত্রীর এক লক্ষ টাকা দিবার টোপ' -এর আজগুবি গল্পখানা বাজারে ছাড়িবার চেষ্টা করিলেন। বাহবা বাহবা কংগ্রেস! এই সার্কাস খেলার মধ্যে গোপাল এবং বীরজিৎ-রা যথাসম্ভব দিল্লির লবিতে আংটা দিয়া ঝুলিয়া থাকিতেছিলেন। ঝাঁপাঝাঁপির হাউই বাজিগুলান আকাশে কিঞ্চিৎ ধূম্রকুণ্ডলী রাখিয়া সবই মাটিতে আছড়াইয়া পড়িয়াছে! ইহা বুঝিতেই 'আইন অমান্য'-এর নামে বীরজিৎ সিংহ এখন হাতে ময়দা মাখিয়া 'ওয়েট লিফটিং'-এর আসরে অবতীর্ণ।

সুতরাং, চিদম্বরমের উপদেশে নহে, আপন আপন ভবিষ্যৎ গড়িতেই কং-নেতারা পরস্পরের স্কন্ধে চড়িয়া ঝাঁপাইয়া চলিয়াছেন। যতদিন কংগ্রেসের ঝাঁপ বন্ধ না হয়, ততদিন এই ঝাঁপঝাঁপি চলিবে। চলিতেই থাকিবে.

(প্রকাশ ঃ ০১.০৮.২০১১)

টিনের তলোয়ার

দশ মাথার বাবণও আজকাল নয়টা মাথা লুকাইয়া রাখে। নহিলে চুল দাড়ি কাটিবার দশগুণ চার্জ! রাক্ষস খোক্কস দানবেরা যেমন খুশি চেহারা বদল করিতে পারে জানি! তাই ধরিয়া লইয়াছি, দেবতা-দানব-যক্ষ, বিশেষত মনুষ্যমাত্রই ঘাড়ে অন্তত একটা আসল মাথা থাকিবে। না থাকিলেও ক্ষতি নাই, দুইখান গাল তো থাকিবেই। অবশ্য মাথা থাকিলেও চুলের গ্যারান্টি নাই। টাকার স্ফীতির সঙ্গে দিকে দিকে টাকের সংখ্যারও যেভাবে স্ফীতি ঘটিতেছে! আরও দুঃখের, দুনিয়ার অর্ধেক গাল এমনিতেই মরুভূমি! নিত্য রঙ মেক-আপের বৈজ্ঞানিক সার প্রয়োগেও নিষ্ফলা। কিন্তু, চুল আব দাড়ি থাকিলে. তুমি দাদা—হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান জৈন শিখ ইশাই — যেই হও, চিন্তা শীলের ক্ষুর কাঁচির তলায় মাথা আর গাল পাতিয়া দিতেই হইবে। তারপব মনে মনে জপ করিবে – রাখো মারো, যাহা করো সবই তোমার ইচ্ছা!

ইত্যাদি দর্শন-কথা ভাবিতে ভাবিতে সাদা কাপড়ের অভাবে পত্রিকা ফুটা করিয়া খরিদ্দারের মস্ত গোল মাথায় বসাইয়া দিলাম। কাঁচিব কিঁচির-কিঁচির শুরু করিতেই ফুটা পত্রিকার গায়ে একটা হেডিং নজরে আসিল। কুমারঘাটের বেলগাড়িতে তিন পকেটমার ধরা পড়িয়া পকেট কাটিবাব কলাকৌশল পুলিসের কাছে খোলসা করিয়াছে। ইহা আব নূতন কথা কী! চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি ধরা না পড়ে। ধবা না পড়িলে কোনও কথা নাই। ধরা পড়িলে দুই খান কথা আছে' মনে পড়িল বাল্যকালে বাবোস্কোপে তিন পকেটমারের শিল্পকলা দেখিয়াছি। একজন ধরা পড়িলে ভিড়ের মধ্যে বাকি দুই পকেটমার ভালমানুষ সাজিয়া তাহাকে তুমুল গালাগাল সহযোগে যৎ-কিঞ্চিৎ চড়-চাপড় মারিয়া মারমুখি জনতার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া যায়। কী অব্যর্থ মহাকৌশল! কিন্তু, তিন পকেটমার একত্রে ধরা পড়িলে জারিজুরি খাটে না। চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই বাহির হইয়া পড়ে।

আমাদের সংসদে সঙ সাজিয়া জনদরদের রঙ দেখান যাঁহারা, নিজেদের ওইরূপ মাসতুতো ভাই প্রমাণ করিলে তাঁহাদের লইয়া কী করি! দিল্লির দশাননেরা প্রতিদিন দশ মুখে গোগ্রাসে জনগণের লক্ষ-কোটি টাকা উদরে পুরিতেছেন। হাতে নাতে ধরা খাইয়া কাহারও বাসস্থান

'তিহার' হইলেও বাকিদের গলে পুষ্পহারের তলে কালো টাকার বাহার! তাঁহারা দশ হাতে দেশবাসীর পকেট কাটিতেছেন আর বাকি দশ হাতে আম্বানি -বিড়লা-টাটাদের সেবা করিতেছেন। ক্যাগ-এর কালো শিলমোহর পড়িয়াছে দিল্লির কংগ্রেস শিলা-মুখ্যমন্ত্রী হইতে প্রধানমন্ত্রীর গিলা অফিসেও। বাজার -দুর্নীতির বিকারে বিশ্বলুটেরা আম-রিকার দোসর হইয়া তাঁহাদের আত্মপ্রসাদের অন্ত নাই। আম আদমির বারোটা বাজাইয়া বারো মাসে বারো বার পেট্রোপণ্যের দাম বাড়াইয়া বলিতেছেন, বাজার বাড়িলে ব্যাজার মুখে মানিয়া লইতে হইবে। খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে এ দেশের ৯০ ভাগ মানুষ দিশাহারা। কিন্তু তাঁহারা বলিতেছেন— ইহা অর্থনীতির অপরিসীম সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী খুশি ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন, দেশের মানুষ কিনিতেছে খাইতেছে পরিতেছে। মরিতেছে না। মন্বন্তর নাই, দুর্ভিক্ষ নাই! অর্থনীতিবিদরা হিসাব করিয়া দেখাইতেছেন— দেশের ৭০ ভাগ মানুষ দিনে ২০ টাকা রুজি করিতে পারে না। এক বেলাও পেট পুরিয়া খাইতে পারে না। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সকলকে বাজারে ঠেলিতেছেন! অপশন দুইটা। হয় বাজারে, নয়তো মাজারে! আহা-রে স্বাধীনতা! নেহরুজি কালোবাজারী- মজুতদার-মুনাফাখোর-ভেজালদারদের ল্যাম্প-পোস্টে ঝুলাইয়া ফাঁসি দিবেন বলিয়াছিলেন। এই গোমুর্খ চিন্তাও মর্মে মর্মে বুঝিতেছে, নেহরুজি নিজেও আগামী ইন্ডিয়াকে ডিসকভার করিতে পারেন নাই। তিনি যখন বলিয়াছিলেন তখন কালোবাজারী মজুতদারের সংখ্যা কম ছিল, তুলনায় ল্যাম্প-পোস্টের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। কাহাকে কোথায় ঝুলাইবেন স্থির করিবার আগেই গদি অস্থির হইয়া উঠিল! এখন দেশের একেকটা ল্যাম্প-পোস্টে দশজন করিয়া দাগি কালোবাজারীকে ঝুলাইলেও পোস্টে টান পড়িবে! তাই প্রতিশ্রুতি কার্যকর হইবার কোনও আশা নাই! তবে, কালোবাজারীরা ফাঁসিতে না ঝুলিলেও গত দশ বছরে দুই লক্ষের বেশি চাষী দেনার দায়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়াছেন— ইহাই বা কম সাফল্য কী!

সারা দেশে মূল্যবৃদ্ধির অগ্নিশিখা দাউ দাউ জ্বলিতেছে। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সরকার অস্বীকার করিতেছেন না, বলিতেছেন – কিছুই করিবার নাই! সবই বিশ্ববাজারের লীলাখেলা! কালাধন, দুর্নীতি, লোকপাল লইয়া ১৬ আগস্ট আবার অনশনে বসিতে চাহিলে কী হইবে, গান্ধীবাদী আন্না-কে 'আর না' বলিয়া চক্ষু রাঙাইতেছে কেন্দ্র। টগবগ করিয়া ফুটিতেছে দেশবাসী। বিজেপি, তৃণমূল যেই দেখিতেছে কেন্দ্রের কংগ্রেস বিপাকে, অমনি মুখে রঙ মাখিয়া রঙ্গমঞ্চে টিনের তলোয়ার ঘুরাইতেছে। মারমুখি জনতার দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরাইয়া দিবার নৈতিক আত্মীয়তা। বম্‌চিকা ডিকা-ডিকা নাচিয়া আম-রিকার পিরিতি-নজরে কার আগে কে পড়িবে তাহার প্রতিযোগিতা। বে-আদপ বামপন্থীরা করিলেন কী, সংসদে ভোটাভুটি চাহিয়া এক লাইনে প্রস্তাব করিলেন, 'মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিতে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যর্থ'। এই প্রস্তাব পাস হইলে উপা সরকার পড়িত না, মহাভারতও অশুদ্ধ হইত না! কিন্তু

আহা, কী শুনিলাম ! কী দেখিলাম !

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তাঁহার ভাষণে আগের বিজেপি সরকারের অর্থমন্ত্রীর ভুয়সী প্রশংসা করিলেন। পেনশন, বিমা, ব্যাঙ্ক, বেসবকারিকরণে একযোগে কাজ করিবার উদাত্ত আহ্বান করিলেন। যেন বলিয়াই দিলেন —- আসেন, আর ভড়ং কারয়া কাজ নাই। এখন বামেরা সংসদে কমিযাছে। দুই রাজ্যে হটিযাছে। এইবার স্কন্ধে স্কন্ধ মিলাইয়া চলি। আমরা একই নৌকার যাত্রী ! খুশি খুশি মুখে কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিল বিজেপি এবং তৃণমুল। দেশবাসীর সামনে ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ ঝলকিযা উঠিল। সঙের মুখের রঙ খসিল। 'মাসতুতো ভাই'-এর বেসরমি গলাগলি প্রকট হইল !

কুমাবঘাটেব বেলগাড়িতে একসঙ্গো ধবা পড়িয়া তিন পকেটমারের যে অবস্থা হইয়াছে, -সংসদে কংগ্রেস-বিজেপি-তৃণমূলেব হকিকতের সহিত তাহার হুবহু মিল খুঁজিয়া পাইযা চিন্তা শীলের কাঁচি অতি দ্রতবেগে কিঁচিব-কিঁচির করিয়া উঠিল।

(প্রকাশ ঃ ০৮.০৮.২০১১)

খোলা চিঠি

শ্রীল শ্রীযুক্ত মানিক দেব মহাশয়,
(প্রাক্তন অধ্যাপক) রাজ্য-তৃণমূল-কুলাধিপতি, আগরতলা, ত্রিপুরা

মান্যবর স্যার,

এই অক্রিয় অকর্মণ্য চিন্তা শীলের শতকোটি প্রণাম গ্রহণে কৃতার্থ করিবেন। শকুন্তলা রোডে তৃণমূল কংগ্রেসের মিশন-২০১৩ সভায় কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী মুকুল রায় এবং আপনার ফাটাফাটি ভাষণ পত্রিকায় পাঠপূর্বক বড়ই রোমাঞ্চিত হইয়া এই পত্র লিখিতেছি।

২০১৩-তে ত্রিপুরায়ও তৃণমূলের সরকার হইবে – এই সচিৎকার ঘোষণা যে সত্য হইবেই, তাহাতে কোনওই সন্দেহ অবশিষ্ট নাই। মুকুল যখন আসিয়াছে, আমও ধরিবে। দিদির 'বামহস্ত' ইঙ্গিত করিয়াছেন, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিলাবৃষ্টি থামিতেই দিদিও আসিবেন! শিলায় বাঁচিলে টিলায় টিলায় আম পাকিবে। তখন 'পাড়িব মনের সুখে, খাইব আহ্লাদে...'। আমরা স্যার, ত্রিপুরার আম-আদমি আদার ব্যাপারী। মুকুলবাবুর জাহাজের খবরে কাজ নাই। ভাবিতেছি, রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে একবার খোয়াইয়ে কংগ্রেসের এক নির্বাচনি মিটিংয়ে ত্রিপুরার নদীগুলিতে জাহাজ চালাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন! ফিডব্যাক-এর ভুল। শ্রোতারা হাসিতেও ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন, কী আশ্চর্য, তাঁহারই ৬৮তম জন্মদিনে কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় উপা-র তৃণমূলী প্রতিমন্ত্রীও ত্রিপুরায় অন্য এক জাহাজ চালাইবার কথা বলিলেন! জাহাজের গায়ে লেখা থাকিবে 'তৃণমূল সরকার ২০১৩'। কিন্তু স্যার, আপনি তো ত্রিপুরার 'গ্রাউন্ড রিয়ালিটি' জ্ঞাত রহিয়াছেন। এখানে– 'আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে'। এইখানে জলে জাহাজ চলে না। আকাশে চলে। প্রতিবারই 'আইতাছি, আইয়া পড়ছি' বলিতে বলিতে মিশন-এর উড়াজাহাজ দূর আকাশে মিলাইয়া যায়। রাজীবজির জাহাজ বালুচরে মুখ গুঁজিয়াছিল, মুকুলবাবুর জাহাজও পথ খুঁজিয়া মরিবে। 'তৃণমূলের নেতৃত্বে সরকার হইবেই!' মঞ্চে বসিয়া আপনি স্যার যদি বার কয়েকও খুক্ খুক্ কাশিতেন– 'বাঘের তেরো হাত ল্যাজ' অন্তত কয়েক হাত কমিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারিত!

কিন্তু স্যার, ভয় পাইতেছি, বিরোধী নেতার পাপের ভাইরাস (ভুল সংশোধন–

পেপার-ভাইরাস) আপনাকেও আক্রান্ত করে নাই তো? বাদল চৌধুরিকে 'অপদার্থ অর্থমন্ত্রী' গাল পাড়িয়া আপনি বলিয়াছেন– প্রত্যেক ত্রিপুরাবাসীর মাথায় এখন ১৯,৫০০ টাকার ঋণ। বাদলবাবুরা কিছু বলিবেন কিনা জানি না। আগেই বিরোধী নেতা এক বেফাঁস মন্তব্য করিয়া বেদম ফাঁসিয়াছেন। ওরে বাপ্‌রে! বাদলবাবু তাঁহাকে কাঠগড়ায় তুলিয়া ঠেসিয়া ধরিয়াছেন। কাগজে পড়িলাম, আদালতে বিরোধী নেতার গরহাজিরার জরিমানাও হইয়াছে। কিন্তু স্যার, ক্ষমা করিবেন। মাথাপিছু ঋণের ক্যালকুলেশনে আপনি একটু ভুল করিয়াছেন। ত্রিপুরাবাসী তো ভারতবাসীও। দেশ-বিদেশের বাজারে ভারত সরকারের ঋণের পরিমাণ এখন কত? বিদেশের কাছেই দেনা ৬ লক্ষ কোটির উপরে। ১২০ কোটি ভারতবাসীর মাথাপিছু দেশি-বিদেশি মোট দেনা শুনিতেছি ২৫ হাজার টাকার বেশি। মুর্খ চিন্তা শীলের ভুল হইলে ক্ষমা করিবেন। এই হিসাবটা জুড়িলে ত্রিপুরার মানুষের মাথাপিছু দেনা দাঁড়াইতেছে ৪৫ হাজার। স্যার, একখান কাম করিলে কেমন হয়?

এন ডি এ এবং ইউ পি এ সরকারের (দুই সরকারেই আপনাদের নেত্রীও মন্ত্রী ছিলেন) আমলে শীর্ষ নেতাব্যক্তিদের কেরামতিতে লুট হওয়া সরকারি অর্থের পরিমান ৩ লক্ষ ৫০ হাজার কোটির বেশি হইবে (স্পেকট্রামেই ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি)! ত্রিপুরার ৩৫ লাখ মানুষের মধ্যে সেই টাকা যদি বিলাইয়া দেওয়া যাইত, মাথাপিছু কত প্রাপ্তি ঘটিত বলিবেন? আইজ্ঞা হ্যাঁ, ত্রিপুরার প্রত্যেকে পাইতেন মাত্র ১০ লক্ষ টাকা করিয়া! একখান ছুট্‌কিয়া (শিশু)-ও জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ১০ লাখের মালিক হইত! এক ইস্তিরি এবং ৯ সন্তানসহ এই হতভাগ্য চিন্তা শীলের ভাগ্যে জুটিত একুনে ১ কোটি ১০ লাখ! সেই টাকার দুই মাসের সুদেই আপনার উল্লিখিত 'ঋণ' শোধ করা যাইত! স্যার, আপনার পরিবারেও কম আসিত না!

সরি! এই মাথামোটার উপর রাগ করিবেন না। আমার আরও একখান কথা আছে। বিদেশের ব্যাঙ্কে ভারতের রাঘব বোয়াল 'চোর'-দের কালো টাকার পরিমাণ মাত্র ৬৭.৫ লক্ষ কোটি! এই চুরির টাকা ফিরাইয়া আনিলে দেশের সব ঋণ শোধ হইয়া যা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহাও যদি ত্রিপুরাবাসীকে দেওয়া যায়, প্রত্যেকে পাইবেন এক কোটি টাকারও বেশি। আইজ্ঞা না স্যার, চিন্তা শীল মোটেই উন্মাদ নহে। তাহার এই রকম ভাবিবার কারণ হইল– এই টাকা তো আমাদেরই টাকা, ত্রিপুরার তথা দেশের চাষাভূষা মজুর মধ্যবিত্ত, ছোট ব্যবসায়ী, ছোট শিল্পোদ্যোগী, শিক্ষক, কর্মচারীর টাকা! আমরাই ইহার হক্‌দার। এই টাকা দেশে ফিরাইবার কথা তো আপনাদের মুখে শুনিতে পাইলাম না! বাজারে জিনিসের দাম বাড়াইয়া সারা দেশে এই যে বেনজির লুণ্ঠন চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধেও আপনাদের কোনও কথা নাই?

কিন্তু স্যার, ওই যে—ওইটা আপনি কী বলিলেন? 'ত্রিপুরার কংগ্রেস নেতারা সব দুর্নীতিগ্রস্ত'! ছি: ছি: ! অমন কথা মুখে বলিতে আছে? জোট আমলে মন্ত্রী হইতে 'ডিফিটেড এম এল এ' তথা গ্রামের স্বঘোষিত উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যানদের কোটি-কোটি টাকা লুটপাটের

কাহিনী মনে করাইয়া আপনার কী লাভ ? এত অকৃতজ্ঞ হইলে চলিবে ? তখন যে আপনিও কংগ্রেসের দুরন্ত বাগ্মি নেতা। অসুরবাহিনীর জামা হইতে রক্তের দাগ ধুইয়া ফেলিতে ব্যস্ত। দল এক সময় আপনাকে সংসদেও পাঠাইতে চাহিয়াছে। দুর্ভাগ্য ! পাস করিতে পারেন নাই। ল্যাং মারামারিতেও পারিয়া উঠেন নাই ! আপনি অধ্যাপক মানুষ। শিক্ষাদানের অভ্যাস মজ্জাগত। এই সপ্তাহে স্যার, কতকিছু যে শিখিয়াছি! 'অহিংসা' কাহাকে বলে, শিখাইয়া গেলেন বাবুরবাজারের জোড়া খুনে অভিযুক্ত কংগ্রেস নেতা বীরজিৎ সিংহ মহাশয়। শকুন্তলায় আপনিও ক্লাস-লেকচার দিলেন। আমরা শুনিলাম। কেবল ওই 'ত্রিপুরার' শব্দখানা খটাং করিয়া বেতালা লাগিতেছে। 'ত্রিপুরার' কংগ্রেস নেতারা দুর্নীতিগ্রস্ত, আর বাহিরের কংগ্রেস নেতারা সাধুসন্ত ? দিল্লির সরকারে আপনারাও রহিয়াছেন বলিয়া ৩০ হাজার কোটি লুটের নায়ক কংগ্রেস নেতা সুরেশ কালমাদি বা মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতদের কথা ভুলিয়া যাইতে হইবে ? নির্বাচনী জালিয়াতির দায়ে আদালতে অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদম্বরমের কথা বলা যাইবে না ? আগাপাশতলা দুর্নীতিতে ডুবিয়া থাকা কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের সমর্থনে 'রামধুন' গাহিতে হইবে ? পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস আপনাদের জোটের শরিক বলিয়া তাহাদের কথাও এহো বাহ্য ? কিন্তু, আপনাদের গাত্রেও তো স্যার সেই কংগ্রেসেরই গন্ধ ! আপনাদের দলের উপর হইতে নিচে, সবই তো সেই পরিচিত কংগ্রেসি মুখ। জোট আমলের কলঙ্কিত, অর্ধ-কলঙ্কিত চেহারা ছাড়া আর চেহারা কই ? ত্রিপুরার কংগ্রেস নেতারা দুর্নীতিগ্রস্ত, ইহা কে না জানে ! ইহারা উপজাতি-বিরোধী (এ ডি সি বিরোধী), শান্তি সম্প্রীতি-বিরোধী, এ রাজ্যে রেল আনার বিরোধী, উন্নয়ন-বিরোধী ভূমিকা লইয়াছিলেন বলিয়াই মানুষ প্রতি নির্বাচনে উহাদের বর্জন করিয়াছে, করিয়াই চলিয়াছে। মানুষের বিশ্বাস অর্জন করিতে ওই দলের নেতারা ২০১৩-এর আগে খুবই প্রচেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু, একই দোষের ভাগী তো স্যার আপনারাও। শকুন্তলা রোডে আপনারা বলিলেন— 'কংগ্রেস গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত।' এইটা স্যার— চালুনি আর সূচ-এর গল্প ! আপনাদের রাজ্যে তৃণমূলে সাড়ে তিনজন নেতার সাড়ে তিন গোষ্ঠী। বাহিরে ভিতরে সেই এক কংগ্রেসি ঘরানা ! একই মানুষ। একই নীতি। একই সংস্কৃতি। মোড়ক বদল করিলেই তিক্ত কুইনাইনের স্বাদ যে বদল হয় না, এই কথা বুঝিবে না— ত্রিপুরাবাসী কি তেমনই মূর্খ ?

স্যার, ঝাড়িয়া কাশিলে ক্ষতি কী ? কংগ্রেসের সহিত জোট চাহিতেছেন, কিন্তু 'দুর্নীতিগ্রস্ত' কংগ্রেস নেতাদের বাদ দিয়া আপনাকেই সেই 'জোট'-এর নেতা করা হউক। ইহাই তো স্যার অন্তরের অন্তস্থলের কথা ? ভালো, বেশ বেশ ! এই যে দ্যাখেন স্যার, না না— দেখিবেন কী করিয়া ! তবুও বলি – চিন্তা-গিন্নি এই এতক্ষণ পরে চিরণ দাঁত মেলিয়া হাসিলেন। চিন্তা শীলের গত সংখ্যার 'সাত' কাটিয়া 'আট' লিখিলেন। অস্ফুটে বলিলেন— দাবিদার বাড়িল। চোখে মুখে করুণ চিহ্ন ফুটাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— আইচ্ছা কও তো, মুখ্যমন্ত্রী যে চেয়ারে বসেন, উহা কি কাঠের ? শক্তপোক্ত ? অষ্টকোণের টানাটানিতে টিকিবে তো ? নিজের এবং গিন্নির হইয়া ক্ষমা চাহিয়া সমাপ্ত করিলাম। — নমস্কারান্তে ইতি ...

(প্রকাশ : ২২.০৮.২০১১)

ইনাফ ইজ ইনাফ!

‘কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।’ আল কায়দা-র ওসামা বিন লাদেনও বোধকরি রবীন্দ্রনাথের কাদম্বিনীকে ফলো করিতেন । না হইলে পাকিস্তানের ‘গুপ্তঘাঁটি’-তে মার্কিন বোম্বেটেদের হামলায় তাহাকে কেন বেঘোরে মরিয়া প্রমাণ করিতে হয় যে, তিনি আগে কখনও মরেন নাই? হায় রে, ওয়াশিংটন আগে যে কতবার তাহার ‘মৃত্যুসংবাদ’ প্রচার করিয়াছে। লাদেন শেষমেষ মবিয়াই ওয়াশিংটনকে ‘মিথ্যাবাদী’ প্রমাণ করিয়া ছাড়িয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি হইলেও বাঙালি। তাঁহার ‘জীবিত ও মৃত’ গল্পের কাদম্বিনীও ছিলেন বাঙালি। ধারণা হইতেছে– আই এন পি টি দলের বিজয় বাঙ্খলেরা সেই মোক্ষম (!) কারণেই তাঁহাদের ফলো করেন নাই। বরং, ২৭ আগস্ট শকুন্তলা রোডে•সমাবেশ করিয়াই প্রমাণ করিলেন, তাঁহারা মরেন নাই।

বিজয় রাঙ্খল, নগেন্দ্র জমাতিয়াদের অবস্থা– ছোটবেলায় ঢাকা রেডিয়োতে শোনা সেই আধুনিক গানটার মতো। ‘ভাবী যেন লাজুকলতা / ছলাকলা কিছুই জানে না/সে যে মনের কথা মনে রাখে/মুখে আনে না’। মুখে বলিতেছেন মেডিক্যালে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদেব আসনের জন্য ‘কাট অব মার্কস’-এর কথা। আর মনে ২০১৩-র বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের কাছে অন্তত পনেরোটি আসনের বাসনা। গত বিধানসভা ভোটে ১৪ আসনে প্রার্থী দিয়া অতিকষ্টে একখানায় কানঘেঁষা জয় পাইয়াছিলেন বিজয়। তাহাও প্রধানত কংগ্রেসের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া! লোকসভা, ভিলেজ কমিটি এবং এ ডি সি-ব ভোটে কোথাও তাঁহাদের খবর নাই! জোট না হইলে উপজাতি সংরক্ষিত আসনেও কংগ্রেসের পিছনে তৃতীয় স্থান জুটিতেছে। অধিকাংশ নির্বাচনে জামানত বাঁচিতেছে না। সব পরীক্ষায় ডাহা ফেল! ১৫-২০ নম্বরও জুটিতেছে না। জোটের জন্য কংগ্রেসের কাছে তাই ‘কাট অব মার্কস’১০-এ নামাইতে প্রার্থনা! সঙ্গে ‘এখনও মরি নাই’ বুঝাইতে সারা রাজ্য হইতে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া শকুন্তলায় জমায়েত!

উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের মেডিক্যাল-ভর্তির জন্য ‘কাট অব মার্কস’ কমানোর দাবি তো রাজ্যের বাম সরকারও জানাইয়াছিল। ইহা মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া আর কেন্দ্রীয়

সরকারের বিষয়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সাফ বলিয়া দিয়াছে, 'মেডিক্যাল শিক্ষা'-র ক্ষেত্রে 'কাট অব মার্কস' কমানো সম্ভব নহে, বাঞ্ছিতও নহে। কেন্দ্রে যেহেতু 'দাদা কংগ্রেস', তাই ভাবী (বাসই, বৌদি) তাহার বদনাম করিবেন কী করিয়া! বিজয়-নগেন্দ্ররা তাই ব্যাখ্যা করিলেন, ইহার জন্যও নাকি রাজ্যের বাম সরকারই দায়ী! কেন, কী করিয়া? জলবৎ তরলম। রাজ্য সরকার তো জানিতই 'কাট অব মার্কস' কমানো সম্ভব নহে, আগে জানায় নাই কেন? যেন, আগে জানাইলেই ছাত্রছাত্রীরা বেশি নম্বর পাইত! ইচ্ছা করিয়া খারাপ পরীক্ষা দিত না! আহা-হা, ইহা যেন সেই আজব কবির আজগুবি কবিতা—'উত্তর থাইক্যা আইল বাতাস/ উড়াই নিল ঢেঁকি/ হাঁটু বাইয়া রক্ত পড়ে, কার বাপের সাধ্য!' ছন্দ মিলে নাই? মিলাইলে মিলিবে, না মিলিলে 'খাজুর গাছ!'

একখান ব্যক্তিগত কথা বলি। চিন্তা-গিন্নি আদর করিয়া যখন স্বামীকে 'বুদ্ধির ঢেঁকি' বলেন, তখন বাহিরে রাগ দেখাইয়াও অন্তরে বড়ই গৌরব হয়। 'এক মাথা বুদ্ধি'র তুলনায় 'এক ঢেঁকি বুদ্ধি' পরিমাণে কতখান বেশি, ইহা না বুঝিবার মতন নির্বোধ নহে চিন্তা শীল। কোনও মুষ্টিযোদ্ধার পাঞ্চ না খাইলেও গিন্নির কথা আলাদা। কথায় কথায় পাঞ্চ মারেন। আমার নাকি পঞ্চকৌণিক চেহারা। খোঁড়ল-চক্ষু। অক্ষয়কুমার বড়ালের ভাষা চুরি করিয়া বড় শ্যালিকা বলেন, 'বাছার চক্ষু-যুগল এমনই কোটরাগত যে, চিৎ হইয়া কাঁদিলে চক্ষের জল চক্ষেই থাকে।' কঞ্জুস ভায়রাভাইয়ের ঘরে বাই চান্স লাঞ্চ-এর পর চিৎ-শুইয়াই আই এন পি টি নেতাদের দুঃখের কথা ভাবিতেছিলাম। ভিজা-ভিজা বোধ হইতেই চক্ষুকোটর জলাশয় হইবার ভয়ে তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিলাম! ফ্ল্যাশ-ব্যাকে খোঁড়ল চক্ষুর পর্দায় অতীত ভাসিয়া উঠিল।

চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়! বিজয় রাঙ্খল,নগেন্দ্র জমাতিয়ারা এখন আর যুবক নাই। ১৯৬৭-তে যুবক ছিলেন। রাজবাড়ির আশীর্বাদে 'উপজাতি যুব সমিতি' গড়িয়া বলিয়াছিলেন – 'আমরা লালও নই, সাদা'ও নই।' কিন্তু অচিরেই উহাদের সবুজ রঙের প্রলেপ চটকাইয়া গেল। শ্বেতবর্ণের শ্বেতসন্ত্রাস প্রকট হইল। ১৯৮০-র শুরুতে তৈদু সম্মেলনে 'রাজমাতা' বিভুদেবীর প্রধানাতিথ্যে 'বিদেশি বিতাড়ন' -এর ডাক। বিজয় রাঙ্খল তেলিয়ামুড়ার বইয়ের দোকানে ঝাঁপ ফেলিয়া 'স্বাধীন ত্রিপুরা' গড়িতে প্রথমে সশস্ত্র 'ত্রিপুর সেনা', পরে টি এন ভি গড়িয়া ঝাঁপাইলেন। উপজাতি যুব সমিতি-টি এন ভি-র 'বাজার বয়কট'-এর ৬ষ্ঠ দিনে (৬ জুন, ১৯৮০) দাঙ্গা শুরু করা হইল। ৮ জুন মান্দাইয়ে বাঙালি-গণহত্যা। ৯ জুন উদয়পুরের হদ্রা-শিলঘাটিতে উপজাতি-গণহত্যা করিলেন পরিচিত কংগ্রেসি এবং 'আমরা বাঙালি' নামধারী দুষ্কৃতীরা। ইহার পরে আরও, আরও। জুমের টঙ আর সমতলের মাটিতে আঠা-আঠা রক্ত! হাজার হাজার বাড়িঘর পুড়িল,। নৃপেন-দশরথরা বহু কষ্টে দাঙ্গা থামাইলেন। শান্তি-সম্প্রীতি ফিরাইলেন। ১৯৮৩ -তে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে

ইন্দিরা গান্ধীর আশীর্বাদে কংগ্রেস সেই টি ইউ জে এসের সঙ্গে জোট বান্ধিল। নগেন্দ্র শ্যামাচরণেরা মঞ্চে, রাঙ্খলেরা মঞ্চের পিছনে! কিন্তু মানুষ বেইমান! জয় আসিল না। ১৯৮৮-তে বিজয় রাঙ্খল-রাজীব গান্ধীর গোপন চুক্তিতে আবার রক্তস্নান ত্রিপুরার। জঙ্গি আর সেনাবাহিনী ব্যবহার করিয়া জবরদস্তি বাম সরকার উচ্ছেদ। কংগ্রেস-যুব সমিতির জোট সরকার বসিতেই বিজয় রাঙ্খল ঘরে ফিরিয়া 'চেয়ারম্যান' হইলেন। ইহার পর কত কাহিনী। লুটপাট, সন্ত্রাসে বিক্ষত বিদীর্ণ ত্রিপুরা। ৯৩-তে মানুষই বামেদের বিপুলভাবে ফিরাইয়া আনিলেন। জঙ্গালের জঙ্গিরা যত দুর্বল হইল, উপজাতি যুব সমিতিও ভাঙিতে ভাঙিতে কত টুকরা যে হইল, নেতাদেরও হিসাব করিতে ক্যালকুলেটর লাগে! শ্যামাচরণ, রবীন্দ্র দেববর্মারা প্রয়াত। যুব সমিতির প্রধান টুকরা আই এন পি টি-র বহু নেতা কংগ্রেসের ভিতরেই চেয়ার পাতিয়াছেন। বিজয় রাঙ্খল আর নগেন্দ্র জমাতিয়ারা এখনও 'কুহকিনী আশা'-র মায়ামোহে টিকিয়া থাকিয়া 'মরি নাই' প্রমাণ করিতে মরিয়া প্রয়াস করিতেছেন। এক কালে কংগ্রেসের 'গলার হার' ছিলেন। এখন 'গলার হাড়'! কংগ্রেস গিলিতেও পারিতেছে না, আবার হাড়ের সহিত কিঞ্চিৎ মাংস লাগিয়া থাকায়, তাহার লোভে থুঃ করিয়া ফেলিতেছেও না!

শকুন্তলার বক্তৃতায় রাঙ্খলদের সর্বশেষ আবিষ্কার– 'দশরথ দেববর্মা মরিবার পর সি পি এমের মধ্যে উপজাতিদের কথা ভাবিবার মানুষ অবশিষ্ট নাই'। বিধানসভায় ২০ জনের মধ্যে ১৯ জন, এ ডি সি-তে ২৮ আসনের ২৮টিতেই, ভিলেজ কমিটিগুলিতে হাজার হাজার নির্বাচিত উপজাতি প্রতিনিধি– ইহারা সকলেই সি পি এমের পোড়খাওয়া উপজাতি নেতা। রাঙ্খলেরা বলিতে চাহেন– ইহারা উপজাতিই নহেন! বরং ইহারা উপজাতি-বাঙালি-সহ সব অংশের শান্তিপ্রিয়, গণতন্ত্রপ্রিয় জনতার ঐক্যের কথা বলেন, তাই 'ট্রাইবেল' পদবাচ্য নহেন। ইহারা 'জাতিশত্রু'। কিন্তু, অন্য পথ বা পন্থা তো ইহারা মানেন না। দশরথ দেব এই গণতান্ত্রিক ঐক্যের পথই ইহাদের আজীবন শিখাইয়া গিয়াছেন। এই কারণেই জীবিতকালে দশরথও ছিলেন রাঙ্খলদের চোখে 'জাতিশত্রু', 'অর্ধেক বাঙালি'। আত্মগোপনে থাকা দশরথ দেববর্মার নাম ভোটার তালিকায় ভুলক্রমে 'দেব' উঠিয়াছিল ১৯৫২-এর নির্বাচনের আগে। তাঁহাকে 'অর্ধেক বাঙালি' চিহ্নিত করিতে এই 'দেব' লইয়া লাগাতার অপপ্রচার কাহারা করিয়াছিল নগেন্দ্রবাবু? এবং – ত্রিপুরার উপাজাতিদের 'হৃদয়ের মুকুটহীন রাজা' দশরথকে হত্যা করিতে তাঁহার গাড়িতে গ্রেনেড ছুঁড়িয়াছিল কাহারা মিস্টার রাঙ্খল?

নাউ মিস্টার রাঙ্খল, শকুন্তলায় 'ইনাফ ইজ ইনাফ' (Enough is Enough) বলিয়া কাহাকে হুঙ্কার ছাড়িলেন আপনি? আপনার দল এবং রাজনীতি আলাদা জানি। ধর্মে আপনি খ্রিস্টান মানি। কিন্তু ত্রিপুরার একজন শিক্ষিত উপজাতি হিসাবে কৃতজ্ঞতাবোধের

গুণটাও আপনার সহজাত থাকিবার কথা। তাহা কোথায় হারাইলেন? হুঙ্কার বামফ্রন্টের সরকারকে? যাহারা ককবরক ভাষাকে সরকারি মর্যাদা দিল, এ ডি সি এবং ভিলেজ কমিটি গঠন করিয়া গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করিল, প্রতি বছর অনাহারে রোগে-শোকে পাহাড়ে মৃত্যুর মিছিল বন্ধ করিল; রাস্তাঘাট, ইস্কুল, বাজারহাট, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গ্রোথ সেন্টার বানাইয়া উন্নয়নের জোয়ার সৃষ্টি করিল, উপজাতি ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও চাকুরির অধিকার প্রতিষ্ঠা করিল, জুমিয়াদের বনভূমির অধিকার দিয়া কাজের ব্যবস্থা করিল, ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটাইল– সেই বামফ্রন্ট সরকারকে 'ইনাফ ইজ ইনাফ' বলিলেন? সেই বামপন্থীদের উদ্দেশে হুঙ্কার দিয়া, আবার জঙ্গলের বন্দুকের ডর দেখাইতেছেন রাঙ্খল? আবার পাহাড়ের নিরীহ পল্লীতে পল্লীতে অশান্তির আগুন জ্বালাইবার ধমক দিতেছেন? শত শত বামপন্থী নেতা-কর্মীকে আবার আগের মতো বন্দুকের মুখে তুলিয়া নিয়া খুনের হুমকি দিতেছেন? ভুল, মহাভুল করিতেছেন বিজয় নগেন্দ্রবাবুরা। তেল ফুরায়াইছে। সলিতা পোড়ার দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। তাহার চাইতে, চিন্তা শীলের কথা ধরেন—বাতি নিভান দাদা। ত্রিপুরার মানুষ অনেক, অ-নে-ক সহ্য করিয়াছে। এইবার থামেন। নইলে দুইখান কথা আছে। 'ইনাফ ইজ ইনাফ!'

(প্রকাশ : ৩০.০৮.২০১১)

শিক্ষক দিবস

– হ্যাঁ গা, শিক্ষক কি মেরুদণ্ডী প্রাণী?

৫০তম শিক্ষক দিবসের প্রাক্‌কালে চিন্তা-গিন্নির এই কিম্ভূত জিজ্ঞাসায় খানিকক্ষণ 'কিংকর্তব্যবিমূঢ ' হইয়া মৌন রহিলাম। অতঃপর 'গার্হস্থ্য হিংসা আইন' মাথায় রাখিয়া অতি মিষ্টস্বরে দুষ্টু করিয়া চিকন ধমকে কহিলাম, ছিঃ কী অর্বাচীন প্রশ্ন করিতেছ। জানো না কি, শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ড! আমাদের জাতি এখন একমেরু বিশ্বের দণ্ডধারী আমেরিকার 'ছোট শরিক'! তাহাদের মেরুদণ্ড উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত প্রসারিত। 'জাতির মেরুদণ্ড' -র মেরুদণ্ড রহিল কি পচিল, সেই প্রশ্ন জাতীয় নেতাদের কাছে অবান্তর। তাঁহারা শিক্ষার বেসরকারিকরণে আদাজল খাইয়া লাগিযাছেন। পাস-ফেল তুলিয়া দিয়া সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও অবান্তর করিযা তুলিতেছেন।

– কিন্তু, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে 'শিক্ষক দিবস' তো হইতেছে সারা দেশেই।

– ইহার সহিত মেরুদণ্ডের সম্পর্ক খুবই সামান্য। সর্বপল্লীও শিক্ষক ছিলেন। তাঁহাদের যুগে শিক্ষকদের মেরুদণ্ড প্রকট ছিল। তাঁহার জন্মদিনে শিক্ষকেরা নিজেদের পৃষ্ঠদেশে হাত রাখিয়া প্রতি বৎসর যেন অনুভব করিতে চেষ্টা করেন, 'মেরুদণ্ড আরও কতখানি হারাইলাম'– তাহার জন্যই এই 'শিক্ষক দিবস'-এর ইন্তেজাম। সর্বপল্লী নিজে মনে করিতেন তাঁহার আসল জন্মদিন ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭। পাঁচ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮ নহে। অর্থাৎ বয়সটাও এক বছর বেশি। বুঝিলে গিন্নি, আমাদের 'শিক্ষক দিবস' পালনের গোড়ায় যে রাষ্ট্রীয় গলদ রহিয়াছে, তাহার সহিত এই জন্মদিনের গোলমালেরও একখানা কাকতালীয় ট্র্যাজিক মিল রহিয়াছে। যাহাই হউক, এই দিবসে সমগ্র শিক্ষক সমাজের সামনে দণ্ডবৎ হও। ইঁহারা জ্ঞানচক্ষু দান করেন। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' উচ্চারণ করিয়া মনের সর্ব অন্ধকার দূরীভূত করেন। আইসো, ইঁহাদের সামনে আজিকার দিনে আমরা নতজানু হই।

– মনে পড়িল, ইশ্‌কুলে পড়িবার কালে 'এইম ইন লাইফ' নিবন্ধ রচনা লিখিতে ডাক্তার হইয়া 'দরিদ্র-সেবা করিব' মুখস্থ করিতাম। যদিও মনে ভাবিতাম, বড় হইয়া সিনেমা হলের গেটকিপার হইব, বিনা পয়সায় যত খুশি ফিলিম দেখিতে পারিব! অথবা গাড়ির

হ্যান্ডিম্যান, যত খুশি গাড়ি চড়িব। ডাক্তার, গেটকিপার, হ্যান্ডিম্যান কিছুই হইলাম না। হইলাম গিয়া চুল কাটা চিন্তাচরণ শীল! ইচ্ছা হয়, ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষকদের সকলকে লাইনে খাড়া করিযা জিজ্ঞাসা করি, আপনারা পরীক্ষার খাতায় 'এইম ইন লাইফ' কী লিখিয়াছিলেন? জানি, 'শিক্ষক হইবো'– এই কথা এক শতাংশও লেখেন নাই। অর্থাৎ অন্য কিছু হইতে না পারিয়া শিক্ষক হইয়াছেন। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতীদের প্রতি বছর সাংবাদিকেরা বোকা-বোকা প্রশ্ন করেন। বড় হইয়া কী হইবে? উহারা বাবা-মায়ের পাশে বসিয়া, হাসি-হাসি মুখ করিয়া কেহ বলে ডাক্তার, কেহ বলে ইঞ্জিনিয়ার। কেহই কবি সাহিত্যিক শিল্পী সাংবাদিক কৃষিবিদ পশু-বিশেষজ্ঞ ঠিকাদার ব্যবসায়ী পুলিস বা সেনা হইবে বলে না। ছবি আঁকে, গান গায়, ক্রিকেট খেলে। কিন্তু কেহ চিত্রকর, সঙ্গীতশিল্পী বা ক্রিকেটার হইবে বলে না। তাহা হইলে সমাজে এই সকল পেশার মানুষ কোথা হইতে আসিবেন? যাহারা শেষতক ছাঁকুনির তলায় পড়িয়া আসিবেন, তাহারা সকলে অ-মেধাবী? অ-কৃতী? হয়ত 'শিক্ষক হইবো' কেহ কচিৎ কদাচিৎ বলিয়া ফেলে। পরে ভুলিয়া যায়। অথচ, শিক্ষকরাই তো মানুষ গড়িবার আসল কারিগর।

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সবই বানাইয়া দেন শিক্ষকরা। না হয় বুঝিলাম, এই পোড়া রাজ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নাই। দলে দলে বেকার বাধ্য হইয়া শিক্ষকের খাতায় নাম লিখাইতে ছুটিতেছেন। বামফ্রন্টের সরকার শত-সহস্র ইশকুল করিয়াছেন, করিতেছেন। শিক্ষার প্রসার হইতেছে। কোয়ান্টিটি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কোয়ালিটি নিশ্চিত করিবার দায় বাড়িতেছে। 'স্কুল সার্ভিস কমিশন' করিয়া শিক্ষক নিয়োগের দাবি উঠিতেছে। এই দাবি অযৌক্তিকও নহে। আজ অথবা কাল করিতেই হইবে। যদিও, চিন্তা শীলের ধারণা, ভবিষ্যতে শিক্ষকতা কেবল মহিলাদের জন্যই সংরক্ষিত হইবে। কেন না, এই কর্মে শারীরিক শক্তির দরকার নাই (ছাত্র ঠেঙাইতে না হইলে)! কিন্তু স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করিলেই সমস্যার সমাধান হইবে? মানব সভ্যতা পুড়িতেছে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের আগুনে। নগর পুড়িলে দেবালয় রক্ষা পায় না– এই কথা স্মরণে রাখিয়াও মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার প্রতিদিন শিক্ষক অভিভাবকদের বলিতেছেন, ছেলেমেয়েদের নম্বরের প্রতিযোগিতায় না ঠেলিয়া ভাল মানুষ,সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করুন। ফুল যেমন নিজের জন্য ফুটে না, তেমনি শিশুরাও 'অপরের তরে' বিকশিত হইয়া উঠুক।

কিন্তু লোভ, চারিদিকে কেবল লোভ। লোভ-চালিত সমাজ সমস্ত নীতি আর মানবিক মূল্যবোধ গিলিয়া খাইতেছে। শিক্ষাকেও বেচা-কেনার পণ্যে পরিণত করিয়া দিকে দিকে বিপণন বাণিজ্যের ঢালাও বিজ্ঞাপন প্রচার হইতেছে। দামি শিক্ষা কিনিয়া, আরও বেশি দামে বিক্রয় করিয়া ভোগের স্বার্থ-সাম্রাজ্য গড়িতে হইবে। অল্প মেয়াদে যে স্কিম বেশি লাভদায়ক, সেই স্কিমেই সন্তানকে বাজি রাখিতে হইবে। অভিভাবকরা শিক্ষকদের মর্যাদা

দিতে ভুলিয়াছেন। ছেলেমেয়েরাও বাড়ি হইতে সেই শিক্ষা লইয়াই শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করিতেছে। যে অভিভাবক ছাত্রজীবনে রাস্তায় কোনও শিক্ষককে দেখিয়া সাইকেল হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িতেন, সেই অভিভাবকই এখন ঘরে নিজের শিশুদের সামনেই শিক্ষকদের নাম ধরিয়া অবাঞ্ছিত সমালোচনা করিতেছেন। সরকারও শিক্ষকদের দিয়া সর্বপ্রকার কর্ম করাইতেছে। শিক্ষকরা পড়াইতেছেন, গণিতের শিক্ষাদান শেষে বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া মানুষ গুনিতেছেন, এমনকি গরু-ছাগলও গুনিতেছেন, বি পি এল বাছিতেছেন, ভোট করিতেছেন, পরিবার পরিকল্পনা বুঝাইতেছেন, এইডস কন্ট্রোল করিতেছেন, আরও কত কী! শিক্ষকের ইজ্জত কেবল বছরে একবার কয়েকজনকে সংবর্ধনা দিলে বজায় থাকে না, সারা বছর সমগ্র সামাজিক কর্মকাণ্ডে শিক্ষকতার সম্মান প্রতিষ্ঠিত না রাখিতে পারিলে কী করিয়া কী হইবে?

আর শিক্ষকেরা? তাঁহারা কয়জন নিজের ব্রত বা পেশাকে সম্মান করেন? যিনি নিজেকে, নিজের কাজকে সম্মান করিতে জানেন না, তিনি অন্যের সম্মান পাইবেন কী করিয়া? শিক্ষকের চাকুরির অফারখানা হাতে পাইলেই কেহ শিক্ষক বনিয়া যান না। দুনিয়ায় কেবল 'বিদ্যা' নামক বস্তুখানাই 'দানে দানে বাড়িতে থাকে'। বাকি সব কমিয়া যায়। যিনি দিবারাত্র নিজের স্বার্থ লইয়াই মগ্ন, তিনি ছাত্রদের সমাজমনস্ক করিবেন কী করিয়া? যে শিক্ষকের দশ আঙুলে পনেরো খানা গ্রহশান্তির আংটি, কিংবা হাতে গলায় কোমরে তাবিজ কবচের আবর্জনা, তিনি ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক করিবেন কী করিয়া? যিনি 'সরস্বতী'-কে ডিভোর্স করিয়া কেবল 'লক্ষ্মী'র পিছনে ছুটিবেন, তিনিই ইশকুল ফাঁকি দিয়া বাড়িতে প্রাইভেট টিউশনের টোল খুলিয়া বসিবেন, মিড-ডে মিলের টাকা মারিবেন, ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড লুট করিবেন, হোস্টেলে ট্রাইবেল ছাত্রদের খাদ্য চুরি করিবেন, সর্বশিক্ষার দালানবাড়ির 'আই-ও' হইয়া অর্ধেক টাকায় নিজের বাড়ি অথবা গাড়ি করিবেন! ইশকুলে অন্যের ছেলেমেয়েদের উৎসন্নে পাঠাইয়া নিজের ছেলেমেয়েকে বাইরে পাঠাইবেন উচ্চশিক্ষিত করিতে। ইশকুলে কলেজে শিক্ষকে-শিক্ষকে ল্যাং-মারামারি, গ্রুপবাজি, ষড়যন্ত্র, দলাদলি এমনকি আরও নিন্দনীয় কুকর্মে জড়াইয়া পড়িবেন। ইহারা সংখ্যায় অতি কম হইলেও বিষফোঁড়ার মতো সমগ্র শিক্ষাঙ্গন এবং সমাজের দেহ বিষাক্ত করিয়া তোলেন। এই মুষ্টিমেয় 'শিক্ষক' সমগ্র শিক্ষক সমাজকে সাধারণ মানুষের চক্ষে হেয় করিতেছেন, অশ্রদ্ধেয় এমনকি উপহাস্য করিয়া তুলিতেছেন। শিক্ষক দিবসে ইহাদের বিরুদ্ধে সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষক -শিক্ষিকা এবং অভিভাবক-সহ ছাত্রছাত্রীদের বিদ্রোহের শপথ গ্রহণ করিবার দরকার রহিয়াছে।

– হ্যাঁ গা, কামটা কি অ্যাত্তো সহজ ভাবিতেছ?

– না গিন্নি, সহজ নহে। তবে অসম্ভব নহে। শুনিতে পাও নাই, শিক্ষক সমিতিও সরকারি শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে বিদ্রোহের ডাক দিয়াছে?

– প্রাইভেট না পড়িলে চলিবে? তাহা ছাড়া, সমিতির কিছু নেতাও তো 'ফাঁকির মাস্টার'!
– মিথ্যা বল নাই গিন্নি। সমাজের মাত্র এক শতাংশ পড়ুয়ার আট দশজন করিয়া প্রাইভেট মাস্টার লাগে। তাহারা শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েদের কাছে পড়ুক। আর ইশকুলের কোনও 'টোল বিশেষজ্ঞ' মাস্টার যদি চান, সরকারি চাকুরি ছাড়িয়া টোল চালান না! রোজগার তো সরকারি বেতনের দশগুণ! আর হ্যাঁ, ফাঁকিবাজরা সর্বত্রই রহিয়াছে। অফিস, আদালত, হাসপাতাল সর্বত্র। শিক্ষকদের মধ্যেও দু-চারজন মুখোশপরা দুষ্কৃতী নাই, হলফ করিয়া কে বলিতে পারিবে? টি জি টি এ (এইচ বি রোড)-এর কেন্দ্রীয় নেতারা কঠোর নিয়ম করিয়া দিয়াছেন ক্লাসের সময়ে (বিকেল ৪টা ২০ মিনিট পর্যন্ত) ইশকুলে সমিতির কোনও কাজ চলিবে না। অথচ, সমিতির কাজের নাম করিয়া কিছু পদাধিকারী মাঝে মধ্যেই ফাঁকি মারিয়া ইশকুল চলাকালে কাটিয়া পড়েন। কেন্দ্রীয় নেতারা ইহাদের না সামলাইলে সমিতির বদনাম হইবে, শিক্ষা-পরিবেশও দূষিত হইবে।জোট আমলে কী হইত দেখিয়াছি! তখন শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা ছাড়া সবকিছুই চলিত। বহু কষ্টে, বহু ত্যাগের বিনিময়ে রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনে একটা সুষ্ঠু পরিবেশ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। আবার নৈরাজ্য ডাকিয়া আনিতে যাঁহারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ঘনঘোর ষড়যন্ত্র চালাইতেছেন, সমিতির এই অল্প কিছু সিকি আধুলি নেতা কার্যত তাহাদেরই সাহায্য করিতেছেন। ইহারা ইশকুলে 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' সাজিয়া হুকুম চালাইতেছেন। ইহারা নিজেদের সুন্দর ভাবেন। লোকেরা বান্দর দেখে। এহেন কর্ম করিয়া ওই ষড়যন্ত্রীদেরই যে পরোক্ষে সাহায্য করিতেছেন, ইহারা নিজেরাও বুঝিতে পারেন না। প্রিয় হইবার বদলে নিজে অপ্রিয় হইতেছেন, সংগঠনকেও অপ্রিয় করিয়া তুলিতেছেন। ইহারা দ্রুত নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিলে কোনও কথা নাই। না পারিলে দুই খান কথা আছে! শিক্ষক দিবসে চিন্তা শীলের ভাঙা সেলুনে ইঁহাদের সাদর আমন্ত্রণ রহিল। আয়নায় নিজেদের মুখ দেখিবার জন্য!

(প্রকাশ ঃ ০৫.০৯.২০১১)

কেন?

কাটিতে কাটিতে চুল গেল ভরসা! কতজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই ফরসা করিয়া বলিতে পারিলেন না— বাংলাদেশ হইতে কী পাইলাম! দুই প্রধামনন্ত্রী যেদিন ঢাকায় রুদ্ধদ্বার বসিলেন, সেই ৬ সেপ্টেম্বর হইতে কত আকৃতির মাথায় কাঁচি চালাইলাম! ছোট বড়, গোল লম্বা চ্যাপ্টা, ত্রিভুজ চতুর্ভুজ এমনকি একখানা প্রায় ষড়ভুজাকৃতিও! কাহারও গরম মাথায় উষ্ণ-মরু, কাহারও ঠান্ডা মাথায় তুষার-মেরু। আবার কাহারও বোলচালে ইতস্তত নাতিশীতোষ্ণতা। কিন্তু, কেহই খোলসা করিলেন না, সুফল কতটা ফলিল মনমোহনজির ঢাকা সফরে। ঘরে ফিরিতেই চিন্তা-গিন্নি চাপিয়া ধবিলেন— তুমিই বল। ভয়শূন্য (!) চিত্তে উচ্চশিরে কহিলাম— শুন গিন্নি, সুফল দুই দেশই ভাগাভাগি কবিয়া লইয়াছে। 'টানাটানিতে' আমরা কেবল 'সু-টা লইয়া দেশে ফিরিয়াছি। আর 'ফল'-খানা এই যাত্রায বাংলাদেশেই পড়িয়া রহিয়াছে!

গিন্নির বিরস বদন হেরিয়া কিঞ্চিৎ বুক কাঁপিল। আলবৎ উত্তরে তিনি খুশি হন নাই। শত হইলেও ভারতমাতা-র জাত। বলিলেন, কচু বুঝিয়াছ। ফুটবল খেলা হইল গগনে-গগনে। মনমোহনজিকে সেন্টার ফরোয়ার্ড করিয়া পাঠাইলেও তিনি বলই পাইলেন না। খেলিলেন দুই মহিলা গোল-কিপার। কলিকাতা হইতে বলে কিক মারিলেন মমতা ব্যানার্জি। ঢাকায় বল ধরিয়া পাল্টা কিক করিলেন শেখ হাসিনা। বাকিরা 'টিরিপ্লো'!

ক্ষমা করিবেন। সম্প্রতি মেসি-জ্বরে আক্রান্ত গিন্নি সব কথায় ফুটবলের উপমা ঝাড়িতেছেন। অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া তাহাকে বুঝাইলাম, ভুল কবিয়ো না। দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক এইরকম ফুটবল খেলার বিষয় নহে। ইহা ঠিক যে, 'সুফল' -এর ফল কাটিয়া অর্ধেকটাও আনিতে না পারায় আপাতত ক্ষতিটা হইয়াছে ত্রিপুরা-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির। আমরা ট্রানজিট পাইলাম না, চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর ব্যবহারের সুযোগ পাইলাম না, ঢাকার উপব দিয়া আগরতলা-কলিকাতা রেল চলাচল ধাক্কা খাইল, ফেনি নদীর জলবন্টন চুক্তি না হওয়ায় দক্ষিণ জেলার বহু উন্নয়ন-প্রকল্প থমকাইয়া রহিল। বন্দী -প্রত্যর্পণ চুক্তি না হওয়ায় আলফা নেতা অনুপ চেটিয়ার মতন ভারতীয় জঙ্গি

যাহারা বাংলাদেশের জেল-এ রহিয়াছে, তাহাদের দেশে আনিয়া বিচারের ব্যবস্থা হইল না। আবার 'ফল-টা' বাংলাদেশেই পড়িয়া থাকিল বলিয়া নেপালে পণ্য আনা নেওয়ার ট্রানজিট পাইল ঢাকা। ভারতে ৪৬টি বাংলাদেশি পণ্য পাইল শুল্ক-ছাড়। কিন্তু, এই সফরে আমাদের প্রাপ্তিযোগও একেবারে মন্দ নহে। আমরা পাইয়াছি অনেকগুলি 'সু'। সু-প্রতিবেশীসুলভ বন্ধুত্বের গ্যারান্টি, সু-সম্পর্ক, বিশেষ করিয়া ত্রিপুরার প্রতি সু-গভীর আগ্রহ, সু-আশ্বাস। তিস্তা-র জল না পাইয়া আপাতত বাংলাদেশ ফেনি-র জল এবং ট্রানজিট-এর চুক্তি আটকাইয়া দিলেও, অদূর ভবিষ্যতে এইগুলি যে আটকাইয়া থাকিবে না তাহা-ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জানাইয়া দিয়াছেন। পূর্বোত্তরের চার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সবরকম সহায়তার আন্তরিক ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন তিনি। ওই পারে ঘাঁটি গাড়িয়া থাকা এ দেশের জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবার কথা হইয়াছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে বাংলাদেশি আমজনতা, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং ব্যবসায়ী -বাণিজ্যপতিদের সু-সমাদর কতখানি তাৎপর্য বহন করিয়া আনিল, বুঝিতে পারিতেছ না?

গিন্নি গনগন করিয়া বলিলেন, হুম্– বুঝিলাম! কিন্তু, আমাদের সদাচারী প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর মাথা কাটা গিয়াছে, সেইটা দেখিতেছ না কেন? ভাবিলাম– মাথা লইয়া এত মাতামাতির কী দরকার! ১৯৯৯ সালে বাজপেয়ীর পর গত বারো বছরে এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক সফরে বাংলাদেশে গিয়াছিলেন। ২০১০-এর জানুয়ারিতে শেখ হাসিনা এ-দেশে আসিয়া দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন একটা উজ্জ্বল যুগের সূচনা করিয়াছেন। তাই আমাদের আশা ছিল অনেক। দেরি সহিতেছিল না। তিস্তার জল লইয়া সেই আশায় জল ঢালিলেন পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী। তিস্তার জলবন্টনের খসড়া চুক্তি পশ্চিমবঙ্গের কেহই মানিয়া নিতে পারে নাই। কিন্তু মমতাজি আগে এই খসড়ায় অনুমোদন দিয়াছিলেন – এই কথাই তো আভাসে বলিয়াছেন স্বয়ং মনমোহন! শেষ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর সহিত মমতাজির না যাওয়াকে তাই তিনি 'দুর্ভাগ্যজনক'-ও বলিয়াছেন! ইঙ্গিতে মারাত্মক ধারণা দিয়াছেন – না যাওয়ার নেপথ্যে 'অন্য কারণ'। সেই অন্য কারণ কী? দেশ জানিতে পারিবে না? মনমোহনজি চুক্তির খসড়া লইয়া এইভাবে দায় এড়াইতে পারিবেন? তাঁহার এবং মমতাজি-র ইউ পি এ জোটের ঘরে কী ঘটিতেছে ইহাতে বাহিরের লোকের আগ্রহ কাম্য নহে। অন্দর কি বাত হ্যায়! কিন্তু, দলের স্বার্থ, জোটের স্বার্থ, এমনকি রাজ্যের স্বার্থেরও উপরে কি দেশের স্বার্থ নহে? অথচ, সফরের প্রাক মুহূর্তে যেন আকাশ হইতে বজ্র পড়িল। সমগ্র পৃথিবীর মিডিয়ার সামনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অসহায়, নিরুপায়, ফ্যাকাশে মুখ ভাসিয়া উঠিল! মমতা কেন আসিলেন না, সাংবাদিকদের এই জিজ্ঞাসার কার্যত কোনও জবাবই দিতে পারিলেন না প্রধানমন্ত্রী। লজ্জায় আমাদের কান লাল হইল। চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে চাহিল। দারিদ্র্য বেকারি, নিরক্ষরতার পরে

দুর্নীতি-কেলেঙ্কারিতেও বিশ্বরেকর্ড হইতে আর বেশি দেরি নাই! এই বার বিদেশের মাটিতে– হায় রে স্বর্গাদপি গরীয়সী স্বদেশ, তোর এই লাঞ্ছনা?

না, গিন্নি না। মনমোহনজি নহেন, মাথা কাটা গেল এই মহান দেশ ভাবতের। এই দেশের ১২০ কোটি মানুষের। সবই হইবে, সমস্ত চুক্তিও সম্পাদিত হইবে। আজ হইল না, কাল হইবে। কিন্তু, দিন তো ফিরিবে না! সত্যই, সর্ব অর্থেই বাংলাদেশের ভূমিকা সদর্থক। এমনকি এতদিনের ঘোর ট্রানজিট-বিরোধী খালেদা জিয়াও তাঁহাব দ্বিমত্য প্রত্যাহার করিয়াছেন। সুতরাং, হতাশ হই নাই। কিন্তু চিৎকারে আকাশ ফাটাইয়া বলিতে চাই– আমরা ব্যথিত, ক্ষুব্ধ, অপমানিত। গোটা দুনিয়ার সামনে স্বদেশের এই লজ্জা ঢাকিব কীসে? দিল্লিতে ক্ষমতাসীনদের তথাকথিত 'জোট-রাজনীতির বাধ্যকতা' আর ক্ষমতাব দড়ি টানাটানিতে, অথবা অন্য কোনও অপদার্থতার কারণে এই অপমান আর লজ্জা ভারতবাসীকে কেন সহ্য করিতে হইবে? কেন?

(প্রকাশ ঃ ১২.০৯.২০১১)

লাটি সমাচার

ছিঃ ছিঃ অমল দাশগুপ্তবাবু! আপনার অমল ধবল মনের কমলবনে এই বাসনা সুপ্ত ছিল? সরকারি কর্মচারী অধ্যুষিত এই রাজ্যে অজয় বিশ্বাসের লাটিমাছের পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (পি ডি এস) যা- ও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল, তাহাও লাটে তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন? মহামহিম রাজ্য-সভাপতি ছিলেন আপনি। অনিয়ম-সর্বস্ব দলের নিয়মতান্ত্রিক মাথা। স্বৈরতন্ত্রের অভিযোগ তুলিয়া ইস্তফা দিয়া এ কী করিলেন! এখন মাথা-ভাঙা হইয়া পড়িল সিস্টেম। লাটিমাছেব প্রোডাক্শন বন্ধ হইলে বন্ধু কংগ্রেস যে বিধানসভা ভোটের আগে বিবাহে অস্বীকাব করিবে!

মাছের দুনিয়ায় লাটিমাছেব মর্যাদা না থাকিতে পারে, লাটি কিন্তু আডকাঠির ভূমিকায় খাঁটি। টানা-বড়শিতে বড় বোয়াল ধরিতে কত লাটিকে শহিদ হইতে দেখিয়াছি দ্যাশ-এর পুকুরে। চকচকা পিঠে বড়শি গাঁথিয়া ছাড়িযা দিতেই লাটিভাই জলের উপব চচ্চড় করিয়া এদিক-ওদিক ছুটিতে থাকে। প্রলুব্ধ বোয়াল লাটিকে গিলিতেই গলায় বডশি আটকাইয়া যায়। অজয় বিশ্বাস তাঁহার 'সিস্টেম' লইয়া সেই কবে হইতেই লাটি মাছেব মতন রাজ্য -রাজনীতির জলে চচ্চড কবিতেছেন। পিঠে কংগ্রেসের বডশি গাঁথা। রাঘব বোয়াল শিক্ষক কর্মচারী সমাজকে সেই বড়শি গিলাইব'ব জন্য কত বকমের কসবত! বাম সরকার কর্মচারীদের কত বড় দুশমন, বুঝাইতেছেন। কেন্দ্রীয় হারে বেতন, মহার্ঘভাতা না পাইবার নেপথ্যে কেন্দ্রীয় সরকার নহে, ষড়যন্ত্রটা বাম সবকারের তারস্বরে বলিয়া বেড়াইতেছেন। ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের নির্মম বঞ্চনাকে উচ্চকিত স্তবমন্ত্রে বন্দনা করিতে যাইয়া বিরোধী নেতা রতনলাল নাথকেও ছাড়াইতে চাহিতেছেন. এক্সট্রিম বাম হইতে এক্সট্রিম ডাইনে! জয় হো অজয়বাবু!

কিন্তু অমলবাবু, আপনারা দুই জনই বাম কর্মচারী নেতা। আপনি ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান। সি পি এম অজয়বাবুকে সাংসদ কবিয়াছিল, রাজ্য কমিটিতেও উঠাইয়াছিল। ট্রেড ইউনিয়ন দিয়া তিনি পার্টিকে শাসন করতে চাহিলেন। নৃপেন চক্রবর্তী তাঁহার রোগটাকে 'অর্থনীতিবাদ' বলিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বিবাদী হইযা প্রকাশ্যে নৃপেনবাবুকে

কুৎসিত ব্যক্তিগত আক্রমণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। শক্তিশালী বাম শিক্ষক-কর্মচারী আন্দোলন বিভক্ত করিয়া বাম-বিরোধীদের উল্লসিত করিলেন আপনারা। সি পি এম হইতে বিতাড়িত হইয়া অজয়বাবু গড়িলেন পি ডি এফ। কিন্তু সেথায়ও পাতিল কালা হইবার পূর্বেই দল ভাঙিলেন। বাংলার সইফুদ্দিন, সমীর পুততুন্ডদের হাত ধরিয়া পি ডি এস বানাইলেন। কিন্তু, যাঁহারা বিভ্রান্ত হইয়া অজয়বাবুর পিছনে জড়ো হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নব্বই ভাগ অচিরেই ভুল বুঝিতে পারিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে ত্যাগ কবিতে লাগিলেন। আপনার মতো যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদের কাছেও অজয়বাবুর আসল চেহারা স্পষ্ট হইল দিনে দিনে। মহিম ঠাকুর সরণির শিক্ষক সমিতি, সমন্বয় কমিটি সবই তাঁহার হাতছাড়া হইয়াছে। তাঁহার 'ট্রাস্ট' গড়িবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, দ্বিগ্বিজয় ভবনে দলের সাইনবোর্ড লটকাইবার অভিপ্রায় মাঠে মারা গিয়াছে, আই সি এল 'টুপি'-র বুজরুকি ধরা পড়িয়াছে। কংগ্রেসের নির্বাচনী দোসর হইয়াও বি জে পি-র হিন্দ মজদুর সভাতে কর্মচারীদের ভিড়াইবার বিচিত্র কৌশল পণ্ড হইয়াছে।

অমলবাবুর মতন বন্ধু এবং একদার অনুগামীদের চোখেও অজয় বিশ্বাস এখন আর কিছু নহেন, নিছক সুবিধাবাদী! অবশ্য তাহাতে অজয়বাবুর কী! তিনি বলিতেই পারেন – সুবিধাবাদও তো একটা পন্থা! বাজারীকরণের বিশ্ব সমাজে বরং সর্বাধুনিক পন্থা! ২০১৩-র ভোটের আগে কংগ্রেসের কাছে দুই-তিনটা আসনের প্রতিশ্রুতিও যদি পান, সেই আশায় আদা-জল খাইয়া পুকুরজলে চচ্চড় কবিতেছিলেন। ধন্য আশা কুহকিনী!

এই মাহেন্দ্রক্ষণে কিনা অজয়বাবুর 'সিস্টেম'-এর কফিনে পেরেক মারিলেন আপনি অমলবাবু? ছিঃ ছিঃ. এ কী করিলেন! অজয় বিশ্বাস যেখানে, সেখানে কোনও কিছুব যে বিশ্বাস নাই, এতদিনে বুঝিলেন অমলবাবুরা? সংগঠনে তিনি একনায়কতন্ত্রী স্বৈরাচারী? নিজেকে জমিদার মনে করেন? কিন্তু, ইহাতে দোষের কী আছে?যে সংগঠন বা দলের জমি(সমর্থন) নাই, তাহাতে নিজেকে জমিদাব ভাবিলে ক্ষতি কী? একনায়কতন্ত্রও তো একটা তন্ত্র!কোনও কোনও দল তো মুখে 'গণতন্ত্র' বলিলেও বাস্তবে সর্বদাই একনায়কতন্ত্রের পূজারী। তাঁহারা 'ডিক্টেটব' বলেন না। বলেন 'হাইকমান্ড'। সব কিছুই হাইকমান্ড ঠিক করিয়া দেন। তিনিই চেয়ার দেন, তিনিই চেয়ার উল্টাইয়া ফেলিয়া দেন। সর্প হইয়া দংশন করেন, ওঝা হইয়া ঝাড়েন। এমন একটি সওয়াশো বছর প্রাচীন দলের সঙ্গে থাকিয়া অজয়বাবু নিজেকে নিজের ছোট্ট দলের 'হাইকমান্ড' ভাবিতেই পারেন!

চিন্তা শীলের সেলুনে আসা লোকেরা বলেন, প্রত্যেকেই নাকি নিজের হাতে সাড়ে তিন হাত! সত্য বটে! কিন্তু, মজা হইতেছে, প্রত্যেকেই মনে মনে কিন্তু নিজেকে সাড়ে তিন হাতের বেশিই ভাবেন! কেহ কেহ তো সাড়ে তেরো হাত, এমনকি তেত্রিশের জার্মানিতে

হিটলারের মতন নিজেকে সাড়ে তেত্রিশ হাতও ভাবিতে থাকেন! অজয় বিশ্বাসও ভাবিতেছেন! ভাবনার গন্ডগোল! চিন্তা-গিন্নি শুনিয়া কহিলেন, ভাবনা কাহারে বলে? বাস্তবেও ঘটিতে পারে। চাহিয়া দেখ, কংগ্রেস দল নিজেদের নির্বাচনী প্রতীকের 'কাটা হাত' দিয়া নিজেকে মাপিতেছে! লম্বায় নিজেকে তিন গুণ মনে হইতেছে! তাই তো ২০১৩-ত 'আসিয়া পড়িতেছি' বলিতেছে! সেই প্রতীক-হাতেই অজয়বাবুও নিজেকে মাপিয়া সাড়ে তেরো হাত লম্বা পাইতেছেন! নিজেকে মন্ত্রীর চেয়ারেও হয়ত দেখিতেছেন। বলিলাম, ভোটের তো দেরি আছে। আপাতত লাটিমাছের পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (পি ডি এস) -এর কী হইবে?

চিন্তা-গিন্নির মুখে ট্যাকসো নাই। কহিলেন, বড়শি-গাঁথা লাটিমাছ যতই চচ্চড় করুক, বেশি বাঁচে না। বোয়ালের পেটে না গেলেও বড়শির মালিক তাহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিবে। মরা-পচা লাটিকে দুর্গন্ধে বিড়ালেও ছুঁইবে না! ভাবিতেছি, কংগ্রেসের বড়শি-গাঁথা পিঠ লইয়া পি-ডি এসের কি উহাই শেষ ভবিতব্য?

(প্রকাশ: ১৯.০৯.২০১১)

চলতা রঁহে

তাঁহার মতন মন্ত্রীকেই বিচারের জন্য আদালতে ছয়-সাত বছর ঘুরিতে হইতেছে, অন্যদের যে কী হাল ... !

মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাদল চৌধুরির আক্ষেপ পত্রিকায় পড়িতেছিলাম। পাড়ার ডাকসাইটে উকিলবাবু চুল কাটাইতে আসিয়া কহিলেন—'ইহা আদালত, এখানে মন্ত্রীগিবি চলিবে না'। ভাবিলাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক। আদালত চত্বর সব রাজত্বের বাহিরে বই কি! এখানে কেবল মন্ত্রীগিরি কেন, কিছুই চলে না। সবকিছু থামিযা থাকে। দুই-একবার যাতায়াতেব সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। অন্য জগৎ। কখনও কখনও মনে হয়, এখানে সবকিছুই স্থির হইয়া রহিয়াছে— সেই ব্রিটিশ রাজত্বেব প্রথম যুগ হইতেই। সেই একই হাঁকডাক, হাতুড়ি, রীতিনীতি, পোশাক, ইংরাজি ...। প্লাই-উডের টিভি-বিজ্ঞাপনে যদিও বলা হয় 'চলতা রঁহে'! উকিল, মোক্তার, বিচারকরা তরুণ-তরুণী হইতে ক্রমে বুড়া-বুড়ি হন, অবসর নেন, মরিয়াও যান। তবুও মামলা চলিতেই থাকে। চলতা রঁহে! সদাব্যস্ত অর্থমন্ত্রীও বিচার চাহিয়া আদালতে হাজিরা দিতে দিতে দৃশ্যতই ক্লান্ত, বিরক্ত। তাঁহার মামলাও 'চলতা রঁহে, চলতা রঁহে ..।'

বাদলবাবু মনে হয় ছোটবেলায় হা-ডু-ডু খেলায ওস্তাদ ছিলেন। ওই খেলায় লম্বা দম থাকিলেই চলে না, বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আলুর দম বানাইয়া দিতে জানিতে হয়। একবাব বালু দিয়া ঠ্যাং ধরিতে পারিলে কেল্লা ফতে। বাছাধন পিছলাইতে পারে না। শত মোচড় মারিলেও কাম হয় না। উল্টা, বালুর ঘষায় ছড়-বাক্‌লা উঠিয়া বড় ব্যথা লাগে। সেই রকম, 'লটারি' লইয়া রতনলালকেও মনে হয় বালু দিয়াই ধরিয়াছেন বাদলবাবু। মাননীয় বিরোধী নেতা পিছলাইতে পারিতেছেন না। মোচড়ামুচড়ি করিতে যাইয়া আদালতে একবার তাঁহার জরিমানাও হইয়াছে। কিন্তু, ওই যে 'চলতা রঁহে'-র দৌলতে 'ডিলে' হইতে হইতে সব ঢিলা হইতেছে। 'ডিলেইড জাস্টিস, ডিনাইড জাস্টিস' যেন আবাবও সত্য হইবার উপক্রম হইয়াছে।

তারিখ যায়, আদালতে যাইতেছেন না বিরোধী নেতা। কত অসুবিধা থাকিতে পারে। কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া বলিতে হইবে, 'যাহা বলিব সত্য বলিব. সত্য বিনা মিথ্যা বলিব না'।

রতনলালের পক্ষে এই শপথ-বাক্যখানা 'সত্যশ্রদ্ধাপূর্বক' উচ্চারণ করাও একটা মস্ত অসুবিধার ব্যাপারে মনে হইতে পারে। কেন না, কংগ্রেসি রাজনীতির শিরায় শিরায় বিপরীত রক্তধারাই প্রবাহিত— 'যাহা বলিব অসত্য বলিব, অসত্য বিনা সত্য বলিব না!' রতনলাল গুণী মানুষ হইলেও 'মরা মরা' বলিতে বলিতে 'রাম রাম' বলা বাল্মীকির মতন তাঁহার পক্ষে সহজ নহে। 'অনলাইন লটারি চালু করিয়া বাদল চৌধুরি লক্ষ লক্ষ টাকা কামাইয়াছেন'— এই অভিযোগ করিয়া ফাঁসিয়াছেন বিরোধী নেতা। বাদলবাবু আদালতে মামলা করিয়া 'অসত্য, মানহানিকর, ভিত্তিহীন' অভিযোগের দায়ে রতনলালের সাজা দাবি করিয়াছেন।

ছয়-সাত বছর ঘুরিতেছেন খোদ অর্থমন্ত্রী! সাধারণ মানুষের কী অবস্থা? তাঁহারা আদালত চত্বরের সেই 'আজব দেশ'-এর কাণ্ডকারখানায় অনেকেই সর্বস্বান্ত হইতেছেন। বারো ভূতে সুযোগ পাইলে তাঁহাদের ঘাড় ভাঙিয়া রক্ত চুষিতেছে। বারো বছর ঘুরিয়া কোনও এক ভূতের কাছে সব বন্ধক দিয়া, বিচারের আশা ছাড়িয়া অনেকেই নিঃস্ব হইয়া ফিরিতেছেন। সব উকিলবাবু খারাপ নহেন। তাঁহাদের দোষ নাই। মেঘ কালো আঁধার কালো। কলঙ্ক এবং কন্যার চুলও কালো। কিন্তু অধিক কালো উকিলবাবুদের কোটের রঙ। দোষ ওই কোটের। সেই কোটে দাগ লাগে না। লাগিলেও দেখা যায় না! পুলিসের জন্য 'প্রয়াস' হইয়াছে। উকিলবাবুদের জন্য এমনই কিছু একটা চালু হইতে পারে না? কোর্টের কালো কোটের তলায় বিবেকের রঙ চাপা পড়িয়া যাইবে?

বাদলবাবুদেরও বলিহারি! সব ব্যাপারেই তাঁহারা উল্টা পথে চলিতেছেন। এ-দেশে মন্ত্রীরা কখনও কাহারও বিরুদ্ধে মামলা করেন? বিরোধী কণ্ঠ থামাইবার কতরকমের পন্থা দেখাইতেছে কেন্দ্রের সরকার। হাতে না পারিলে ভাতে মারার কত নতুন স্টাইল। কিন্তু মামলা? নৈব নৈব চ। বরং মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেই এখন মামলা হয়। লক্ষ কোটি লুট-দুর্নীতি আর ঘুষ খাইবার অভিযোগ উঠিয়া থাকে। দুর্গন্ধ বেশি ছড়াইলে তদন্ত হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদেরও মাঝে মধ্যে জেলের ভাত খাইতে হয়। যদিও সেই সব মামলা কখনও শেষ হয় না। রাশি রাশি কেলেঙ্কারি ধরা পড়ে। বাজার গরম হয়। দুই পাঁচখানা লোক-দেখানো 'ইস্তফা' হয়। কিন্তু মামলা শেষ হয় না! বোফর্স বলেন, হাওলা বলেন, কফিন বলেন, শেয়ার কেলেঙ্কারি বলেন, কমনওয়েলথ, টু-জি বলেন-- এই যে এত সব সিরিজ-কেলেঙ্কারি, কোনও মামলা শেষ হয় নাই। কবে হইবে কেহ বলিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত বেশির ভাগেরই সাজা হয় না। তাই কোনওমতে মন্ত্রী হইবার নিমিত্ত লাঠালাঠি, ল্যাং মারামারি, কোন্দল। অন্তত পাঁচ বছর মন্ত্রী থাকিতে পারিলে কোটি কোটি টাকার ব্যক্তিগত সম্পদ নির্মিত হয়। দেশের ভিতরে নানান ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট উপচাইয়া, টাকা

বিদেশি ব্যাঙ্কের খোপে খোপে গিয়া জমা পড়ে। অথচ, বামফ্রন্টের মন্ত্রীদের চেহারা বিপরীত! ইঁহাদের মুখ্যমন্ত্রী দশ বছর রাজত্বের পর একটা ছোট্ট সুটকেস লইয়া পার্টি অফিসে বসবাস করিতে যান! তিনি সি পি এমের নৃপেন চক্রবর্তী বলিয়া আলাদা করিবেন না। আর এস পি-র গোপাল দাসের দিকে দেখিতেছেন? এত বছর মন্ত্রী থাকিবার পর এখনও ভাঙা সাইকেল লইয়াই রাজধানীতে ঘুরিতেছেন। রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া রাজনীতি করিতেছেন। সারা দেশের কংগ্রেসি বা বি জে পি-র মন্ত্রীদের সহিত ইঁহাদের পার্থক্য টানিবেন না? পশ্চিমবঙ্গে দম্ভের, দলতন্ত্রের অথবা অন্যকিছুর অভিযোগ উঠিতে পারে, কিন্তু ৩৫ বছরে প্রায় চার-পাঁচশো মন্ত্রীর একজনের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠে নাই! এই মহাসত্য কি আজিকার ভারতে ধ্রুবতারার মতন দেদীপ্যমান নহে?

বেচারা বিরোধী দলনেতা কী করিবেন? 'রাজনীতি' তো করিতে হইবে! ভোট করিতে হইবে। দেশ জুড়িয়া দুর্নীতি-দুর্নীতি! এখানেও বামফ্রন্টের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলিতে না পারিলে কোথায় দাঁড়াইবেন! তাই লম্বা গলা করিয়া অনলাইন লইয়া 'অন রেকর্ড' বলিয়া বেড়াইতেছিলেন। বাদলবাবু যে এমন করিয়া আদালতে ঠেসিয়া ধরিবেন, 'বাঘমামা, সে-কথা কে জানত'! ইহার পূর্বে এক প্রাক্তন জোট-মন্ত্রী জনসভায় ভাষণ দিয়াছিলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের কলিকাতায় দুই খানা বিশাল বাড়ি'। তিনি নাকি দেখিয়াও আসিয়াছেন! মুখ্যমন্ত্রী মামলা করিতেই সেই কংগ্রেস নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী, ক্ষমা চাহিয়া নিজের কান মলিয়া নিস্তার পাইয়াছেন। কিন্তু, বাদলবাবুদের বলি, এত গোঁসা করিলে চলে? কংগ্রেসের দেশপ্রেম গিয়াছে, নীতি-আদর্শ-লক্ষ্য (ছিল কি?) সততা, ঐক্য— সব গিয়াছে। অসত্য বলিবার অধিকারটুকুও না থাকিলে কংগ্রেসের আর থাকিবে কী?

(প্রকাশঃ ২৬.০৯.২০১১)

দুর্গা ও গান্ধীজি

মহাষষ্ঠীতে মহা ফ্যাসাদ! গান্ধীজির জন্মদিনে এই বছরের মহাষষ্ঠী। এক হাতে গান্ধীজির ফটো, আর এক হাতে দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার ছবি লইয়া চিন্তা-গিন্নি মহা-শোরগোল বাধাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা—.

অশুভ শক্তি পারভূত হইবে কোন পথে? গান্ধীজির অহিংসামন্ত্রে, নাকি দেবী দুর্গার যুদ্ধতন্ত্রে?

বুঝিলাম, গিন্নির মগজে এই তর্কযুদ্ধের টাইফুন একবার যখন উঠিয়াছে, উহা সহজে থামিবার নহে। দুর্গার দশ হাতের দশখানি অস্ত্রের প্রতীকী তত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া ফ্যাসাদ বাড়িল। গিন্নি বলিলেন, দুষ্ট বারণ বধ করিতে শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে যে অকাল বোধন করিয়াছিলেন, তাহাই তো এখনকার শারদীয়া দুর্গোৎসব। প্রতীক আসিল কোথা হইতে? অসুরেরা দেবতাদের যুদ্ধে পর্যুদস্ত করিয়া স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। দেবতাদের সমস্ত শক্তি আর 'যার যাহা আছে' অস্ত্রশস্ত্র একত্র করিয়াই তো দুর্গার সৃষ্টি। তবে? যুদ্ধ ছাড়া পথ কই। অহিংসামন্ত্রে মহিষাসুরের হৃদয়ের পরিবর্তন হইলে তো যুদ্ধেরই প্রয়োজন হইত না। সন্ত্রস্ত হৃদয়, ক্ষুদ্র জ্ঞান আর তীব্র বিস্ময়তে কহিলাম, সব যুদ্ধ একই প্রকার নহে গিন্নি। কিছু দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতে এক পক্ষের বিনাশ অনিবার্য। আবার কিছু দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতে হৃদয়ের পরিবর্তনেই যুযুধান দুই পক্ষের ঐকমত্য ঘটে। বরং ঘটনাচক্রে এই বছর গান্ধী জয়ন্তী আর হিন্দুদের মহাদেবীর বোধন একসঙ্গে হইল বলিয়া , ওই মহাসত্যই নতুন করিয়া আলোচিত হইতে পারে।

– পত্রিকা পড়িয়াছ? আগরতলার ঋষভ গান্ধার তাহার একাদশ জন্মদিনে ইস্কুলের একুশ ছাত্রকে জামা-কাপড় দিয়াছে। কৈলাসহরের ছোট্ট ভাই-বোন কুণাল এবং রাইমাও তাহাদের পূজার জামা-কাপড় হইতে গরিব ঘরের শিশুদের হাতে কয়েকখানি তুলিয়া দিয়াছে। অন্য দিকে কী মর্মান্তিক, একই সময়ে কল্যাণপুরের ঘিলাতলিতে এক গরিব কৃষকের কিশোরপুত্র রতন দেবনাথ, পত্রিকায় পড়িলাম – পূজার জামা-কাপড় কিনিতে না পারিয়াই আত্মহত্যা করিয়াছে! এই চরম দারিদ্র্যের মূল উৎপাটন করিতে হইলে আপসহীন যুদ্ধই পথ।

পৃথিবীর কোথাও আবেদন নিবেদনে শোষক শ্রেণীর হৃদয়ের পরিবর্তন এবং শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটে নাই গিন্নি। ঘটিবেও না। এই যুদ্ধ একা করা যাইবে না। সকলের সম্মিলিত শক্তিতে, দুর্গা পরিবারের মতন, ওই যুদ্ধে সকলের অংশগ্রহণেই জয় সুনিশ্চিত হইবে। কিন্তু, সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবকেরা যদি আর একটু ভাবেন, ঋষভ -কুণাল -রাইমাদের বাবা-মায়ের মতন আরও একটু মানবিক হন, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতে 'ভালো মানুষ' হইয়া উঠিবার জন্য হাত ধরিয়া একটুখানি আগাইয়া দেন, তাহা হইলেই কোনও রতনকে পূজার জামার জন্য আর আত্মঘাতী হইতে হয় না। অস্ত্রশস্ত্রের যুদ্ধ করিয়া এই মানবিকতা জাগ্রত হইতে পারে না গিন্নি।

– দেখিতেছ তো, এই বছর দুর্গতিনাশিনীর নিজেরই দুর্গতির সীমা নাই! ভয়ঙ্কর দ্রব্যমূল্যাসুরের আক্রমণে দুর্গোৎসবের বাজেট বাড়িয়াছে। পূজার আয়োজকদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইতেছে। পেট্রোপণ্য, খাদ্যশস্যের সহিত তাল মিলাইয়া জামা-কাপড়-জুতা সবকিছুর দামে আগুন! আই এম এফ বলিতেছে, বিশ্ব-অর্থনীতি ভয়াবহ সঙ্কটে।প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সম্প্রতি বিদেশের মাটিতে স্বীকার করিয়াছেন– 'বিশ্বায়নের কুফল ফলিতেছে'। দেশে কিন্তু তিনি বিশ্বায়নের অর্থনীতির ঘোড়ার পিঠেই সওয়ারি করিতেছেন। লুটেরা আমেরিকার সহিত দোস্তি বাড়াইতেছেন। অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জির কথায়ও বিপন্ন অর্থনীতির হতাশা। কিন্তু যে অসুরেরা দেশবাসীর লক্ষ-কোটি টাকা লুটিয়া খাইল এবং খাইতেছে, তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে কে? ওয়াশিংটন হইতে দিল্লি পর্যন্ত যে অসুর-রাজ চলিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে সম্মিলিত ও নিরন্তর যুদ্ধ ছাড়া পথ নাই। বছরে একবার 'শক্তিরূপিণী দুর্গা' সপরিবার আসিয়া মহিষাসুর বধ করেন। অসুরের বিরুদ্ধে সুরের, অশুভর বিরুদ্ধে শুভর বিজয়ে বিজয়া দশমীর বিজয়োৎসব হয়। ইহাই প্রতীক। লাগাতর যুদ্ধের প্রণোদনা। যুদ্ধ বছরে একবার নহে। ইহা সম্বৎসরের নিরন্তর যুদ্ধ। যাহা কিছু শুভ, তাহাকে সুরক্ষা করিবার যুদ্ধ, শান্তি – সম্প্রীতি প্রগতি, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সুরক্ষার যুদ্ধ। শোষণ -অবিচার-অন্যায়ের শক্তিকে চূড়ান্তভাবে বিনাশ করিবার যুদ্ধ। এই যুদ্ধেও শেষ পর্যন্ত শুভ শক্তির জয় অনিবার্য।

– একই সঙ্গে অন্য যুদ্ধটার কথাও বলি। এই আনন্দ-মহোৎসবের একটু অবসরে আমরা যদি ভাবি – রক্তদানে দেশের সেরা হইলাম কী করিয়া? ত্রিপুরার ক্লাব, সঙ্ঘ, সমিতি এবং প্রতিষ্ঠানগুলি এই সাফল্য আনিয়াছে। কারণ, এই রাজ্যের মানুষের মন সঙ্কীর্ণ নহে। তাহারা উদার। অতিথিপরায়ণ। অন্যের তরে আপনাকে উৎসর্গ করিবার মহৎ গুণ তাহাদের রহিয়াছে। উৎসবে আনুষ্ঠানিকতার বস্ত্রদান হইতেছে, কিন্তু আমরা কি উৎসব অনুষ্ঠানের এই লাখ-লাখের খরচ কমাইয়া গরিব দুঃস্থদের পাশে আরও নিয়মিতভাবে দাঁড়াইতে পারি না? সারা বছর? 'মাতৃরূপেণ সংস্থিতা' দুর্গার মতন যে বধূরা শ্বশুরবাড়ির অসুরদের

হাতে লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত, এমনকি নৃশংসভাবে নিহত পর্যন্ত হইতেছেন, তাহাদের রক্ষায় পাড়ায় পাড়ায়, ক্লাবে ক্লাবে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারি না? ইহাও তো যুদ্ধ! কিন্তু সহিংস, সশস্ত্র যুদ্ধ নহে। সমাজিক আন্দোলনের যুদ্ধ।

এতক্ষণে চিন্তা-গিন্নি বলিলেন, হুম! তাহার অর্থ– দুই প্রকার যুদ্ধই একসঙ্গো করিতে হইবে। গান্ধীজিকে চাই, দুর্গাদেবীকেও চাই। দুই হাতে ধরা গান্ধীজির ফটো এবং দুর্গার ছবি তিনি সযত্নে ঘরের বেড়ার যথাস্থানে আবার সাজাইয়া রাখিলেন।

(প্রকাশ : ০৩.১০.২০১১)

তোবা মুফ্‌তি সায়েব!

জনাব মুফ্‌তি তৈয়িবুর রহমান সায়েব। আদাব গ্রহণ করিবেন। পত্রিকায় আপনার চাঞ্চল্যকর বিবৃতি পাঠ করিয়া রীতিমতন বাকরুদ্ধ হইয়া গিয়াছি! কেয়া বাত্‌ সায়েব! এই না হইলে জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দ-এর রাজ্য সভাপতি? কী আবিষ্কার! কী মোক্ষম দাবি, বীরত্বব্যঞ্জক হুমকি, আর কী নির্ভুল সময়বিচার!

আপনার আবিষ্কার নম্বর ১: পাপাই সাহা হত্যাকাণ্ডে প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করিতে সরকার পরিকল্পিতভাবে সোয়েব মালিককে জড়াইয়া দিবার অপকৌশল গ্রহণ করিয়াছে। **আবিষ্কার নম্বর ২:** সোয়েব মুসলমান বলিয়াই পুলিস তাহাকে জড়াইতেছে। **তাই দাবি:** ওই দিন (১১ জুলাই) -এর ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে সি বি আই তদন্ত করিতে হইবে। **হুমকি:** ভবিষ্যতে সঠিক তথ্য প্রমাণ ছাড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের কাহাকেও যেন হয়রানি বা অপমান না করা হয়।

মুফ্‌তি সায়েবের বড় আশা ছিল— এই বিবৃতি পাঠ করিয়া ত্রিপুরার মুসলমান সমাজ তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিবে, তাহারা বামফ্রন্ট সরকারের ভয়ঙ্কর মুসলিম-বিরোধী ষড়যন্ত্র (!) এক নিমেষে বুঝিয়া ফেলিবে এবং কংগ্রেসের সি বি আই লীলাকীর্তনে যোগদান করিয়া নৃত্য করিতে থাকিবে। কিন্তু, চিন্তা শীলের সেলুনে যে মুসলিম যুবকেরা ক্ষৌরকর্ম করাইতে আসেন, তাঁহারা সকলেই মুফ্‌তি সায়েবের উদ্দেশে যে-সব বিশেষণ প্রয়োগ করিলেন সেগুলি তাঁহার পক্ষে মোটেই শ্রুতিসুখদায়ক হইবে না বিধায় উল্লেখ করিলাম না।

মুফ্‌তিজি, মার্জনা করিবেন। আপনি যাহাকে এত সার্টিফিকেট দিতেছেন সেই সোয়েব মালিক রত্নটি কে? পাপাই হত্যার প্রায় দুই মাস পর, গত ৭সেপ্টেম্বর নিশিকালে দক্ষিণ ত্রিপুরার মনুবাজারের দীপায়ন দত্ত নামে এক ব্যবসায়ীকে অপহরণের দায়ে আরও দুইজন সমতে গোর্খাবস্তিতে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে মসজিদ পট্টি এলাকার এই যুবক ওমর শরিফ ওরফে সোয়েব মালিক। তিনদিন পর প্রকাশ্য আদালতে জবানবন্দী দিয়াই অপহরণের কথা সে স্বীকারও করে। তখন হইতে সোয়েব কারাগারেই রহিয়াছে। এলাকার মানুষ যুবকটিকে 'দাগি সমাজবিরোধী' হিসাবেই জানেন। পুলিসের লোকেরাও বিলক্ষণ চিনেন।

শহরে মহিলার গলার হার ছিনতাইয়েও তাহার পিছনে পুলিসকে ছুটিতে হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু, পাপাই হত্যার পিছনে তাহার নাম আসিল কী করিয়া?

১১ জুলাই পাপাই সাহা-সহ মোট চারজনের গায়ে গুলি লাগিয়াছিল। পাপাই – এর বড় ভাই কয়েকদিন পরে এফ আই আরে 'টি এস আর গুলি করিয়াছে' বলিলেও ব্যালেস্টিক তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য বাহির হয়। একজনের দেহে গুলির যে টুকরা পাওয়া যায়, তাহা পরীক্ষা করিয়া বিশেষজ্ঞরা জানান – গুলি নিরাপত্তা বাহিনীর কোনও আগ্নেয়াস্ত্রের নহে। সি আই ডি তদন্তের মোড় ঘুরিয়া যায়। কাহারা গুলি করিল? শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর কাছে, মিটারসনের পাশে দাঁড়াইয়া থাকা পাপাই-এর মাথায় কাহার গুলি লাগিল? কাহার গুলিতে 'পাপাই'-এর মৃত্যু হইল?

সেই দিন কংগ্রেস-এর 'অহিংস' সশস্ত্র কর্মীদের থানা আক্রমণ, পুলিসের গাড়িতে পেট্রল ঢালিয়া অগ্নিসংযোগ সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সি আই ডি তদন্তে ক্রমশ প্রকাশ পায়, টি এস আরের এক অফিসার অমরজিৎ দেববর্মার পত্নী এবং বিলোনিয়ার মহকুমাশাসক সঞ্জয় চক্রবর্তীর পত্নী সেই সময় আটকা পড়েন শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের শো-রুমে। ফোন পাইয়া টি এস আরের ওই অফিসার তাঁহার দেহরক্ষী এবং দুইজন জওয়ানকে লইয়া দুই মহিলাকে উদ্ধার করিতে সেখানে হাজির হন। তখনই তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বাইকের পিছনে বসিয়া থাকা এক দুষ্কৃতী পিস্তলের গুলি চালায় বলিয়া প্রত্যক্ষদর্শীরা সি আই ডি-কে জানান। ওই দুষ্কৃতীই যে ওমর শরিফ ওরফে সোয়েব মালিক, তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর সি আই ডি অফিসাররা নিশ্চিত। চলন্ত বাইক হইতে গুলি চালানোয় সেই গুলি টি এস আরের বদলে বিদ্ধ করিয়াছে পাপাইকে। অন্তত, সি আই ডি তদন্তে ইহাই বাহির হইয়াছে।

মুফ্‌তিজি ইহাকেই 'প্রকৃত ঘটনা আড়াল করিতে পরিকল্পিতভাবে নাম জড়াইয়া দেওয়ার অপকৌশল' বলিতেছেন? কী করিয়া বলিলেন? অন্য কোনও 'প্রকৃত ঘটনা' কি মুফ্‌তি সাহেবের জানা রহিয়াছে? জানা থাকিলে তিনি সি আই ডি-কে না জানাইয়া লুকাইয়া রাখিতেছেন কেন? ইহাও কি হত্যাকান্ডের মতনই গুরুতর অপরাধ নহে? সোয়েব মালিক নিরপরাধ, এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আগে যে-সব 'তথ্য প্রমাণ' মুফ্‌তিজি একত্র করিয়াছেন, কেন লুকাইতেছেন?

ঝোলার বিড়াল অবশ্য মুফ্‌তি তৈয়িবুর নিজেই বাহির করিয়া দিয়াছেন! 'মুসলিম' বলিয়াই নাকি সোয়েব মালিককে জড়ানো হইতেছে! সারা রাজ্যে শান্তিতে দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে উৎসবে সামিল হইয়াছেন। এই রাজ্যে মুসলমানের

ইদে যেমন হিন্দুরা সামিল হন, তেমনি দুর্গোৎসবেও বহু মুসলিম অংশ নেন। শান্তি-সম্প্রীতিতে উৎসব শেষ হইবামাত্র মুফ্‌তিজি 'মুসলিম কার্ড' খেলিলেন। নির্ভেজাল সাম্প্রদায়িক উস্‌কানি দিলেন। কোনও অপরাধে কেহ অভিযুক্ত হইলে তিনি দোষী কি নির্দোষ আদালত বিচার করিবে। এখানে ধর্ম-বিচার আসে কোথা হইতে? ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা এবং সুযোগ সুবিধা পাইয়াছেন বাম আমলেই, এই সত্য মুফ্‌তিজি অস্বীকার করিতে পারেন? কিন্তু তাই বলিয়া মুসলিম হইলে কাহাকেও অভিযুক্ত করা যাইবে না? অপরাধ করিলেও বিচার করা যাইবে না? হাবিলদার রোহিদ মিয়াঁ নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের খুন করিয়া অস্ত্র নিয়া পলাইয়াছিল। সে-ও ধর্মে মুসলিম। তাহার বিচার হইবে না? মুফ্‌তি সায়েবের পোশাকের আড়াল হইতে মৌলবাদী চেহারা উঁকি মারিতেছে যে! বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কিংবা খ্রিস্টান মিশনারিরা যদি একই সুরে কথা বলেন? সহিষ্ণু ধর্মীয় নেতাদের অনেক আগুন গিলিতে হয়। তিনি আগুন নিয়া খেলিতেছেন? আগুন-খেলায় ত্রিপুরার সর্বনাশ ডাকিতে চাহিতেছেন? কিন্তু, সাবধান সায়েব! এই রাজ্যের সচেতন মুসলমান সমাজকে এত বেওকুফ মনে করিবার সাহস— ভাল নহে!

সি বি আই তদন্ত যে-কেউ দাবি করিতে পারেন। কংগ্রেস আগেই করিয়াছে। মুফ্‌তি সায়েব কংগ্রেসের পিছনে হাঁটিতেছেন। হাঁটুন। কিন্তু, সি বি আই তদন্তের অভিজ্ঞতা তো শোচনীয়! শ্যামহরি শর্মা হইতে বিধায়ক মধুসূদন (ভোলা) সাহা হত্যা, একটি ক্ষেত্রেও সি বি আই পাস করে নাই। ডাহা ফেল। চিন্তা-গিন্নিও জানেন – সি বি আই তদন্ত দাবি তোলার অর্থই হইল তদন্ত ধামাচাপা দেওয়ার দাবি তোলা। আর কিছু নহে! মুফ্‌তি সায়েবও তাড়াতাড়ি 'তদন্ত বন্ধ' করিতেই চাহিতেছেন? কেন? 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়'?

তোবা তোবা মুফ্‌তিজি! এইভাবে নিজেকে উন্মোচন করিতে আছে? তেরো-র ভোটের জন্য কংগ্রেসের উপজাতি চাই, সরকারি কর্মচারী চাই, সুশীল চাই, আর চাহ – ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম। উপজাতি মহল্লায় 'শিকারি মোরগরা ' শিকার জুটাইতে পারিতেছেন না। কর্মচারীদের মধ্যে চেষ্টা চলিতেছে। সুশীলরা ১০ জুলাই লইয়া ঝাঁপ মারিয়া পাথরে বুকে ফাটাইয়াছেন। আর মুসলিম-ভোট ভিড়াইবার প্রথম চালটাই আপনি 'বেচাল ' করিয়া দিলেন? তোবা তোবা!

(প্রকাশ: ১০.১০.২০১১)

সম্মেলনে সি পি এম

সময়ের কাজ সময়ে করিলেই চলিত। কিন্তু, পশ্চিমবাংলা আর কেরলের নির্বাচনী ফলাফল ত্রিপুরার সি পি এমকে পিছন হইতে ধাক্কা মারিয়া দুই বৎসর আগেই ভোটে নামাইয়া দিয়াছে। 'শাপে বর' নহে তো কী!

সি পি এমের চলতি ত্রিবার্ষিক সম্মেলনগুলিও এইবার তাই বিধানসভা নির্বাচনী প্রস্তুতির সহিত আরও বেশি করিয়া অঙ্গে-অঙ্গে জোড়া লাগিয়া গিয়াছে। ইহার সুবিধা অসুবিধা দুই-ই কিন্তু প্রকট! শুনিতে পাই — কমিউনিস্টদের কাছে নির্বাচন আলাদা কিছু নহে। নিরন্তর শ্রেণী-সংগ্রামেরই অংশ। গুরত্বপূর্ণ রাজনৈতিক 'ব্যাট্‌ল'। 'ওয়র' নহে। পশ্চিমবাংলার মতন কিছু 'ব্যাট্‌ল' হারিতে হইতেই পারে, কিন্তু 'ওয়র'-এ মেহনতি জনতার চূড়ান্ত জয় অবশ্যম্ভাবী। এই তাত্ত্বিক আস্থা আর আদর্শগত দৃঢ়তা-র শক্তিতেই চির-আশাবাদী কমিউনিস্টরা নাকি সব বাধা অতিক্রম করিয়া শোষণমুক্ত সমাজের লক্ষ্যে অবিরাম পথ চলিতে পারেন। ইঁহারা কেবল নির্বাচনের জন্যই নির্বাচনী লড়াই করেন না।

আবার, নির্বাচনে জয়ী হইয়া শোষক শ্রেণীর সর্বার্থ-স্বার্থবাহী রাষ্ট্রকাঠামোতে অঙ্গরাজ্যের সরকার চালাইতে গিয়া এই কমিউনিস্টরাই নিজের কমিউনিস্ট -সত্তার বিসর্জনের ঢাক নিজের হাতেই বাজানো শুরু করিতে পারেন। এমনকি, পার্টির সম্মেলনগুলিকেও ভ্রান্তিবশত সরাসরি বা সুকৌশলে নিছক সংসদীয় ভোটের 'প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে' পরিণত করিয়া দিতে পারেন। কোনটা হইবে, নির্ভর করিবে মূলত নেতৃত্বের উপর।

সি পি এম নেতারা প্রায়ই বলেন, অন্য কোনও দলে, বিশেষত কংগ্রেসের মতো 'বড়লোকদের স্বার্থবাহী' দলগুলিতে এইরকম গণতন্ত্রের চর্চা নাই। সর্বনিম্ন হইতে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সম্মেলন করিয়া আগামী পথ, কর্মসূচি ও আগামী নেতৃত্ব নির্বাচনের কোনও ব্যবস্থা নাই। তাঁহারা ঠিকই বলেন। কমিউনিস্ট পার্টির 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা' নীতির বিকল্প কোনও বিজ্ঞানসম্মত সাংগঠনিক নাতি আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেহ আহিষ্কার করিতে পারেন নাই। কিন্তু, এই বিজ্ঞানসম্মত নীতি-পদ্ধতি গতানুগতিকতার লোহার খাঁচায় তথাকথিত 'সংসদীয় শিক্ষা আর সৌজন্য'র সোনার শিকলে বন্দী হইয়া পড়িলে পরিণতি মারাত্মক হইতে পারে।

কেন না, পশ্চিমবাংলায়ও তিন বছর অন্তর সি পি এমের সম্মেলন হইয়া আসিতেছিল। ৩৪ বছরে বাসা বাঁধা অসুখের ডায়াগ্নসিস চালিয়া আসিতেছিল, এমনকি অব্যর্থ মহৌষধের নিদানও সিদ্ধান্ত হইতেছিল। কিন্তু ঠিকভাবে কার্যকর হয় নাই। দুধ-পুষ্করিণী বানাইতে যাইয়া রাত্রের অন্ধকারে সকলেই দুধের বদলে জল ঢালিয়াছেন। কে জানিয়া-বুঝিয়া ঢালিয়াছেন, কে দুগ্ধজ্ঞানে জল ঢালিয়াছেন অথবা কাহার দুগ্ধ ঢালিবার পর জলে পরিণত হইয়াছে, ইহা খুব বড় কথা নহে। বড় কথা হইল, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির গুণগান করিলেই চলে না, পদ্ধতিটি সততা ও নিষ্ঠার সহিত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রয়োগ করিলেই অভীষ্ট ফল মিলিতে পারে।

৪০ লাখ জাতি-উপজাতির এই শ্যামল সুন্দর ছোট্ট পাহাড়ি ত্রিপুরা তো বিশাল ভারতেরই অংশ, এই কথা ভুলি কেমনে, কোন মনে? ভারতের কল্যাণ, আমাদেরও কল্যাণ আনে, দেরিতে এবং অল্প পরিমাণে। কিন্তু, ভারতের অকল্যাণে আমাদের অকল্যাণ হয় অতি দ্রুত এবং বহুগুণে। দিল্লিতে দাম একশো বাড়িলে এখানে বাড়ে দেড়শো, কিন্তু রাতারাতি। পেট্রলের দাম পাঁচ টাকা বৃদ্ধিতে উন্নত রাজ্যে মধ্যবিত্তের সংসারের খরচ ১০০ টাকা বাড়িলে ত্রিপুরায় বাড়ে ৩০০ টাকা! রেল পৌঁছায় স্বাধীনতার উনষাট বছর পরে! রওয়ানা হইয়া পৌঁছাইতে ব্রডগেজ পরিণত হইয়া যায় মিটারগেজ-এ! কেন্দ্র সরকারের চাকরি বন্ধ। ছাঁটাই হইতেছেন কর্মচারীরা। রাজ্য সরকার চাকুরি বন্ধ না করায় তাহার বাজেট বরাদ্দ ছাঁটাই হয়। ত্রিপুরার বাম সরকারকে উৎখাত করিবার নীল নক্শা হইতেই হয়ত ইদানীং দিল্লির বাধার পর বাধা আসা শুরু করিয়াছে। অর্থ কমিশনের বরাদ্দ কমানো হইতে শুরু করিয়া সর্বশেষ ইতালির বিনিয়োগেচ্ছু প্রতিনিধিদলকে ত্রিপুরায় আসিতে না দেওয়া — সবই একই সূত্রে গাঁথা হইতে পারে। কিন্তু, সি পি এম এই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফাটিয়া পড়িতেছে না! হয়ত কৌশলগত কারণেই। প্রধানমন্ত্রীর 'বিশেষ প্যাকেজ' যদি আদায় করা যায় — সমস্যার কিছুটা হাল হয়ত করা যাইবে। ষড়যন্ত্রের গভীরতাটা সি পি এম বুঝিয়া লইয়াই রাজনীতির ময়দানে হেস্তনেস্ত করিতে নামিবে? হইতে পারে।

সাধারণ মানুষ কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা শুনিতেছেন, পড়িতেছেন। কংগ্রেস নেতৃত্বে পরিচালিত দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার যে এ দেশে দুর্নীতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিরোমণি, ইহারা যে কৃষক-বিরোধী, শ্রমিক-কর্মচারীর স্বার্থ-বিরোধী, মানুষ জানিতেছেন। কিন্তু, সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন বিকল্প বাম শক্তিকে। খুঁজিতেছেন সর্বোচ্চ আত্মমর্যাদাবোধ-সম্পন্ন আর্দশ কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের, যাঁহারা 'সকলের আগে' কষ্টভোগ করেন কিন্তু ' সকলের পরে' আরামের সুযোগ গ্রহণ করেন। জনগণের দুঃখ

দুর্দশায় কেবল তাঁহাদের সঙ্গেই থাকেন না, সকলের আগে বুক পাতিয়া দেন। সুখের ভাগ নিতে আসেন লাইনে সকলের পিছনে দাঁড়াইয়া। ওই সকল আদর্শ কমিউনিস্ট নেতা-কর্মী হঠাৎ আকাশ হইতে পতিত হন না, তাঁহারা নিরন্তর গণসংগ্রামের মধ্য দিয়া সাধারণ মানুষের মধ্য হইতেই উঠিয়া আসেন, শ্রেণী সংগ্রামের আগুনে পুড়িয়া খাঁটি হন।

কিন্তু, যখন কমিউনিস্ট পার্টিতে ছোট নেতা মাঝারিকে তেল দেন, মাঝারি দেন বড়কে, তখন পার্টির চলিবার পথ ক্রমেই তৈলাক্ত, পিচ্ছিল এবং আরও বিপদসঙ্কুল হইয়া পড়ে। যখন সাধারণ মানুষ দেখিতে পান জোট আমলের মতনই — গ্রাম শহরের প্রতিটি ছোটখাটো সভাতেও ভারী ভারী পদবি-লাঞ্ছিত বক্তাদের নামের সুদীর্ঘ তালিকা, কাহাকেও কেহ বাদ দিতে পারেন নাই, সকলেরই মুখে ভাষণের নামে একই কথার চর্বিত-চর্বণ, কাজের সহিত কথার মিল নাই, কথার সহিত স্থানীয় বাস্তবের সম্পর্ক নাই— তখন তাঁহারা উৎসাহ হারান। ক্লান্ত হন। যদি কোনও নেতা বা মন্ত্রী চাটুকার-পরিবৃত থাকেন, তোষামোদে তুষ্ট থাকেন, সমালোচনা সহ্য করিতে না পারেন, চাটুকারের সংখ্যা বাড়াইয়া চলেন অথবা 'পছন্দের লোক' বাছিতে থাকেন —কর্মীদের নিকট হইতে তাঁহার দূরত্ব বাড়ে। কর্মীরাও 'ক্ষমতাবান' বা 'ক্ষমতাবতী' সেই নেতা-নেত্রীর ঘনিষ্ঠ হওয়াই আসল কর্ম ধরিয়া লন। নেতার সামনে বশ্যতা প্রমাণ করিতে নিজের মাথা চুলকাইয়া টাক ফেলিতে শুরু করেন! নেতার গলা, পোশাক, চাল-চলন, চুল আঁচড়ানো নকল করিতে শুরু করেন। এই কর্মীরাও জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হন। এইভাবে ওই নেতা বা নেত্রী যে জনগণের সহিত পার্টির দূরত্ব বাড়াইতেই কাজ করিতেছেন, তিনি নিজে বুঝিয়াও গুরুত্ব দেন না। শুদ্ধিকরণকেও ইঁহারা নিজের সুবিধামতন 'শুদ্ধ' করিয়া নিতে জানেন! আখেরে ইঁহারাই সকলের বিপদ ডাকিয়া আনেন।

সামনের ২০তম সর্বভারতীয় পার্টি কংগ্রেসে সি. পি এম মতাদর্শগত নতুন দলিল প্রস্তুত করিবে। কিন্তু তাহার আগে ত্রিপুরায় পার্টিকে একসঙ্গে অনেক কাজ করিতে হইতেছে। 'শ্রমিকশ্রেণীর পাশে আরও মিত্রশক্তিকে জড়ো করা'—ইহাই যদি পার্টির সর্বস্তরের সমস্ত সদস্যের মূল কাজ হইয়া থাকে, পাহাড়ের একজন জুমিয়া পার্টি-সদস্য হইতে বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্তরা, এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার পর্যন্ত, সকলেরই যদি এই একটাই লক্ষ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখনও কেন এই রাজ্যের বাম-বিরোধীরা নির্বাচনে ৪২ হইতে ৪৯ শতাংশ পর্যন্ত ভোট পাইতেছেন? এতদিন জনকল্যাণকারী বাম সরকার চালাইবার পরেও? কে প্রকৃত বন্ধু, কে প্রকৃত শত্রু— জনগণের চোখে 'সত্য' উদ্ভাসিত হইতে পারে না কোন অস্বচ্ছতার কারণে? কোথায় দুর্বলতা? 'কমিউনিস্টরা জলের মাছ', জল হইতে তুলিলে ছটফট করিয়া মরিয়া যায়। জল মানে জনগণ। সি পি এম কি তাহাদের প্রতিটি

সম্মেলনে বিচার করিবে—কোন কোন সদস্যের কাজকর্ম, আচার-আচরণ, জীবনযাত্রা জনগণের মধ্যে পার্টির সাবলীল বিচরণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করিতেছে? পঞ্চায়েত, ভিলেজ কমিটি, এ ডি সি, নগর পঞ্চায়েত, পুর পরিষদ কিংবা সরকারের সুযোগ-সুবিধা বন্টনে কোন কোন ক্ষেত্রে কাহাদের ভূমিকা—'জয়' না আনিয়া বিপর্যয় আনিতেছে? তাহাদের পিছনে সরাইয়া সি পি এম উদ্যমী নবীনদের সামনে আনিতে পারিবে?

ঘরের যে খুঁটিগুলি ঘুণ ধরিয়া একেবারেই 'অসার' হইয়া পড়িয়াছে, সি পি এম সেগুলি ফেলিয়া দিতে পারিবে তো? ব্যক্তি মানুষের জীবন্ত চোখে পলক পড়ে। কিন্তু, জনগণের চোখে পলক পড়ে না। জনগণ সবই লক্ষ্য করেন, গভীর আগ্রহে লক্ষ্য করিতেছেন—।

(প্রকাশঃ ১৭.১০.২০১১)

কদমতলায় কে?

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে/কদমতলায় কে?/
হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে/খুকুমণির বে।'

— মা, 'বে' মানে কী? পাড়া-গরম-করা পড়া থামাইয়া চিন্তা- কন্যার প্রশ্ন! সর্দির কারণে খোনাকণ্ঠী গিন্নির বিরক্ত জবাব -'বেঁ মাঁনে বিবাহ'! শুনিতেই চিন্তার মাথায় বাল্ব জ্বলিল। ছড়ার খুকুমণি তো নাবালিকা। তাহার বিবাহ? জোরজবরদস্তি ছাঁদনাতলায় তুলিবার আয়োজন? বেআইনি হইবে যে! নাকি রাজনীতির ছড়া? অনিল সরকার যেমন লেখেন? রাজনীতির বিবাহ ২০১৩ সালে! দেরি আছে। নাবালিকা তখন সাবালিকা হইবে। কিন্তু সাঁঝ না আসিতেই চাঁদ উঠিতে দেখিলে, সুকুমার রায়ের 'ঠাস ঠাস দ্রুম দ্রুম ' ফুল ফুটিতে শুনিলে -- উহা ভাল লক্ষণ নহে। 'বে' হউক বা না হউক, গত ২১ অক্টোবর কদমতলায় সত্যই মত্ত হাতি-ঘোড়া নাচিল তো! কদমতলা ব্লকের কংগ্রেস পরিচালিত বরুয়াকান্দি পঞ্চায়েত। বেশি নহে — এক বছরে মাত্র ৭৯ লাখ টাকার দুর্নীতি! এই অভিযোগই তদন্ত করিতে যাইয়া আক্রান্ত, আহত হইলেন পঞ্চায়েত দপ্তরের খোদ যুগ্ম-অধিকর্তা এবং উপ-অধিকর্তা সমেত সরকারি কর্মকর্তারা তাঁহাদের গাড়িও ভাঙচুর হইল। প্রায় ৭০ খানা বাইক চাপিয়া কংগ্রেসের অহিংস যুব বাহিনী তদন্তকারী দলের ওপর ঝাঁপাইয়াছিল বলিয়া অভিযোগ। ঘটনাস্থলে খবর সংগ্রহ করিতে গিয়া আক্রান্ত হইলেন এক সাংবাদিকও।

'আমি টাকা খাই নাই' বলিয়া বফোর্স ঘুষ কেলেঙ্কারির দায় হইতে বাঁচিতে চাহিয়াছিলেন রাজীব গান্ধী। দেশবাসী যাহা বুঝিবার বুঝিয়া লইয়াছিল। কংগ্রেসের বাহুবলী বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনও 'আমি মারি নাই' বলিয়া পার পাইবেন ভাবিতেছেন? 'বরুয়াকান্দি' কংগ্রেসের কান্ধের বোঝা যেভাবে আরও দুর্বহ করিয়া তুলিল, যেভাবে যুব কংগ্রেসের 'আইকন' রাহুল গান্ধীকে তাঁহার আসন্ন ধর্মনগর সফরের আগে আরও একগুচ্ছ অপ্রীতিকর জিজ্ঞাসার সামনে দাঁড় করাইয়া দিল-- ইহার দায় বিশ্ববন্ধুরা এড়াইবেন কেমন করিয়া?

অথচ, কদমতলার বুরুয়াকান্দিতে ঘটনা অন্যরকম হইতে পারিত। ধরিলাম, কংগ্রেসের ওই পঞ্চায়েতে কোনও দুর্নীতি হয় নাই! সি পি এমের 'চক্রান্তেই' এক হাজার লোক গণস্বাক্ষর

করিয়া পঞ্চায়েত কমিশনারের কাছে দুর্নীতির মিথ্যা নালিশ করিয়াছিল। অভিযোগ পাইলে তদন্ত হইবে। সরকারি তদন্তকারী দলকে সহযোগিতা করিয়া, পঞ্চায়েতের কংগ্রেসি কর্মকর্তারাই পারিতেন সবকিছু হাতে-কলমে দেখাইয়া প্রমাণ করিতে— অভিযোগ মিথ্যা। জনসাধারণকে বলিতে পারিতেন — এই দেখ, সি পি এমের লোকেরা 'চক্রান্ত করিয়া' দুর্নীতির মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করিয়াছে। ইহাতে নৈতিক এবং রাজনৈতিক সবদিকেই কংগ্রেসের জয় হইত। কিন্তু, উচ্চ-তদন্তকারী অফিসাররা আসিতেছেন শুনিয়াই তদন্তে বাধা দিবার যাবতীয় সহিংস প্রস্তুতি গৃহীত হইল। হামলা করিয়া তদন্ত বানচাল করা হইল। কেন? কারণটা বোধ হয় দুধের শিশুরও অনুমান করিতে কষ্ট হইবে না।

হায়রে কংগ্রেস! কয়লার গায়ের ময়লা ধুইয়া সাদা ন্যাপথলিন তৈরি হয়, কংগ্রেসের ময়লা ধুইতে বলিলেই ময়ালের ফোঁস -ফোঁসানি! দুর্নীতি আর স্বৈরাচার একই সাপের ল্যাজ আর মাথা। ল্যাজে ধরিতে গেলেই মাথা আসিয়া ছোবল মারে। ১৯৮৮ হইতে ১৯৯২-এর জোট রাজত্ব ইহার সাক্ষী। সরকারি অর্থ-সম্পদের লুণ্ঠন বাধামুক্ত, অবারিত করিতেই সকলের আগে নির্বাচিত পঞ্চায়েত ভাঙা হইয়াছিল। সারা রাজ্যে খুন-সন্ত্রাস-আক্রমণ-গৃহদাহ- গণধর্ষণের এক ভয়াবহ 'অভিযান' চালানো হইয়াছিল। সৃষ্টি হইয়াছিল বীরচন্দ্রমনু-নলুয়ার মতো গণনিধনভূমি, উজান ময়দানের মতো কলঙ্ক-লজ্জা। বরুয়াকান্দি বলিল—কংগ্রেস সুযোগ পাইলেই এখনও সেই একই কংগ্রেস হইতে দেরি করিবে না! এমনকি গ্রাম পঞ্চায়েতেও!

কেবল বরুয়াকান্দি কেন? দিল্লিতে 'বামপন্থীদের চাপমুক্ত' দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের মন্ত্রীরা কী লীলা দেখাইতেছেন? ইঁহারা থামিবেন না, থামিতে জানেন না বলিয়াই। নহিলে আর কংগ্রেস-রাজনীতি কী জন্য! ইহাই তো 'দেশসেবা'! ইহার জন্যই দলের ভিতর এত মারামারি, এত কাড়াকাড়ি! টু-জি স্পেকট্রামে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটির পর এখন আবার কেন্দ্রেরই সর্বোচ্চ অডিট সংস্থা ক্যাগের রিপোর্ট বলিতেছে—বিদ্যুতে আরও ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি ফাঁক হইয়াছে! কিন্তু কোনও প্রতিবাদ সহ্য হইতেছে না! অনশনরত যোগ-প্রচারক রামদেবকে চ্যাংদোলা করিয়া লইয়া গেল পুলিস! প্রধানমন্ত্রীবলিলেন —'উপায় ছিল না'! অনেকটা ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি করিয়া যে সুরে ইন্দিরা গন্ধী বলিয়াছিলেন, সেই সুর! আন্না হাজারেকেও জেলে পোরা হইল। আদালতকে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করা হইল। যেভাবে ১৯৭৫-এ ইলাহাবাদ হাইকোর্টে বাতিল হওয়া ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন 'বৈধ' করিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকেও ব্যবহার করা হইয়াছিল। এখন আন্না-টিমের লোকদের উপরও আক্রমণ শুরু হইয়াছে। এই রকম অজস্র উদাহরণ। মাত্র কয়দিন আগে অসমের কংগ্রেস সরকার প্রতিবাদী নিরীহ কৃষকদের মিছিলে গুলি করিয়া পাখিরা মতন মনুষ্য-শিকার করিল! কেন? ভয় দেখাইতে। কংগ্রেস রাজত্বে শান্তি যদি

চাও, শান্তিতে লুট করিতে দাও! কোনও প্রতিবাদ করিয়ো না! মারা পড়িবে!

বরুয়াকান্দির মতো একটা পঞ্চায়েতে আর কয় টাকা যায়! কংগ্রেস সুযোগ চাহিতেছে রাজ্য সরকারে বসিবার! হাজার হাজার কোটি টাকা! তাই হাতি-ঘোড়া নাচিতেছে! কিলাইয়া কাঁঠাল পাকাইতে ফেলেইরো, বেদপ্রকাশরা আসিয়া চেষ্টা করিতেছেন। হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রের সব উপ-নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর জয়কুমার ২৯ অক্টোবর আসিতেছেন 'ত্রিপুরা-জয়'-এর পথ খুঁজিতে! ফুল ফুটুক না ফুটুক স্বপনে বসন্তের গন্ধ ভাসিতেছে। ৮ নভেম্বর ধর্মনগর, উদয়পুরে হুল ফুটাইতে আসিতেছেন রাহুল গান্ধী। যে 'রাহুর দশা' সারা দেশে কংগ্রেসকে গিলিতেছে, তাহা হইতে এই দলকে মুক্ত করিবে কে! কদমতলায় দুর্নীতির তদন্ত বন্ধ করিতে যে হাতি-ঘোড়ার দল তাণ্ডবনৃত্য করিল, তাহারাই তো কংগ্রেসের 'যুব-আইকন' রাহুল গান্ধীর জনসভাতেও জয়ধ্বনি করিবে! রাহুল কি তখন মনে মনেও নিজেকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন — 'আঁই কন' (আমি কে)? আমি কাহাদের আইকন?

(প্রকাশ : ২৪.১০.২০১১)

জয়ধ্বনি

শনিবারের 'বারবেলা' ধুম-ধাম ইট পড়িল। পাটকেল ছুঁড়িয়া বিটকেলরা 'গো -ব্যাক' বলিল। পচা ডিম উড়িয়া আসিয়া গাড়িতে আছাড় খাইয়া ভাঙিল। গোষ্ঠীর সহিত গোষ্ঠীর হাতাহাতি, লাথালাথি, রক্তারক্তি হইল। তেরঙ্গার বদলে বহু কালো পতাকা সবেগে লাফাইয়া কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ পতাকার রঙ কী হইতে পারে, বুঝাইয়া দিল! এ আই সি সি-র সম্পাদক কে জয়কুমার গাড়িতে পি সি সি সভাপতির পাশে বসিয়া ত্রিপুরা সফরের প্রথম দিবসেই দলের নেতা কর্মীদের গণতন্ত্র-চর্চার নিষ্ঠা দেখিয়া যুগপৎ আতঙ্কিত ও মুগ্ধ হইলেন! খোয়াই রতনপুরের পর বাচাইবাড়ির রাস্তায় বিক্ষুব্ধ কর্মীদের অবরোধ হইতে তাঁহাদের মুক্ত করিতে হইল 'অপদার্থ সি পি এম সরকারের' পুলিসকে!

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সুরজিৎ দত্ত ক্রুশবিদ্ধ যিশু-র মতন বলিতে পারিতেন, "হে প্রভু, ইহারা অবুঝ। কী করিতেছে বুঝিতে পারিতেছে না। ইহাদের ক্ষমা করিয়া দাও।" কিন্তু, বলিলেন না। বরং হুঙ্কার ছাড়িলেন। নিজের পুরানো 'সুনু গুন্ডা' ইমেজের কথা স্মরণ করাইয়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়িলেন, আমাকে সভাপতির পদ হইতে কেহ সরাইতে পারিবে না। আমার হাত ধরিয়াই তেরো-তে সি পি এমকে হটাইয়া কংগ্রেস ক্ষমতায় আসিবে। আগরতলায় বসিয়া দলের এক 'দালালের বাচ্চা' এই সব করাইতেছে বলিয়াও প্রকাশ্য জনসভায় গাল পাড়িলেন। নাম না করিলেও কাহাকে বলিলেন বুঝিতে বাকি রহিল না। এক সঙ্গে বাপ-বেটাকে 'সি পি এমের দালাল' বলিয়া যাঁহাদের দিকে কামান দাগিলেন, তাঁহারাও ছাড়িয়া দিবেন ভাবিবার কারণ নাই।

চিন্তা শীলেরও কিছুই বলিবার নাই। কংগ্রেস নিজেই নিজেকে খুলিয়া-মেলিয়া ধরিতেছে। সেন্ট আর গন্ধ-সাবানে দুর্গন্ধ ঢাকে না। 'বাউল হয় না পরিলে গেরুয়া'। কংগ্রেস থাকিবে কংগ্রেসেই। সি পি এমের সহিত যুদ্ধ করিবে কী, কংগ্রেসকে কংগ্রেসের সহিতই যুদ্ধ করিতে হইতেছে! সি পি এম যখন শাখাস্তর হইতে সম্মেলন আর নির্বাচন করিয়া অঞ্চল, বিভাগ, রাজ্যস্তর এবং সবশেষে ২০১২-র এপ্রিলে সর্বভারতীয় 'পার্টি কংগ্রেস'-এর দিকে যাইতেছে, তখন কংগ্রেস দলের চেহারা যদুবংশের মতন। এই দলে সাংগঠনিক

নির্বাচন নাই, সম্মেলন নাই। সর্বভারতীয় স্তরে বংশানুক্রমিক রিলে-ব্যাটন হস্তান্তর। নেহরুর পর ইন্দিরা, ইন্দিরার পর রাজীব, রাজীবের পর সোনিয়া। এখন তাড়াতাড়ি রাহুলকে টানিয়া-ঠেলিয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। তিনি একদিন হাইকমান্ড হইবেন, কংগ্রেসের সরকার হইলে প্রধানমন্ত্রীও হইবেন। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলিতে থাকিবে। হাইকমান্ড নিজের ইচ্ছামতন প্রদেশ সভাপতি বানাইয়া দিবেন। প্রদেশ সভাপতিরা ব্লক সভাপতিদের বানাইবেন নিজের মর্জিতে। সুতরাং হাইকমান্ড বা প্রদেশ সভাপতির 'মর্জি'-কে নিজের পক্ষে টানিবার জন্য লবিবাজি (অতএব গোষ্ঠীবাজিও) চলিবে, চলিতেই থাকিবে।

আসলে হাইকমান্ডই এই গোষ্ঠীবাজি এবং লবিবাজি বাঁচাইয়া রাখেন। পুষ্টি জোগান। ব্লকের অসন্তুষ্ট কংগ্রেস নেতারা চিরকাল ব্লক কং-সভাপতি বদলের দাবি জানাইতে থাকিবেন। প্রদেশের অসন্তুষ্ট নেতারাও চিরকাল প্রদেশ সভাপতি বদলাইবার চেষ্টা করিয়া যাইবেন। বিরোধী দলে থাকিলে কং-বিধায়করা 'বিরোধী নেতা' বদলের জন্য লবি করিবেন। সরকারে থাকিলে মুখ্যমন্ত্রী বদলের 'লড়াই' চালাইয়া যাইবেন। আজ পর্যন্ত এদেশের কোনও প্রদেশে একজন কংগ্রেস সভাপতিকেও দেখা যায় নাই, যাহাকে হটাইবার জন্য দলের মধ্যে নিরন্তর লবিবাজি, গোষ্ঠীবাজি হয় নাই। ইহাই কংগ্রেস! ছোট মাঝারি ও বড় নেতা-কর্মীরা নিজেদের মধ্যে চেয়ার লইয়া নিরন্তর মারামারি করিতে থাকিবেন—ইহাই এই দলের সাংগঠনিক নিয়ম। ইহাই চালিকাশক্তি। সি পি এম-সহ বামপন্থীদের সামনে একটা ঘোষিত রাজনৈতিক লক্ষ্য রহিয়াছে। কাহারও পছন্দ হউক বা না হউক, তাঁহাদের ঘোষিত আদর্শ, কর্মনীতি ও কর্মসূচি রহিয়াছে। শৃঙ্খলা রহিয়াছে। কংগ্রেসের এই সবের বালাই নাই। ১৮৮৫ সালে অক্টাভিয়ান হিউম সাহেবের 'মধ্যস্থতায়' ইংরেজের সহিত দর-কষাকষির জন্য কংগ্রেস গঠিত হইয়াছিল। অনেক পরে 'পূর্ণ-স্বরাজ'-এর লক্ষ্য স্থির হয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের করণীয় কী, লক্ষ্য -উদ্দেশ্য, আদর্শ, কর্মসূচি কী, কখনও স্থির হয় নাই। একেকটা কংগ্রেস সরকারের যেমন যেমন কর্মসূচি ঠিক হইয়াছে, কংগ্রেস দলকেও ইহার বাহিরে কিছু বলিতে কখনও শুনা যায় নাই। ক্ষমতাই কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য। মন্ত্রী, এম পি, এম এল এ, চেয়ারম্যান হইয়া ক্ষমতা ভোগ করা আর ব্যক্তিগত আখের গুছানোই নেতাদের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত। তাই নেতায়-নেতায় ক্ষমতার লড়াই, চেয়ার দখলের লড়াই। নির্বাচনী 'হাত' -এর টিকিট পাইতে হাতাহাতি। কর্মী, সমর্থকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়া 'রাজনীতি করাই নেতাদের 'রণকৌশল'। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, গোষ্ঠীসঙ্ঘর্ষ কংগ্রেসের স্বাভাবিক আত্মপরিচয়। বড় নেতারা চান, ছোটরা কোন্দলে ব্যস্ত থাকুন, খবরদারি করিবার রসদ মিলিবে।

জয় করিতে আসিয়া জয়কুমার যে জয়ধ্বনি শুনিলেন, শনিবার ঢিল-পাটকেল, পচা ডিমের যে অভ্যর্থনা পাইলেন তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই অবাক হন নাই। বরং পুলকিত হইবেন!

গোষ্ঠী-কোন্দল না থাকিলে তাঁহার কাজ কী! কোন্দল না থাকিলে এ আই সি সি বা হাইকমান্ডেরও কাজ থাকিত না। কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হইতে দেয় না দলের নীতি। গোড়াতেই আসল গলদ। দায়ী তাহাদের সরকারগুলির জনবিরোধী নীতি আর কার্যক্রম। কর্মী-সমর্থকদের চোখ মূল সমস্যাগুলি হইতে অন্য দিকে সরাইয়া রাখিতে হইলেও দলের অভ্যন্তরে উত্তেজনা বজায় থাকিলে সুবিধা! নেতারা কর্মীদের উত্তেজিত করেন। মানুষকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু, যতটা উত্তেজনার অভিনয় করেন আসলে নিজেরা ততটা উত্তেজিত হন না। তাই নেতায়-নেতায় গালাগালি আর গলাগলি, কোনওটাতেই দেরি হয় না।

আসলে সকলেই সবকিছু জানেন, বোঝেন। সমীর বর্মন, সুদীপ বর্মন, বীরজিৎ সিংহ, রতনলাল নাথ, গোপাল রায় কিংবা সুরজিৎ দত্ত—সকলেই কংগ্রেসের শৃঙ্খলাহীনতার ঐতিহ্য বজায় রাখিতেছেন মাত্র। সি পি এমের বিরুদ্ধে লাগিবার ইস্যু না পাইলে নিজেদের মধ্যে লাগালাগি লাগাইয়া রাখিয়া কর্মীদের ব্যস্ত রাখিতে চাহিতেছেন। কংগ্রেসের 'হাত' যাঁহার হাতেই থাকুক, বেশ-কম কিছু নাই। ইঁহাদের কাহারও একজনের হাত ধরিলে তেরো-তে গোটা রাজ্যকেই 'উচ্ছৃঙ্খল' করিবার সুযোগ মিলিলেও মিলিতে পারে! তবে, এগারোতেই ইঁহারা যে চেহারা ধরিয়াছেন, তেরোতে লোকে আর হাতে-হাত রাখিবার ভুল করিবেন বলিয়া মনে হয় না।

(প্রকাশ ঃ ৩১.১০.২০১১)

স্লো ডেথ!

মুদ্রীস্ফীতি কাহাকে বলে?

সেলুনে কেশস্ফীতি, শ্মশ্রুস্ফীতি দেখি। স্বামী-গৌরবে গরবিনী চিন্তা-গিন্নির অনর্গল ঢোলা বক্‌বকানি আর ভোট আসিলে কংগ্রেস নেতাদের 'ঢপের চপ' প্রতিশ্রুতি শুনিয়া গপস্ফীতিও বুঝি। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি? মুদ্রা তো সত্যই আর ফুলিয়া উঠে না বরং আগুনে গলিয়া যায়। রেল লাইনে রাখিলে চাকার নিচে পিষিয়া কিংবা চ্যাপ্টাইয়া যায়। কাগজের নোট জাল হইলেও জলে ভিজিয়া কিংবা জ্বালে জ্বলিয়া নষ্ট হয়। ফুলিয়া উঠিতে শুনি নাই।

বাল্যকালে শুনিয়াছি, চীনে চিয়াং কাইশেকের আমলে এক ঝুড়ি টাকা লইয়া দোকানে গিয়াছিলেন এক বিধবা। সব টাকা ঢালিয়া দিয়া চারখানা ডিম চাহিলেন। দোকানি ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল,'এই টাকায় ডিমের খোসাও মিলিবে না। তুমি বরং তোমার ঝুড়িখানা দিলে ইহার বিনিময়ে একজোড়া ডিম লইয়া যাইতে পারো!' অর্থাৎ ডিমের দাম আছে, ঝুড়ির দাম আছে। কেবল টাকার দাম নাই! জিনিসের দাম বাড়িতে বাড়িতে এমন হইয়াছে যে টাকায় কুলাইতেছে না। টাকা সংখ্যায় বাড়িতেছে, কিন্তু দামে নিঃস্ব হইয়া নিছক ছাপানো কাগজে পরিণত হইতেছে। ইহাই নাকি মুদ্রাস্ফীতি।

মনে হয়, আমাদের এই পোড়া দেশকেও চিয়াং কাইশেকের ভূতে পাইয়াছে! সমস্ত জিনিসপত্রের দাম এমন হু-হু করিয়া বাড়িতেছে যে, মূল্যবৃদ্ধির এই গতি বুঝাইতে 'বিপুল', 'ভয়াবহ', 'লাগামহীন', 'গগনচুম্বী' ইত্যাদি সকল শব্দই জব্দ হইতেছে। কোনও বিশেষণ যথেষ্ট মনে হইতেছে না। খাদ্য সামগ্রী কিনিতেই মধ্যবিত্তের আয় ফুরাইতেছে। খাদ্যমুল্যের মুদ্রাস্ফীতি ১২.২১ শতাংশ উঠিয়াছে কেন্দ্রের হিসাবেই। যদিও সকলেই জানে, এই হিসাব সমুদ্রে ভাসমান তুষারপর্বতের দৃশ্যমান চূড়া মাত্র! তাহা ছাড়া, কিছুকাল পরপর ভিত্তিবর্ষ বদল করিয়া মুদ্রাস্ফীতি আর মূল্যবৃদ্ধির হার কম দেখাইতে হয়! ইঁদুরের দাঁতের মতন। প্রতিদিন কুটুস-কাটুস করিয়া ক্ষয় না করিলে ইঁদুরের দাঁত নাকি দেড় হাত লম্বা হইত! সাধারণ মানুষ এই সব কারসাজি না বুঝিলেও নিত্যদিনের অভিজ্ঞতায় সবই বুঝিতে পারেন। সমস্ত রকম ওষুধের দাম লাফাইয়া বাড়িতেছে। দেশের সদাশয় সরকারের কোনও

দায়িত্ব নাই! পেট্রলের দাম এক বছরে ১১ বার বাড়ানো হইল। ১৯৯৯ সালের পর হইতে দাম বাড়ানো হইয়াছে ৫৮ বার! আবার বাড়িবে ডিজেল, কেরোসিন এবং রান্নার গ্যাসের দাম। বাড়িবে পরিবহণ ভাড়া। মূল্যবৃদ্ধির রকেট উর্ধ্বপানে এমনিতেই ছুটিতেছে। পেট্রোল-ডিজেলের ঘন ঘন দামবৃদ্ধি সেই রকেটের পেছনেই রামধাক্কা মারিতেছে! বিশ্বায়ন, বেসরকারিকরণ এবং উদারীকরণের পথে হাঁটিয়া দেশ এক সর্ববিনাশী কৃষ্ণগহ্বরের দিকে ধাবিত হইতেছে। গ্যাট-এর দাসখতে স্বাক্ষরের পরিণতিতে দেশের সরকার যেন ক্রমশই আপাঙক্তেয়। ক্রীতদাস! বিশ্বায়নের মওকায় নেতা-মন্ত্রীরা অনেকেই লক্ষ কোটি টাকা লুটিতেছেন। দেশে বড়লোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে। আড়াই লক্ষ কৃষক দেনার দায়ে আত্মহত্যা করিলেও মার্কিন মুলুকে আমাদের ইজ্জত, খাতির বাড়িয়াছে। অতএব, জিন্দাবাদ...!

কিন্তু কী হইবে এই দেশের কোটি কোটি গরিব চাষী- মজুর-কেরানি-শিক্ষক- কর্মচারীর? মানবাধিকার সূচকে বিশ্বে আমাদের দ্রুত অবনমন ঘটিতেছে। কী হইবে এ দেশের কোটি কোটি বেকারের? চাকরি নাই। বেসরকারিকরণে কর্মচ্যুতি বাড়িতেছে। কেন্দ্র দেয় না। রাজ্য সরকার চাকরি দিলে অপরাধ। বাজেট ছাটাঁই। কী হইবে বাঁধা আয়ের পরিবারগুলির? মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারি নীরব ঘাতকের মতন ঘর-সংসার ছারখার করিয়া দিতেছে। কী হইবে পেনশনপ্রাপক বয়োবৃদ্ধদের? যাঁহারা সারা জীবন সমাজের জন্য করিয়াছেন তাঁহাদের পেনশনের অর্জিত টাকা কেন্দ্রীয় সরকার শেয়ার বাজারে ফেলিয়া দিলে সমাজ চুপ করিয়া থাকিবে? যে প্রবীণ মানুষটি সারা জীবনের কৃচ্ছ্রসাধনে ব্যাঙ্কে কিছু টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন, মুদ্রাস্ফীতির ফলে সেই টাকার দাম অর্ধেকের নিচে নামিয়া আসিতেছে। কীভাবে শেষ দিনগুলি বাঁচিবেন তিনি? সমগ্র দেশ জুড়িয়া এই অনাচার, এই গণলাঞ্ছনা, এই ব্যভিচার চুপচাপ মানিয়া লইতে হইবে?

কেরল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই অবস্থাকেই জনসাধারণের 'স্লো ডেথ' বলিয়াছে। দায়ের এক কোপে বা বন্দুকের এক গুলিতে না মারিয়া ধীরে ধীরে মারিবার জন্য বিষপ্রয়োগের নাম 'স্লো পয়জনিং'। এই রকম, দেশবাসীকে 'স্লো ডেথ'-এর দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। যে কেরল হাইকোর্ট একদা 'বনধ' বেআইনি করিয়া দেশ জুড়িয়া প্রবল বিতর্ক সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারাই এখন মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে জনগণকে প্রতিবাদে সামিল হইতে নজিরবিহীন আহ্বান করিতে বাধ্য হইয়াছে!

প্রতিবাদ হইতেছে। সংসদের ভিতরে বাহিরে, রাস্তায় ময়দানে প্রতিবাদ করিতেছেন বামেরা। সঙ্গী হইয়াছে কিছু গণতান্ত্রিক শক্তিও। ত্রিপুরায়ও মিছিল-মিটিং করিতেছেন তাঁহারাই। কিন্তু কেবল বামেরাই কেন? কংগ্রেস নেতারা মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে একটি শব্দও বলিবেন না কেন? জনগণকে লইয়া 'রাজনীতি' করিবেন, জনগণের দুঃখ কষ্ট সমস্যায় পাশে থাকিবেন

না? ভোটের লক্ষ্যে তাঁহারা রাতদিন এত গাল পাড়িতেছেন, পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে একটি বাক্য বলিতে তাঁহাদের জিহ্বা আড়ষ্ট হয় কেন? একটি বিবৃতি দিতেও কলমের কালি শুকাইয়া যায় কেন? এমনকি, তৃণমূল কংগ্রেসও প্রতিবাদের মুখভঙ্গি করিয়া পদত্যাগের হুমকি দিতে পারিয়াছে। কংগ্রেস তাহাও পারিতেছে না! তাহাদের বিশ্বাসী লেজুড়ে পরিণত এক বহিষ্কৃত সি পি এম নেতা তথা প্রাক্তন 'জেনারেল'-কেও দেখিলাম পত্রিকায় উদোম হইয়া বিশ্বায়নের গুণকীর্তন করিতেছেন! কই, তিনিও তো এই মূল্যবৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে একটিও অক্ষর খরচ করিলেন না! প্রতিবাদ কেবল বামেরাই করিলে জনগণ তো বামেদের পাশেই সমবেত হইবে। হইতেছেও। বাম-বিরোধীরা নিজেদের রাজনৈতিক 'স্লো ডেথ' বুঝি এইভাবেই ডাকিয়া আনেন। আনিতেছেনও। ইতিহাসের নিয়মেই।

(প্রকাশ: ০৭.১১.২০১১)

ঠাকুরমার ঝুলি

পাড়ার ব্যানার্জিবাবু! দাড়ির নিচে লুকানো গাল দুইখান যেন চ্যাপ্টা মুড়ির টিন। কাৎ করিবার দরকার নাই। চা-চারমিনার পাইলে, টিনের মুড়ির মতন অনর্গল কথা বাহির হইতে থাকে। সেলুনের চেয়ার দখল করিয়া বলিলেন, সি পি এম নেতারা বড়ই বেরসিক। 'ঠাকুরমার ঝুলি'-ও পড়েন নাই! রাক্ষস-খোক্কসের রূপকথা সত্য ধরিয়া লইতে আছে? টিভি দেখিয়া, অনেক চালাক -চতুর মেধাবী বালকও অনেক সময় 'নোবিতা'-কে নকল করে। তাই বলিয়া তাহাকে 'গণ্ডমূর্খ' বলিতে আছে?

ভাবিলাম, কথার সারবত্তা রহিযাছে। যিনি পণ্ডিত, তাঁহাকে 'পণ্ডিত' বলিলে অখুশিঁ হইবার কারণ নাই। কিন্তু মূর্খকে 'মূর্খ' বলা শোভন নহে। তাহা ছাড়া, শত্রু-সেনাপতি 'মূর্খ' হইলে তাহাকে লইয়া বিপদও নাই। গাছের আগায় বসিয়া গোড়া কাটেন বলিয়াই তিনি মূর্খ। নিজের বিপদ তিনি নিজেই ডাকেন। ডাকিবেনও। বরং জানিয়া-বুঝিয়া চক্ষু বুজিয়া যিনি দিনকে রাত করা অসত্য-ভাষণ দেন, তাঁহাকে 'গণ্ডমূর্খ' না বলিয়া কেহ কেহ 'পণ্ডিতমূর্খ' বলিলেও বলিতে পারেন। কিন্তু, ব্যাপার বোধকরি এত হাল্‌কা নহে।

১০ নভেম্বর কৈলাসহর আর উদয়পুরে কংগ্রেসের 'যুবসূর্য' রাহুল গান্ধীর বক্তৃতায় এই রাজ্যের কংগ্রেস নেতারাই বিষম আশাহত, দলের কর্মী-সমর্থকদের কথা আর কী বলিব? সবাই স্বীকার করিবেন — দেশের সুদূর উত্তর-পূর্ব প্রান্তে পড়িয়া থাকা ত্রিপুরা রাজ্যে আসলেই কী কাজ হইতেছে, স্বচক্ষে ঘুরিয়া দেখিবার মতন সময় ভাবী দিল্লিশ্বরের নিকট প্রত্যাশা করাও অন্যায়। হেলিকপ্টারে গগনবিহারী যুব-ঈশ্বর তাই দুই জায়গায় দুইবার চরণস্পর্শ দিয়াই দিল্লি ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, ত্রিপুরায় আসিবার আগে তিনি কোনও হোম-ওয়ার্ক করেন নাই? বামফ্রন্ট সরকারের কোনও কাজে, কাজের ধরনে অনেকের অনেক সমালোচনা থাকিতে পারে, অনেক অভিযোগ এমনকি ক্ষোভও থাকিতে পারে। আছেও। কিন্তু, রাহুল না হইয়া ত্রিপুরায় যদি কেহ আসিয়া বলেন — বাম আমলে এই রাজ্যের কোনও উন্নতি হয় নাই, কোনও রাস্তা-ঘাট হয় নাই, রেগা-র কাজ হয় নাই, বনাধিকার আইনে উপজাতিরা জমি পান নাই, উপজাতিদের কোনও উন্নতি হয় নাই,

স্কুলে মিড-ডে মিল নাই ইত্যাদি, যদি কেহ বলেন — তাহা হইলে লোকে বিশ্বাস করিবে? নাকি বক্তাকে নির্ঘাত 'বদ্ধ পাগল' মনে করিবে! অথচ কংগ্রেস দলের 'সর্বভারতীয় ভবিষ্যৎ' রাহুল গান্ধী এমনই বলিয়া গেলেন! অবলীলায়!

কী বলিব, এখন বাম-বিরোধীরাই লজ্জা পাইতেছেন। তাঁহাদের সমর্থক একটি পত্রিকা ময়না তদন্তও শুরু করিয়াছে। রবিবার লিখিয়াছে, রাজ্যের কোনও এক উচ্চ পদাধিকারী কংগ্রেস নেতাই নাকি, 'রাহুলজি'-কে এই সব 'ভুল তথ্য' ফেলেইরোর মাধ্যমে সরবরাহ করিয়াছেন। আবার এমনও সন্দেহ করা যাইতেছে যে, সি পি এমই চক্রান্ত করিয়া ত্রিপুরায় কংগ্রেসের 'সত্যনাশ' করিতে রাহুলকে দিয়া ওই সব অবিশ্বাস্য কথাবার্তা বলাইয়াছে! এই বক্তব্য চিন্তা শীলের নহে, বাম-বিরোধী ওই ইংরেজি দৈনিকের!

মুশকিল হইল, ত্রিপুরা কোনও কংগ্রেস-শাসিত রাজ্য নহে। এমনকি বি জে পি বা অন্য দলের সরকারও এখানে আসীন নহে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে-কোনও কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যের ক্ষেত্রে রাহুল গান্ধীর অভিযোগগুলি হুবহু খাটে। এমনকি ত্রিপুরার গা ঘেঁযা আসামে, মিজোরামে, নাগাল্যান্ডে, মণিপুরে — সর্বত্র। ত্রিপুরার শহর-নগর-গ্রাম-পাহাড়ে বর্তমান রাস্তাঘাটের বিস্তৃত জাল, তাহার উন্নত মান দেখিয়া সকল বহিরাগতই বিমুগ্ধ হন। রাজ্যের উপজাতি অঞ্চলগুলিরও ৯৫ ভাগ অংশে এখন গাড়ি যাইতে পারে। এই দেশের আর কোনও রাজ্য সরকার এই সাফল্য দেখাইতে পারে নাই। শিক্ষাক্ষেত্রে কোথা হইতে ত্রিপুরা আজ কোথায় উঠিয়াছে, দিল্লিও ভাল জানে। রাহুল জানেন না? ২০১১-র জনগণনার পর কেন্দ্রই বলিতেছে, সাক্ষরতায় ত্রিপুরা এখন দেশে তৃতীয়। আর পুরুষ-মহিলা সাক্ষরতা হারের ব্যবধান হ্রাসের ক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে গত আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসেই তো দিল্লিতে 'বর্তমান দশকের সেরা রাজ্য' হিসাবে পুরস্কৃত করিয়াছেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল। রাহুল গান্ধী জানেন না বুঝি! স্বাস্থ্য পরিষেবাতেও বিপুল অগ্রগতি ঘটিয়াছে বাম আমলেই। প্রত্যন্ত অঞ্চলেও হাসপাতাল। দুই মেডিক্যাল কলেজ হইয়াছে। ডাক্তার নার্স বাড়িতেছে। পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধিতে ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে রাহুল গান্ধীর দলের কেন্দ্রীয় সরকারই এই বছর ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করিয়া 'হীরক রাজ্য' পুরস্কার দিয়াছে। আর এম এন রেগা? বামপন্থীরাই তো গত দুই দশক ধরিয়া ন্যূনতম একশো দিনের কাজের গ্যারান্টি দিবার আন্দোলন করিতেছিলেন। তাঁহাদের চাপেই বড়লোকদের অখুশি করিয়াও প্রথম ইউ-পি-এ সরকার এই আইন পাস করিতে বাধ্য হয়। দিল্লির বর্তমান সরকার ইহা করে নাই। তবে, ত্রিপুরাকে পরপর তিন বছর এম এন রেগা রূপায়ণে দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করিয়াছে কিন্তু মনমোহনজির সরকারই। রেগা গ্রামে। কিন্তু শহরের গরিবদের জন্য একমাত্র

ত্রিপুরাই 'টুয়েপ' চালু করিয়াছে। মিড-ডে -মিল তো দেশের মধ্যেই ত্রিপুরাই সর্বপ্রথম সফলভাবে চালু করিয়াছিল, নিজস্ব উদ্যোগে, নৃপেন চক্রবর্তীর আমলে। কেন্দ্র তখন ইহা কল্পনাও করিতে পারে নাই!

রাহুল না জানিলেও অন্য সকলেই জানেন, বনাধিকার আইন পাসের ইতিহাসও ভিন্ন নহে। জনসংখ্যার হারে এই আইন রূপায়ণেও দেশের সেরা হইয়াছে ত্রিপুরা। যে রাজ্যে মোট পরিবারই দশ লাখের নিচে, সেখানে ১ লাখ ১৮ হাজার পরিবার পাইয়াছেন ১ লাখ ৭৪ হাজার হেক্টর জমি! রাহুল গান্ধী এই সব তথ্য না জানিলে দিল্লিতে বসিয়াই জানিতে পারিতেন। কেন্দ্রীয় সরকারই আগরতলা শহরকে 'নগররত্ন' পুরস্কার দিয়াছে স্বচ্ছতা আর দায়বদ্ধতার জন্য। পুরস্কৃত করিয়াছে শহরের গরিবদের শ্রেষ্ঠ মৌলিক পরিষেবা দিবার জন্যও। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-ই দশ লাখ টনের নিচে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে খাদ্য উৎপাদনে ত্রিপুরাকে 'শ্রেষ্ঠ' পুরস্কার দিয়াছেন মাত্র কিছুকাল আগে। রাহুল গান্ধী কিছুই জানিলেন না? নাকি জানিয়া বুঝিয়াই অসত্যের বন্যায় ত্রিপুরার মানুষের বিচার-বুদ্ধি বিবেককে ডুবাইয়া দিতে চাহিলেন?

গরিব মানুষ দেখিতে কেমন হয়? আগেকার দিনে সম্রাটের পরিবারের লোকেরা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দরবারে আসা হাড্ডিসার নতজানু দরিদ্রদের দেখিয়া কৌতূহল নিবৃত্ত করিতেন শুনিয়াছি। অনেকটা সেই বকমই, রাহুল গান্ধী কৈলাসহরে বলিয়াছেন, "ঠাকুরমা-র কাছে আপনাদের গল্প অনেক শুনিয়াছি। দিল্লিতে ছোটবেলায় প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে উত্তর পূর্বাঞ্চলেব মানুষের সহিত পরিচিত হইয়াছি। এখন আপনাদের মধ্যে আসিতে পারিয়া খুশি হইলাম।" ইহাই ব্যানার্জিবাবুর কথায় 'ঠাকুরমার ঝুলি'। উদয়পুরেও তিনি তাঁহার ঠাকুরমা ইন্দিরা গান্ধী এবং বাবা রাজীব গান্ধীর সহিত ত্রিপুরার পুরনো 'রিস্তা'-র প্রসঙ্গ টানিয়া বক্তৃতা শুরু করিয়াছেন।

মনে হয় ইহাতেও দুই খান কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এক) কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদেব রাহুল বলিলেন — কংগ্রেসে তাঁহাদের পরিবারই শেষ কথা। পরিবারতন্ত্রই চলিতে থাকিবে। 'ছোটবেলা'-র ইঙ্গিতের অর্থ — এখন তিনি আর ছোট নহেন! বড় হইয়াছেন। ছোট ছিলেন বলিয়াই অন্য লোককে (মনমোহনজিকে) প্রধানমন্ত্রী করিতে হইয়াছিল. সামনে আর নহে। কংগ্রেসের সরকার (যদি হয়)-এর তিনিই হইবেন প্রধানমন্ত্রী। দলের ভিতরে 'গণতন্ত্র' বা 'সাংগঠনিক নির্বাচন'-এর কথাবার্তা কেবল কথার কথাই! গণতন্ত্র আর কংগ্রেসের ডিভোর্স হইয়া গিয়াছে স্বাধীনতার পরই। দুই) ঠাকুরমা-র বাবা জওহরলাল

নেহরু-র কথা তিনি একবারও উচ্চারণ করিতে চাহেন নাই। কেন? নেহরুজি গভীর শ্রদ্ধা করিতেন বামপন্থীদের, কমিউনিস্টদের। সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেক কিছু এ দেশে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। বর্তমান কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধীরা নেহরু-র পথ ত্যাগ করিয়াছেন। আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত পথে চলিতে চাহিতেছেন এবং বিশ্ব-পুঁজির মহাজনদের গলায় গলা মিলাইয়া অন্ধ কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ জাহির করিতেছেন। ঠিক কী কারণে যে কেরল, পশ্চিমবঙ্গের মতন ত্রিপুরার বাম সরকারকেও 'হটাইতে হইবে'— কোনও সৎ যুক্তি দিয়া বুঝাইবার সাধ্য তাঁহার নাই, কাহারও নাই। তাই বেচারা রাহুলেরও মিথ্যা বলা ছাড়া উপায় নাই! তবে হ্যাঁ, ব্যানার্জিবাবু কহিলেন— রাহুলজির ঠাকুরমা আর বাবা-র আত্মীয়তার কথা আমরা সত্যই কোনও দিন ভুলিতে পারিব না। ঠাকুরমা ইন্দিরাজি সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিয়া নিজের দেহরক্ষীদের হাতে খুন হইয়াছেন। ঠাকুরমার ঝুলিতে আরও রহিয়াছে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধকারী 'জরুরি অবস্থা'। রহিয়াছে ত্রিপুরায় এত বড় দাঙ্গার দায়ে অভিযুক্ত সশস্ত্র টিন এন ভি-র তদানীন্তন প্রকাশ্য রাজনৈতিক দল টি ইউ জে এসের সঙ্গে কংগ্রেসের আঁতাত সৃষ্টির কৃতিত্ব (!)। বাবা রাজীব গান্ধী আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া টি এন ভি-র সহিত গোপন চুক্তিতে পরপর গণহত্যা, উপদ্রুত ঘোষণা, ভোট গণনায় ডাকাতি ইত্যাদির মাধ্যমে জোট রাজত্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই ভয়াবহ স্মৃতি এখনও দুঃস্বপ্নের মতো জাগিয়া রহিয়াছে ত্রিপুরার মানুষের মনে। সুতরাং, 'ঠাকুরমা' এবং 'বাবা'- কে স্মরণ করাইয়া রাহুল গান্ধী বুঝাইলেন — বামপন্থী সরকার হটাইবার আর কোনও পথ তাঁহার জানা নাই, কাহারও জানা নাই।

(প্রকাশ ঃ ১৪.১১.২০১১)

ঘরের ইঁদুর

স্বাস্থ্যমন্ত্রী তপন চক্রবর্তী মহাশয় অতিশয় সদাশয়। ঠান্ডা মানুষ। গরম বলেন কম। তিনিই কিনা সাংবাদিকদের বলিলেন, অন্তর্ঘাত চলিতেছে জি বি হাসপাতালে!

কী ভয়ঙ্কর! বলিউডি রঙিন ফাইটিং ফিলিমের দৃশ্য মনে পড়িতেছে যে! মাথা-হাত-পায়ে ব্যান্ডেজ -বাঁধা নায়ক নার্সিংহোমের শয্যায় সংজ্ঞাহীন। ছদ্মবেশী দুষ্ট ভিলেন ঘরে ঢুকিয়া তাহার অক্সিজেন-মাস্ক কিংবা স্যালাইন অথবা রক্তের লাইন খুলিয়া দিল! জানি, বলিউডের নায়ক মরিবে না, মরিতে পারে না! কুড়ি-পঁচিশটা গুলি খাইয়াও বাঁচিয়া থাকে! জানিয়াও আমরা উদ্বেগে রুদ্ধশ্বাস, কী হয় কী হয়! ফিলিমের নাম মনে নাই। তবে চিন্তা-গিন্নি পরে স্বামীকে বাদ দিয়া রূপসী হলে ওই ফিলিম আরও নয় বার দেখিয়া ক্ষান্ত দিয়াছিলেন, এত বছর পরেও বিলক্ষণ মনে আছে!

কিন্তু, বাস্তব জীবনের সাধারণ মানুষ বলিউডেব নায়ক নহেন। ধনাঢ্যও নহেন। তাহাদের অন্ন-চিন্তা চমৎকার! নার্সিংহোমে চিকিৎসার সাধ্য নাই। ত্রিপুরার মতো রাজ্যে সরকারি হাসপাতালই মানুষের প্রধান ভরসা। আর, জি বি হাসপাতাল ত্রিপুরার স্বাস্থ্য-গগনে ধ্রুবতারার মতন। সেই খানে অন্তর্ঘাত? মন্ত্রী ভাবিয়া চিন্তিয়াই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কেন না, তিনি সাংবাদিকদের সামনে তথ্য পেশ করিয়া বলিয়াছেন, কিছুকাল যাবৎ এই রকম ঘটনা ঘটিতেছে। হাসপাতালের দামি দামি মেশিনের যন্ত্রাংশ সরাইয়া ফেলা হইতেছে, অক্সিজেনের পাইপ, জলের নল কাটিয়া ফেলা হইতেছে, অথবা গজ-তুলা ঢুকাইয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে! তিনি তদন্ত কমিটি গড়িয়াছেন। একই সঙ্গে 'ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতি' আবেদন করিয়াছেন তাহারা যেন ওই রকম কুকর্ম হইতে বিরত থাকে।

ভয়ঙ্কর নহে? ওই বলিউডি ফিলিমের অন্তর্ঘাত ছিল একজনকে খতম করিতে। কিন্তু, মন্ত্রী যে তথ্য দিয়াছেন — এই অন্তর্ঘাতে কত রোগী খতম হইয়াছে, কত জনের চরম সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে এবং হইতেছে — তাহার হিসাব করিবে কে? জি বি হাসপাতাল আজ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম আধুনিক ও বৃহত্তম সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। যে এন্ডোস্কোপি মেসিনের যন্ত্রাংশ বারবার চুরি হইতেছে, মন্ত্রী বলিয়াছেন

— এত দামি মেশিন পূর্বোত্তরে কোথাও নেই। কিন্তু খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া যখন এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র ও অন্তর্ঘাতের কথা বলিতে হইতেছে, তখন তাঁহার স্বাস্থ্য প্রশাসনের কৈফিয়তটা কী? এত বড় হাসপাতাল, এত দামি দামি যন্ত্রপাতি বসিয়াছে! রক্ষণাবেক্ষণের পরিকাঠামো নাই? নজরদারি কোথায়? এত ডাক্তার , নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, নিরাপত্তা কর্মী— সকলেই 'আমার দায়িত্ব নহে' ভাবিয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিতেছেন? নাকি তাহারা দেখিয়াও না দেখার ভান করিতেছেন? স্বাস্থ্য-প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তারা কেবল বিপুল অঙ্কের বেতন গুনিয়া আর লম্বা-চওড়া ভাষণ দিয়া মন্ত্রী-তোষণে ব্যস্ত থাকিলে তাঁহাদের আসল কাজ করিবে কে?

চিন্তা-গিন্নি অ্যালার্ম বাজানো গলা-খাঁকারি দিয়া কহিলেন— 'মাথা ঠান্ডা করো। লাভ যাহার, হাতও তাহার'। মনে মনে গিন্নির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিলাম— ঠিক কথা। প্রধান সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য-পরিষেবা বিঘ্নিত হইলে লাভ কাহার? এই প্রশ্নের উত্তর পাইলেই 'অন্তর্ঘাতী হাত'-এর সন্ধান মিলিবে। কিন্তু, প্রশ্ন যত চমৎকার, উত্তর তত সহজ নহে! লাভ তো অনেকের, অনেক দিক হইতে। কেন্দ্রীয় সরকার যখন স্বাস্থ্য, শিক্ষা-সহ সব ক্ষেত্রে সরকারি বরাদ্দ কমাইতেছেন, গরিবের পরিষেবা ছাঁটিতেছেন, টাকাওয়ালাদের স্বার্থে সব বেসরকারি করিয়া দিতেছেন, এমনকি দেশের খুচরা পণ্যের বাজারেও অবাধে বিদেশি রাঘববোয়াল বহুজাতিকদের ডাকিতেছেন— তখন ত্রিপুরার বাম সরকার সাঁতার কাটিতেছে একেবারেই উল্টা স্রোতে। 'সকলের জন্য শিক্ষা, সকলের জন্য স্বাস্থ্য'— এই সব কথা আজকাল কেহ বলে? কম্যুনিস্টরা ছাড়া? রাহুল গান্ধী এই জন্যই বলিয়াছেন, ' এ দেশের কম্যুনিস্টরা এখনও পঞ্চাশের দশকে পড়িয়া আছেন'। ঠিকই তো! স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের কথাই যদি ধরি— গ্রামে গ্রামে গরিবদের জন্য আরও স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আরও গ্রামীণ হাসপাতাল, আরও মহকুমা হাসপাতাল কেন করিতেছে বামফ্রন্ট সরকার? সব হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পরিষেবা, ব্লাড ব্যাঙ্ক, উন্নত যন্ত্রপাতি কেন স্থাপন করিতেছেন তপনবাবুরা? ডাক্তারের অভাব মিটাইতে দুই মেডিক্যাল কলেজ, নার্সের অভাব মিটাইতে একাধিক নার্সিং ইনস্টিটিউট, প্যারা মেডিক্যাল কর্মীর জন্য প্যারা মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ফার্মাসিস্টের জন্য রিজিওনাল ফার্মেসি কলেজ ত্রিপুরার মতন ছোট্ট প্রান্তিক রাজ্যে হইয়াছে বাম সরকারেরই প্রচেষ্টায়। এই কথা অস্বীকার করিবে কে? কিন্তু, এই প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রের কী লাভ? গরিবের আবার স্বাস্থ্য কী: টাকা যাহার, স্বাস্থ্য তাহার! কড়ি নাই, নাড়ি নাই!

বুঝাই যাইতেছে, সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ভাল চলিলে স্বাস্থ্য-ব্যবসায়ীদের মুনাফা কম হয়। বরং, সরকারি পরিষেবা অচল করিতে পারিলে বেসরকারি স্বাস্থ্য সংস্থার মালিকদের লাভ। সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার বদনাম হইলে বেসরাকারিকরণের প্রবক্তা বাম-বিরোধীদের লাভ। কিন্তু, শুনিতে তিতা লাগিলেও সত্য যে— ত্রিপুরায় অধিকাংশ বেসরকারি স্বাস্থ্য

প্রতিষ্ঠান, নার্সিংহোম, প্যাথ-ল্যাব, রেডিওলজি সেন্টারের সঙ্গে সরকারি চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মীরাই যুক্ত। সরকারি কর্মক্ষেত্রে অনেকেই যান বিশ্রাম করিতে এবং মাসান্তে বেতন আনিতে। সরকারি চিকিৎসকরা কেবল রাত অবধি প্রাইভেট চেম্বারে লক্ষ টাকা রোজগারই করিতেছেন না, তাঁহারাই নামে-বেনামে বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানও চালাইতেছেন। শহরের অন্যতম প্রধান হাসপাতালের রেডিওলজি প্রধান নিজের বাড়িতে ডায়াগনস্টিক সেন্টার খুলিয়া নিশিদিন এক্স-রে, সোনোগ্রাফি করিতেছেন, স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তা নিজেই প্যাথ-ল্যাব চালাইতেছেন! আরও মারাত্মক হইল— এই সব প্রতিষ্ঠানের ৯০ ভাগেরই কোনও বৈধ লাইসেন্স নাই। অনেকের লাইসেন্স কবেই তামাদি হইয়াছে। তবুও বাণিজ্য জোরদার চলিতেছে! অতি চালাকরা আবার একটা পরীক্ষার লাইসেন্স লইয়া দশরকম অবৈধ কর্ম করিতেছেন। সরকারি হাসপাতালে এন্ডোস্কোপি মেশিন নষ্ট থাকিলে কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কোন সরকারি ডাক্তারের এন্ডোস্কোপি বেশি হয়, কিংবা হাসপাতালে অক্সিজেনের পাইপ কাটা থাকিলে কোন প্রতিষ্ঠানের অক্সিজেন সিলিন্ডার বিক্রি কয়েকগুণ বাড়ে— এই নিগূঢ় তত্ত্ব আর তথ্য বাহির করিতে শঙ্খ-ঘন্টা বাজাইতে হয় না!

আর বাম-বিরোধীদের তো লাভই লাভ! জি বি হাসপাতালের চিকিৎসা-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িলে বিধানসভা ভোটের আগে তাঁহাদের সুবিধার অন্ত থাকিবে না! সাধারণ মানুষ দুর্ভোগ পোহাইয়া বিরক্ত হইলে তাহাদের ক্ষেপাইতে বেশি হ্যাপা সামলাইতে হইবে না। সুতরাং, কে কোথা হইতে কোন মন্ত্রণায় হাসপাতালেব যন্ত্র অচল করিতেছে—তাহা বাহির হইতে বলা সহজ না হইলেও অনুমান করিতে কষ্ট হয় না। মন্ত্রী 'অন্তর্ঘাত' বলিয়া দিয়াছেন। ষড়যন্ত্রের স্পষ্ট অভিযোগ করিয়াছেন। অন্তর্ঘাত মানে ভিতর হইতে আঘাত। অর্থাৎ ঘরের ইঁদুর বেড়া কাটিতেছে! নেংটি ইঁদুর, ধাড়ি ইঁদুর— সবই রহিয়াছে। যাহারা অন্তর্ঘাত করে তাহারা আদতে কাহারও বন্ধু নহে। কাহারও বন্ধু হয় না। তাহারা গণশত্রু। সদাশয় মন্ত্রীর আবেদনে ইহারা থামিয়া যাইবে, এমন বিশ্বাস আর কেহ করিলে করিতে পারেন, চিন্তা শীল করে না। মন্ত্রীও যদি ইহা বিশ্বাস করেন তবে আর তদন্ত করা কেন? বরং ডাক্তার,নার্স, হাসপাতাল কর্মীদের দায়িত্বশীল সংগঠন ইঁদুর ধরিবার দায়িত্ব নিক। প্রয়োজনে ফাঁদ পাতিয়াই ইঁদুর ধরিতে হয়। তাহার পর মুগুর মারিতে হয়। স্বাস্থ্য প্রশাসন, ডাক্তার, হাসপাতাল কর্মী, নিরাপত্তা কর্মী ও জনসাধারণ — সকলে মিলিয়া এই অন্তর্ঘাতকারী গণশত্রুদের মুখোশ ছিঁড়িয়া দিন। মানুষের স্বাস্থ্য লইয়া কোনও ধান্দাবাজি, ষড়যন্ত্র, অর্ন্তঘাত কিংবা কোনও রাজনীতি সহনযোগ্য নহে।

(প্রকাশ : ২১.১১.২০১১)

প্রি-টেস্ট

শীত এখনও তেমন পড়ে নাই। গিন্নির কোলে আগুন-পাতিলও উঠে নাই। তবুও গরমহাট লাগিতেছে। রাজ্যে ১৫ কলেজের ছাত্র-সংসদ নির্বাচন ২ ডিসেম্বর। এখন,কলেজের কাছে সেলুন কিংবা সেলুনের কাছে কলেজ থাকিতে হয়। আঠারো বছরের যৌবনেরা আঠারো মিনিট অন্তর সেলুনে ঢুকিয়া একবার চুলে চিরুনি চালাইবে। কাহারও তোয়াক্কা না করিয়া কেহ কেহ আবার সিগারেটও জ্বালাইবে। কিছু বলিলেই সর্বনাশং সমুপস্থিতম্! 'আমরা শক্তি আমরা বল' – কাজী সাহেব কি সাধে বলিয়াছিলেন!

এক ছাত্র বলিল, এইবার নির্বাচনে এখনও মাথা ফাটে নাই, জামাও ফাটে নাই! মাথা ফাটার ব্যাপারটা বুঝিলাম। কিন্তু 'জামা ফাটে নাই'– মানে কী? ছাত্র বলিল, গত বছর বাহির হইতে বিশালদেহী বাহুবলীরা 'মাতরম্' ধ্বনিতে কলেজে ঢুকিয়া হাঙ্গামা করিয়াছিল। তাহারা ছাত্রদের জামা গাত্রে চড়াইতে গিয়া বহু জামা ফাটাইয়াছিল বলিয়া খবর। এইবার এখনও তেমন ফাটাফাটি নাই! কিন্তু. ফাটাফাটি রাজনীতি-চর্চা চলিতেছে। চলিবেই। সামনে ২০১৩ যে! গণতন্ত্রে ছাত্র সংগঠন রাজনৈতিক দলসমূহের 'রিক্রুটিং ক্যাম্প'-ও বটে। স্বাধীনতার আগেও ছিল। এখনও। আজ যাঁহারা রাজনীতির নেতা, তাঁহারা প্রায় সকলেই ছাত্র সংগঠনের নেতা হিসেবেই হাত পাকাইয়াছেন। কলেজ ছাত্র-সংসদের ভোটে বিধানসভার জোটের ছবিও স্পষ্ট হইতেছে। বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এস এফ আই এবং টি এস ইউ সম্বৎসর এক জোটেই লড়াই চালায়। তাহাদের মত-পথ, লক্ষ্য এবং স্লোগান সবই এক। অতএব ছাত্র সংসদের ভোটেও তাহারা একপক্ষ। শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্যহীন সুস্থ পরিবেশ আর শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য তাহারা ভোট চাহিতেছে। অপরপক্ষে জোট বাঁধিয়াছে এন এস ইউ আই এবং টি এস এফ। তাহারা কেন ভোট চাহিতেছে, খুব স্পষ্ট না বলিলেও, এস এফ আইয়ের একাধিপত্য খর্ব করা, শিক্ষাঙ্গনে 'দলবাজি' এবং শিক্ষার 'লালীকরণ' বন্ধ করার স্লোগান দিতেছে। অবশ্য দুই সংগঠনের মত, পথ, লক্ষ্য এবং স্লোগানে মিল নাই। এন এস ইউ আই কংগ্রেসের জাতীয়বাদী আদর্শের কথা বলে। আর টি এস এফ 'স্বাধীন ত্রিপুরা' স্লোগানের ধ্বজাধারী নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠীর 'রিক্রুটিং ক্যাম্প' হিসাবেই বহুকাল যাবৎ পরিচিত। 'জাতীয়তাবাদ' আর 'বিচ্ছিন্নতাবাদ'-এর নির্বাচনী জোট কলেজ

ছাত্র-সংসদের ভোটেও স্পষ্ট। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এবং আই এন পি টি তথা সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিদের সহায়তাপুষ্ট বাম-বিরোধী 'ওভারগ্রাউন্ড পলিটিক্যাল অ্যালায়েন্স'-এর সেই বহু সমালোচিত অশুভ ছায়া! রাজ্যের কলেজস্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা এই দুই পক্ষের কোন পক্ষ অবলম্বন করিবে, বুঝা যাইবে ২ ডিসেম্বরের পরে।

তবে, সমস্ত কলেজেই ছাত্র-সংসদের ভোট হইতেছে, প্রতি বৎসরই নিয়মমতো হইতেছে, কংগ্রেসের এন এস ইউ আই এবং আই এন পি টি সমর্থক টি এস এফও তাহাতে অবাধে অংশগ্রহণ করিতেছে – এই পর্যন্ত ঠান্ডা দিমাকে বিচার করিলেই বাম-বিরোধীদের অস্বস্তি বাড়িবে। কারণ, তাঁহাদের জোট আমলে কোনও ছাত্র-সংসদের ভোট হইতে দেখি নাই। তাহারা পঞ্চায়েতেও ভোট করেন নাই। লোকসভার ভোটে দিনে-ডাকাতি হইতে দেখিয়াছি। ত্রিপুরার মানিক সরকারকে পাঁচ লক্ষ ভোটে পরাজিত করিয়া শিলচরের 'সন্ত্রাসমোহন' রানা-দা নিজেই বড় লজ্জা পাইয়াছিলেন! সিমনা আর ফটিকরায়ের উপনির্বাচনে ভোটেব হিসাব আজও মিলানো যায় নাই! এ ডি সি-তে জঙ্গি-বন্ধুরা বন্দুকের ভোট করিয়া ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছিল!

'পুবানো সেই দিনেব কথা' গাহিতে হইত না, যদি পুরানোরা নিজেদের বদল কবিতেন।

শিক্ষার অঙ্গান সেদিন দস্যুদের হাতে চালিযা গিযাছিল। সেই অঙ্গানে এখন ফুল ফুটিতেছে। সুস্থ পরিবেশে অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া কবাইতে পাবিতেছেন। শিক্ষাঙ্গানে ছাত্রেব পৃষ্ঠদেশে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিবাব ঘটনা এখন অতীত। র‍্যাগিং, গণটোকাটুকি বিদায় লইয়াছে। বাত ১১টাতেও ছাত্রীবা শহরে প্রাইভেট পডিয়া নিশ্চিন্তে একাকী বাডি ফিরিতেছে।

গত বৎসবও এন এস ইউ আই অভিযোগ করিয়াছিল, কলেজের ছাত্র-সংসদ নির্বাচনে দলবাজি হইয়া আসিতেছে। এস এফ আইয়ের 'দুর্বৃত্ত'-রা এনএসইউ আই সমর্থকদেব বছরের পর বছর ছাত্র-সংসদের ভোটে দাঁড়াইতে দেয় না। তাই এস এফ আই-টি এস ইউ একতরফা জিতিয়া যায়। সমস্ত রকম পুলিস প্রহরায় গত বছরে ছাত্র-সংসদে ভোট হইয়াছিল। কিন্তু হায়, এন এস ইউ আই 'লড়াই' করিয়া সর্বত্রই শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হইয়াছিল। এমনকি শিক্ষার 'লালীকরণ'-এর বাস্তবতাহীন স্লোগান ছাত্রেরা কানেও তোলে নাই। এই বছর কী হইবে? ইতিমধ্যে ১৫টি কলেজের মধ্যে ৩টিতে এস এফ আই-টি এস এফের প্রার্থী হইতে ছাত্রছাত্রীরা রাজিই হয় নাই! আরও কিছু কলেজের বহু আসনে তাহারা প্রার্থী খুঁজিয়া পায় নাহ। কিন্তু এস এফ আই 'দুর্বৃত্ত-রা বাধা দিয়াছে, এমন অভিযোগ এইবার এন এস ইউ আই তথা কংগ্রেসের নেতারাও তুলিতে পারেন নাই। কী হইবে তবে?

আসল কথা, নিজেদের অবিমৃশ্যকারিতায় কংগ্রেস নেতারাই এন এস ইউ আই-কে ছাত্রছাত্রীদের কাছে আরও বর্জনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা জবরদস্তি বাতিল করিতে যাইয়া গত ১০ এবং ১১ জুলাই তাঁহারা আগরতলায় যে কাণ্ড করিয়াছেন, রাজ্যের শিক্ষানুরাগী মানুষ এই জন্য তাহাদের ক্ষমা করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি, এম বি বি কলেজে ছাত্রীদের সহিত কুৎসিত আচরণের জন্য কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের প্রতি যে অভিযোগের আঙুল উঠিয়াছে, সেই আঙুলও তাহারা নামাইতে পারেন নাই।

সুতরাং, ২ ডিসেম্বর কলেজ ছাত্র-সংসদের নির্বাচনে এই রাজ্যে বাম এবং অ-বাম শিবিরের মধ্যে যে রাজনৈতিক যুদ্ধের মহড়া হইতে যাইতেছে– তাহাকে যদি ২০১৩-র বিধানসভার প্রি-টেস্ট পরীক্ষাও ধরা যায়, মনে হইতেছে– ছাত্রসমাজ তাহাতে কোথাও বাম-বিরোধীদের 'পি' পাস-মার্কস দিতেও রাজি হইবে না। তখন? অজুহাত কী হইবে– কংগ্রেস নেতারা ভাবিয়া রাখিয়াছেন নিশ্চয়ই!

(প্রকাশ : ২৮.১১.২০১১)

স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা

গত সোমবারের 'দুই খান কথা' এমন ফলিবে কে জানিত! পরীক্ষা হইল। কলেজের ছাত্রকুল ছিলেন পরীক্ষক। তাহারা 'পি-পাস্' দিতেও রাজি হইলেন না এন এস ইউ আই-টি এস এফ-কে। রাজনীতির অনুবাদে বলিতে হইলে 'কংগ্রেস-আই এন পি টি জোট'-কে। গণবর্জন ইহাকেই বলে।

বলিয়াছিলাম ২০১৩-র প্রি-টেস্ট। অনেকে বলিলেন, না হে চিন্তা সেমিফাইনাল!২০১৩ বিধানসভার আগে তো আর কোনও ভোট নাই। তা বেশ। নামে কী আসে•যায়। ফলে পরিচয়। ফল যে এমন ফলিবে বাম নেতারাও বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালিয়া বুঝিতে পারেন নাই! কংগ্রেস নেতারা অজুহাত বাছিতেছেন। বাছিতেই হইবে! লোকসমাজে কিছু একটা বলিতে হইবে কিনা! ২ ডিসেম্বর উৎসবের ভোট হইল সাধারণ নির্বাচনের চেহারায়। কংগ্রেস আর সি পি এমের জেঠু-কাকুদের কলেজ টিলায় 'ভাই-ভাই' দেখিয়া যুব-ভোটারের দল আশ্বস্ত। নিরাপত্তাও ছিল বড় কঠোর। ফলে বিপুল ভোট পড়িল। বামেদের জয়ও বিপুলতর হইল। গণনা শেষে গভীর রাতে গোলমালের চেষ্টা করিয়াও গুলে-মালের পিরিতিতে কাঁঠাল পাকিল না। এখন ১৫ কলেজেই প্রি-টেস্ট বা সেমিফাইনালের এই অভাবিত বিপর্যয়ে কংগ্রেস শেষ তক্ কী বলিবে? চুপিচুপি কারচুপি? মহাবৈজ্ঞানিক মহারিগিং? অথবা কোনও অধরা-অদৃশ্য নিঃশব্দ হিংসা? নাকি নবতম শব্দ-অভিধা আবিষ্কার হইতে যাইতেছে!

চিন্তা-গিন্নি ফোড়ন কাটিলেন— কলেজের ছাত্র-সংসদে সব সময়ই বামেরা জিতিয়া থাকে। নতুন কথা কী! বলিলাম—ঠিক কথাই, আবার মোটেও ঠিক কথা নহে। এই বারের কলেজ ভোট কেবল চেহারা-ছবিতে অন্যরকম ছিল তাহাই নহে। গুরুত্বে একদম আলাদা। এই ভোট ছিল কংগ্রেসের কাছে স্বপ্নের রাজপুরীতে সিংহদুয়ার খট্‌খটানির ভোট। "শিওর আইয়া পড়তাছি" -র স্বপ্নে বিভোর কংগ্রেস। কেরলে নাই, পশ্চিমবাংলায় বাম সরকারের *বিদায় সম্পন্ন। তোরোতে ত্রিপুরা দখল, সময়ের অপেক্ষা!* কংগ্রেসের ভাষায়— 'ত্রিপুরার মানুষ অধীর আগ্রহে বাম-বিনাশের মাস গণিতেছে!' ২৩ মে কংগ্রেসের ছাত্র-যুব শক্তি

রক্তারক্তির বন্ধে ছন্দ খুঁজিয়া পাইয়াছে। তাহার পরে সেই ঐতিহাসিক ১০ জুলাই! ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করিবার কংগ্রেসি যুদ্ধে (!) বুদ্ধের আসন টলিয়াছে। বাম সরকারকে জনগণের চক্ষে 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী' বানাইয়া ১১ জুলাই 'গণবিদ্রোহের আগুন' জ্বালানো হইয়াছে। আর কী চাই! বামের কফিন রেডি! ধাক্কা দিয়া শোয়াইয়া পেরেক মারা বাকি। সেই পেরেক মারিতে আনা হইল কংগ্রেসের যুবরাজ রাহুল গান্ধীকে। পরিবর্তনের সঞ্জীবনী মন্ত্রে দীক্ষা হইল কংগ্রেসের যুববাহিনীর। ইহার পর, কলেজ ছাত্র-সংসদের ভোটে রাজ্যের ছাত্র-যুব সমাজের প্রবল 'পরিবর্তনকামিতা' টাইফুনের মতন আছাড় খাইয়া পড়িবার কথা নহে? কিন্তু, বিধি এবে বাম! এ কী হইল, কেন হইল!

কোথায় যেন শুনিয়াছি– 'রাহুল গান্ধী যেখানেই যান, কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়'। কী মুসিবত, ত্রিপুরায়ও তাহাই হইল! আহা-রে! একটু ব্যতিক্রম হইলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হইত? কেবল তাহাই নহে। শুনিতে পাই, রাহুল গান্ধীর সফরে রাজ্যের কংগ্রেস নেতাদের দেহেও হুল্ -এর বিষ ছড়াইয়াছে। মুখ না-দেখাদেখি বাড়িয়াছে। মুখে মুখে বিষের উদ্গার বাড়িয়াছে। সেই বিষে জেলা ব্লক স্তরের নেতারাও কেহ বিবশ, কেহ আবার বিষহরি! ক্লান্ত বিরক্ত প্রদেশ সভাপতির চোখ ঘুম-ঘুম! আবার পাল্টা শিবিরের হৃদ্কমলে নবীন আশার রুম-ঝুম! নেতারা কেহ কেহ অশ্য কলেজভোটে বিপর্যয়ের পূর্ণ কৃতিত্বের মুকুটখানা বিরোধী দলনেতা ছাড়া আর কাহারও মস্তকে পরাইতে রাজি নহেন। কারণ, ১০-১১ জুলাইয়ের মহানায়ক তো তিনিই! নাহিলে, কংগ্রেসকে 'সেই কংগ্রেস' বলিয়া চিনিতে পারা কি সহজ হইত? সেই কংগ্রেস, ৮৮'র কংগ্রেস! সুতরাং, মুকুট রতনলালেরই! মানিলাম। মানে কিন্তু এই নহে যে, কংগ্রস কলেজ-ভোটে ঝাঁপায় নাই। ঝাঁপাইয়াছে! কিন্তু বিষজর্জর দেহ লইয়া দিঘির জলে না পড়িয়া ঘাটের পাকা সিঁড়িতেই মাথা ফাটাইয়াছে! আর ওই পাকা সিড়িঁটা বাম সরকারের গণতন্ত্র-বিকাশ আর উন্নয়নের প্রত্যক্ষ ফল।

সব শুনিয়া গিন্নির ছোট্ট জিজ্ঞাসা– স্বপ্নের কী হইবে? তেরোর স্বপ্ন? বলিলাম – স্বপ্ন দেখিতে বাধা কি বধূ? বড় মধুর লাগে। 'স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে, সাত সাগর আর তেরো নদীর পারে'। নিশির স্বপ্নে কেহ বিরহ-বিধুর। দিবসের স্বপ্নে আবার নেশাতে মেদুর। দেখিতে দাও! 'স্বপন যদি মধুর এমন, হোক সে মিছে কল্পনা, জাগিয়ো না–আমায় জাগিয়ো না ...'!

(প্রকাশঃ ০৫.১২.২০১১)

‘ফেল্ হিরো’!

মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসিযা ত্রিপুবার সমীররঞ্জনজি বলিতেন, আমি আগুন খাইয়া হজম করিতে পারি! ভক্তসকল বিমুগ্ধ নয়নে তাঁহার দৈবজ্যোতি অবলোকন করিত আর ভাবিত, আহা– আমরাও যদি পারিতাম! দুই দশক পরে, সমীররঞ্জন-সুরজিৎ বীরজিৎদের ক্ষমতায় ফিরিবার পথ দেখাইতে, দিল্লির ম্যাডাম যাঁহাকে গুরু করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার পিছনে এক্ষণে নাকি পুলিস ছুটিতেছে, পানাজির এই গুরুজি ৪০০ কোটি টাকার জমি কেলেঙ্কারিতে ফাঁসিয়া গিয়াছেন। সমীররঞ্জন এখন খিস্তি করিয়া বলিতেই পারেন – “বেগুন খাইয়া হজম করিবার ক্ষমতা নাই, ... আগুন গিলিতে গিয়াছে! যে নিজেই পথ পাইতেছে না, সে আবার পথ দেখাইবে কী রে..?” (ডট্-চিহ্নিত স্থানে কোন্ খিস্তি বসিবে, রঞ্জন-ঘনিষ্ঠবা সহজেই আন্দাজ করিতে পারিবেন!)

কিন্তু রঞ্জনজি নহেন, আজিকার দুই খান কথা যাঁহাকে লইয়া তিনি এ আই সি সি-র সাধারণ সম্পাদক লুইজিনহো ফেলেইরো। গোয়া-র নেতা। ত্রিপুরার কংগ্রেস নেতৃবর্গ বামফ্রন্টের ‘চরম অপশাসন’ খতম করিতে যাঁহার পদতলে বসিয়া ‘গুরু উপায় বল না’ গাহিতেছিলেন, তিনি নিজেই নাকি এক্ষণে বিষম বিপদে পড়িয়া বাঁচিবার উপায় খুঁজিতেছেন! দিল্লির হাইকমান্ড অনেক বাহাদুরের মধ্যে বাছিয়া তাঁহাকেই দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরায় বাম জমানার অবসান চাই। গোয়া-ব মোয়া হস্তে লইয়া ত্রিপুরার কংগ্রেস নেতৃবর্গের সম্মুখে তিনি আবির্ভূত হইলেন। বাম সরকারকে ‘দুর্নীতির শিরোমণি’ আখ্যায়িত করিয়া সারা রাজ্যে লম্ফ দিয়া বেড়াইলেন। কংগ্রেসের সব গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া বামফ্রন্টের ভোটদুর্গ চূর্ণ করিতে হইবে। হাইকমান্ডের হুকুম। ফেলেইরোজি উপজাতি অঞ্চলে হানা দিয়া বুঝিলেন ইটও খসিতেছে না। শিক্ষক-কর্মচারীদের নাকে কেন্দ্রীয় বেতনভাতার মোয়া ছোঁয়াইয়া দেখিলেন তাহাদের জিহ্বায় জল আসিতেছে না, ত্রিপুরাকে ‘নারী ধর্ষণের রাজধানী’ বলিতে গিয়া শুনিতে পাইলেন, লোকে গোয়া-র রাজপথে বিদেশিনীদের আকছার ধর্ষিত হইবার কাহিনী বলিতেছে। দিল্লিতে হরদম নারী ধর্ষণের তথ্য শুনাইতেছে!

দিল্লির সরকার আট ক্লাস অবধি ফেল করা তুলিয়া দিলেও গুরু ফেলেইরো শুরুতেই, অর্থাৎ

ক্লাস ওয়ানেই সব পরীক্ষায় ফেল মারিতে লাগিলেন। কংগ্রেসের সব গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করিবার বদলে তিনি দলে অভূতপূর্ব গৃহযুদ্ধ ডাকিয়া আনিয়াছেন। এমন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অতীতেও দেখা যায় নাই। এখন আর দুই বা তিন গোষ্ঠী নহে, প্রত্যেক নেতা নিজের নিজের গোষ্ঠী গড়িয়া তুলিয়াছেন গুরুজির উৎসাহ পাইয়া। কারণ, গোয়া-র গুরুজি বলিয়াছেন– যে কোনও নেতা তাঁহার নিজের মতন যে-কোনও আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে পারিবেন। ইঙ্গিত অস্পষ্ট নহে। আড়ালে শুনা যাইতে লাগিল, পকেটে প্যাকেট পাইয়া পানাজি-র গুরুজি কোনও এক গোষ্ঠীর পকেটে ঢুকিয়া গিয়াছেন। আবার, আরও ভারী প্যাকেট পকেটে আসিলে পাল্টি খাইতেও তাঁহার অরুচি নাই। এই সমস্ত জঘন্য গুঞ্জনে অনেকেই কান পাতেন নাই। চিন্তা-ও গুজব বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। এমন সময় বজ্রপাত হইল খোদ ফেলেইরোজির নিজের রাজ্য গোয়া-র পানাজিতে!

পানাজি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বেরসিক বিরোধী দলনেতা মনোহর পারিক্কার– কেবল পরিসংখ্যানের ফাঁকা আওয়াজে বিশ্বাস করেন না। তিনি সরাসরি রাজ্যের পুলিস মহানির্দেশকের নিকট 'এফ আই আর' করিয়াছেন ফেলেইরোজি-সহ কয়েকজনের নামে। ফেলেইরো একদা গোয়া-র মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু বছর তিনেক পূর্বে, প্রতাপ সিং রানে যখন মুখ্যমন্ত্রী তখন ফেলেইরো ছিলেন শিল্পমন্ত্রী। চন্দ্রকান্ত কাভেলকার নামে এক বর্তমান বিধায়ক তৎকালে ছিলেন গোয়ার শিল্প নিগমের চেয়ারম্যান। অভিযোগ, ফেলেইরো, রানে এবং কাভেলকার মিলিয়া এক বিরাট জমি-কেলেঙ্কারি ঘটাইয়াছেন। খাইয়া হজম করিতে পারেন নাই। ৪০০ কোটির ঘোটালা . পুলিসকে অবিলম্বে ইহাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে দাবি করিয়াছেন পারিক্কার।

এই খবর সংবাদ-মাধ্যমে প্রচারিত হইতেই ত্রিপুরার কংগ্রেস নেতারা মাথা হেলিয়া দিয়াছেন। হায় হায়, কাহাকে 'গডফাদার' করিয়া পাঠাইলেন ম্যাডাম! সর্বাঙ্গে দুর্নীতির দুর্গন্ধ লইয়া ত্রিপুরায় বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করিলে মানুষ যে দূর-দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে! শুনিতেছি, ত্রিপুরায় তেরো-র 'হিরো' হইতে আসা 'ফেল্ হিরো' ফেলেইরোকে অবিলম্বে ফিরাইয়া নিতে ম্যাডামের কাছে আর্জি যাইতেছে। ম্যাডাম কী করিবেন! কাহাকে বাছিবেন! চারিদিকে ক্রন্দনরোল। ফান্দে পড়িয়া কান্দিতেছেন একের পর এক কংগ্রেসি নেতা মন্ত্রী। লক্ষ কোটির ঘোটালা ফাঁস হইতেছে একের পর এক। কেহ জেলে, কেহ এখনও জেল-এর বাহিরে। দেহ জুড়িয়া কাটা ঘা, পোড়া ঘা, পচা ক্ষত! তেরঙ্গা অঙ্গাবস্ত্রে দূষিত সর্ব অঙ্গ ঢাকা যাইতেছে না। 'ফেল হিরো'-কে ফেলিয়া কাহাকে ত্রিপুরা দখলে পাঠাইবেন! চারশত কোটির চোর সরাইলে চার হাজার কোটির ডাকাত মাথা তুলিবে! দেওয়ালে গান্ধীজির দিকে চাহিয়া চিন্তার চক্ষে জল আসিল।

চিন্তা-গিন্নি বলিলেন, কান্দো ক্যান্! সমাধানের পথ অনুসন্ধান কর। নিজেই ভাবিয়া বলিলেন, দেখা যাইতেছে—হজমশক্তিই হইল কংগ্রেসের ভিতরে আসল কোয়ালিটি! "যত চাও খেয়ে যাও"— হজম করিতে পারিলে হিরো, নহিলে জিরো! আসলে ত্রিপুরার কংগ্রেস নেতাদেরকে শিখাইবার সিদ্ধান্তটাই ভুল। এই রাজ্যেও বহু উদীয়মান জাগ্রত নেতা রহিয়াছেন যাঁহারা চা-বাগানের জমি খাইয়াছেন, শিশু উদ্যানের জমি খাইয়াছেন, কিংবা গোয়ালা বস্তি গ্রাসিতে চাহিতেছেন! আর জোট জমানার খাতা খুলিলে দেখা যাইবে— ত্রিপুরার কংগ্রেসে রহিয়াছেন এমন অনেক বড় নেতা যাঁহারা দিল্লির নেতাদের 'আগুন খাইয়া হজম করা' শিখাইতে পারেন। গিন্নির প্রস্তাব, আচ্ছা হ্যাঁ গা—আমাদের সমীররঞ্জনজিকে দিল্লিতে পাঠাইলে হয় না?

(প্রকাশ : ১২.১২.২০১১)

কেন এমন হয়?

কলিকাতার আমবি-তে আগুন। কেহ বলিতেছেন মহাভারতের 'জতুগৃহ', কেহ নাম দিয়াছেন হিটলারের 'গ্যাস চেম্বার'! আঁচ লাগিয়াছে চিন্তা-র সেলুনেও। ঠোকাঠুকি কাটাকাটি, কথার। গাল মাথা এত নড়িতেছে যে, ক্ষুর-কাঁচি ঠেকাইবারও জো নাই। ব্যবসা লাটে উঠিবার জোগাড়! মনে মনে বিহিতের নানান পন্থা ভাবিতেছি। হঠাৎ বেলুনের কথা মাথায় আসিল। ছোট ছোট ক্রিকেট বল সাইজের বেলুন! চেয়ারে বসাইয়া মুখে পুরিয়া দিলে খাসা হইবে! ভাঙা গাল ফুলিয়া থাকিবে, ফলে দাড়ি কাটিতেও জবর সুবিধা হইবে। আবার কথাও বন্ধ থাকিবে। নিজের আবিষ্কারে নিজেই বিমোহিত হইলাম।

কিন্তু চিন্তা, তুই কী পাষণ্ড রে ভাই! আমরি-তে পুড়িয়া, দমবন্ধ হইয়া ত্রিপুরার ছয় সাতজন- সহ, প্রায় দুইশত লোক মরিল, আর তুই কিনা ব্যবসার কথাই ভাবিতেছিস! ছিঃ ছিঃ। লোকে বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোমগুলির অমানবিক ব্যবসার কথা বলাবলি করিতেছে, তাহাদের বেআইনি কারবারের পিছনে সরকারের দায়িত্বহীনতাকে ধিক্কার দিতেছে! সকলেই শোকাহত, ব্যথিত, উদ্বিগ্ন। আর তুই চিন্তাচরণ – ছিঃ! অতএব, বিবেকের এবংবিধ বাক্যবাণে আমি যে সত্যই পাষণ্ড, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। সেলুনে বেলুন-সার্জারির সেই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার আপাতত তুলিয়া রাখিলাম।

বিপ্রতীপে, বিরোধী দলনেতার ব্যথাতুর কান্না-ফোলা মুখখানা মানসপটে ভাসিল। আহা, তাঁহার কত দুঃখ, কত উদ্বেগ! ত্রিপুরায় যে কোনও সময় দুর্যোগ ঘটিতে পারে। বেশি ঘটিতে পারে জি বি হাসপাতালে, আই জি এমে, কারণ সেইগুলি সরকারি! দুর্যোগ মোকাবিলার কোনও ব্যবস্থা নাই কিনা! মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী চরম দায়িত্বহীন হইতে পারেন, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বা দলের অন্য নেতাদের (ছোঃ) মাথায় না আসিতেই পারে। তাঁহার মতন বিরোধী নেতা থাকিতে কথা বলিবার এমন মাহেন্দ্রক্ষণ নষ্ট করিবেন কেন! অনেকেই ধন্য ধন্য করিল। কিন্তু, এইবারও ত্রিপুরার মানুষের প্রতি এত দরদে *বিরোধী নেতা ধৈর্য ধরিতে পারিলেন না। তিনি হঠাৎ পড়িলেন আই এল এস হাসপাতাল লইয়া এবং শেষ পর্যন্ত সি পি এমকে লইয়া! পরীক্ষায় 'শ্মশান' রচনা লিখিতে যাইয়া তিনি*

'শ্মশানে তালগাছ' লিখিতে শুরু করিলেন! কেন না, 'তালগাছ' ছাড়া আর যে কিছুই তাঁহার শিখা হয় নাই!

কেন এমন হয়? আরেক প্রাক্তন বিরোধী নেতা, বর্তমানে বাংলার শিল্পমন্ত্রী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কে কাহাকে নকল করেন গবেষণা হইতে পারে! আমরি-কাণ্ডের পরই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সংগ্রামপুরে বিষমদ্য পানে আরও প্রায় দুইশত মানুষের মৃত্যু হইল। হাসপাতালে ন্যূনতম চিকিৎসা পরিষেবা দিয়া যখন অসুস্থদের বাঁচানো একমাত্র কর্তব্য, তখন পার্থবাবু শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের ঘোষণা দিলেন, "সি পি এমই মদের সহিত বিষ মিশাইয়া দিয়া এই গণহত্যা ঘটাইয়াছে!" সেই একই বাক্যের যেন প্রতিধ্বনি! বাংলার বিধানসভা ভোটের আগে। "সি পি এমই জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস-এর দুর্ঘটনা ঘটাইয়া এত লোক হতাহত করিয়াছে!" এখন তৃণমূল নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বলিতেছেন – মাওবাদীরাই ওই নাশকতা ঘটাইয়াছিল। এতবড় কলঙ্কজনক মিথ্যাচার, ভোটের আগে? ক্ষমা প্রার্থনা কোথায়? কেন এমন হয়! কেন?

ত্রিপুরায় অষ্টআশির ভোটের আগে কী হইয়াছিল? তৎকালীন কংগ্রেস সর্বাধিনায়ক এবং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী আগরতলার আসাম রাইফেলস ময়দানের বিশাল সমাবেশে বলিয়াছিলেন, "টি এন ভি-র স্রষ্টা সি পি এমের নৃপেন, দশরথ"! পরে রাজীব-রাঙ্খল গোপন চুক্তি ফাঁস হইয়া গিয়াছিল। রাজীবজি নাই। কিন্তু, কংগ্রেসের তরফে সেই মিথ্যাচারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কই? নিদেনপক্ষে সোনিয়া বা রাহুলও ক্ষমা চাহিতে পারিতেন! কিন্তু কই? মানুষকে উল্টা বুঝাইয়া ভোটে জিতাও এক ধরনের জবরদখল। সেই দখল করা ক্ষমতা টিকাইয়া রাখিতেও ক্রমাগত উল্টা বুঝাইয়া যাইতে হয়। এক মিথ্যা হাজার মিথ্যার জন্ম দেয়! হাজার মিথ্যা ডাকিয়া আনে ধ্বংস। কেন এমন হয়? বাম-বিরোধিতা কেন এমন যুগে যুগে মিথ্যাচার, কুৎসা আর অন্ধ-বিদ্বেষের পথে ছুটিয়া চলে? কেন? বোধহয়, বামপন্থাকে সত্য পথে মোকাবিলা করা যায় না বলিয়া। ন্যায়ের পথে, নৈতিকভাবে বামপন্থার মোকাবিলা অসম্ভব, তাই মিথ্যা ছাড়া বাম-বিরোধীদের অন্য পথ নাই!

কিন্তু, বিরোধী নেতা রতনলাল নাথের রাজনীতি সত্যই সুপার স্পেশাল! তিনি চমকে, ঠমকে বিশ্বাসী! সুচ হইয়া ঢুকিয়া কুড়াল হইয়া বাহির হওয়া তাঁহার প্রতিদিনের সাধ, প্রতি রাতের স্বপ্ন! চমৎকার চিক্কন করিয়া তিনি সব ইস্যুর শুরুয়াৎও করেন। কিন্তু, অল্পেতেই ধৈর্য হারান। ল্যাজে-গোবরে হইয়া পড়েন। শেষ রক্ষা কস্মিনকালেও করিতে পারেন না। প্রথমে বলিলেন, দুর্যোগ মোকাবিলার দুর্বলতা। পরে আই এল এস, এর পরে সি পি এম এবং শেষমেশ কোনও এক নেতাকে লইয়া পড়িলেন। বলিলেন, আই এল এসের সহিত ওই নেতার যোগ রহিয়াছে! কোথায় আমরি-র পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার মানুষের জন্য

তাঁহার উদ্বেগ, আর কোথায় কোনও এক নেতার ব্যক্তিগত যোগাযোগ, বাড়ি ইত্যাদি! সি পি এম চ্যালেঞ্জ করিল. সাংবাদিকেরা চাপিয়া ধরিল। কিন্তু, বিরোধী নেতার নার্ভ ফেল করিল। তিনি নাম বলিবার সাহস না দেখাইয়া 'বীরত্বপূর্ণ পশ্চাদপসারণ' করিলেন! তাঁহার বুক ফাটিল, মুখ ফাটিল না। বুঝিলাম, ন্যাড়া কেন দুইবার বেলতলায় যায় না! একবার অর্থমন্ত্রীর নামে যা-তা বলিয়া আদালতে আসামি হইয়াছেন, আবার কাহার নাম বলিয়া ফাঁসিবেন। তাই 'কৃষ্ণ কেমন, যাহার মনে যেমন' বলিয়া কাটিয়া পড়িলেন! বেচারা!

কিন্তু, কোনও নেতার ধান্ধার রাজনীতি আর মেকি দরদ লইয়া তর্ক-বিতর্কের আড়ালে আসল বিষয় যেন চাপা না পড়িয়া যায়। মানুষ হাসপাতালে, নার্সিংহোমে বাঁচিতে যায়। বেঘোরে মরিতে যায় না। লুণ্ঠিত হইতেও যায় না। ত্রিপুরায় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকার অনেক করিতেছেন। কিন্তু, সরকারি পরিষেবাকে আরও মানবিক করা, বেসরকারি সংস্থাগুলিতে আরও কঠোর নজরদারি, সর্বত্র সুরক্ষা ও দুর্যোগ মোকাবিলার সম্ভাব্য সবরকম ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার কাজ অবশ্যই ফেলিয়া রাখা চলিবে না। সমস্ত ফাঁক-ফোকর বন্ধ করিতে হইবে। ত্রিপুরা ভূমিকম্প-প্রবণ এলাকার মধ্যে। তাই এই বিষয় আরও জরুরি।

পুনশ্চ : মাননীয় বিরোধী নেতাকে অনুরোধ, আপনি কথা যত কম বলিবেন ততই রাজ্যের ভাল, বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের ভাল হইবে। আশা জাগাইয়া কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের হতাশার অন্ধকারে ঠেলিতে আপনার জুড়ি নাই। সিগারেট ছাড়িতে মুখে লবঙ্গ যেমন কার্যকর, কথা বন্ধ রাখিতে মুখে বেলুনও তেমনই! চিন্তা-র আবিষ্কার! ট্রাই করিয়া দেখিতে পারেন।

(প্রকাশ ঃ ১৯.১২.২০১১)

ও নদী রে ...

আবহাওয়াবিদেরা গম্ভীর। এমন শীত নাকি গত দুই দশকের কোনও শীতে পড়ে নাই! শীতের সূর্য তাই 'মহাদ্যুতিম্' না হইলেও মহার্ঘতর। 'সর্বপাপঘ্নং' না হইলেও সর্বজনপ্রার্থিত। মুনাফা-প্রভুরা খেলিছে বিশ্ব লয়ে! পুঁজিবাদ আপন গন্ধে 'ম-ম'! মহামন্দা, মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি – আরও কত 'ম'! এত বড় মমতাময়ী -মহাপরিবর্তনের ছয় মাসেই পশ্চিমবঙ্গে মেগালো-ম্যানিয়াক কমিউনিস্ট-ফোবিয়া! বিষ-মদের পিছনে সি পি এম। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে ইঁদুরের কামড়ে রোগী মরিলেও! মা-মাটি মানুষকে 'মার্ডার' করিতে চোলাই মদে বিষ মিশাইয়াছে সি পি এম! এস এস কে এম হাসপাতালে ইঁদুর ছাড়িয়া দিয়াছে সি গি এম! হাসিব না কাঁদিব, বুঝিতেছি না। শীত পড়িয়াছে বই কী!

এমন শীতেই রাজ্যে পরপর সি পি এমের বিভাগীয় সম্মেলন। বিভাগীয় কমিটিতে তরুণদের সংখ্যা বাড়িতেছে। আরও বেশি সংখ্যায় আসিতেছেন মহিলারা। শীত-সূর্যের ঝিলিক। কিছু আলো আর উত্তাপ। প্রবীণদের আছে অভিজ্ঞতা, নতুন উদ্যম কম। দুইয়ে মিলিলেই পোক্ত হইবে যৌথ নেতৃত্ব। মহিলারা কেবল মিছিল-মিটিং করিবেন, সংরক্ষণের জোরে 'দ্বিতীয় শ্রেণীর' চেয়ারপার্সন হইয়া 'ভাইস চেয়ারম্যান' পার্টি-নেতার কথামতো সই করিতে থাকিবেন – ইহা চলিতে পারে না। পার্টির নেতৃত্বেও মহিলাদের যোগ্য ভূমিকা পালনের প্রসার ঘটিতেছে। কাত হইয়া চলিতে থাকা নৌকা কিঞ্চিৎ সোজা হইতেছে। উত্তম খবর। *কী কারণে বুঝি নাই, চিন্তা-গিন্নিও উল্লাসে ফাটিয়া পড়িতেছেন!*

শাখান্তর হইতে বিভাগ, সম্মেলনেই সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার গড়িবার শপথও উচ্চকিত। স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। সর্বত্র সব কিছু ভাল না হইলেও ইঁহাদের চেয়ে ভাল কোথাও *কিছু নজরে পড়িতেছে না। কিন্তু, অতঃকিম? আরও উন্নত বামফ্রন্ট সরকার। তাহারও পরে? প্রশ্নটা উঠিয়াছিল পশ্চিমবঙ্গেও। এই খানেও প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। একই পার্টি।* সংসদীয় রাজনীতির গলিপথে রূপকথার মায়াবিনী রাক্ষসীদের বড় বড় হাঁ! সেই হাঁ-তে পড়িয়া ঝরিয়া মরিয়া থাকিলে থাক কিছু। চলা থামিবে না। কিন্তু, কোথা যাও, কোন অজানায়?

তৃতীয় বিকল্প, বাম গণতান্ত্রিক ঐক্যমঞ্চ, জনগণতন্ত্র এবং শেষে সমাজতন্ত্রের দিকেই তো? নদী, কোথা হইতে আসিয়াছে, পিছনে তাকাইয়া বলা কঠিন নহে। কিন্তু 'যাইব সাগরে' বলিলেই প্রত্যয় জন্মে না। সাগর আছে, নিশ্চিত জানা। ঠিকানা অজানা, পথ অচেনা। তাহা ছাড়া, সব নদী সাগরে যায়ও না। সেই প্রশ্নও আছে। তাই 'ডেড ইস্যু' কবর হইতে উঠিয়া আসে। 'হিস্টোরিক ব্লান্ডার' কিংবা সমর্থন প্রত্যাহার-এর ফলে দিল্লি কি আরও দূরে? নাকি নীতি-আদর্শে শৃঙ্খলায় অবিচল থাকিবার 'বোকামি'-তেই লিখিত হইবে আগামীর গৌরবময় কোনও নয়া ইতিহাস? বুকে-বুকে থাকা প্রশ্ন মুখে-মুখে ফুটিয়া তর্ক বাধুক সম্মেলনে।

হইতে পারে, সংসদীয় রাজনীতির পথ কাহারও চোখে গলিপথ, কাহারও কাছে রাজপথ! ইতিহাসই এই দেশে কমিউনিস্টদের সংসদীয় রাজনীতির পথে ঠেলিয়াছে। গোটা দুনিয়ার মধ্যেই এক ব্যতিক্রমী পরীক্ষা। কিন্তু, রাজপথ আর গলিপথ, পথকে পথ হিসাবেই লইতে হইবে। রাজবাড়ির চারিদিকে অতি সাবধানে তেলের বাটি হাতে ঘুরিয়া একাগ্রতার পরীক্ষা দিলেই চলিবে না। রাজবাড়িতে ঢুকিয়া রাজত্বের ভারও লইতে হইবে। সরকারি সুবিধা বন্টন, গ্রাম পাহাড় শহরে আমজনতার জীবনমানের আরও উন্নয়ন, রাস্তাঘাট-শিক্ষা-স্বাস্থ্য, পানীয় জল ইত্যাদি পরিকাঠামোর আরও উন্নতি, কৃষি আর শিল্পের বাস্তবসম্মত সমন্বয়ে আরও কর্মসংস্থান– এইসব কাজ পরিচালনায় কী করিয়া বামকর্মীদের আরও দক্ষতা আসিবে, কী করিয়া নিজে প্রকৃত 'জনবন্ধু' হইয়া বন্ধু বাড়ানো যাইবে– সম্মেলনে ইহার চর্চাই আকাঙ্ক্ষিত। 'মুখে রঙ মাখি আর মুখোশ পরি' করিয়া 'চোখে ধুলো' দেওয়ার তথাকথিত 'সৌজন্যের রাজনীতি' নহে, মূল্যবোধের রাজনীতি হইতেই স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ গড়িয়া উঠিবে। আর, 'যাইব সাগরে' ভুলিয়া গেলে জল শুকাইয়া নদী হইবে মরানদী বা 'ঢ্যাপা'! মোহনার দিকে গতি হারাইলে পথের পরীক্ষা বিফলে যাইবে। কেবল একটু ভাল থাকিবার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের দরকার নাই। কোনও ডানপন্থী সরকারও চেষ্টা করিলে ইহা করিতে পারে। বামফ্রন্ট সরকার মানে ভাল থাকিয়া সকলের জন্য আরও ভাল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করিবার অবিরাম লড়াই। বামেরা সরকারে না থাকিলেও সেই লড়াই চলে। পশ্চিমবঙ্গে চলিতেছে। কেরলে চলিতেছে। গোটা দেশেই চলিতেছে। ত্রিপুরায়ও চলিবে।

ছোট ত্রিপুরায় ৭ম বাম সরকার আনিবার শপথ তাই ভারতজোড়া নতুন ভবিষ্যৎ গড়িবার সেই চলমান লড়াইয়ে শক্তি জোগানোরই সঙ্কল্প। সি পি এমের নেতা-কর্মীরা সেই সঙ্কল্পই পার্টির সম্মেলনে ঘোষণা করিতেছেন। ঝাড়িয়া বাছিয়া পার্টিকে মজবুত করিতে চাহিতেছেন। বাম সরকার এতকাল এত উন্নয়নের কাজ করিবারও পরও কেন প্রায় ৪৭ শতাংশ মানুষ এই রাজ্যে এখনও বাম-বিরোধী বাক্সে ভোট দিয়া চলিতেছেন, ইহার কারণ নিশ্চয়ই খুঁজিতেছে সি পি এমের সম্মেলন। মানুষের জন্য উন্নয়নে পঞ্চাশ নম্বর হইলে সেই উন্নয়ন

কর্মকাণ্ডে ব্যাপক মানুষের উদ্যোগী অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার মধ্যে রহিয়াছে বাকি পঞ্চাশ নম্বর। বরং, বামেদের কাছে দ্বিতীয়টিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের উদ্যোগী অংশগ্রহণেই রহিয়াছে মোহনার ঠিকানা। নহিলে নদী হইতে পারে মরানদী। ত্রিপুরাও হইতে পারে পশ্চিমবঙ্গ। সি পি এমের সম্মেলন সেই বিচার-বিবেচনাই করিয়া দেখিতেছে নিশ্চয়ই।

(প্রকাশ ঃ ২৬.১২.২০১১)

২০১২

অ্যামোন ড্যাশ্‌টি ...

চিন্তা গিন্নির আনন্দের সীমা নাই। বলিলেন, মাত্র আট কি দশ বৎসর! তাহার পরে বিশ্বে আমরাই সেরা শিক্ষিতের দ্যাশ! এতদিন ছিলাম প্রায় সকলের পিছনে, এইবার এক লাফে যাইব সকলের সামনে! কেহই ঠেকাইতে পারিবে না। 'পৃথিবীর অর্ধেক নিরক্ষরের দেশ' বলিয়া উপহাসের দিন শেষ। প্রত্যেক ভারতবাসী অন্তত একটি করিয়া 'এইট পর্যন্ত শিক্ষা'-র সার্টিফিকেট প্রায় ফ্রি-তে পাইবেন। 'সকলের জন্য শিক্ষা'র আর কী বাকি রহিল! সর্বজন খুশি, তাই সর্বজনীন। মেরা ভারত মহান এবং মোহন। সুন্দর। শুনিতে সুন্দর। দেখিতে সুন্দর। নষ্টের গোড়া বামেরা আর 'সকলের জন্য শিক্ষা' দাবি করিবেন? পাস ফেল নাই, সুতরাং আর চিন্তাও নাই। বলিয়াই নিজের জিহ্বা কামড়াইয়া ধরিলেন গিন্নি। চিন্তা তাঁহার স্বামীর নাম। 'চিন্তা নাই' বলিতেই পতিপ্রাণা শ্রীমতীর প্রাণ অকারণ বৈধব্যের ছায়াপাতে কাঁপিয়া উঠিল বোধকরি।

ভাবিতেছিলাম, কেমন আইন করিল কেন্দ্রের বিচক্ষণ সরকার! ক্লাস এইট পর্যন্ত ফেল নাই, পাসও নাই! একবার ইশ্‌কুলে নাম লিখাইলেই চলিবে। বয়স আর দেহের বৃদ্ধির মাপ বুঝিয়া ক্লাস ঠিক হইবে। ফাইভে ভর্তি হইতে আগের কোনও ক্লাসে পড়িতে হইবে– এমন কোনও কথা নাই। এইটে ভর্তি হইতে সেভেন পর্যন্ত পড়াশুনার কোনও দরকার নাই! গায়ে গতরে এইটের যোগ্য মনে হইলেই চলিবে! পরে সার্টিফিকেট খাড়া! ত্রিপুরায়ও বাম সরকার বাম হস্তে স্বাক্ষর করিয়া মানিয়া লইয়াছে। চাঁদ সওদাগরের মনসাকে ফুল দেওয়ার মতন। শুনিয়াছি, দেশে দেশে শিক্ষা সর্বজনীন করিবার প্রয়াস চলিতেছে। উদ্যোগ জাতিসঙ্ঘের। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিই পথ দেখাইয়াছে। কিন্তু তাহা আর এক রকম। সকল ছেলে মেয়েকে ইশ্‌কুলে আনা সহজ নহে। শিকড়ে টান পড়ে। আগে সকলের জন্য পেটের জোগাড়, ঘরে ঘরে কাজের নিশ্চয়তা। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বাসস্থান নাই, এইরকম কোটি কোটি ভারতবাসী তাহাদের সন্তানদের আগে পেটের জোগাড় করিতেই পাঠান। রাস্তায় ভিক্ষা করিতে ঠেলিয়া দেন নিরুপায় হইয়া। ইশ্‌কুলের কথা আজও তাহারা স্বপ্নে ভাবিতে পারেন না। এই সবের ব্যবস্থা হইলেই ইশ্‌কুলে গিয়া পড়িতে লিখিতে পারা। এত সব দায়-দায়িত্ব আর ঝুট-ঝামেলার কী দরকার দাদা! সকলকে সার্টিফিকেট দিয়া দিলেই কম্ম

কাবার! পাসের পড়া পড়িতে হইবে না। শিক্ষা-সমস্যার কেমন আশ্চর্য সমাধান! এক্কেবারে জালিম লোশন! কানে আসিল, গিন্নি তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ কন্যাটির উচ্চারণ শুদ্ধ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছেন। কন্যা গাহিতেছে– 'অ্যামোন ড্যাশ্‌টি কোটায়ও খুঁজে ...'।

জানিতে ইচ্ছা করে, আইনটি বেসরকারি ইশ্‌কুলে কার্যকর করা যাইবে? খট্‌কা, খট্‌কা। আইনে বেসরকারি ইশ্‌কুলেও পাস ফেল থাকিবে না। ভর্তির ক্ষেত্রেও এক বা তিন কিলোমিটারের বাধ্যকতা থাকিবে। কিন্তু, রাজ্যের হোলি ক্রস, ডন বস্‌কোর মতো ইশ্‌কুল বা দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, দেরাদুন, জয়পুর-এর ব্যয়বহুল বেসরকারি ইশ্‌কুলগুলিতে ইহা কী করিয়া কার্যকর হইবে? টিউশন ফি 'রিয়ালিস্টিক' করিবার কথা বলা হাস্যকর নহে? কোথাও মাসে একশো, কোথাও দশ-বিশ হাজারও নেওয়া হয়। কোনটা রিয়ালিস্টিক? যাহাদের সন্তান পড়ে, তাহাদের কাছে এই টাকা কিছুই না। ওই ধনী অভিভাবকেরা কস্মিনকালেও টাকার নালিশ করিবেন না। আর, এক কিলোমিটারের ভিতরে বসবাসরত ছাত্ররাই 'দুন' ইশ্‌কুলে পড়িবে? দিবাস্বপ্ন ছাড়া কী! গরিব মধ্যবিত্তরা পরিবে না। বড়লোকেরাই সুযোগ পাইবে। এই সকল ইশ্‌কুলে এমনিতেই কেহ ফেল করে বলিয়া শুনিতে পাই না। সুতরাং, বাস্তবে অভিজাত বেসরকারি ইশ্‌কুলগুলির জন্য এই আইন নহে।

আসল কথা কী? দেশের বেসরকারি নামীদামি ইশ্‌কুলগুলিই হইবে এক নম্বর ইশ্‌কুল। যাহাদের টাকা আছে তাহাদের জন্য। আর সরকারি ইশ্‌কুল আম জনতার শিক্ষা-লঙ্গারখানা। দ্বিতীয় শ্রেণীর ইশ্‌কুল। আগামীতে অভিজাত বেসরকারি ইশ্‌কুল বানাইবে বিজ্ঞানী, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। আর সরকারি ইশ্‌কুলে তৈরি হইবে পিওন, দপ্তরি, হোমগার্ড। শিক্ষা অভিজাতদের অধিগত করা তথা বেসরকারিকরণ এই পথেই ঘটানো হইতেছে? চিন্তা-গিন্নি জিজ্ঞাসা করিলেন, পিওনের চাকুরিকে তুমি অমর্যাদা করিতেছ? বলিলাম, না গিন্নি। সেই পথও কেন্দ্র আগেই বন্ধ করিয়া দিয়াছে! কেন্দ্রীয় সরকার তাহার সমস্ত দপ্তরে চতুর্থ শ্রেণীর পদটাই তুলিয়া দিয়াছে। হ্যাঁ, আগেভাগেই! আমজনতার জন্য শাসকদের শিক্ষানীতি সেই 'হীরক রাজার দেশ'-এর মতনই। কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই। শিক্ষা মানে জ্ঞান, জানকারি। শাসক শ্রেণীর মনের কথা হইল, আমজনতার অতশত জানাজানির কী দরকার! জ্ঞান হইল শাসকদের জন্য, অভিজাতদের জন্য, আর শাসনের প্রয়োজনে যে-সব লোকের দরকার হইবে – তাহাদের জন্য। আমজনতা মুখস্থ করিতে থাক – "জানার কোনও শ্যাষ নাই, জানার চ্যাষ্টা বৃথা তাই!"

কিন্তু, ত্রিপুরার বাম সরকার কী করিতেছে? কেন্দ্রের 'শিক্ষা-অধিকার' আইন মানিয়া লইয়াও কি সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে তাহারা কিছু করিতে পারে না? গিন্নির এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিলাম না। তবে মনে হইল– কিছু করিবার আছে কি না ভাবিয়া দেখা

জরুরি। পাস-ফেল না থাকিলেও পরীক্ষার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গ্রেডেশন চালু করা যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গেও শুনিতেছি চালু হইবে। ভাল নম্বর পাইলে 'এ' গ্রেড, মাঝারি নম্বরে 'বি' গ্রেড, খারাপদের 'সি' এবং খুব খারাপের জন্য 'ডি' গ্রেড দেওয়া যায় কি না। মার্কশিটে গ্রেড লেখা থাকিবে। 'ডি' প্রাপকদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া যাইবে। অন্তত, ইশ্‌কুলে যাইয়া ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনা করুক। শুনিতেছি, শহরের নামী সরকারি বিদ্যালয়েও ইতিমধ্যেই ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হারে ভাটার টান লাগিয়াছে। এই বিপদ মোকাবিলা করিতেই হইবে।

(প্রকাশ ঃ ০২.০১.২০১২)

১২-র বিবেক

সেলুনের জীর্ণ-পুরাতন কাষ্ঠ-কেদারায় দেহরক্ষা করিয়াই পাড়ার হাবিলদারবাবু চড়া গলায় হাঁকিলেন, 'আজ উঠুক, পিঠের ছাল তুলিব। শ্বশুরের পুত্ এস-পি খাইয়া ঘুমাইতেছে, উঠুক।'

এস পি সাহেবের ওপর পুলিসবাবুর এত অর্বাচীন ক্রোধের কারণ বুঝিলাম না। পুলিস সুপারও মানুষ। দিন রাত কত পরিশ্রম। দুপুরবেলা খাইয়া একটু ঘুমাইতেই পারেন। কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হইতেছে? তাহা ছাড়া, এহেন বিশেষণ যদি সাহেবের কানে যায়, আর রক্ষা নাই! উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ্যেই প্রতিবাদী হইলাম (একখান 'দ্যাশের কাজ' করিয়াছি ভাবিয়া খানিক আত্মতৃপ্তিও জাগিল)। কিন্তু, পুলিসবাবু কট্মট করিয়া তাকাইয়া কহিলেন – 'তোমার মাথা! পুলিস সুপার নহেন। নেশার ট্যাবলেটের নাম এস-পি।' এতক্ষণে মালুম হইল – 'শ্বশুরের পুত্' হইল পুলিসবাবুর একমাত্র 'এম-ফিল' (মাধ্যমিক ফেল) পুত্র! ঘরে নেশার ট্যাবলেটে বুঁদ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে!

পরে এক ডাক্তারবাবু বুঝাইলেন – এস-পি মানে 'স্পাজ্মো প্রক্সিভন'। এক ধরনের ব্যথা উপশমের ওষুধ। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র অবশ করিয়া দেয়। একটানা বেশিদিন খাইলে পাগলখানায় যাইতে হইতে পারে! কী সর্বনাশ! দেশের কী যে হইল। ছোট ছোট ছেলেরা, এমনকি মেয়েরাও নাকি নেশার ট্যাবলেট খাইতেছে। গাঁজা, কোরেক্স, ফেন্সিডিলেও কাম হইতেছে না। নাইট্রোজাপাম, ক্লোনজেপাম ইত্যাদি হরদম পেটে চালান করিতেছে। ডেনড্রাইটের আঠা, হাওয়াই স্যান্ডেল, এমনকি টিকটিকির লেজ পুড়িয়াও শুঁকিতেছে! ইহাই নাকি নেশা! এই নেশা করিতেই হইবে! আনন্দের নামে যত রকমের বিকৃত ধিক্কৃত জঘন্য পন্থা নির্বিচারে চলিতেছে। আমাদের কালে লুকাইয়া সিগারেটের 'নম্বর টেন'-এ এক টান দিয়াই ছেলেরা এক বৎসর চরম আপরাধবোধে ভুগিত। আর এখন, সিগারেট? ছোঃ। নম্বর টেন নয়, চাই 'এন-টেন'! মানে 'নাইট্রোসান-টেন' ট্যাবলেট। মহামারীর মতন ছড়াইতেছে ত্রিপুরার মহকুমাগুলিতেও। আগরতলায় নীল-রক্তের ইশ্কুলগুলিতেও নাকি বহু ছাত্রছাত্রী ট্যাবলেট-নেশায় আক্রান্ত। বাপ-মা যখন জানিতে পারেন, তখন খুব কমই করার থাকে। ভবিষ্যতের স্বপ্ন-ইমারত হঠাৎ একদিন ধূলিসাৎ হইয়া পড়ে।

খোয়াই শহরে কিছু ক্লাব নাকি পাড়ায় পাড়ায় নেশা-বিরোধী অভিযানে নামিয়াছে। সুস্বাগত। নামাই উচিত। গ্রামে শহরে পাহাড়ে সকল ক্লাব ঐক্যবদ্ধ হইয়া 'নেশা-বিরোধী সমন্বয় কমিটি' গড়া উচিত। ধর্ম বর্ণ ভাষা সম্প্রদায় কিংবা রাজনৈতিক সমর্থনের সীমানা ডিঙাইয়া সকলে ঐক্যবদ্ধ সামাজিক অভিযানে নামা উচিত। না হইলে ইশ্‌কুলের ছেলেমেয়েরা ছোট বয়সেই ধ্বংস হইতে থাকিবে। বড় হইয়া সমাজের ধ্বংস সাধন নিশ্চিত করিবে। এক দিকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাস-ফেল তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত, অন্যদিকে কচি কচি ছেলেমেয়েদের হাতে ট্যাবলেট ধরাইয়া দেওয়া! বাহ্‌বা, কী চমৎকার ব্যবস্থা! এই যুবক-যুবতীরা কোনওদিন দ্যাশ-প্রেমের রোগে আক্রান্ত হইবে না। কোনওদিন কোনও স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি বা অলিম্পিক কেলেঙ্কারি লইয়া মাথা ঘামাইবে না। উহারাই হয় জঙ্গি হইবে, নয় রাজনৈতিক দুষ্কর্মের সঙ্গী হইবে। হাইকমান্ডের ভাবমূর্তি গড়িবে, হেমন্ত দেববর্মার মূর্তি ভাঙিবে। একশত পার্সেন্ট গ্যারান্টি। বিফলে মূল্য ফেরত! ইশ্‌কুলে যাইতে হইবে না, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতেই পারিবে না। কেবল 'রিবা রিবা' করিয়া আমেরিকার কাছে দ্যাশ বিক্রির সমর্থনে দুই হাত তুলিয়া নাচিতে থাকিবে! হায় স্বামীজি, তোমার সার্ধ জন্ম-শতবর্ষ শুরুর মুহূর্তে দেশের যুবশক্তির একটা বড় অংশের আজ এ কী হাল! ইহারই নাম বিশ্বায়ন? বলো স্বামী বিবেকানন্দ, এই ভারতই তুমি চাহিয়াছিলে?

স্বাধীনতার কালে কিছু দুষ্টু লোক খাদ্যে ভেজাল দিত বলিয়া চাচা নেহরু ধমকের সুরে ল্যাম্প-পোস্টের কথা বলিয়াছিলেন। সিরিয়াসলি থোড়াই! অমনি আর কী! এখন খাদ্যে ভেজাল নহে, ভেজালের সহিত সামান্য খাদ্য অথবা সম্পূর্ণ অখাদ্য মিশাইতেও বিবেকে বাধে না! মিরজাফর সাহেব কবরে শুইয়া লজ্জায় (আবার) মরিয়া যাইতেছেন। ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া যাহারা কিশোর-কিশোরীদের হাতে নেশার ট্যাবলেট গুঁজিয়া মুনাফার ধান্দা করিতেছেন, তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা কী দিয়া মাপিব? মাপিবার কোনও একক নাই। তরলের জন্য যেমন লিটার, দৈর্ঘ্যের জন্য মিটার, ওজনের জন্য আছে গ্রাম-কিলোগ্রাম। তেমনি দেশ ও দশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাপ? ইহার একক যদি ধরা হয় 'এক মিরজাফর' কিংবা 'এক বিভীষণ'-এ, তবে একটি কিশোরের হাতে একটিমাত্র নেশার ট্যাবলেট তুলিয়া দেওয়ার অর্থ 'একশো মিরজাফর' কিংবা 'একশো বিভীষণ' অপরাধ করা। আর, যে পুলিস অফিসার টাকা খাইয়া নেশা কারবারিদের ছাড়িয়া দেন? তাহার অপরাধের সীমা নাই! ক্ষমা নাই!

কিন্তু, কথা হইল একটু বড়রা কী করিতেছেন? দৃষ্টান্ত দেখিলাম মেলাঘরে! রুদ্রসাগরের পাড়ে রাজঘাটে, ৬ জানুয়ারি। বনের চিহ্ন নাই যেথা, সেই খানে বনভোজন করিতে যাইয়া বড়রা বন্য হইলেন, মারামারি কামড়া-কামড়ি-কোপাকুপি করিলেন। চড়ুইভাতির নামে অন্যের ওপর চড়াও হইয়া রক্তারক্তি করিলেন। মাত্র কিছুকাল আগে প্রায় একই রকম ঘটনা

দেখিয়াছি খুমুলুঙে। সেথায় এখন পিকনিক বন্ধ। ৭ জানুয়ারি আরেক পিকনিক-ফেরত হিংস্রতার নমুনা অমরপুরের মন্দিরঘাটের রাস্তায়। মূল কারণ – নেশা! পিকনিকের নামে মদমত্ততার কুৎসিত বেলেল্লাপনা! যাহারা এই সব ন্যক্কারজনক কাণ্ড করিলেন, করিতেছেন বা হামেশাই করিয়া থাকেন, তাহারা নিজের সন্তানদের কাছে কী আশা করিতে পারেন? পিঠের ছাল তুলিয়া কিংবা পুলিস-টি এস আর দিয়া সমাজের সর্বনাশ ঠেকাইতে পারিবেন? নাকি, একবার কেবল আয়নায় নিজের দুই চক্ষুর দিকে তাকাইয়া উচ্চারণ করিবেন — 'ছিঃ, আর নয়'!

চিন্তা শীল অতি সীমিত বুদ্ধি-বিবেচনায় তাহার সেলুনে একখান পোস্টার টাঙাইয়াছে। তাহাতে লেখা: একটি আবেদন! প্রিয় বন্ধুরা, আসুন – স্বামীজির নামে, এই ১২ সালের ১২ জানুয়ারি তাঁহার জন্ম সার্ধ শতবর্ষের শুরুতে আমরা বারো-র বিবেক জাগাই। সকলে শপথ করি, আর নহে এই আত্মহনন, এই আত্মপ্রবঞ্চনা। নেশামুক্ত, শান্তিতীর্থ, সমৃদ্ধতর ত্রিপুরা-র মাটিতে দাঁড়াইয়া আসুন সকলে কণ্ঠ মিলাই – 'হে ভারত তুমি আত্মশক্তিতে জাগিয়া উঠো'।

(প্রকাশ: ০৯.০১.২০১২)

জ্বইল্যা যায় ...

কাষ্ঠ পুড়িলে আংরা, তুষ পুড়িলে ছালি। অন্তর পুড়িলে কী হয়? গিন্নির আচমকা এই সৃষ্টিছাড়া জিজ্ঞাসায় চিন্তাচরণের চিন্তা বাড়িল। 'পেশারটা' একবার মাপিয়া দেখিলে হইত! এই বয়সে গিন্নির অন্তরে আবার কীসের আগুন!

অতি সাবধানে জানিতে চাহিলাম, অন্তর যে পুড়িতেছে কী করিয়া বুঝিলে? দেখা তো যায় না। শব্দ শুনিতেছ? কিন্নি কহিলেন, ধ্যাৎ– অন্তর পুড়িলে শব্দ হয় নাকি। বলিলাম, কেন হইবে না! শ্মশানে মড়া দাহ করিবার কালেই ফটাস ফাটাস হাড্ডি ফুটিয়া শব্দ হইতে শুনিয়াছি। জীবিত দেহের জীবিত অন্তর পুড়িলে শব্দ হইবে না? সুকুমার রায় 'ঠাস ঠাস দ্রুম দ্রুম' শব্দে ফুল ফুটিতেও শুনিয়াছেন। অন্তরের দাহ হইলে বিলকুল আরও বড় শব্দ হয়। সকলে শুনিতে না পাইলেও লক্ষণে সকলি দৃষ্ট হইবে। অন্তরের আগুনে দেহ-যন্তরের বাহিরে নিরন্তর 'জ্বইল্যা যায় জ্বইল্যা যায়' মনে হইতে থাকে। কিছুতেই শান্তি লাগে না। মস্তিষ্ক গরম হয়। পেট নরম হয়। নাসিকা এবং কর্ণে ধূম্র উদ্গীরণ ঘটে। চক্ষু হয় রক্তলাল। মুখে উল্টাপাল্টা প্রলাপ আসিতে থাকে। সহজ উদাহরণ দেখিতে পাইবে রাজ্যের রাজনীতিতে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ত্রিপুরায় শুভেচ্ছা-সফর করিলেন। ত্রিপুরাবাসী দলমত নির্বিশেষে বিপুল আবেগে-উচ্ছ্বাসে তাঁহাকে বরণ করিল। বিশ্ববিদ্যালয় দিল ডি-লিট। পুরপরিষদ দিল সংবর্ধনা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণকে ত্রিপুরার মানুষের সহমর্মিতা, অকুণ্ঠ সমর্থন এবং আত্মত্যাগের জন্য বঙ্গবন্ধু- কন্যা বারে বারে তাঁহার কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কহিলেন – 'ত্রিপুরাকে ভুলিনি, ভুলব না'। আসাম রাইফেলস ময়দানের সুবিশাল সুশৃঙ্খল মহাসমাবেশে সংবর্ধিত হইয়া বলিলেন – 'আমরা অভিভূত'। ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বার্থে যতরকম প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার আগে উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় সবই ২০১০-এ দিল্লিতে এবং ২০১১-তে ঢাকায় দুই প্রধানমন্ত্রীর সফর এবং প্রতি-সফরে গৃহীত ও চুক্তিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এইগুলি দ্রুত কার্যকরী হইবে বলিয়াও সুস্পষ্ট আশ্বাস দিয়া গেলেন শেখ হাসিনা। ত্রিপুরার মানুষ অনাবিল ভালবাসায়

আপ্লুত। এক নির্মল আনন্দে উদ্বেল। কেবল, অন্তর পুড়িতে লাগিল রাজ্যের কংগ্রেস নেতাদের। তাঁহারা 'জ্বইল্যা যায়, জ্বইল্যা যায়' করিয়া হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতন আচরণ করিতে শুরু করিলেন। দইখান পত্রিকাতেও গাত্রদাহের শব্দমালা— মাত্রাছাড়া হইয়া ঠুস-ঠাস ফুটিতে লাগিল।

'আসাম রাইফেলস ময়দানের মহাসমাবেশ সিপিএমের দলীয় সমাবেশে পরিণত করা হইয়াছিল!' ইহা 'আবিষ্কার' হইল সমাবেশের তিনদিন পরে। কেন না, এমন জনসমুদ্র হইবে ধারণাই যে ছিল না! স্তম্ভিত কংগ্রেস নেতারা সম্বিত ফিরিয়া পাইতেই একজন আর একজনকে কানে কানে বলিলেন, আমার লোক আসে নাই, তোমার লোকও আসে নাই। কংগ্রেসের লোকদের আসিতে বলা হয় নাই। তাহারা তেমন আসেনও নাই। তাহা হইলে এত মানুষ কোথা হইতে আসিল! হায় হায়! সব দিকেই যে সাগর শুখায়ে যায়। শেখ হাসিনার সফর হইতে ত্রিপুরা অনেক পাইল, বামফ্রন্ট সরকার আর তাহার মুখ্যমন্ত্রীও মানুষের শুভেচ্ছা ভালবাসা পাইলেন। সি পি এম পাইল আত্মবিশ্বাস। আমরা কী পাইলাম!

বুঝিলে গিন্নি, বিড়ালের নজব শুঁটকির ছিক্কার দিকেই! কংগ্রেস নেতাদের এ হেন অন্তর্দাহের পিছনে রহিয়াছে কেবল ভোটেব বিচার। ২০১৩-ব বিধানসভা নির্বাচন ব্যতিত ইঁহাদের ভাবনা নাই, আর কোনও বিচার নাই, অন্য দিকে নজর নাই। ত্রিপুরার স্বার্থ, দেশের ইজ্জত, জনগণের কল্যাণ লইয়া কোনও মাথাব্যথা নাই। শেখ হাসিনা আবার বলিয়াছেন, বাংলাদেশের মাটিতে কোনও ধরনের জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। সম্ভবত, এই দৃপ্ত ঘোষণায় কংগ্রেস নেতাবা আরও কাত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রশ্রয় না পাইলে ২০১৩-তে জঙ্গালের জঙ্গি-সাহায্যের কী হইবে! এই অতি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই চরম হীনমন্যতায়ও ভুগিতেছেন কংগ্রেস নেতাবা। সকলেই জানে, বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা ছিল অত্যুজ্জ্বল। তিনি যে কংগ্রেস দলেরই নেত্রী ছিলেন – এই কথাখানিও জনগণেব কাছে জোরে-শোরে বলিবার সুযোগ কাজে লাগাইতে পারিলেন না কংগ্রেস নেতারা। অবশ্য, শাশুড়িমাতার 'অতিরিক্ত জয়ধ্বনি' বর্তমান 'হাইকমান্ড বধূমাতা' কোন্ চক্ষে দেখিবেন – কংগ্রেসের রাজ্য নেতারা ইহাও ভাবিয়া থাকিলে কিছু বলিবার নাই।

তবে, অন্তর পুড়িবার কোনও হেতু নাই কী করিয়া বলি! জেলা-মহকুমা-ব্লকের সংখ্যা বাড়িল। রাজ্যবাসী সমর্থন করিল দুই হাত তুলিয়া। কংগ্রেস ভাবিল— আমরা রসাতলে। রতনলালরা ভাঙা গলায় চিৎকার করিলেন— সবই ভোটের জন্য বামফ্রন্টের চাল। কিন্তু প্রতিটি নতুন জেলা-মহকুমা-ব্লক ডদ্বোধনে জনতার ঢল। কংগ্রেসের আপত্তি ভাসিয়া গেল। বরং উদ্বোধনের মঞ্চে রতনলাল, বিশ্ববন্ধুদেরকে বাম সরকারের প্রশংসাই করিতে হইল।

উপায় নাই গোলাম হোসেন! এমন সময়, তিন যুবক মধ্যরাতে মদে চুর হইয়া আখাউড়া চেকপোস্টের বাঁশ ভাঙিয়া গাড়ি-সমতে ধরা পড়িল। প্রবল উৎসাহে রতনলাল ঝাঁপাইলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারই ভয়ঙ্কর চক্রান্তের ব্লু-প্রিন্ট রচনা করিয়া উহাদের বাংলাদেশের সীমান্তে পাঠাইয়াছিলেন!'

হতভাগ্য বিরোধী দলনেতা! ত্রিপুরাকে বাম-মুক্ত করিবার এমন মহামোক্ষম দাওয়াই কেহই সেবন করিল না! থুঃ করিয়া ফেলিয়া দিল। কংগ্রেসের ভিতরেই কেহ কেহ আড়ালে 'ভাঁড়' বলিয়া আমোদ প্রকাশ করিলেন।

গিন্নি হাস্য করিয়ো না। কংগ্রেসের সময় খারাপ চলিতেছে। 'একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর।' শেখ হাসিনা আসিলেন। তাঁহার আগে আসিলেন উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি। ডি জি পি-র হাতে 'প্রেসিডেন্টস্ কালার' তুলিয়া দিয়া কহিলেন, 'ত্রিপুরা-পুলিস দেশের গর্ব।' স্বাধীনতার ৬৫ বৎসরে দেশেব চতুর্থ রাজ্য হিসাবে ত্রিপুরা এই সম্মান পাইল। বিরোধী নেতাকে হাজির থাকিয়া স্ব-চক্ষে দেখিতে হইল, স্ব-কর্ণে শুনিতে হইল। আরও বাকি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে শুনিতে হইল উপরাষ্ট্রপতির মুখে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের নেতৃত্বে ত্রিপুরা সরকারের কাজের প্রশংসাও। বল মা তারা দাঁড়াই কোথা!

সুতরাং, গিন্নি, অন্তরের আগুন বড় আগুন। জল দিলে নিভে না। ফুঁ দিলে কমে না। কেবল 'জ্বইল্যা যায়, জ্বইলা যায়!' চচ্চড় শব্দে স্বপ্ন পোড়ে, আশা পোড়ে। পরাণ ফাটাব শব্দ হয়। শয়নে স্বপনে দিবানিশি জাগরণে কেবল চক্ষে ভাসে– ২০১৩ সাল আবার বামফ্রন্টকেই বরণ করিয়া কংগ্রেসকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে ...। হঠাৎ বজ্রপাত হইল! কানে আঙুল দিয়া দেখিলাম– বাজখাঁই গলায় গান ধরিয়াছেন চিন্তা গিন্নি – ''আমার বাড়িব সামনে দিয়া/বন্ধু যখন বউ লইয়া হাইট্যা যায়/বুকটা আমার ফাইট্যা যায়, ফাইট্যা যায়!''

(প্রকাশঃ ১৬.০১.২০১২)

ককবরক
(মানুষের ভাষা)

তুঙ্গে বৃহস্পতিই বলিতে হইবে! সাত দিনের ব্যবধানে দুই বৃহস্পতিবার আবেগে ভাসিল ত্রিপুরা। ১২ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার শেখ হাসিনার গণসংবর্ধনায় যতই ভারত-বাংলাদেশ বলি, তলে তলে কিন্তু উথলি উঠিয়াছিল বাঙালির আবেগ। ছিন্নমূল বাঙালি তাহার ছিঁড়া নাড়ির টানে যন্ত্রণা আর আনন্দে ছিল মাখামাখি। তাই বলিয়া রাজ্যের জনজাতিরাও সেই আনন্দে ব্রাত্য ছিলেন না।

এক সপ্তাহ পরে, ১৯ জানুয়ারি, আর এক বৃহস্পতিবার আবেগে ভাসিলেন ককবরকভাষীরা। মাতৃভাষার কষ্টার্জিত সরকারি স্বীকৃতির তেত্রিশ বৎসর। আবার ভাষার জয়ধ্বনিতে মুখরিত ত্রিপুরা। কাতারে কাতারে নবীন প্রবীণ জনজাতির মানুষ ভাষা-মায়ের সম্মুখে নতজানু হইলেন। কবিরা কবিতা পড়িলেন, শিল্পীরা গান গাহিলেন, কচিকাঁচারা মাতৃদুগ্ধের মতন ভাষা-সুধা পান করিয়া কূজন করিল। কাব্যে-নাটকে-নৃত্যে-ভাব বিনিময়ে ত্রিপুরায় ১৯ দফার জনজাতি-সত্তা বিপুল গৌরবে বিশ্বের দরবারে আত্মবিকাশের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা আবারও ঘোষণা করিল। অন্য রাজ্যের মানুষ শুনিলে বিশ্বাস করিতে চাহিবেন কি না জানি না, ককবরক ভাষা-স্বীকৃতির স্মারক এই মহোৎসবে ত্রিপুরার বাঙালি, হিন্দুস্থানি, মণিপুরিরাও অংশীদার হইলেন। বৃহস্পতি তুঙ্গে না হইলে ত্রিপুরার মতন ছোট্ট রাজ্যের এত সৌভাগ্য হয়?

কক মানে কথা বা ভাষা। বরক মানে মানুষ। ককবরক-এর অর্থ হইল মানুষের ভাষা। এই ভাষার স্বীকৃতি চাহিয়া আন্দোলন চলিতেছিল বহুকাল। ১৯৭৫ সালের ৩ মার্চ ককবরকের স্বীকৃতি-সহ উপজাতিদের চার দফা দাবির আন্দোলনে গুলি চালাইয়া জোলাইবাড়িতে ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে 'ভাষা-শহিদ' বানাইয়াছিল সুখময় সেনগুপ্তের কংগ্রেস সরকারের পুলিস। একুশে ফেব্রুয়ারি কিংবা উনিশে মে-র সঙ্গে সেই দিন হইতে একই আসনে বসিয়াছে তেসরা মার্চও।

চিন্তা-গিন্নি কিছু বলিবার আগেই ইতিহাসের জ্ঞান জাহির করিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ করিলাম। বলিলাম, না গিন্নি— আর জ্বালাইও না। গত সোমবারের 'জ্বইল্যা যায়' পড়িয়া লঙ্কাপুরীর

আগুন এখনও নিভে নাই। তোমার মনের জিজ্ঞাসা বুঝিতেছি। ত্রিপুরার রাজারা এত কিছু চর্চা করিলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান-কাব্য চর্চাকে উৎসাহিত করিলেন, তবুও 'ককবরক আমার মাতৃভাষা' বলিতে তাঁহারা গৌরব বোধ করিতেন – এমন সাক্ষ্যপ্রমাণ ইতিহাসে নাই। বরং, ককবরকভাষী হইয়াও সাড়ে আটশো বছরের রাজত্বে ত্রিপুরার চুরাশি জন রাজা মাতৃভাষার জন্য, নিজের জাতিসত্তা বিকাশের জন্য কিছুই যে করেন নাই – ইহাই নিষ্ঠুর সত্য। সাত বারের অতিথি রবীন্দ্রনাথও রাজাদের গোপন কুঠুরিতে বন্দিনী, অপমানিতা, অবহেলিতা ককবরক-কে একটিবার উঁকি মারিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই। শুনিয়াছি, রাজা বীরবিক্রমের মৃত্যুর পরে, মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিতে ঢাকায় গিয়া নিজামুদ্দিন সায়েবের সহিত দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। নিজামুদ্দিন সময় দিতে না পারায় 'রাগ করিয়া' দিল্লি চলিয়া যান এবং নেহরুজির সঙ্গে দেখা করিয়া ভারতে যোগ দেন। গিন্নি ভাবিয়া দেখ, ত্রিপুরা যদি পাকিস্তানে যাইত কী হইত ককবরকের ভবিষ্যৎ। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান, অধুনা বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনও বিরাট সংখ্যায় ককবরকভাষীরা বাস করেন। তাঁহারা আজও মাতৃভাষার সরকারি স্বীকৃতির কথা কল্পনাও করিতে পারেন না।.

হতভাগ্য 'মানুষের ভাষা' ককবরক-এর জন্য রাজারা যেমন কিছু করেন নাই, শচীন্দ্রলাল সিংহ হইতে সুখময় সেনগুপ্তদের কোনও কংগ্রেস সরকারও কিছুই করে নাই। তাঁহারা ছিলেন 'ভাত কাপড়ের নাম নাই, কিল মারিবার গোঁসাই'। বামফ্রন্টের সরকার না হইলে ত্রিপুরায় কোনওদিন উপজাতিদের চার দফার স্বীকৃতি মিলিত না, কোনও দিন স্বশাসিত উপজাতি এলাকা জেলা পরিষদ গঠন করা সম্ভব হইত না, কখনও ককবরক সরকারি ভাষার মর্যাদা পাইত না। জাগিয়া ঘুমাইয়া না থাকিলে যে-কোনও সচেতন মানুষ এই সত্য বুঝিতে পারেন।

অনেকেই ভুল করিয়া, 'এপার বাংলা-ওপার বাংলা' বলেন। অথচ, ত্রিপুরা কখনও বাংলা ছিল না। বাংলা নহে। এখানে কোনও স্বাভাবিক নিয়মে, শত সহস্র বছরের কোনও বিবর্তনের মধ্য দিয়া বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হন নাই। ইতিহাসের এক বিপর্যয়ে, সাম্প্রদায়িক হিংসার কারণে প্রায় রাতারাতি ছিন্নমূল পাকিস্তানি বাঙালি হিন্দুরা আসিয়া ত্রিপুরায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইহাতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতিরা শতাংশের হিসাবে আজ তিরিশ ভাগে পরিণত হইয়াছেন। বাঙালিরা এইভাবে জনসংখ্যার সত্তর ভাগ হইয়া গিয়াছেন বটে, তাই বলিয়া ত্রিপুরাকে তাঁহারা 'বঙ্গভূমি বা বাংলার তৃতীয় ভুবন' কখনই ভাবিয়া লইতে পারেন না। বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতির রাজধানী কলিকাতা অথবা ঢাকা হইতে পারে, আগরতলা কখনও হইবে না। কিন্তু বিরাট পৃথিবীতে ককবরক ভাষা এবং সংস্কৃতির রাজধানী আর কোথাও হইবে না। এই ছোট্ট আগরতলাই এখনও ককবরক-এর নির্বিকল্প রাজধানী-শহর।

ককবরক ভাষার উন্নতি লইয়া ভাবনার কালে এই কথাটির পরিষ্কার উপলব্ধি দরকার রহিয়াছে। গিন্নি, মনে রাখিও – এই উন্নত গণতান্ত্রিক চেতনা ত্রিপুরায় চল্লিশের দশক হইতেই বিকশিত হইতেছে। ১৯৮০-তে উপজাতিদের চার দফা-বিরোধী দাঙ্গা মোকাবিলা করিয়াছে এই চেতনাই। ৬০ আসনের বিধানসভায় ৪৩ জন অনুপজাতি বিধায়ক সত্ত্বেও এই চেতনাই উপজাতিদের জন্য রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ ভূমিতে এ ডি সি গড়িয়াছে। তাই ককবরক ভাষার সরকারি স্বীকৃতি নিশ্চিতভাবেই ত্রিপুরার উপজাতি-অনুপজাতি জনগণের একতার সন্তান।

ককবরক-এর ভাগ্য ককবরকভাষীরাই নির্ধারণ করিবেন। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। কিন্তু, ত্রিপুরার উপজাতি-অনুপজাতি একতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ককবরকের ভাগ্য গড়িবার চিন্তা-ভাবনা বা পদক্ষেপ ইতিহাসেরই কোনও মরা গলিতে যাইয়া মাথা ঠুকিতে বাধ্য। হরফ কিংবা লিপি-বিতর্কের শিকল পরাইয়া ককবরককে ঠেকানো যাইবে না ঠিক, কিন্তু সামনে চলিবার গতি বাধা পাইবে। পাইতেছেও। একতার বাস্তব জমিতে পা রাখিয়াই এই বাধা পার করিতে হইবে ককবরক-কে।

(প্রকাশ : ২৩.০২.২০১২)

কেমন সম্মেলন?

এই ফেব্রুয়ারির দুই তারিখ। পত্রিকা হাতে প্রবল উত্তেজিত চিন্তা-গিন্নি সটান সেলুনে হাজির! থতমত খাইয়া কোনওমতে কাঁচি সামলাইলাম। আর একটু হইলেই এক রিটায়ার্ড আর্মি অফিসারের কান কাটা যাইত! গিন্নি বাজখাঁই গলায় হাঁকিলেন – রাখো তোমার চুল-কাটা। রাজনীতির খবর রাখো? রাজ্য সি পি এমের প্রথম সারির ৩৬ নেতা কংগ্রেসে যোগ দিতে যাইতেছে। সি পি এমের ঘর খালি!

বলিলাম বক্ষে জুড়িয়া পাণি – না হানি, না! এই কংগ্রেস সেই কংগ্রেস নহে। সি পি এমের ৩৬ নেতা এপ্রিলে তাঁহাদের সর্বভারতীয় পার্টি-কংগ্রেসে যোগ দিতে যাইতেছেন, কেরলের কোঝিকোড়ে। রাজ্য সম্মেলনে ইঁহারা নির্বাচিত হইয়াছেন। ঘর খালি নহে, সি পি এম নিজেকে আরও শক্তিশালী করিতেই তিন বছর পরপর শাখাস্তর হইতে ধাপে ধাপে সর্বভারতীয় সম্মেলন পর্যন্ত করিয়া থাকে। বৃথাই উতলা হইতেছ বুদ্ধিমতী! গিন্নি বিরস বদনে বলিলেন, অ্যাঁ! কিন্তু দমিলেন না। কহিলেন, কীসের রাজ্য সম্মেলন হইল ছোঃ। মারামারি নাই, ধরাধরি নাই, রক্তারক্তি নাই। এমনকি গালাগালিও নাই। সি পি এমের তেজ আছে? কংগ্রেস দলের নেতারা ভুল বলেন নাই – সি পি এম দিশাহীন।

দিশাহীন? ঠিকই তো। দিশা আছে কংগ্রেসের। আছে বলিয়াই প্রায় প্রতিটি দলীয় সভায় গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে মারামারি হয়। ডিক্‌শনারি উপচানো ভীষণ-শ্রুতি অমৃত-ভাষারা কবর হইতে জাগিয়া উঠে। এমনকি ছাত্র যুব সংগঠনের কমিটি নির্বাচনেও পুলিস ডাকিতে হয়। রিগিং, জালিয়াতি, প্রতারণার খুল্লম খুল্লা অভিযোগ উঠে। দিশা কী -- ? দলের চেয়ার, ক্ষমতা, ভোটের টিকিট, তাহার পর 'কপালে থাকিলে' মন্ত্রী কিংবা এম এল এ, নিদেনপক্ষে 'ডিফিটেড এম এল এ'। রাজ্যে না পারিলে দিল্লির মন্ত্রী। দিশা অতিশয় স্পষ্ট। স্পেকট্রাম অথবা অলিম্পিক নতুবা আরও কতরকমের সুযোগ! মূল দিশা খুবই অল্প কথায় বলা যায় -- 'হাত'-এ জিতে 'হাতানো'! জনগণের সম্পদ হাতানো, লুণ্ঠন। ইহার জন্যই চাই -- ক্ষমতা. কেবল ক্ষমতা। ৮৮-র মতন জোট, কিংবা কোনও জঙ্গল-গন্ধী মহাজোট -- যাহাই করিতে হয় করিব। যাহাই বলিতে হয় বলিব। অসত্য, অর্ধসত্য, মিথ্যা, কুৎসা – এই সব তো রামায়ণ মহাভারতের যুগেও ছিল। তখন ধর্ম সংস্থাপনা-র আদর্শ ছিল। সাতচল্লিশের আগেও

স্বাধীনতা-ই ছিল ধর্ম। এখন অধর্মই কংগ্রেসের ধর্ম। নিজেকে খুশ্ করিবার দিশা থাকিলে ঘুষেও কোনও দোষ নাই!

এই সব মহৎ দিশা-র আলোচনা ছাড়িয়া সি পি এম চারদিনের রাজ্য সম্মেলনে কী আলোচনা করিল? 'বন্ধু' বাড়াইতে বলিল। গরিব অনগ্রসর, তফসিলি জাতি উপজাতি এবং নারীদের স্বার্থরক্ষায় আরও জোর লড়াইয়ের কথা আলোচনা করিল। বামফ্রন্টের সরকারকে কী করিয়া শ্রমজীবীদের স্বার্থে, ত্রিপুরার সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায় তাহা আলোচনা হইল। কথাবার্তা হইল রাজনৈতিক শিক্ষার, পার্টি কর্মীদের মান এবং জনগণের মধ্যে সক্রিয়তা বাড়ানোর বিষয়ে। রাজ্য সম্পাদক যে রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করিলেন, ৫০৮ জন প্রতিনিধির মধ্য হইতে ৬৯ জন তাহার ওপর ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করিলেন! একটা হাতাহাতিও হইল না। একটা চপ্পলও উড়িল না। এই নেতা-কর্মীদের কোনও দিশা আছে? কোনও 'এইম ইন লাইফ' আছে? ঠিকই তো, সি পি এম নেতারা নিতান্ত অকর্মণ্য, মাথামোটা না হইলে চারদিন ধরিয়া এই সব অবান্তর বিষয়ে আলোচনা চালাইতে পারিলেন? দিল্লি হইতে প্রকাশ, সীতারাম, বৃন্দারা আসিয়া হেথায় পড়িয়া থাকিলেন কেন? ইহাদের হস্তে কোনও কর্ম নাই বলিয়াই তো?

কী করিব! সি পি এমের দিশা বুঝিতে পারা কংগ্রেসি মস্তিষ্কের কর্ম নহে গিন্নি। দুই দলের চিন্তাধারা আলাদা, দিশা-র ফ্রিকোয়েন্সিও পৃথক। 'দুজনার দুটি পথ— দুটি দিকে গেছে বেঁকে'। সি পি এমের মূল দিশা যে 'সমাজতন্ত্র'– এই কথা দ্বিধাহীন কন্ঠে নেতারা বারে বারেই ঘোষণা করিতেছেন। তাহা ছাড়া, দিশা বদল করিতে হইলে করিতে পারে একমাত্র তাহাদের 'পার্টি-কংগ্রেস'। রাজ্য সম্মেলনে কখনও দিশা বদল হয় না। দিশা ঠিকও হয় না।

গিন্নির শেষ চেষ্টা – এত কথা বলিতেছ কেন? ২৯ জানুয়ারির জনসভা তো ফ্লপ! ভাবিলাম – ব্যহেস করিয়া লাভ নাই। বিরোধী নেতা রতনলাল আগেভাগে সাংবাদিক ডাকিয়া বলিলেন, 'চারভাগের একভাগ'! কংগ্রেস মুখপাত্র রতন চক্রবর্তী দুই দিন পর খুব অঙ্ক কষিয়া গুরুগম্ভীর চালে কহিলেন – 'অর্ধেক'। রতনে রতন চিনিলেও ইহাদের দুজনের বিচার মিলিল না। জনতাও অভিজ্ঞতার সহিত মিলাইতে পারিলেন না। পত্রিকায় টিভিতে ছবি দেখিলাম, আস্তাবল ময়দান ভাসাইয়া তিনদিকের রাস্তাঘাট এবং শহরের বিরাট অংশ প্লাবিত হইল। ইঁহারা বলিতেছেন ফ্লপ! আরে বাবা, ফ্লপ হইলে তো কংগ্রেসেরই ভাল হইত। নিজের কানকে নিজের মিথ্যা শুনাইতেছেন কেন! নিজের চক্ষুকে নিজেরই পত্রিকার ভুল ফটো দেখাইয়া অন্ধ বানাইতেছেন কেন? বরং, সি পি এমের রাজ্য সম্মেলন লইয়াও কংগ্রেস দল যে একবাক্যে 'একটি কথা' বলিতে পারিল না – জনগণ কিন্তু ইহাই লক্ষ্য করিল। চিন্তা-গিন্নি ডিগবাজি খাইয়া বলিলেন – আমি তো আগেই লক্ষ্য করিয়াছি। কেবল তোমাকে বাজাইয়া দেখিলাম! চুল দাড়ি কাটিতেছিলে, কাটো –!

(প্রকাশ : ০৬.০২.২০১২)

সেলাম সহিদ

সি পি এমের ২০তম রাজ্য সম্মেলন শেষ হইবার ১১ দিনের মাথায় আবার মন্ত্রী হইলেন সহিদ চৌধুরি। বিষয়টি একেবারেই কাকতালীয় না-ও হইতে পারে। চিন্তা-গিন্নি নিজের বজ্রকণ্ঠ যতখানি সম্ভব মোটা করিয়া ফোড়ন কাটিলেন, 'নেতাদের দ্বিধা দূর হইয়াছে এই রাজ্য সম্মেলনে।'

দ্বিধা? মনে হয় না। সহিদ চৌধুরিকে মন্ত্রিসভায় ফিরাইয়া আনা সম্পর্কে বামফ্রন্টে কাহারও কোনও দ্বিধা ছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে সঠিক সময় লইয়া দ্বিধা থাকা অস্বাভাবিক নহে। ত্রিপুরায় গত বিধানসভা নির্বাচনের পর ইহাকেই বিরোধীরা সবচেয়ে স্পর্শকাতর ইস্যু বানাইয়া তুলিয়াছিলেন। এক দিকে 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ' সম্পর্কে মানুষের আশঙ্কা, অন্য দিকে সহিদ চৌধুরির ইস্তফায় সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের আহত-আবেগ, আবার বামফ্রন্টের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখিবার স্বাভাবিক তাগিদ – এই তিন রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া সি পি এম যেন সময়ের ঘড়ি দেখিতেছিল!

নিম্ন আদালতে বাংলাদেশি নাগরিক মামুন মিয়াঁর ১০ বছর কারাদণ্ড হইয়াছে। এই দেশে বে-আইনি অনুপ্রবেশ, নিজের নামে জাল কাগজপত্র করা এবং সেইগুলির ব্যবহার – এই তিন অপরাধে। উচ্চ আদালতেও সেই রায় বহাল। মামুন মিয়াঁ আদৌ সন্ত্রাসবাদী কিনা তাহার তদন্ত করিতেছে পশ্চিমবঙ্গের পুলিস। ওই রাজ্যের সি আই ডি অফিসাররাই অন্য এক সন্ত্রাসবাদীর সূত্র ধরিয়া আগরতলা হইতে মামুনকে গ্রেপ্তার করেন। মামুন সন্ত্রাসবাদী হোক কিংবা নিছক কোনও জালিয়াত হোক, ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়! সহিদ চৌধুরির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হইয়াছিল – তাঁহার সহযোগিতা ও ইন্ধনেই মামুন জাল কাগজপত্র করিয়াছে। নিম্ন আদালতেই ইহা সম্পূর্ণ অ-সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। উচ্চ আদালতে তো সহিদ চৌধুরি প্রসঙ্গ বিচার্য বিষয়ই ছিল না। তবুও ...

কে এই সহিদ চৌধুরি? সোনামুড়া মহকুমার এক শিক্ষিত যুবক। কৈশোর হইতেই সাধাসিধা, ভদ্র, বিনয়ী। প্রথম বাম সরকারের বনমন্ত্রী আরবের রহমানের সি-এ হিসাবে আগরতলায় আসা। মন্ত্রীর আবাসে থাকিয়াই পড়াশুনা করিতেন। অমায়িক ব্যবহারের জন্য ছিলেন

পরিচিতদের প্রিয়পাত্র। পরে এলাকায় ফিরিয়া পার্টির কাজ। ২০০৮ সালের বিধানসভা ভোটে জিতিয়া প্রথমবার মন্ত্রী হন। কিন্তু, ১৯৯৩ সালেই প্রথম বিধায়ক হন। ১৯৯৮-তে হারিয়া গেলেও ২০০৩ এবং ২০০৮ সালে পরপর বিপুল ভোটে জিতিয়াছেন। আগে মন্ত্রী না হইলেও সরকারের বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাইছেন। তখন তাঁহার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ উঠে নাই। অভিযোগ উঠিল মন্ত্রী হইবার পরেই! ৩৭ দিন মন্ত্রিত্ব করিয়া পার্টি বলিবার আগেই সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে পদত্যাগ করিলেন। দৃষ্টান্ত। আর কোথায় এমন হয়? কোন রাজ্যে, কোন দলের কোন সরকারের মন্ত্রী অভিযুক্ত হইয়া 'সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে' ইস্তফা দিবার হিম্মত দেখাইতে পারেন? দিল্লির দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কথা না হয় বাদ থাক! ইহাও সত্য, মন্ত্রী না থাকিলেও সহিদ চৌধুরি পার্টিব রাজ্য কমিটিতে ছিলেন, আছেন। গণসংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ কাজেকর্মে ছিলেন, আছেন। কিন্তু তবুও বিরোধীদের অসত্য প্রচারের তোড়েই সহিদ চৌধুরিকে চার বছর অপেক্ষা করিতে হইল?

কংগ্রেস এখনও সহিদ চৌধুরিকে মানিয়া লইতে পারিতেছে না। বলা হইয়াছে, 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য লইয়া সি পি এম ২০১৩ ব ভোটে জিতিবার জন্যই সহিত চৌধুরিকে আবাব মন্ত্রী করিয়াছে।' অর্থাৎ সহিদ চৌধুরি 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ' -এব সহিত যুক্ত। কংগ্রেসের নেতাদের দোষ নাই। আমেরিকাব সহিত এখন তাঁহাদের মহাসখ্য। মুসলমান হইলেই প্রাথমিকভাবে 'সন্ত্রাসবাদী' সন্দেহ করা ৯/১১-র পর হইতে আমেরিকার বাষ্ট্রীয নীতি! ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এ পি জে আবদুল কালামকেও তাহারা প্রায় বিবস্ত্র করিয়া তল্লাশি করিতে দ্বিধা করে না। কাবণ, তিনি ধর্মে মুসলমান। 'মাই নেম ইজ খান' সিনেমা দেখি নাই। পর্দাব 'খান' হওযাব কারণে 'টেবরিস্ট' অপবাদে মার্কিন-লাঞ্ছনার কাহিনী শুনিয়াছি। ভাবতীয জাতীয কংগ্রেসেব নেতারাও এখন ওই নীতির অনুসারী? সঙ্ঘ নেতাদের সহিত তাঁহাদেব তফাত কোথায? নাবী আর মুসলমানকে সন্দেহ করিবার অধিকার বুঝি সকলেরই রহিযাছে। সীতাব মতো 'অগ্নিপরীক্ষা' দিতে হইবে সহিদ চৌধুরিকে? কংগ্রেস নেতারা ভুলিতেছেন যে, ইস্তফার পরে সংসদের নির্বাচন হইতে পঞ্চায়েতের ভোট, সবক্ষেত্রেই বক্সনগবে সি পি এমের জনসমর্থন এবং সহিদ চৌধুরিব জনপ্রিয়তা অনেক বাড়িয়াছে।

বহুকাল সন্ত্রাসবাদী হিংসায় দীর্ণ ছিল এই রাজ্য। এই সন্ত্রাসবাদীরা বাহির হইতে ত্রিপুরায় রপ্তানি হয় নাই। ইহারা ত্রিপুরারই সন্তান। বহু সাচ্চা দেশপ্রেমিকের ছেলে কিংবা ভাই, অথবা নিকটাত্মীয়ও এক সময় সন্ত্রাসবাদী দলে নাম লিখাইয়াছিল। কংগ্রেস নেতা দেবব্রতকলই-এর সহোদর চুনি কলই ছিলেন দুর্ধর্ষ জঙ্গি নেতা। সি পি এমের চাঁচু অঞ্চল কমিটির সদস্য কৃষ্ণ দেববর্মাব পুত্রই টাইগার ফোর্সের নেতা রণজিৎ দেববর্মা। এই রকম অসংখ্য উদাহরণ রহিয়াছে। কিন্তু, দেবব্রতবাবু কিংবা কৃষ্ণবাবুকে এই কারণে 'সন্ত্রাসবাদী'

বলা গুরুতর অপরাধ। মামুন মিয়াঁ যদি সন্ত্রাসবাদী হয়ও, কোনওভাবে কখনও সহিদ চৌধুরির পরিবারের কোনও সদস্যের সহিত যদি তাহার পরিচয় ঘটিয়াও থাকে, ইহার কারণে সহিদ চৌধুরির দেশপ্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা কদর্য এবং নোংরা রাজনীতি ছাড়া কিছু নহে। এতকাল সহিদ অকথ্য মানসিক নির্যাতনের মধ্যেও নিজেকে শক্ত রাখিয়াছেন। ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়াছেন চার বছর। তাঁহাকে সেলাম। কিন্তু এখনও সমগ্র ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলমান জনগণকেই অপমান করিতেছেন কংগ্রেস নেতারা।

হঠাৎ, এতক্ষণ পর চিন্তা-গিন্নি বলিয়া উঠিলেন, শুনিয়াছি মামুন মিয়াঁ যে বাড়িতে ভাড়া থাকিত, যাহারা তাহার বন্ধুবান্ধব ইয়ার দোস্ত ছিল – তাহারা সকলেই হিন্দু। তাহাদের সম্পর্কে কেহ কোনও অভিযোগ তোলেন নাই। হ্যাঁ গা, সহিদ চৌধুরি হিন্দু হইলে কি তাঁহার সম্পর্কে অভিযোগ উঠিত?

(প্রকাশ: ১৩.০২.২০১২)

'আইন অমান্য'

– কী হে চিন্তাচরণ, ১৫ ফেব্রুয়ারি যুব কংগ্রেসের আইন অমান্য দেখিলে? পরের দিন সংবাদপত্রে বড় হেডিং! কেমন লাগিল? সেলুনে হাজির পাড়ার ব্যানার্জিবাবু। বলিলাম, বেশ হইয়াছে। বড় হেডিং তো হইবেই। ব্যতিক্রম কি না! শুনিয়াছি, মানুষকে কুকুরে কামড়াইলে নাকি সংবাদ হয় না। বরং কুকুরকে মানুষে কামড়াইলেই বড় সংবাদ হইতে পারে। যুব কংগ্রেস তো আইন-ফাইন খুব একটা মান্য করিয়া চলে না। এইবারেই প্রথম 'আইন অমান্য'-র নামে শান্তিতে আইন মান্য করিল। ১১ জুলাইয়ের কলঙ্ক ইহাতে কতটা মুছিল জানি না। তবে যুব কংগ্রেসিদের ব্যতিক্রমী চেহারায় সকলেই অবাক হইয়াছে। বড় হেডিং, কিন্তু ভুল হেডিং। 'আইন অমান্য' নহে, পড়িতে হইবে 'আইন মান্য আন্দোলন'!

লিখিয়াছে 'লক্ষাধিকের গ্রেপ্তারবরণ'। কেন লিখিবে না! নামের তালিকাই-তো রহিয়াছে। মনে হয়, যুব কং নেতারা যে যত নাম জানেন, অজস্র ভুল বানানে সব লিখিয়া দিতে প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছেন! যাহারা আসিয়াছে তাহাদের নাম উঠিয়াছে, যাহারা আসেন নাই তাহাদেরও নাম বাদ যায় নাই। এমনকি, যাহাদের এখনও জন্ম হয় নাই, তাহারাও তালিকায় সমাদরে স্থান পাইয়াছে। আগরতলায় ৪-৫ হাজারের মিছিল হইতে কী করিয়া '১৫ হাজারের বেশি লোকের গ্রেপ্তারবরণ' সম্ভব হইল – পুলিসের কর্তাদের এই বিষয়ে মাথাব্যথা নাই। কারণ, তাঁহারাও বুঝিয়াছেন – সংখ্যা খুবই দার্শনিক বিষয়। বিশ্বাসেই হেথায় পরম সত্যের অধিষ্ঠান।

কী বলিলেন? 'বেকারদের প্রতি বাম সরকারের বঞ্চনা ও প্রতারণার প্রতিবাদে' আইন অমান্যর যুব-মিছিলে বয়স্ক, বৃদ্ধরাও হাঁটিয়াছেন? একশোবার হাঁটিবেন। কী অন্যায় শুনি? কংগ্রেস ২০১৩-তে 'আসিয়া পড়িলে' চাকরির জন্য ইঁহাদের ডাক পড়িবে না? সুরজিৎ দত্ত কিংবা সমীররঞ্জন অথবা রতনলাল নাথের মন্ত্রিসভা এই সব দাদু-জেঠু-মাসি-পিসিদের সরকারি চাকুরির সিদ্ধান্ত লইবেন। বয়স ষাট হইলে কী! বালাই ষাট! প্রকৃত বেকাররা হাততালি দিয়া আপন উদরে গামছা বান্ধিবেন। তাহাদের মধ্যে ভাগ্যবান-ভাগ্যবতীরা কেহ অবশ্য বিবাহের আসরে মন্ত্রীর পকেট হইতে 'অফার' উপহার পাইবেন। কেহ আবার

অর্থ দপ্তরের অনুমোদনহীন ভুতুড়ে চাকুরি পাইলেও পাইতে পারেন! কেহ চারমিনারের প্যাকেটের কাগজে স্বাক্ষর করিয়া হাফ-বেতন পাইবেন, কেহ আবার মন্ত্রী-নেতা-এম এল এ-চেয়ারম্যান এবং 'ডিফিটেড এম এল এ'-দের দফায় দফায় মোটা অঙ্ক ঘুষ দিয়াও 'কিছু একটা' জোগাড় করতে পারিবেন না। তাঁহারা যদি একবার আসিয়া পড়িতে পারেন, চাকরিতে অন্য কোনও নীতি চলিবে না। কোনও 'নিডি-সিনিয়রিটি'-র ঝুট-ঝামেলা চলিবে না! কেবল 'গিভ অ্যান্ড টেক' পলিসি চলিবে! চাকরি চাহিয়া দুই-চারজন সবিতা দেবনাথ গণধর্ষিতা হইবার পর গুলি খাইয়া কলেজ লেক-এর জলে ভাসিলেও ক্ষতি কী!

এ যাবৎ অনুষ্ঠিত সব নির্বাচনে প্রমাণিত, রাজ্যের ভোটারদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বামফ্রন্টকেই ভোট দেন। ইহাদের ঘরে কোনও 'বেকার নাই' বলিলে বুঝিতে হইবে সকলেরই চাকরি হইয়া গিয়াছে! আবার ঘরে কোনও 'কর্মচারী নাই' বলিলে বুঝা যাইবে – সকলেই বেকার। কিন্তু ইহাদের ঘরে বেকারও নাই, কর্মচারীও নাই, তাহা কী করিয়া হয়! কংগ্রেসের অভিযোগের অর্থ– বামফ্রন্ট সরকার একইসঙ্গে 'বেকার-বঞ্চনা' এবং 'কর্মচারী-বঞ্চনা' করিয়া নিজের ভোট স্বেচ্ছায় নষ্ট করিতেছে। ঘরে বাইরে বেকার ছেলেমেয়েদের কী জ্বালা, বামফ্রন্ট নেতা-মন্ত্রীরা বোকা বলিয়াই বুঝিতে পারেন না? আসুন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাক্।

বাম সরকার বলিতেছে– চাকরি চলিতেছে, বন্ধ নাই। কেন্দ্রের সরকার যত খুশি হুমকি জারি করিতে পারে, টাকা দেওয়া বন্ধ করিতে পারে– এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার চাকরি বন্ধ করিবে না। জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ কোনও সরকারই বন্ধ করিতে পারে না। ত্রিপুরার মতন রাজ্যে বেকাররা যাইবেন কোথায়? শিক্ষা বাড়িতেছে! নানান শাখায় শিক্ষিত বেকার বাড়িতেছে। কিন্তু কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র কোথায়? কংগ্রেসের নেতৃত্বে কেন্দ্রের সরকার এমন এক নীতি লইয়া চলিতেছেন, যাহাতে সারা দেশেই কোটি কোটি বেকারের কর্মসংস্থানের আশা ভরসা ধূলিসাৎ। কেন্দ্রের সরকারি দপ্তরগুলিতে নতুন পদ সৃষ্টি করা বন্ধ। পুরনো পদ বিলোপ হইতেছে। সরকারি পরিষেবা গুটাইয়া আনা হইতেছে। বেসরকারি হাতে চলিয়া যাইতেছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি। সর্বত্র আউট-সোর্সিং। সরকারি কর্মীদের সারা জীবনের সঞ্চয় পেনশনও বেসরকারি হাতে ফাটকা বাজারে পাঠানো হইতেছে। রাজ্যগুলিকেও এই নীতি মানিতে বাধ্য করা হইতেছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরার অর্থমন্ত্রীকে ধমক দিয়ে বলিয়াছেন, 'এত চাকরি দিলেন কেন?' অপরাধই করিয়াছে বাম সরকার! সম্যক বিচারে চাকরি দেওয়ার 'অপরাধেই' ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন ত্রিপুরার সাড়ে দশ হাজার কোটি টাকা ছাঁটিয়া দিয়াছে। ফলে, শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি-সহ বিভিন্ন দপ্তরে বহু চাকরির 'ইন্টারভিউ' বহু আগে শেষ করিয়াও অফার ছাড়িতে বিলম্ব হইতেছে। তাহাতেও চাকরি থামে নাই। উন্নয়নের কর্ম থামে নাই। রাজ্যে রাজ্যে দেনার দায়ে প্রায় আড়াই লক্ষ কৃষক এ যাবৎ আত্মঘাতী

হইলেও ত্রিপুরায় এখনও একটিও এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে নাই। কারণ, এইখানে সরকারের কৃষি-নীতি আলাদা। ত্রিপুরাবাসী এমন এক সুষ্ঠু আর্থিক বাতাবরণে বাস করিতেছেন যে, ওই সকল রাজ্যের আত্মঘাতী কৃষকদের ভয়াবহ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি কল্পনাও করিতে পারিবেন না।

বামেরা কী চাহিতেছেন? বেসরকারিকরণ বন্ধ হউক, সরকাবি পরিষেবা, গণবন্টন প্রসারিত হউক। আমূল ভূমিসংস্কার করিয়া প্রকৃত কৃষকের হাতে জমি দেওয়া হউক, উৎপাদন বাড়ুক, গরিবের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ুক। বাজার তেজি হইবে। শিল্পপণ্যের চাহিদা বাড়িবে। ব্যাপকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হইবে সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি – সমস্ত ক্ষেত্রেই। কিন্তু কংগ্রেস দল তাহাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে সম্পূর্ণ বিপরীত মুখেই চালাইতেছে। ত্রিপুরাব বাম সরকার সেই পথের শেষ কাঁটা। ইহাকে উপড়াইয়া ফেলিতেই বেকারদেব বাম-বিরোধী করিয়া তুলিতে হইবে। বেকার-বঞ্চনার স্লোগানে যে বেকারদেব কোনও স্বার্থেব গন্ধ নাই, কংগ্রেস নেতাবাই ১৫ ফেব্রুয়ারিব জমায়েতে '২০১৩-তে বাম-হটাও' ডাক দিয়া প্রমাণ করিয়া ছাড়িয়াছেন।

তবে, এইবাব 'আইন অমান্য'-ব নামে আইন মান্য কবিবাব ঘটনা হইতে আবও একটি সত্য উঠিযা আসিল, কিছু কর্মীব ভতি উৎসাহে কংগ্রেসি হিংসা তাণ্ডব ঘটে না। কং নেতাবাই 'প্রয়োজনে' কর্মীদের সাহংস করিযা তোলেন। ১১ জুলাইযেব মতন।

(প্রকাশ: ২০.০২.২০১২)

৯৯

পোস্টার! চিন্তা-গিন্নির হাতে!

প্রবল ক্ষিপ্রতায় আঠা মারিয়া সাঁটিতে গেলেন সেলুনের দরজায়। খরায় ফাটা-ফাটা খেত যেমন, তেমনই শ্রীহস্তলিপিতে লেখা, "**ধর্মঘট। ২৮শে সেলুন বন্ধ থাকিবে। সেদিন কোনওপ্রকার চুল দাড়ি কাটা হইবে না!**" বাধা দিলাম।

কিন্তু, বুক ধড়াস্ করিয়া উঠিল। হায় হায়! এমন বান্ধব থাকিলে আর শত্রুর কী প্রয়োজন! ২৮ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট হইবে: প্রতিদিন প্রচার-মিছিল দেখিয়া প্রাণে বড়ই আহ্লাদ হইতেছিল। সেদিন সকলই বন্ধ থাকিলে সেলুনের ব্যবসা জমিবে। অফিস কাছারি ইস্কুল কলেজ দোকান বাজার কিছুই নাকি খুলিবে না। এমনকি, মোটর শ্রমিক রিকশা-শ্রমিকরাও তাহাদের যান চালাইবেন না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সেদিন ইহাদের সকলের সব কাম বন্ধ। মানে, চিন্তার সেলুনে চুল দাড়ি সাফ করিবার ভিড় আটকাইবে কে: কেবল বুদ্ধিজীবীদের পাওয়া যাইবে না। পরের দিন আগরতলা বইমেলা শুরু কি না! তাঁহারা কেই এই উপলক্ষে সযত্নে নিজেকে আলুথালু আর খোঁচা-খোঁচা করিয়া তুলিয়াছেন! কিন্তু, চিন্তা-গিন্নির এ কী দুর্মতি হইল!

শুনিয়াছি, ১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং ৪৯টি জাতীয় ফেডারেশন সমেত আরও বহু সংগঠন ও সংস্থা একযোগে ১০ দফা দাবিতে দেশ জুড়িয়া এই ধর্মঘট ডাকিয়াছে। পত্রিকায় দেখিলাম, ১০ কোটির বেশি শ্রমিক-কর্মচারী এই ধর্মঘটে সামিল হইবেন। ওরে বাপ্‌রে! দেশে তুফান উঠিবে মনে হইতেছে। উঠুক। সেলুনের সহিত ইহার কী সম্বন্ধ বুঝি না! কেন্দ্রের মনমোহন সরকারকে বিপদে ফেলিতে বামপন্থীরাই এই সব করিতেছে। সেলুনের সহিত রাজনীতির সম্বন্ধ নাই! কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, বি জে পি সকলকেই সেলুনে ঢুকিতে হয়। বিদ্যুৎ-পানীয় জল আর হাসপাতালের মতোই সেলুনকেও ধর্মঘটের বাহিরে রাখিতে পোস্টার লাগাও গিন্নি!

চিন্তা-গিন্নি পানের পিক্ থু করিয়া বলিলেন, তুমি কোনও খবরই রাখো না! আরে, কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন আই এন টি ইউ সি-ও এই ধর্মঘটে রহিয়াছে। এমনকি, বি জে পি-র ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘও আছে! জিজ্ঞাসা করিলাম– ইহারাও ধর্মঘটে কেন? ১০ দফা দাবির সবই

তো কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে। ইহাদের বেসরকারিকরণের নীতি, উদারীকরণের নীতি, পুঁজিপতি বড়লোকদের মাত্র তিন বছরে ১৫ লক্ষ কোটি টাকার ট্যাক্সো ছাড় দিয়া গরিব মধ্যবিত্তের ঘাড়ে মূল্যবৃদ্ধির ভার চাপাইবার নীতির বিরুদ্ধেই তো ধর্মঘট! তাহা বাদে, পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের যে খাদের পথে আমেরিকার পিছে পিছে মনমোহনজির সরকার চলিতেছে, বি জে পি-ও ইহাকে সমর্থন করে। গুনিয়া দেখি নাই, তবে বিশ্বায়নের নীতি গ্রহণর পর ওই নীতির বিরুদ্ধে কমপক্ষে ১২-১৩টি দেশব্যাপী ধর্মঘট হইয়াছে। ইহা ১৪তম। প্রথম ১২টি ধর্মঘট ছিল সিটু-সহ বাম ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে। গত ধর্মঘটে যোগ দেয় বি জে পি-র মজদুর সঙ্ঘ। এইবার ইনটাকও। কেন? চিন্তা-গিন্নি জবাব দিয়া বলিলেন, অতশত বুঝি না বাপু। শুধু বুঝি আসর বুঝিয়া কীর্তন না করিলে শতরঞ্চি খালি হইয়া যাইবে! কংগ্রেসের ইনটাক আর বি জে পি-র বি এম এস বুঝিতেছে – দেশের মানুষ অতিষ্ঠ, শ্রমিকরা বাঁচিতে পারিতেছেন না, কৃষকরা দেনার দায়ে আত্মহত্যা করিতেছেন, আর নেতা-মন্ত্রী-আমলারা লুট করিতেছেন। ধর্মঘটের বিপক্ষে যাইলে যেমন অ-ধর্ম হইবে, সংগঠনের ঘটেও কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না।

ব্যাঙ্কের নিখিলবাবু কখন আসিয়াছেন দেখি নাই। বলিলেন, বুঝিলে চিন্তা – মনমোহন সরকার এখন বলিতেছেন – রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কই আর্থিক মন্দা হইতে দেশকে বাঁচাইয়াছে। মজার কথা কী জানো – ব্যাঙ্কের কর্মচারী অফিসাররা এত আন্দোলন-ধর্মঘট না করিলে ১০ বছর আগেই দেশের সব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক মনমোহনজিরা বেসরকারি করিয়া ফেলিতেন। তবে, সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে ধ্বংস করিয়াই ছাড়িবে। বেসরকারি শিল্পপতিদের ছাড় দিযা এখন ইহারা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে ১০ শতাংশ বেশি ট্যাক্সো আদায় করিতেছে। তাহার পরেও যে-সব রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা লাভ করিতেছে, শেয়ার বেচিয়া তাহাদের লুণ্ঠনের ব্যবস্থা হইতেছে। বিপুল প্রতিবাদ না হইলে কিছুদিন আগে ইহারা দেশের খুচরা ব্যবসায়ীদের সর্বনাশটা প্রায় করিয়া ফেলিয়াছিল। কেন্দ্রের এই সরকার কৃষিতে ভর্তুকি তুলিয়া দিতেছে। খাদ্যে ভর্তুকি ছাঁটিতেছে। গণবন্টন ব্যবস্থাকে গলা টিপিয়া মারিতেছে। জাতীয় আয়ের মাত্র ০.৬৪ শতাংশ ভর্তুকি দিলেই দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ সস্তায় সমস্ত নিত্যপণ্য রেশনে পাইতে পারে। কিন্তু, ইহারা দিতে রাজি নহেন। দেশের মোট শ্রমশক্তির ৯৩ ভাগ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক। ইহাদের রুজি রোজগারের কোনও নিরাপত্তা নাই। জীবন অনিশ্চিত। সর্বজনীন গণবন্টনের দাবি, সারা দেশে সর্বজনীন ন্যূনতম মাজুরি ১০ হাজার টাকা করিবার দাবি রহিয়াছে এই ধর্মঘটের দশ দফায়। চিন্তা, দেশের ৯৯ ভাগ মানুষের স্বার্থে এই ধর্মঘট– 'উই আর নাইনটি নাইন পার্সেন্ট'। তুমি কোন্ দিকে?

বুকটা আবার ধড়াস্ করিল। কিন্তু, চোয়াল দুইটা নিজের অজান্তেই শক্ত হইয়া উঠিল।
বলিলাম, গিন্নি– পোস্টার লাগাও! ২৮শে সেলুন বন্ধ। খোলা হইবে না। ধর্মঘট!

(প্রকাশ: ২৭.০২.২০১২)

মিল!

দুরন্ত সেঞ্চুরি হাঁকাহয়া তিনি আউট হইলেন। ১০৬! সহজ নহে। অন্যদের তুলনায় যথেষ্ট ভালই বলিতে হইবে। তবুও লোকে হায় হায় করিল। কাঁদিল। সারা রাজ্যে পতাকা অর্ধনমিত থাকিল। এত ভালবাসা, এত শ্রদ্ধাও অর্জন করা যায়? অর্জন করিলেও শেষ অবধি ধরিয়া রাখিতে পারা যায়? হাঁ, যায় বইকি। নহিলে তিনি কী করি‍‍ ‍‍রিলেন! ব্যাটসম্যানের নাম ব্রজমোহন জমাতিয়া।

অথচ, তাঁহার সেঞ্চুরি করিবার কথা নহে। ক্যাচ ফেলিয়া তাঁহাকে ২৩ বছর ৪ মাস বেশি বাঁচিবার সুযোগ দিয়াছে কংগ্রেস। ১৯৮৮-র ১২ অক্টোবর বীরচন্দ্রমনুতে কং-সন্ত্রাসে বন্ধ থাকা সি পি এমের পার্টি অফিসটি যে নেতারা আবার খুলিতে গিয়াছিলেন, শ্রীদাম-ছত্রমণি-গাথিরাই -- সহ সকলকেই কচুকাটা করা হইয়াছিল। চৌদ্দ জনকে চুয়াল্লিশ টুকরা করিতে চৌদ্দ মিনিটও লাগে নাই! জোটের যমদূতদের হাতের লিস্টিতে একনম্বর নামটি ছিল ব্রজমোহনের। লুঙার বাঁশঝাড়ে লাফাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন সেদিন। পার্টি অফিসের পতাকার রশি ছিল তাঁহার হাতে। পতাকা ওত্তোলিত হইবার আগেই ঝাঁপাইয়াছিল খুনে-বাহিনী। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই পতাকা শক্ত হাতে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন ব্রজমোহন। যাঁহারা হুহুঙ্কারে কহিয়াছিলেন, লালের চিহ্ন রাখিব না, দূরবিন দিয়াও কমিউনিস্টদের দেখা মিলিবে না -- তাঁহাদের সব আস্ফালন মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছিলেন তিনি। তাঁহারা। ব্রজমোহনেরা।

ব্রজমোহন জমাতিয়ার হাতের সেই পতাকা আজ ত্রিপুরার নীল আকাশময় অপ্রতিহত। সি পি এমের পার্টি সভ্যের সংখ্যা এখন প্রায় ৮০ হাজার। ১৫ লাখের উপরে মানুষ এই দলের কোনও না কোনও গণসংগঠনের সদস্য। রাজ্যের প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার প্রতি ২৭ জনে একজন পার্টি-সদস্য। সারা দেশের মধ্যে ইহা এক নজিরবিহীন ঘটনা। অনেক ভালবাসা আর শ্রদ্ধার উল্টা পিঠে অনেক ঘৃণা আর ষড়যন্ত্রও জমাট বাঁধে। বাঁধিবেই। না বাঁধিলে এইরকম নজিরের কোনও সত্যমূল্য সৃষ্টি হয় না, হইত না। ১৯৮৮-৯৩ ছিল সেই সংহত শ্রেণীঘৃণার সংহত আঘাতের কাল। এই আঘাত আর পাল্টা আঘাত চলিতেই থাকে। চলিতেছেও।

টিভি খুলিয়া এক বয়স্ক মানুষের মুখে তীব্র সত্যের উচ্চারণ শুনিতে শুনিতে চিন্তা-গিন্নি জিজ্ঞাসা করিলেন -- ইনিই কি ব্রজমোহন? গিন্নির ভুল ভাঙাইতে বলিলাম, না গো, মানুষটির

নাম আজিজুল হক। লেখক আজিজুল বলিতেছিলেন, পশ্চিমবাংলার লোক খেতের ছাগল তাড়াইতে নরখাদক বাঘ ডাকিয়াছে। ত্রিপুরায় '৮৮-'৯৩ যে অভিজ্ঞতা মানুষের হইয়াছিল, পশ্চিমবাংলায় এখন সেই অভিজ্ঞতাই হইতেছে।

চার অক্ষরের একটি শব্দ তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল – 'জনরোষ'। বর্ধমানের সি পি এম নেতা প্রদীপ তা এবং কমল গায়েনকে নৃশংস বর্বরতায় হত্যা করিবার পর বলা হইল – জনরোষ। কী আশ্চর্য, বীরচন্দ্রমনু গণহত্যার পরেও হুবহু ওই একই শব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল – জনরোষ! খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীও তখন সি পি এম নেতা-কর্মীরা খুন হইলে ওই চারিটি অক্ষরের রেকর্ড বাজাইতেন। বঙ্গে 'পরিবর্তন' ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই সি পি এমের পার্টি অফিসগুলিতে পুলিস আর দিদিভক্ত ভাইদল হানা দিয়া গুলি-বোমা-বন্দুক, সামরিক পোশাক ইত্যাদি উদ্ধার করিতে শুরু করিয়াছিল। '৮৮-তে ত্রিপুরাতেও হুবহু তাহাই ঘটিতে দেখিয়াছি। উদয়পুরে সি পি এমের বিভাগীয় অফিস হইতে গুলি-বন্দুক-সামরিক পোশাক 'উদ্ধার'-এর রোমহর্ষক 'খবর' পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিতে কিছুমাত্র বিলম্ব ঘটে নাই। একবার যাচাই করিতেও হয় নাই! পার্ক স্ট্রিটের ধর্ষণ শুনিয়াই 'দিদি-মুখ্যমন্ত্রী' উজানময়দানের কালে ত্রিপুরার 'দাদা– মুখ্যমন্ত্রী'র ভাষায় কথা বলিয়া উঠিলেন! তিনি বলিলেন, 'সাজানো'। দাদা বলিয়াছিলেন, 'সেনা সাজিয়া আমিও তো ধর্ষণ করিতে পারি, ইহা সি পি এমের চক্রান্ত!' অভিজ্ঞতা এমন করিয়া মিলিয়া যাইতে পারে!

– 'সুশীলেরা কই? কোথায় পলাইলেন?' চিন্তা-গিন্নির এই দুঃশীল জিজ্ঞাসায় নাড়া-ঝাড়া খাইতে হইল। গিন্নি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যোগ করিলেন – কতকাল ইঁহাদের দেখি নাই! দুই-একজন 'অ-শুভা'কে অ-প্রসন্ন চেহারায় আমতা-আমতা করিতে দেখি বটে, কিন্তু অন্যরা কই? যাঁহারা জ্ঞানেশ্বরী দুর্ঘটনা 'সি পি এম ঘটাইয়াছে' বলিয়া সাংবাদিক সম্মেলন করিয়াছিলেন? যাঁহারা প্রভাতে-দ্বিপ্রহরে-গোধূলিতে-নিশীথে দিদি-র জন্য এই হাসিতেন, এই কাঁদিতেন? গলার শিরা ফুলাইয়া তর্ক করিতেন – তাঁহারা কোথায়? 'পরিবর্তন চাই' বলিয়া আপন শ্রীমুখ ভাড়া দিয়া তাঁহারা যে সব বড় বড় পোস্টার ছাপাইয়াছিলেন, সেই সব পোস্টারই বা কই! চিন্তা-গিন্নির অর্বাচীন প্রস্তাব: আবার বাংলার শহরে-গ্রামে শ্রীমুখচ্ছবিতে মুখর সেই সব পোস্টার লটকাইয়া দেওয়া হউক। কেবল 'পরিবর্তন চাই' শব্দ মুছিয়া তলায় লিখিয়া দিতে হইবে – 'সন্ধান চাই'!

গিন্নির কথায় কান না দিয়া ভাবিতেছিলাম – বাংলায় 'পরিবর্তন' হইয়াছে দশ মাস হইল। দশ মাস পরের ভোটে ত্রিপুরা কি বাংলার পথে হাঁটিবে? নাকি বাংলাই দ্রুত ত্রিপুরার পথে ফিরিবে? দিনপঞ্জি দেখিয়া মনে হইতেছে – বাংলার মানুষ 'পরিবর্তন'-এর পরিবর্তন শীঘ্রই চাহিতে শুরু করিবেন। কী আশ্চর্য, ব্রজমোহন জমাতিয়া মৃত্যুর কয়েক মাস আগেই আজকালের সহিত সাক্ষাৎকারে সেই দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আজিজুলের কণ্ঠে যেন ব্রজমোহনের কণ্ঠেরই প্রতিধ্বনি– 'বাংলায় এখন ত্রিপুরার জোট-জমানা চলিতেছে!'

(প্রকাশ: ১২.০৩.২০১২)

দিল্লিমুখী

সেলুনে কাস্টমার নাই। ক্ষুর-কাঁচি বাক্সে ভরিয়া ঘুম-চোখে ঢুলিতেছি। রিটায়ার্ড দারোগা, কাব্যরসিক হীরালালবাবু প্রায় আবৃত্তি করিতে করিতে হাজির। বলিলেন – বুঝিলে চিন্তাচরণ, মুখ হইতে মুখী। কেহ জনমুখী, কেহ জীবনমুখী। না বুঝিয়া আহ্লাদে বলিলাম, আইজ্ঞা হাঁ! মুখ্যমন্ত্রী যেমন বলেন 'জনমুখী', নচিকেতার গানকে যেমন ...। ধমক দিয়া হীরালালবাবু আদেশ করিলেন – বডি ম্যাসেজ করো! মুখ বন্ধ রাখিয়া শুনিতে থাকো।

বলিলেন – কেহ অন্তর্মুখী, কেহ বহির্মুখী। কেহ সঙ্কল্পে একমুখী, কেহ প্রকল্পে বহুমুখী। ফুল সুন্দর সূর্যমুখী, মুখ-সুন্দর নারী চন্দ্রমুখী। কিন্তু, রাজ্যের কীর্তিখ্যাত কংগ্রেস নেতারা সকল সিজনেই নিজেরা মুখোমুখি। ইঁহাদের মুখ আছে সুখ নাই। সাধ আছে সাধন নাই। বীর্য আছে ধৈর্য নাই। বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে কয়েকদিন ফাঁক পাইতেই এখন প্রায় সকলে দিল্লিমুখী। চলো মন ব্রজে চলো! ব্রজধাম দিল্লিধামের পথের ধুলা অঙ্গে মাখিয়া সভাপতির চেয়ার মাগিয়া, তাঁহারা গীত গাহিবেন – 'দে মা আমায় তবিলদারি'! সকলেই এখন একমুখী সূর্যমুখী, দিল্লিমুখী! কী বুঝিলে? সঙ্কেত পাইয়া মুখ খুলিলাম। পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে দিল্লির সূর্য যে মেঘে ঢাকা স্যার! রাহুগ্রস্ত যুবসূর্য রাহুলের হুল আবার নির্বিষ প্রমাণিত হইল। উল্টা ফুল ফুটিল মুলায়মের বাগানে। কংগ্রেস সেই চার নম্বরেই! এখন এনারা দিল্লিমুখী, এই অসময়ে?

হীরালালবাবু দলাই-মলাইয়ে মুখে মৃদু সুখশব্দ করিয়া কহিলেন – (ওফ্) সান্ত্বনা দিতে, সান্ত্বনা (আঃ)! সেই সঙ্গে – সভাপতির চেয়ার হইতে সুরজিৎকে ঠেলিয়া ফেলিবার ইহাই যে প্রকৃষ্ট সময় – এই কথা বুঝাইতে। গুরুতর নালিশ লইয়া বীরজিৎ, সুদীপ এবং সবশেষে কলকাঠি হাতে রবিবার ছুটিয়াছেন বিরোধী নেতা রতনলাল। বিধায়ক হইয়াও এইবার বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে নাকি প্রায় গরহাজির কংগ্রেস সভাপতি সুরজিৎ দত্ত। বিধানসভা ভোটের আগে বিরোধী নেতাকে তিনি প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করিতেছেন, মুখে ঐক্যের কথা বলিয়া নিজেই ঐক্য ভাঙিতেছেন। এই সভাপতি আসলে 'তরমুজ'। ভিতরে লাল, বামফ্রন্টের সাহায্যকারী। বাহিরে সবুজ। ইহাকে উল্টাইতে হইবে। অন্য দিকে সুরজিৎ বলিতেছেন তিনি অসুস্থ। বিধানসভার অফিসে যাইয়া হাজিরা খাতায় সই করিতেছেন। অধিবেশনে থাকিতে পারিতেছেন না। বীরজিৎ সুদীপ রতনলালরা মানিতে রাজি নহেন।

তাঁহারা বলিতে চাহেন – ইহা অন্তর্ঘাত।

ভাবিতেছিলাম – বাম-বিরোধী জোটের বহুবর্ণ বিচিত্র মিশ্রণটি কিছুতেই দলা পাকাইতেছে না। ঝুর ঝুর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। কংগ্রেসের এই অবস্থা। রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস কলিকাতামুখী হইলেও নেতাদের মুখ দেখাদেখি নাই। এই রাজ্যে তাহাদের সমর্থন নাই, ভোট নাই। তবুও প্রতি প্রভাতে উঠিয়া একে অন্যকে গিলিয়া ফেলিতে চাহেন। আহ্বায়ক নিজের দলে ঘোর অনৈক্যের চোরাবালিতে এক জায়গায় তিষ্ঠিতে না পারিলেও কংগ্রেসের সহিত 'ঐক্য' চাহিতেছেন! আবার মণিপুরে কংগ্রেসের ভোটে তৃণমূল সাত আসন পাইবামাত্র তিনি ঘোষণা করিতে বিলম্ব করেন নাই – ত্রিপুরায়ও 'তৃণমূলের নেতৃত্বে' ২০১৩-তে নাকি সরকার হইবে। নেতৃত্বে কংগ্রেস নহে, তৃণমূল! যেহেতু তৃণমূলের নেতা তিনিই, তাই আগামী সরকারের আগামী নেতার নাম বলিয়া দিবার দরকার নাই! 'বাম হটাও' স্লোগানে একমুখী, মুখে মুখে মমতামুখী, কিন্তু প্রকল্পে বহুমুখী!

অজয় বিশ্বাসের পি ডি এস কোমাচ্ছন্ন। মহিম সরণির কর্মচারী সমন্বয় কমিটিকে 'বাম-বিরোধী' মোর্চাভুক্ত করিয়া বকলমে কংগ্রেসের পেটে ঢুকাইতে চাহিয়াছিলেন তিনি। নিজে আগেই সংগঠনের বেড়া কাটিতেছিলেন, অতি চালাকিতে তাঁহারা এখন দ্বিগ্বিজয় ভবন হইতে উৎখাত হইয়া পোস্ট অফিস চৌমুহনির কংগ্রেস ভবনের পদতলে আশ্রয় লইয়াছেন। অজয়বাবুর কোনও স্বপ্ন সাকার হইবার পথ দেখা যাইতেছে না। তাঁহার ব্যক্তিগত বহুমুখী প্রকল্প ধূলিসাৎ! কংগ্রেসকে তিনি আর কী সাহায্য করিবেন!

কংগ্রেস যেমন দিল্লিমুখী, আই এন পি টি কিংবা অন্য উপজাতীয় দলছুটদের দলগুলিও তেমনি প্রায় সকলেই জঙ্গালমুখী! তাহাদের সকল আশা ভরসা, দর কষাকষির ক্ষমতা– সবই জঙ্গালনির্ভর। সেথায়ও আশার সঙ্কেত কম। বরং পিছন হইতে তাহাদের ঘর ভাঙিতে চেষ্টা চালাইয়াছে কংগ্রেসের উপজাতি ডিভিশন! এমন বন্ধু থাকিলে শত্রুর কী দরকার! এমতাবস্থায় 'আইয়া পড়তাছি'-র কী হইবে? এত আগে জলে নামিয়াই বিপদ হইয়াছে। না হইলে নাকে-মুখে-কানে এত জল ঢুকিতে পারিত না।

– কী ভাবিতেছ? হীরালালবাবুর ধমক খাইয়া বলিলাম -- কই, না স্যার। রিটায়ার্ড দারোগাবাবু বলিলেন, শুনো – দিল্লিমুখী হইবার পিছনে ত্রিপুরার যুবসূর্য সুদীপ বর্মনের মনে একটা ভিন্নমুখী প্রকল্প রহিয়াছে। ক্রমশ ইহা প্রকাশ্য। তাঁহার যুক্তি – উত্তরপ্রদেশ। বুঝিলে না তো? সুদীপ বলিতে পারেন বা দিল্লিকে বলাইতেও পারেন, 'মুলায়ম-অখিলেশ জনসমর্থন জিতিতে পারিলে সমীর-সুদীপ পারিবেন না কেন? তাঁহারা বাপ-পুত। উত্তরপ্রদেশে বাপ-পুতের সাফল্যে পুত মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছেন। ত্রিপুরায় কী করিতে হইবে আমি নিজের মুখে বলিব কেন?'

(প্রকাশ: ১২.০৩.২০১২)

আমাগো নন্দ

'করো কী, করো কী নন্দলাল' বলিয়া সকলে ডাক ছাড়িলেও রতনলাল দমিবার পাত্র নহেন! রাজ্যের জন্য, দ্যাশ-এর জন্য সর্বদাই তাঁহার পরান আকুলি-বিকুলি করে ইহা কে না জানে। এইবার জানা হইল বি-দ্যাশের জন্যও তিনি 'জান কবুল আর মান কবুল'। বি-দ্যাশটি হইল বাংলাদেশ। তাহাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যেন তাহাদেরই হাতে 'বিকৃত' না হয়, আমাগো নন্দলাল তাহা না দেখিলে দেখিবে কে!

বাংলাদেশ তাহাদের মুক্তিযুদ্ধের ৪০ বৎসর পূর্তি উৎসব করিবে। এই উপলক্ষে সেই দেশের সরকার উপমহাদেশের কিছু মানুষকে সম্মান জানাইবেন মনস্থ করিয়াছেন। সেই তালিকায় ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত শচীন্দ্রলাল সিংহের নাম আছে। তাঁহার ৮৫ বছরের বৃদ্ধা সহধর্মিণী লক্ষ্মী সিং ঢাকায় গিয়া সম্মান গ্রহণ করিবেন। শুনিলাম নাম রহিয়াছে ত্রিপুরার 'মহারানী' কংগ্রেস নেত্রী বিভুকুমারী দেবীরও। বাংলাদেশের জন্মের কিছুকাল আগে তিনি রাজপরিবারে বধূ হইয়া ত্রিপুরায় প্রথম আসেন। তাহাতে কী হইল! তিনি কংগ্রেস নেত্রী! কিন্তু তালিকায় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের নাম দেখিবামাত্র নাচিয়া কুঁদিয়া মাথার চুল ছিঁড়িতে শুরু করিয়াছেন রতনবাবু এবং তাঁহার দল কংগ্রেস। এমকি, ভারতের প্রধানমন্ত্রীকেও চিঠি লিখিয়া অনুরোধ করিয়াছেন – বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে চাপ দিয়া ত্রিপুরার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নাম কাটাইবার ব্যবস্থা করিতে!

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। ভারতের কোনও অঙ্গরাজ্য নহে। অঙ্গরাজ্যের সরকারও কাহাকে সম্মান জানাইবে – প্রধানমন্ত্রীব তাহাতে কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকার কাহাকে সম্মানিত করিবেন, কাহাকে করিবেন না– সম্পূর্ণতই তাহাদের ব্যাপার। কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপত্তিজনক কেহ না হইলে এই বিষয়ে অন্য কোনও দেশের কিছু বলিবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

কথা হইল, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধে ত্রিপুরার মানুষের বিপুল অবদান তো ইতিহাস-স্বীকৃত। সত্য কথা বলিতে কী, তখন এই রাজ্যের প্রায় প্রতিটি পরিবার কোনও না কোনওভাবে, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন।

কেবল নিজেদের জনসংখ্যার দ্বিগুণ সংখ্যক আর্ত শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়াই নহে, মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বতোভাবে সমস্ত রকম সহায়তা দিয়াছিলেন এই রাজ্যের সাধারণ মানুষ। এই পারের মানুষের আত্মীয় পরিজন, একদা ছাড়িয়া আসা প্রতিবেশী, পরিচিত বন্ধু-বান্ধবেরাই ওই পার হইতে কেহ শরণার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন, কেহ মুক্তিযোদ্ধা হইয়া প্রশিক্ষণ লইয়া রণাঙ্গনে গিয়া প্রাণ দিয়াছেন। কোনও রাজনৈতিক দল কিংবা কোনও সরকারের সিদ্ধান্তে নহে, ত্রিপুরাবাসীর এই স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ এবং সহমর্মিতা ছিল সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত।

মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ভূগোলের সীমা মানে না। তাই, এই পারে শোষিত নির্যাতিত মানুষের আন্দোলনের স্রোতও ওই পারের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্রোতে সেই দিন মিশিতে দেরি করে নাই। ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের খবর, নগুয়েন গিয়াপদের গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল সংক্রান্ত পুস্তক তাই সেদিন বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরে শিবিরে প্রেরণা জোগাইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নজরুল সুকান্ত জীবনানন্দ হইতে সলিল চৌধুরি, কিংবা মান্না দে অংশুমান দেবদুলালরা মুক্তিযোদ্ধাদের অন্তরে দেশপ্রেমের অগ্নিশিখা অনির্বাণ রাখিয়াছেন। তাহার পরেও, ত্রিপুরার সব অংশের মানুষ সেই দিন যেমন করিয়া আবেগে-অনুভবে-সর্বান্তঃকরণ সহযোগিতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত জড়াইয়া গিয়াছিলেন তেমন আর কোনও ভারতীয় প্রদেশের ক্ষেত্রে ঘটে নাই। এই মহতী ইতিহাসের স্বীকৃতি হিসাবেই ত্রিপুরার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে সম্মাননার সিদ্ধান্ত। এই সম্মাননা যে দলমত নির্বিশেষে ত্রিপুরার সমস্ত অংশের মানুষকেই নিবেদিত ইহা বুঝিতে রাজনীতি করিতে হয় না।

মানিক সরকার ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কতখানি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে এমন বালখিল্য প্রশ্ন উত্থাপনের অর্থ – সমগ্র বিষয়টিকে বিপথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা মাত্র। সম্প্রতি বাংলাদেশের সম্পর্কে যে 'নতুন দিগন্ত' (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-র ভাষায়) উন্মোচিত হইতেছে, এই ক্ষেত্রে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের অবদান ভারত সরকারেরও অজানা নহে। ত্রিপুরার সকল অংশের মানুষের আবেগই পিছন হইতে মুখ্যমন্ত্রীকে এই অসামান্য ভূমিকায় আগাইয়া দিয়াছে।

ইহাতেই সন্ত্রস্ত রতনলালেরা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ত্রিপুরা সফরে ত্রিপুরাবাসীর সেই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের চেহারা দেখিবার পর হইতে তাঁহারা কেবল তেরো-র দুশ্চিন্তায় মুখ্যমন্ত্রীকে হেয় করিতে আদা-জল খাইয়া লাগিয়াছেন। মানিক সরকারকে সম্মান জানাইবার অর্থই যে ত্রিপুরার মানুষকে সম্মান জানানো – এই নিষ্ঠুর (!) সত্যই মানিতে পারিতেছেন না তাঁহারা। এই জন্যই, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও টানিয়া আনিয়াছেন সি পি এমের ভূমিকার প্রসঙ্গও।

ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবেই। শরণার্থীদের জন্য সীমান্ত খুলিয়া রাখিবার যে সিদ্ধান্ত শচীন্দ্রলাল সিংহ পালন করিয়াছিলেন, তাহাও কি তিনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবেই করেন নাই? কংগ্রেস দল তো যুদ্ধ ঘোষণাও করে নাই, সীমান্তও খুলিয়া দেয় নাই! সি পি এম তখন 'চীনের পক্ষ লইয়াছিল'-- এমন ইতিহাস-বিরোধী, আজগুবি এবং এই আহাম্মক-মার্কা তথ্য আসিল কোথা হইতে? চীন তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কোনও পক্ষেই ছিল না। বরং ইদানীংকালে-- দিল্লির কংগ্রেস নেতৃত্বের সরকার যেই আমেরিকার তাঁবেদারি করিতেছেন, সেই আমেরিকাই সেদিন পাক হানাদার বাহিনীর পক্ষ লইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ধ্বংস করিতে, ভারতের বিপক্ষে বঙ্গোপসাগরে পরমাণু অস্ত্রবোঝাই সপ্তম নৌবহর পাঠাইয়াছিল। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বাধীন সোবিয়েত ইউনিয়ন ভারতের পক্ষে দাঁড়াইয়া পাল্টা হুঁশিয়ারীতে আমেরিকার নৌবাহিনীকে পিছু হটিতে বাধ্য না করিলে ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশ-এর জন্ম হইত কি?

তবে হ্যাঁ, সম্মাননার তালিকায় আরও অনেক শ্রদ্ধেয় নাম থাকিলে সকলেরই ভাল লাগিত সন্দেহ নাই। কিন্তু, এই তালিকা প্রস্তুত করিবে কে? বাংলাদেশ সরকার ভারতকে এই তালিকা প্রস্তুত করিতে বলে নাই। ত্রিপুরা সরকারও বানায় নাই। বাংলাদেশের এই সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি তাহাদের মহাফেজখানা ঘাঁটিয়া, সম্ভাব্য সমস্ত দিক বিবেচনায় রাখিয়াই এই তালিকা প্রস্তুত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিশ্বে বাঙালির একমাত্র রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং চিন্তাবিদেরা এতই নির্বোধ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন যে ত্রিপুরার সি পি এম নেতাদের নির্দেশে বা প্রভাবে তাঁহারা সম্মাননার তালিকা প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন? রতনলালেরা যাহা বলিতেছেন, যাহা লিখিতেছেন, প্রচার করিতেছেন, ত্রিপুরার মানুষের আবেগ লইয়া যে ফাটকা খেলা খেলিতেছেন, তাহাতে বাংলাদেশের কাছে ত্রিপুরার তথা ভারতের আত্মসম্মান কতখানি বজায় রহিল একবার ভাবিলেন কি? ভোটের জন্য বিদেশের কাছে দেশকে ছোট করিতেও বাধিবে না? নিজেদেরও আত্মসম্মানে লাগিবে না?

এতক্ষণে, চিন্তা-গিন্নি বলিয়া উঠিলেন, ধুত্তোর! 'তেরো' না থাকিলে আত্মসম্মানে কী হইবে! আত্মসম্মান সাধারণ মানুষের দরকার, কংগ্রেস নেতাদের দরকার ভোট। তবে, বিরোধী নেতা ভোটের রাজনীতিতেও 'নন-ইস্যু'কে ইস্যু করিতে যাইয়া প্রতিবার শেষমেশ কংগ্রেসকেই ডুবাইতেছেন। সুবিধা করিয়া দিতেছেন সি পি এমকে। হ্যাঁ গা, তিনি আসলে কাহার? তিনি রতনলাল? না 'লাল রতন'?

(প্রকাশ: ১৯.০৩.২০১২)

আফান্দির ফন্দি

এতদিন জানিতাম, চিন্তা-গিন্নি বড়ই দুর্বল বলিউডের এক সুপারস্টারের প্রতি। মনে মনে হিংসা করিতাম ওই নাক-মোটা ন্যাকা খানকে। কিন্তু সন্দেহ, ইদানীং তাঁহার স্টার-প্রেম মুম্বই হইতে দিল্লির কক্ষপথে ঘুরঘুর করিতেছে। দিল্লির মিনিস্টাররা নামেই 'মিনি', কামাই-কর্মে মহা-'ম্যাক্সি', টিভি-মাধ্যমে গিন্নিরও মনোহরণ করিয়াছেন। কী বুদ্ধি তাঁহাদের! গিন্নি যত মজিতেছেন ততই মজাইয়া ছাড়িতেছেন বেচারা চিন্তাচরণকে। এই 'নির্বুদ্ধির ঢেঁকি' যে কোনও কর্মেরই নহে, লোকের গাল-মাথা সাফাই করিতে করিতে ক্ষুর-কাঁচি হাতে এই সেলুনেই যে তাহাকে মরিয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে, এবংবিধ বিষয়ে গিন্নির কোনও সন্দেহ অবশিষ্ট নাই। ভাতের থালা সামনে ফেলিয়া বড়ই অনাদরের কণ্ঠে কহিলেন, পোলাপানের ইশকুল বন্ধ কর। পেটের ভিতরে থাকিতেই এখন সকলের এইট কেলাস পড়া কমপ্লিট! কেহ রহিবে না আর ঘরে 'অ-শিক্ষাগত'! বি পি এল কার্ড উনুনে ফেলিব। দ্যাশে আর দরিদ্র নাই! দারিদ্র্যসীমার রশি এমন নামাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, সকলেই চন্দ্রপৃষ্ঠে হাঁটিবার মতন অনায়াসে পার হইতে পারিবে। কেবল অনাহারে না মরিলেই চলিবে, সকলেই দারিদ্র্যের ঊর্ধ্বে থাকিবে! আহা-হা, কী আশ্চর্য ফন্দি বাহির করিয়াছেন দিল্লির মিনিস্টারবৃন্দ, আফান্দিও লজ্জায় গল্পের বইয়ের পাতা হইতে একলাফে অদৃশ্য হইবেন!

আফান্দি। কোথাও তাঁহার নাম মোল্লা নাসিরুদ্দিন। গিন্নি ভাতের থালার পাশে ছোট্ট রেখা টানিয়া বলিলেন – ইহাকে না ছুঁইয়া ছোট করিয়া দিতে পারিবে? গল্পটি জানি। তবুও – জবাবে 'না' বলিলাম। গিন্নি ছোট-র পাশে আরেকটি বড় রেখা টানিয়া বলিলেন— দেখ, আগেরটা ছোট হইয়া গেল। দিল্লির সরকার দারিদ্র্য আর অশিক্ষা দূরীকরণে এই আফান্দির ফন্দি গ্রহণ করিয়াছে। দারিদ্র্য অশিক্ষা যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল, কিন্তু সংখ্যার হারে 'ছোট' হইয়া গেল! সত্যই, কী অত্যাশ্চর্য বাহাদুরি।

বুঝিলাম, দরিদ্ররা এতকাল যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাইতেছিলেন, দিল্লির সরকার আর তাহা দিতে রাজি নহেন। যোজনা কমিশন বলিয়া দিয়াছে – দিনে ২২ টাকা ৪৩ পয়সা খরচ *করিতে পারিলেই গ্রামে কেহ আর বি পি এল কার্ড পাইবে না।* শহরে দিনে ২৮ টাকা ৬৫ *পয়সা খরচ করিতে পারার অর্থ তিনিও আর দরিদ্র নহেন!* দৈনিক ২২ টাকা ৪৩ পয়সা অর্থাৎ মাসে ৬৭২ টাকা ৮০ পয়সা! এই ৬৭২ টাকা দিয়া সারা মাসে গোটা পরিবারের

পেটভরা খাদ্য, জামাকাপড়, বাসস্থানের খরচ, চিকিৎসা, লেখাপড়া, যাতায়াতের খরচ? যাঁহারা বলিতেছেন তাঁহারা কি সুস্থ না কি বদ্ধ উন্মাদ? প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন অর্জুন সেনগুপ্ত। তাঁহার রিপোর্টে প্রকাশ – এই দেশে এখন ৭৭ শতাংশ মানুষ দরিদ্র। কেন্দ্রের সরকার যোজনা কমিশনের নতুন মাপকাঠিতে তাহা '২৯ শতাংশ' দেখাইতে চাহিতেছে। অর্থাৎ, দেশের জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশ (প্রায় অর্ধেক) মানুষকে 'দরিদ্র' হিসাবে প্রাপ্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিবার উদ্যোগ! ইঁহারা না খাইতে পাইয়া রাস্তায় পড়িয়া মরিলেও দারিদ্র্যের 'তাপস' এবং আত্মমর্যাদা হইতে বঞ্চিত হইবেন। ইঁহাদের মৃতদেহ চোর, বদমাশ, ভিক্ষুক, ভবঘুরে অথবা অন্য যে-কোনও পরিচয়ে সৎকার করা যাইবে। কিন্তু, কিছুতেই 'দরিদ্র' বলা যাইবে না!

কেন্দ্রের কংগ্রেস-চালিত বুদ্ধিমান মন্ত্রী-মহামন্ত্রীদের সরকার দেশে গণবন্টন ব্যবস্থা বিলোপ করিতেছে। দরিদ্রদের রক্ষার জন্য চালু থাকা মাত্র ১২৫ হাজার কোটি টাকার ভর্তুকি তুলিয়া দিতে চাহিতেছে, কিন্তু বড়লোকদের ৫ লক্ষ কোটি টাকার করছাড় দিতে তাহারা কিঞ্চিৎমাত্র বিবেক-দংশনও বোধ করিতেছে না। বরং নানান ফন্দি-ফিকির বাহির করিয়া ফাঁকের ফাঁকি ভরাট দেখাইতে ব্যস্ত দিল্লির 'মিনিস্ট্রি' তথা 'ইকনমিস্ট্রি'-র বিদগ্ধ সেবাইতেরা।

গিন্নি কতক্ষণ ধরিয়া গোপনে বুদ্ধি পালিশ করিতেছিলেন কে জানে! চোখ নাচাইয়া বলিলেন, ২২-২৩ টাকার কী দরকার। দিল্লির সরকার সকলকে একটি করিয়া 'আলাদিনের প্রদীপ' ফ্রি-তে দিলেই সব ল্যাঠা চুকিয়া যাইবে। যা দরকার প্রদীপে ঘষা লাগাও, অমনি হাজির! এক টাকাও খরচ নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বন্ধ হইবে। দিল্লির মন্ত্রীদেরও অতশত বুদ্ধি করিয়া লক্ষ-কোটি টাকা আত্মসাৎ করিতে হইবে না! তিহার জেলে ঘাস উঠিবে। হ্যাঁ গা, অ্যামোন হইলে ক্যামোন হয়?

– অতি চমৎকার হয়! কিন্তু, আলাদিন নিজেই তো তাহার প্রদীপ হারাইয়া আলো খুঁজিতেছেন। অন্ধকার ঘনাইয়া তুলিবার চেষ্টাতে বিরাম নাই এই রাজ্যেও। দিল্লির এই হানাদারি, ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, গরিব নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্তের ওপর প্রতিদিনের এই আক্রমণ রোধ করিবে কে? এই উদারীকরণ, বেসরকারিকরণের কালা ঘোড়া থামাইবে কে? মনে হয় একমাত্র বামশক্তিই সেই শক্তির উৎস। ক্ষুদ্র ত্রিপুরার একটিমাত্র বামপন্থী সরকারই দেশব্যাপী গণপ্রতিরোধে ইন্ধন জোগাইতে পারে, প্রেরণা জোগায়। গিন্নি, সেই কারণেই আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হইতেছে এই সরকারের কেন্দ্রস্থলের দিকে। কেন্দ্রটি হইলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। সমস্ত ইট পাথর ঢিল পাটকেল আর কাদার ঢেলা ছুঁড়িয়া মারা হইতেছে তাঁহারই ধবধবে সাদা জামা তাক করিয়া। তাঁহার কুশপুতুল পোড়াইয়া কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা যতই খুশ-নৃত্য করিতে থাকুন, ত্রিপুরার হুঁশ মানুষেরা বে-হুঁশ হইবেন কী করিয়া! তাঁহারা যে সব দেখিতেছেন, সব বিচার করিতেছেন, সব কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন। স–ব।

(প্রকাশ ঃ ২৬.০৩.২০১২)

চুপ কেন

হে ত্রিপুরার মান্যবর রাজ্যপাল মহোদয় মহামহিম। খুবই বিচলিত, হতাশ-বিরক্ত-ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ চিত্তে একটি অসম্পূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন সম্পূর্ণ করিতে চিন্তাচরণের স্কন্ধে ভর করিয়াছি। পত্রিকায় পড়িয়াছেন নিশ্চয়ই। অথবা টিভিতে দেখিয়াছেন। সাংবাদিক সম্মেলনটি অসম্পূর্ণ, কারণ মনের সব কথা বলিতে পারি নাই। হেথায় বলিব। তবে, অসম্পূর্ণ-তে মোদ্দা কথা যাহা বলিয়াছি, অবশিষ্টাংশের প্রাক্‌কথনেও তাহাই বলিব। জিজ্ঞাসা আপনাকে। কংগ্রেসের তরফে, একজন অত্যুজ্জ্বল সম্ভাবনাময় (লোকে বলে) সীমান্ত সুরক্ষা-নেতা (আপাতত সোনামুড়ায় নিজের কেন্দ্রে সুরক্ষাহীন, লোকে বলে), বিধানসভায় সবচেয়ে বিত্তশালী জনপ্রতিনিধির তরফে। হে মহামহিম, জিজ্ঞাসা আপনাকে, আপনি চুপ কেন?

আপনার বিস্মৃতিতে আমরা বিস্মিত। আপনি আপন-পর ভুলিয়াছেন। নিজের রাজনৈতিক ঘর-ঘরানা ত্যাজিয়াছেন। মানিক সরকারে মজিয়া দিনানিশি বাম ভজিতেছেন। বিধানসভার সদ্য-সমাপ্ত বাজেট অধিবেশনে আপনার উদ্বোধনী ভাষণ শুনিয়া মনে হইতেছিল কেহ বুঝি কানের ভিতরে গলন্ত সিসা ঢালিয়া দিতেছে। ছি ছি। বাম সরকারের এত প্রশস্তি করিতে আছে? না হয় কিছু ভাল কাজ করিয়াছে, শান্তি ফিরাইয়াছে, উন্নয়ন হইতেছে, অভাব দূর হইয়াছে। কিন্তু, তাই বলিয়া 'আমার সরকার' বলিায় এত আহ্লাদ প্রকাশ কেন? গুটিকয় ক্ষেত্রে 'দেশের সেরা' পুরস্কার পাইলে এমন কী হইল? কী বলিতেছেন? আপনি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান? সরকারের কাজকর্মের ফিরিস্তি দিবার থাকিলে দিবেন না কেন? কী যে বলেন মহামহিম! এত পড়িয়াছেন, এত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চালাইতেছেন, গোপাল গান্ধীর বাংলা-পাঠশালে পড়েন নাই দেখিতেছি!

বামফ্রন্টের চরম অপশাসন লইয়া কত কথা বলিয়াছি। কত সাক্ষাৎ করিয়াছি। কত ডেপুটেশন দিয়াছি। চা-বিস্কুট খাইয়াছি। রাষ্ট্রপতির শাসন চাহিয়াছি। হস্তক্ষেপ, পদক্ষেপ মাগিয়াছি। আপনার মন মজিল না? কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে কড়া করিয়া বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে কেবল কয়েকখানা পত্র, ইহাও কি আমরা আশা করিতে পারি না? আগে, আশা ছিল,

ভালবাসা ছিল। আজ আশা নাই, ভালবাসাও নাই। আপনি *দেখিয়াও দেখিতেছেন না,* শুনিয়াও শুনিতেছেন না! এত বধূ *নির্যাতন, নারী ধর্ষণ! বলিতেছি! শুনিতেছে কে! তিন* স্তর পঞ্চায়েত, ভিলেজ কমিটিতে নারীরা ফিফ্‌টি পার্সেন্ট। রাজ্যের সত্তর ভাগ নারীর লালঝান্ডা-ধারণ, কী করিয়া সহ্য করিতেছেন মহামহিম? 'মন্ত্রীরা চোর' বলিলে সব রাজ্যের মানুষ গপাগপ্‌ খায়। ত্রিপুরায় খায় না। লোকে উল্টা দিল্লির কেলেঙ্কারি বমি করে। নিজের কাপড় বাঁচানোই দায়! বলিতেছি দলবাজি, স্বজনপোষণের কথা। লোকে মানে না। তাই বলিয়া আপনিও মানিবেন না? আপনি কি বামফ্রন্টের এজেন্ট হইয়া গেলেন মান্যবর? দিল্লি আপনাকে নিযুক্ত করে নাই? আমাদের দল দিল্লি সরকারের নেতৃত্ব করিতেছে না? তাহার পরও আপনি চুপ? কেন?

এই যে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের কথা বলি। মহামহিম, আপনি তো সম্পূর্ণ অবগত, আমাদের দলের কোনও মূর্তি ইঁহার সততা, দক্ষতা, বাগ্মিতা, ব্যক্তিত্ব, সর্বোপরি আদর্শবাদিতা এবং নিট-ফলত অসম্ভব জনপ্রিয়তাকে স্পর্শও করিতে পারিবেন না। আমরাও আলবাত জানি। আমাদের দলে কেহ কষ্টে-সৃষ্টে (আমার মতন) নেতা হইয়া পড়িলে তাহাকে নিত্য সার্কাসের ট্রাপিজের খেলা খেলিতে হয়। এই হাত ছাড়িয়া ওই পা ধর। আবার ডিগবাজি খাইয়া কাহারও কাঁধে অথবা পিঠে ঝাঁপাইয়া পড়! প্রতিক্ষণে পড়িয়া মরিবার ভয়। নিজে এইবার সোনামুড়া ছাড়িয়া সাব্রুমে যাইবার বাসনা করিতেছি। সোনামুড়া আর সোনামুড়াতে নাই স্যার! বক্সনগরে বিল্লাল হটাইতে তফাজ্জলের সভায় গিয়া দেখিলাম— আমি একা! সকল নেতাই তলে তলে ভিন্ন তালে! ধুত্তোর, মাঝে মাঝেই মনে হয় রাজনীতি না করিয়া কেবল বাগান করি!

তো, এই মানিক সরকারের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হইতে থাকিলে আমাদের উপায় কী মহামহিম। ভাবিয়াছিলাম, বাংলাদেশে যাইতেই দিব না। হট্টগোল মন্দ হয় নাই। কিছু সুশীলকে দিয়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়াছি : সব বুমেরাং হইল। আমরা আমাদের রাজ্যের তথা দেশের মুখ নাকি কালা করিয়াছি! দিল্লিতেও আমাদের দলের অনেক বড় নেতা ইহাতে খুবই অসন্তুষ্ট। আমরা কি অতশত বুঝি? সুশীল-বন্ধুরাও বুঝিলেন না? এখন তাঁহারা ডুব মারিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী গেলেন। সম্মাননা গ্রহণ করিলেন। দুই দেশের মৈত্রীর কথা বলিলেন। ফিরিয়া আসিয়া ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশে সেই সম্মাননা উৎসর্গ করিলেন। নায়ক হইতে গিয়া খলনায়ক হইলাম। আমরা এবং সুশীল-সখাবৃন্দ! তবুও আপনি চুপ?

মহামহিম, একটানা বামফ্রন্ট সরকার, আবার? ইহা কি গণতন্ত্রের জন্য ভাল? আপনি জানেন না বুঝি—একটানা ভাল কখনও ভাল নহে। মাঝে মধ্যে খারাপ, খুবই খারাপ, জোট

আমল হইতেও খারাপ দরকার। তখন ভাল-কে 'আরও ভাল' মনে হইবে। মাঝখানে 'খারাপ'-এর রিলিফ-সিনে আমাদের ভাল হইবে, আশা পুরিবে! জনগণ জাহান্নামে যাক (শ্ শ্, সাংবাদিক বন্ধুরা কেহ শুনিবেন না)। মান্যবর, এখনও ক্ষীণ আশা মনে। এই আশা বড় কুহকিনী। দেরির যাতনা আর সহে না। দিবস গনিয়া গনিয়া বিরলে নিশিদিন, আর কত! ভাবিয়াছিলাম 'পশ্চিমবঙ্গ' দেখাইব। এখন সি পি এম উল্টা আমাদিগকে পশ্চিমবঙ্গ দেখাইতেছে। যতদিন যাইতেছে, আশা দূর মিলাইতেছে মহামহিম। তবুও চুপ থাকিবেন? দাঁড়ান, কমপ্লেন করিতে হইবে! কিন্তু, হায় কমপ্লেন শুনিবে কে!

ওপরের লিখিত বিবৃতি পাঠ সমাপ্ত হইতেই উপস্থিত সাংবাদিকেরা বলিলেন, 'আমাদের আর কোনও জিজ্ঞাসা নাই!'

(প্রকাশ : ০২.০৪.২০১২)

ম্যান, মেশিন

ভোট আসিতেছে। নোট ডাকিতেছে। ঠোঁট ভিজিয়া উঠিতেছে। গাছের কচি আমে ভাল করিয়া টক আসে নাই। অ-কালবৈশাখীর লিলুয়া তুফানে সেই আমের কড়া টুপটাপ ঝরিতেছে। না-টক আমে টক-ডাল জমিতেছে না। টাক্কাতুলসীর মুগডাল কিংবা জিরানিয়ার মুসুরি অথবা বাংলাদেশের সম্মাননা -খেসারি— যাহাই হউক! বরং টক খাইতে গিয়া 'না-টক নাটক' স্বাদে জনতার জিহ্বা কিঞ্চিৎ সিক্ত হইলেও মন অধিকতর তিক্ত হইবার চান্স বাড়িতেছে।

বিশালগড়ের হারানো 'গড়'-এ যাতায়াতের গাড়িতে গদি-ঠেস বসিয়া মনে মনে তিনি হাসেন। বেচারা সুরজিৎ-বীরজিৎ-রতনলাল আর গোপাল-সুবলেরা রন্ধন করিবে কী, ভাল করিয়া খুন্তি ধরিতেই শিখিল না! অতএব, 'আমি শ্রীশ্রী ভজহরি মান্না' বলিয়া তিনি নিজেই রতনলালের হাতের খুন্তি (মানে কলম) কাড়িয়া লইলেন। 'লাখে এক' চিঠি লিখিলেন (রতনলালের লাখ, তাঁহার এক) সরাসরি ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বরাবরে! কংগ্রেস-এর নাম একবারও লইলেন না, কেন কে জানে! বলিলেন— 'আমরা বিরোধী দল'। নিজে সেই দলটার কে হন তাহা-ও লিখিলেন না। কেবল ছোট্ট করিয়া লিখিলেন 'এক্স চিফ মিনিস্টার'!

সি পি এম নেতারা যদি সর্বত্র বক্তৃতায় এখনও 'জোট আমল' টানিতে পারেন, তিনিও সম্মুখে 'এক্স' বসাইয়া 'চিফ মিনিস্টার' লিখিতে পারেন! তবে চিঠির বিষয়বস্তু বড়ই চিত্তাকর্ষক। লিখিয়াছেন, গত কয়েকটি বিধানসভা নির্বাচন সমেত রাজ্যের সমস্ত নির্বাচনে যেই সব ই-ভি-এম (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) ব্যবহার করা হইতেছে সেইগুলি বদল করিয়া নতুন ই-ভি-এমে '১৩-র ভোট করিতে হইবে। কারণ, এই সব নির্বাচনে ভোটিং মেশিনে কারচুপি করিয়া, রিগিং করিয়া শাসক দল জিতিয়া আসিতেছে। রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের অধীনে এই সব মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ করা হইতেছে। শাসক দলের সংগঠন কর্মচারী সমন্বয় কমিটির লোকেরাই এইগুলি ব্যবহার করিয়া থাকে। আর রাজ্যের ইঞ্জিনিয়াররাও শাসক দলের লোক। তাই সহজেই মেশিনগলিতে কারচুপি করা হইতেছে। সম্প্রতি

পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে যেসব মেশিনে ভোট করিয়া কমিশন সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন, সেই রকম মেশিনে ত্রিপুরায় ভোট করা হউক। 'লাখে এক' চিঠি না বলিয়া উপায় আছে? বিরোধী নেতা রতনলাল নাথ দুঃখ করিবেন না। এত এত তথ্য পরিসংখ্যান জমা করিয়া, এত গাদা গাদা চিঠি লিখিলেন, এমন একটিও লিখিতে পারিলেন কই! 'ইস্যু-রন্ধন' ছাড়িয়া তাঁহার ক্রন্দন করিতে বসাই স্বাভাবিক।

সম্বোধনের নিচে চিঠির সাবজেক্ট-এ লিখিয়াছেন, "ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন 'সেফার ই ভি এম' দিয়া করিবার অনুরোধ"। শুনিবামাত্র চিন্তা-গিন্নি ইসকুলের ইংরাজি গ্রামার মুখস্থ বলিলেন 'সেফ-সেফার-সেফেস্ট'। ইহার পরেই ফোড়ন কাটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সেফার' কেন? 'সেফেস্ট' মেশিনগুলি আমেরিকার 'এক্স প্রেসিডেন্ট' বুশ-এর সেই কুখ্যাত নির্বাচনের পরে এখনও বুঝি ফেরত আসে নাই। নাকি, আবার কোনও দিন সুযোগ আসিলে মজলিশপুর, ফটিকরায় কিংবা সিমনা-র মতো 'নির্বাচন' করিতে দেশেই কোথাও সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে? হায় হায়, তখন যে ই-ভি-এমে ভোট হয় নাই কে বুঝাইবে। গিন্নিকে থামাইয়া হঠাৎ খেয়াল হইল— পত্রদাতা এক্স স্যার নিজেই নিজের গর্ত খুঁড়িয়া ফেলিয়াছেন এক পত্রে দুইরকম লিখিয়া সত্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এক্স-চিফ মিনিস্টার বলিয়া ফেলিয়াছেন — আগের মেশিনগুলিও 'সেফ', মানে নিরাপদ। এবার 'সেফার' (আরও নিরাপদ) মেশিন চাহিতেছেন তিনি। আগের মেশিন 'সেফ' হইলে রিগিং এর গপ্পো শুনিয়া তো 'কুছ হজম নেহি হুয়া' বলিতে হয়।

আবারও গিন্নি মুখ ফসকাইলেন। হ্যাঁ গা, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নাম কি বাবুরাম সাপুড়ে? (কী বিদঘুটে প্রশ্ন!) এক্স চিফ মিনিস্টার গত নির্বাচনে জনগণের ক্রোধের ছোবল খাইয়া ই ভি এম মেশিনকে 'বিষধর সাপ' ভাবিয়া ভয় পাইতেছেন। তিনি সেই ছড়াটাই তো লিখিয়া দিলে পারিতেন। মুখস্থ নাই বুঝি? 'যে সাপের চোখ নেই নাক নেই/ছোটে না কি হাঁটে না/কাউকে যে কাটে না/করে নাকো ফোঁস ফাঁস/ মারে না কো ঢুঁশঢাশ/সেই সাপ জ্যান্ত/গোটা দুই আন তো ।' ভাবিলাম, ঠিকই তো। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বাবুরাম সাপুড়ে হইয়া কয়েকশত নির্বিষ ভোটের মেশিন ত্রিপুরায় পাঠাইতেই পারেন। জনগণের ঘৃণার ছোবলকে এই সব মেশিন 'ভালবাসা'-য় পরিণত করিবে, জনতার বর্জন-কে 'অর্জন', প্রত্যাখ্যান-কে 'বিপুল সমর্থন' বানাইয়া দিতে পারিবে। এমন 'সেফার' কিংবা 'সেফেস্ট' ই ভি এম না হইলে এক্স-চিফ যে নিজের এবং তাঁহার দলের কোনও ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেছেন না। পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের মতন 'চমৎকার ফল-দায়ক' মেশিন না পাঠাইলে যে কিছুতেই কিছু হইবে না।

ত্রিপুরায় সরকারি কর্মচারীদের ৯০ শতাংশই সমন্বয় কমিটির সহিত যুক্ত। এক্স-চিফ ইহাদের

কস্মিনকালেও বিশ্বাস করেন নাই। নির্ভর করেন নাই। কখনও করিবেন না। পুলিস তো তাঁহার চক্ষুশূল। ১৯৯২-এর পর হইতে পুলিসের পোশাক নজরে পড়িলেই ক্রোধ সংবরণ করিতে স্যারের বড় কষ্ট হয়। জানিতাম। এইবার জানিলাম — ইঞ্জিনিয়াররাও 'সি পি এমের এজেন্ট'। ভাবিতেছি — পাহাড়, সমতলের সব মানুষই তো একটানা সব ভোটে বামেদের বেশি ভোট দেন। দিয়াই চলিয়াছেন। 'ম্যান বিহাইন্ড দ্য মেশিন'-এ যখন গন্ডগোল, তখন মেশিন বদলাইয়া কী হইবে? ত্রিপুরার সকল মানুষ, অন্তত ভোটার-মানুষগুলিকে সম্যক বদলাইবার অনুরোধ পাঠাইলে কেমন হয়? যন্ত্র-বদলের বদলে মনুষ্য-বদল? 'সেফার মেশিন'-এ নিশ্চিত হইবেন কী করিয়া স্যার? 'সেফার হিউম্যান', মানে নিরাপদ মানুষই আপনাদের নিরাপদ থাকিবার চিরকালীন গ্যারান্টি হইতে পারে!

(প্রকাশ ঃ ০৯.০৪.২০১২)

সেই সুর

ফাটাফাটি গান। কিন্তু ফাটিল না! জ্বালা-জ্বালা কথামালা। কিন্তু জ্বলিল না! মাঝখানে ৩২ বৎসর। ১৯৮০-তে তৈদু-র আসরে গাহিয়াছিলেন 'রাজমাতা'। এইবার, ১০ এপ্রিল ২০১২-তে আস্তাবল ময়দানে গাহিলেন তাঁহারই পুত্র, নাই-রাজত্বের 'রাজাধিরাজ' স্বয়ং। ভাষা এক, সুর এক। 'এই মাটি আমাদের। ছাড়িব না'!

বত্রিশ বৎসর পূর্বে যিনি তৈদুতে রাজমাতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া 'স্বাধীন ত্রিপুরা' গড়িবার ঘোষণা দিয়াছিলেন, এখনও তিনিই 'মহারাজা'-র পার্শ্বে। রাজত্ব উদ্ধারের শিঙাতে ফুঁ দিয়া চলিয়াছেন। ধন্য বিজয়কুমার রাঙ্খল। ধন্য তাঁহার রাজভক্তি। কিন্তু, কীমাশ্চর্যম, ১৯৮০-র মতো এইবার কোনও উপজাতি তরুণের অন্তরে আগুন লাগিল না, রাজা-র কোনও অশ্ববাহিনীর খুরে টগবগ ধ্বনি উঠিল না! কেবল আস্তাবলের বৃষ্টিস্নাত বাতাস রাজ-দীর্ঘশ্বাসে ভারী হইল। আর, উল্টাদিকের আকাশবাণী ভবনে কিশোরকুমারের রেকর্ড বাজিয়া উঠিল, "পৃথিবী বদলে গেছে, যা দেখি নতুন লাগে/তুমি আমি একই আছি, দুজনে যা ছিলাম আগে ...!"

এই 'একই আছি'-টা তো ভাল লক্ষণ নহে। 'পরিবর্তন'-এর জন্য সকলের আগে নিজেদের পরিবর্তন করিতে হইবে না? বলিয়া উঠিলেন চিন্তা-গিন্নি। ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া কহিলাম, ১৯৮০-র শুরুতে তৈদু-তে বসিয়াছিল ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির কেন্দ্রীয় সম্মেলন। কংগ্রেস নেত্রী রাজমাতা 'এই মাটি আমাদের' বলিয়া উদ্ধারের ডাক দিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, হরিনাথ দেববর্মা, নগেন্দ্র জমাতিয়া, রতিমোহন জমাতিয়া, বিজয়কুমার রাঙ্খল, রবীন্দ্র দেববর্মারা তখন তরুণ। 'এই মাটি আমাদের', সুতরাং ১৯৪৯-এর পরে ত্রিপুরায় আগত বাঙালিরা 'বিদেশি' ঘোষিত হইলেন। ইহাদের বিতাড়নের জন্য প্রথমে 'বাজার বয়কট' কর্মসূচি। তাহার পর ভয়াবহ দাঙ্গা। মান্দাই, বুরাখা, হদ্রা-শিলঘাটির গণহত্যা। বিজয় রাঙ্খলরা 'স্বাধীন ত্রিপুরা'-র মানচিত্র এবং স্বাধীন সরকারের মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন। সশস্ত্র ত্রিপুরা-সেনা, টি এন ভি জঙ্গি-বাহিনী গড়িলেন। হত্যা, গৃহদাহ চালাইলেন। ইহার পর হইতে একের পর এক জঙ্গি বাহিনীর নাম। রক্তে রক্তে ভিজিতে থাকা 'আমাদের মাটি'

শুকাইতে না দেওয়া। ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি ভাঙিতে ভাঙিতে প্রধান অংশটি এখন আই এন পি টি। বিজয় রাঙ্খল তাহার সভাপতি। আজ অবধি তিনি তাঁহার জঙ্গি-বাহিনীর হত্যালীলার জন্য কোনও দুঃখ কিংবা অনুশোচনা প্রকাশ করেন নাই। ক্ষমা প্রার্থনা বহু দূরে। ১০ এপ্রিল তাঁহাদেরই সমাবেশে 'বড়ো-বরক-ত্রিপুরি ভাই ভাই' বলিয়া হাতে হাত মিলাইয়া এই অঞ্চলের ভূমিপুত্রদের লড়াই করিতে ডাক দিলেন 'রাজাধিরাজ'।

সেই এক সুর! আশির দশকে আসাম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যের উপজাতি তরুণদের বিপথে ঠেলিবার সেই তত্ত্ব। কুখ্যাত 'অপারেশন ব্রহ্মপুত্র প্রজেক্ট' এই তত্ত্বকেই ওপরে তুলিয়া বিচ্ছিন্নতাবাদে ইন্ধন জোগাইয়াছিল। দেশের এই অংশকে লইয়া নতুন 'ট্রাইবাল রাষ্ট্র' গঠনের ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখাইয়াছিল। ত্রিপুরায় ১৯৮০-র দাঙ্গা এবং ইহার পরবর্তী জঙ্গি কার্যকলাপ তাহারই ফল। কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না, কংগ্রেস দল, বিশেষ করিয়া ত্রিপুরায়, বিচ্ছিন্নতাবাদ-এর বিরুদ্ধে কখনও স্বচ্ছ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে নাই। বরং, উপজাতি যুব সমিতি এবং পরে আই এন পি টি-র সহিত নির্বাচনী জোট করিয়া এই মারাত্মক প্রবণতাকে কেবলই প্রশ্রয় দিয়াছে। উৎসাহিত করিয়াছে। কংগ্রেস কিছুতে সেই পথ ছাড়িতে পারিতেছে না বলিয়াই এক বড় অংশের মানুষের সমর্থন পুনরুদ্ধার করিতে পারিতেছে না।

আবারও কি দাঙ্গার উস্কানি? চিন্তা-গিন্নির এই উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসার উত্তরে জোরে শোরে 'না' বলিতে পারিলে খুশি হইতাম। কিন্তু 'হ্যাঁ'-ও বলিলাম না। ভাবিলাম— ত্রিপুরায় বাম সরকার এবং স্বশাসিত উপজাতি জেলা পরিষদ উপজাতিদের উন্নয়নে বিপুল কর্মযজ্ঞ করিতেছে। শান্তি ফিরিয়াছে বহু কষ্টে। ফলে, পাহাড় কন্দরের কোণে কোণেও দ্রুত রাস্তাঘাট শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও অন্যান্য পরিষেবা ছড়াইতেছে। ইহা সকলেই দেখিতেছেন। এই বিষয়ে কোনও বিতর্ক হইতে পারে না। আসল কথা, উপজাতি-অনুপজাতি একতা না থাকিলে এই সমস্ত কর্মকাণ্ড এমনকি কোথাও উন্নয়নই সম্ভব হইত না। জঙ্গি কার্যকলাপের প্রায় আড়াই দশকে এমনিতেই অনেক ক্ষতি হইয়াছে উপজাতিদের। যা উন্নতি হইয়াছে, তাহার দুই-তিনগুণ হইতে পারিত। এখন কোনও অজুহাতে আবার শান্তি-একতা বিঘ্নিত হইতে দিলে পিছনে পড়া উপজাতিদেরই ক্ষতি হইবে বেশি।

১০ এবং ১৭ এপ্রিল। সাত দিনের ব্যবধানে দুইটি সমাবেশের পরিকল্পনা। একই রকম ইস্যু। টাক্কাতুলসী এবং জিরানিয়া। ঘটনা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু পরিকল্পনা বিচ্ছিন্ন নহে। অতি স্পর্শকাতর দুইটি ঘটনারই তদন্ত হইতেছে। সত্য মিথ্যা জানা যাইবে। দোষীদের সাজা হইবে না ভাবিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু ১০-এর জমায়েতে আই এন পি টি "কাহারও বিরুদ্ধে বিদ্বেষ নাই" বলিয়াও জাতি-বিদ্বেষের পথ ধরিয়াছে। সেই পুরনো সাম্প্রদায়িকতারই

ইন্ধন দিয়াছে। কংগ্রেস নিশ্চয়ই শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখিবার কথা বলিতে ১৭-র জমায়েত আহ্বান করে নাই! অর্থাৎ, ২০১৩-র ভোট সামনে রাখিয়া সেই চেনা সুরই ধ্বনিত হইতেছে বাম-বিরোধী শিবিরে। রাজ্যের আকাশে সেই অশুভ মেঘই জমা করিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

ত্রিপুরার জনজীবনে শান্তি-সম্প্রীতি আর প্রগতি বাম-ডান কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নহে। কোনও রাজনৈতিক নেতৃজোটের ক্ষমতা-লোভেব যূপকাষ্ঠেও এই তিন অমূল্য রত্নকে বলি দেওয়া যাইতে পারে না। অতএব, খুব সাবধান গিন্নি। সকলকে সতর্ক থাকিতে বল।

(প্রকাশ: ১৬.০৪.২০১২)

কংগ্রেস

সেলুনে ভিড়। তুমুল তর্ক। চুল-দাড়ি কাটাইতে আসিয়া যুক্তির কাটাকাটি। নতুন প্রদেশ সেনাপতি নিযুক্তি কংগ্রেসের। ভাল হইল কি মন্দ হইল, তাহাতেই বেজায় ধন্দ। চিন্তা-র আনন্দ। কারণ এই দ্বন্দ্বে তাহার ব্যবসা সকলের আশীর্বাদে মন্দ নহে!

ক-বাবু কহিলেন, প্রদেশ কংগ্রেসের হাল তরুণ প্রজন্মের বিধায়কের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এইবার বামফ্রন্ট ঠ্যালা বুঝিবে। কথা না ফুরাইতেই খ-বাবু মশকরা করিলেন, ঠিকানা বদল মাত্র। রামনগর হইতে কৃষ্ণনগর। 'একই দেহে রাম-নাম কৃষ্ণ সুমধুর'। ইহাতে বামফ্রন্টের নতুন করিয়া ঠ্যালা-ঠুলা বুঝিবার কিছুই নাই হে। কংগ্রেস কংগ্রেসেই রহিয়াছে। দিল্লি যখন যাহাকে খুশি তুলিয়া ধরে, আবার যখন খুশি আছাড় মারে। গণতন্ত্র নাই। কর্ত্রী বা কর্তার ইচ্ছায় কেত্তন। কংগ্রেসে একটাই পোস্ট, 'হাইকমান্ড'! বাকি সব ল্যাম্পপোস্ট! এমন সময় গ-বাবু কহিয়া উঠিলেন, ত্রিপুরার কংগ্রেস রাজনীতির চাণক্য, ধুরন্ধর বিরোধী নেতাকে বিশ্বাস করাই সুরজিৎ দত্ত-র জীবনের বড় ভুল। এখন তিনিও নিশ্চয় বুঝিতেছেন। 'ব্রুটাস তুমিও!'— এই বলা ছাড়া এখন তাঁহার আর কী-ই বা বলিবার আছে।

ক-বাবু তাড়াতাড়ি একটি পত্রিকার ভাঁজ খুলিয়া দেখাইলেন, আছে —বলিবার আছে। বলিয়াছেন, "আমি কংগ্রেস ভবনে তালা মারিয়া সি পি এমকে লইয়া কংগ্রেস করি নাই। আমি জানি না, আমার অপরাধ কী!" পিছন হইতে ঘ-বাবু সংলাপ দিলেন, সামনের দরজায় তালা মারিলে কী হইল! কংগ্রেসে পিছনের দরজাই আসল। এই দলে কোনও কেন-র উত্তর নাই। জিজ্ঞাসারও অধিকার নাই। যিনি বধ হইলেন, তাঁহার জানিবারও অধিকার নাই – কেন বধ হইলেন। উত্তর দিবারও কেহ নাই। 'বর্তমান' হিসাবে রাত্রে ঘুমাইলে, সকালে 'প্রাক্তন' হিসাবে জাগিতে পারেন। উড়ন্ত ঘুড়ির সুতা লাটাইয়ের গোড়ায় কাটিয়া দেওয়ার মতো! আবার, যিনি চেয়ার পাইলেন – তিনি কী করিয়া, কেন পাইলেন, রাধা নাচিতে কত মন ঘি পুড়িল, কত ধানে কত চাল হইল, তাঁহার কী কী গুণাগুণ, কী ভাবমূর্তি – কেবল তিনি নিজে জানিলেই হইল। আর কাহারও জানিবার আবশ্যকতা নাই। আবার খ-বাবুর মশকরা, জানিয়া কী হইবে? যে পরিমাণ তেল পুড়িল, তাঁহাকেই তো তুলিতে হইবে। বিধানসভার টিকেট বন্টনের সুযোগ একবার পাইলেই আর দেখিতে হইবে না। রামনগরের

রাম-দা এখন আফসোস করিয়া বলিতেই পারেন, ''সাঁতার দিলাম আমি, গাঙ পার হইলি তুই!'' ''বামফ্রন্ট সরাইবার দায়িত্ব'' পালনের মধ্যপথে নিজেকেই সরিতে হইল। ভোটের আগেই নতুন 'বর্তমান'-কেও সরাইয়া 'প্রাক্তন' করা হইবে না— তাহারই বা গ্যারান্টি কী!

গ-বাবু জানাইলেন, সুরজিৎ দত্ত আরও বলিয়াছেন, নতুন সভাপতি সি পি এমের এজেন্ট। আগামী নির্বাচনেও বামফ্রন্টকেই জয়ের রাস্তা করিয়া দিবেন নতুন সভাপতি। অতীত ইতিহাসও তুলিয়া ধরিয়াছেন সুরজিৎ। ভাবিলাম, গৃহযুদ্ধ আরও তেজি হইল। যদুবংশ ধ্বংস হইতে শত্রু লাগিবে না। ত্রিপুরায় কংগ্রেসের মরা গাঙে বান আসিবে কী করিয়া! আবার যে জলের ওপর কেবল দুইটি মাত্র মুখ ভাসিয়া উঠিয়াছে! একটি পুত্রের, অন্যটি পিতার। সুরজিৎ দত্তের গত সওয়া দুই বৎসরে অন্য আরও অনেকের মুখ দেখা যাইত। তিনি ধনীদের ইশ্‌কুলে পড়েন নাই, ইংরাজি বলিতে লিখিতে চোস্ত নহেন সত্য। সেই কারণেই হয়ত বেশি করিয়া সকলকে লইয়া চলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু, এখন শুরুতে তিন চার জনের তালু দেখা গেলেও শীঘ্রই কি পিতা-পুত্র ছাড়া আর কাহাকেও দেখা যাইবে না? সি পি এমও সুবিধা পাইবে। জোট আমলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে 'এক্সপোজ' করিতে তখনকার সীমাহীন বর্বরতা আর দুর্নীতি-লুটপাটের তথ্য তুলিয়া ধরিবে। জবাব দিতে আগাইয়া আসিতে হইবে পিতাকেই। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রের পিঠে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা হইতে গোয়ালা বস্তি, কুণ্ডু পরিবার উৎখাত – ইত্যাদি আরও অজস্র অভিযোগের জবাব দিতে হইবে পুত্রকে। সুতরাং, পিতা-পুত্রই হইয়া উঠিবেন দলের বক্তা-প্রবক্তা। ইহার সঙ্গে নতুন পি সি সি গঠন, ব্লক কংগ্রেস পুনর্গঠন এবং সর্বোপরি ২০০৮-এর মতো টিকেট বন্টনের 'চাবি' যখন আখাউড়া রোডের সান্ত্রী-বেষ্টিত বড় বাড়িতেই ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন অচিরেই কংগ্রেস এই রাজ্যে আবার 'বাপ-পুতের দল' হইয়া উঠিতেই পারে।

আগে লিখিয়াছিলাম, সুদীপ রায়বর্মনের মনে অন্য হিসাব রহিয়াছে। আপাতত রাহুল গান্ধীর পতাকা উড়াইয়া তিনি উত্তরপ্রদেশের অখিলেশ সিং যাদবের পথে হাঁটিতেছেন। তাঁহার মনের যুক্তিও বলিয়াছিলাম। উত্তরপ্রদেশে মুলায়ম-অখিলেশ 'বাপ-পুত' হইয়া পারিলে ত্রিপুরায় সমীর-সুদীপ পারিবেন না কেন? সুদীপ রায়বর্মন প্রদেশ সভাপতি হইবার পর বাবা আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছেন 'হাইকমান্ডের বেস্ট চয়েস'। মন্তব্য চমৎকার এবং মোক্ষম! চিন্তা শীলের মনে পড়িতেছে, কিছুদিন আগে বিশালগড়ে কংগ্রেসের এক সভায় বাবা-কে পাশে রাখিয়া সুদীপবাবু প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'ত্রিপুরার আগামী মুখ্যমন্ত্রীর নাম সমীররঞ্জন বর্মন।' সুদীপ জানেন, সময় যদি আসিয়াই পড়ে, স্বপ্ন যদি কোনওভাবে সত্যই সাকার হয়, তাহা হইলে তিনি অখিলেশ-এ থামিবেন না। পিতা শাহ-জাহানকে এই বৃদ্ধ বয়সে প্রিয়পুত্র এত কষ্ট করিতে দিবেন না! তিনি নিজেই সম্রাট হইবেন, সম্রাট হইবেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব হইবেন।

(প্রকাশ : ২৩.০৪.২০১২)

দাঁড়াই কোথা!

সারা দেশে কংগ্রেসিরা হাসিয়া পেট ফাটাইতেছেন।

-- বেচারা বঙ্গারু লক্ষ্মণ! মাত্র এক লক্ষ টাকা ঘুষ খাইতে গিয়া নিজের এবং দলের নাক কান কাটিলেন। চার বৎসরের জেল তো হইলই, বেরসিক আদালত তাঁহাকে সেই 'এক লক্ষ' টাকার অঙ্কেই কিনা জরিমানা করিলেন!

বঙ্গারু ১১বছর আগে ভারতীয় জনতা পার্টি মানে বি জে পি-র সর্বভারতীয় সভাপতি, দলের সর্বোচ্চ পদে ছিলেন। মাত্র এক লক্ষ টাকা ঘুষ-এর ছবি তুলিতে তহলকা-র গোপন ক্যামেরাও নিশ্চয় শর্মাইয়াছিল! পদমর্যাদা বলিয়াও তো একটি কথা আছে! পত্রিকায় দেখিলাম, কুমারঘাটে ফটিকরায় পঞ্চায়েতের কংগ্রেসিরা এক ফুঁয়েই সাড়ে পনেরো লক্ষ টাকার 'সুপারি বাগান' বেমালুম হাওয়া করিয়া দিয়াছেন! একটা পঞ্চায়েতে কংগ্রেস যা পারে বঙ্গারু লক্ষ্মণ বি জে পি-র সর্বভারতীয় সর্বোচ্চ পদে থাকিয়াও তাহার 'পনেরো ভাগের এক ভাগ' পারিলেন না? এমনকি, প্রাক্তন বি জে পি মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদিয়ুরাপ্পাও লজ্জিত হইবেন। নিজের শত-সহস্র কোটির জমি কেলেঙ্কারির জন্য নহে, দলের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতির 'চরম অপদার্থতা'-র কথা মনে করিয়া!

অবশ্য, চিন্তা শীলের সেলুনে লোকে বলাবালি করিতেছে, কংগ্রেস দল কেন্দ্রের ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া বি জে পি-কে টাইট দিয়াছে! আসলে নিজেদের নেতা-মন্ত্রীদের দুর্নীতি চাপা দিবার কৌশল! মানে 'আমরাই কেবল চোর আর ঘুষখোর নহি, বি জে পিও...'। বোফর্স কামান ক্রয়ের ঘুষ কেলেঙ্কারিতে রাজীব গান্ধীর পরিবারের ইতালীয় বন্ধু (কী যেন একটা কঠিন নাম — ও হ্যাঁ) ওত্তাভিও কোয়াত্রোচি-কে বাঁচাইতে সি বি আইকে দিয়া অভিযুক্তদের মধ্যে অমিতাভ বচ্চনের নাম কে ঢুকাইয়া দিয়াছিল? কেন ঢুকাইয়াছিল? অমিতাভও রাজীব-পরিবারের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হইলে বলা যাইবে, অমিতাভ যেমন নির্দোষ তেমনি 'কোয়াত্রোচিও নির্দোষ!' বলা যাইবে— রাজীব গান্ধীর বন্ধু বলিয়াই তাঁহাদের 'দুই জনকে' অভিযুক্ত করা হইয়াছে! কিন্তু, ২৫ বছর পরে ওই ১৫০০ কোটি ডলারের কামান ক্রয় চুক্তিতে ঘুষ কেলেঙ্কারির আরও তথ্য

জানাইয়াছেন সুইডেনের তৎকালীন পুলিস প্রধান স্টেন লিন্ডস্টর্ম। সেই দেশে এই ঘুষ-দুর্নীতির তদন্ত-দলের তখন ছিলেন প্রধান। তিনি বলিয়াছেন, রাজীব গান্ধী সরাসরি ঘুষ লইয়াছিলেন এমন প্রমাণ তিনি পান নাই। তবে কোয়ত্রোচি বিশাল অঙ্কের ঘুষ পাইয়াছিল ইহা সত্য। তাহাকে বাঁচাইবার জন্য রাজীব গান্ধীরও যে স্পষ্ট ভূমিকা ছিল, সেই কথাও ইঙ্গিতে বলিয়াছেন লিন্ডস্টর্ম। ভারতের সি বি আই বোফর্স তদন্তের নামে কী প্রহসন করিয়াছে, তাহাও জানাইয়াছেন তিনি। 'কোয়াত্রোচিকে পাওয়া যায় নাই' লিখিয়া বোফর্স তদন্ত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে বহু আগেই। চিন্তা-গিন্নি বলিলেন, ইহার কারণেই একটি ভক্ত পত্রিকা নিরুপায় (!) হেডিং করিয়াছে— "রাজীব নির্দোষ, কিন্তু ত্রুটি ছিল"! এমন হাঁসজারু হেডিং জন্মেও দেখি নাই! আহা কী পড়িলাম ...!

যাহাই বল গিন্নি, দিনে দিনে তিহার জেল তীর্থক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছে। লক্ষ-লক্ষ কোটি টাকা লুণ্ঠনে ধরা পড়িয়া কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা ওই জেলে আখড়া করিতেছেন। একের পর এক! 'দুর্নীতি' আর 'কংগ্রেস'– এই দুইয়ের কে যে কাহার অঙ্গের ভূষণ তাহা লইয়া ঘোর তর্ক চলিতে পারে। এইবার তিহারে ঢুকিলেন বি-জে পি-র বঙ্গারুও। দেশে 'দ্বিদলীয় ব্যবস্থা' কায়েম করিতে হইবে কিনা! তিহার জেল হইতেই তাহার মহড়া শুরু হইয়াছে!

চিন্তা-গিন্নি বলিলেন, দুর্নীতিতে 'ভারতরত্ন' উপাধি চালু করিলে কংগ্রেস এবং বি জে পি-র সুতীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপভোগ্য হইবে বুঝিলাম। কিন্তু ইহা তো বুঝিলাম না – আর কোনও দলের কথা বলিতেছ না কেন? বলিলাম– গিন্নি, চুল কাটিতে গিয়া কাটা-চুল একটাও পড়িবে না, এমন কোনও সেলুন নাই। 'কজ্জলকা ঘর মে ইয়েত্তা সিয়ান হুঁয়ে, থোড়া বুঁদ লাগে পর লাগে'– অর্থাৎ, কালিঝুল ভরা ঘরে অল্পসময় থাকিলেও দেহের কোথাও না কোথাও একটু কালিঝুল লাগিতেই পারে। যে ব্যবস্থায় আমাদের দেশ চলিতেছে, তাহাতে দুর্নীতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

সি পি এম বলে, আমরা এই ব্যবস্থার ভিতরেই বামফ্রন্টের সরকার চালাইতেছি। ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত, ভিলেজ কমিটি, ব্লক স্তরে অসংখ্য প্রকল্পে শত-সহস্র কোটি টাকা খরচ হইতেছে। ইহাতে কোথাও একফোঁটা দুর্নীতি হইতেছে না – বলা যাইবে না। কিন্তু, বামপন্থী নেতারা ঘুষখোর কিংবা বিধানসভায়-সংসদে টাকা দিয়া তাঁহাদের বিধায়ক বা এম পি-দের ক্রয়-বিক্রয় করা যায় – এই কথা কোনও শত্রুও বলিতে পারিবেন না। অন্য দলে ইহা জলভাত। কংগ্রেস, বি জে পি কিংবা অন্য অ-বাম দলের মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে রাজ্যে রাজ্যে সরকারি তহবিলের কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি এবং বহু কেলেঙ্কারির অভিযোগ। কিন্তু, জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কিংবা নৃপেন চক্রবর্তী, দশরথ দেব, মানিক সরকাররা দুর্নীতি

করিয়াছেন এমন কথা উচ্চারণ করিতেও বিবেকের বাধা আসিবে। ত্রিপুরায় জোট আমলে দুর্নীতি-কেলেঙ্কারির কোনও সীমা-পরিসীমা ছিল না। একজনও মন্ত্রী ছিলেন না যাঁহার বিরুদ্ধে কোনও কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠে নাই। বামফ্রন্টের কোনও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠিতে পারে না, কারণ ইঁহারা নীতির জন্যই রাজনীতি করেন। মন্ত্রী বিধায়ক হিসেবে তাঁহাদের প্রাপ্য বেতনের টাকাও পার্টির তহবিলে যায়। ইঁহাদের সহিত অন্যদের তুলনা করিও না।

বাহিরে সন্ধ্যা নামিতেই পাড়ার আধ-পাগলাটা হেঁড়ে গলায় গাহিয়া উঠিল— 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা'! চিন্তা-গিন্নি দূর-দূর যা-যা করিয়া অতি কষ্টে তাহাকে দরজা হইতে খেদাইলেন। ভাবিলাম – আধ-পাগলের সমস্যাটা বড়ই জটিল। সে নিশ্চিন্তে দাঁড়াইবার জায়গা খুঁজিতেছে। কিন্তু কোথায় মিলিবে! 'দিকে দিকে নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস'! কোথাও ভরসা নাই। নিশ্চিন্তি নাই। আসলে, সমগ্র ভারতবাসীর সমস্যাও পৃথক নহে! ভারতবাসীও দাঁড়াইবার জায়গা খুঁজিতেছে। মনে হইল, বামেরা সেই দাঁড়াইবার জায়গা দিতে না পারিলে আর কেহ পারিবেন না। বামপন্থাই ভবিষ্যৎ।

(প্রকাশ : ৩০.০৪.২০১২)

নলছড়

সুকুমার বর্মন। জীবিতকালে মেলাঘর ব্লকের অখ্যাত গ্রাম কেমতলিকে সুবিখ্যাত করিয়াছেন। প্রয়াত হইয়া গোটা নলছড়কে বিখ্যাত করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন! কেমতলির অদ্বৈত মল্ল বর্মন উৎসবে প্রতি বছর এখন জড়ো হন দেশ-বিদেশের জ্ঞানী-গুণীরা। তেমনই নলছড় লইয়াও এখন কেবল ত্রিপুরার নহে, দেশ-বিদেশেরও আগ্রহের বুঝি অন্ত নাই। সুকুমারবাবুর মৃত্যুতেই নলছড় বিধানসভার শূন্য আসনে ১২ জুন উপনির্বাচন। মুখোমুখি বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস (ও তার সঙ্গীরা)। কে জিতিবে?

২০১৩-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইহাই একমাত্র নির্বাচন। কংগ্রেস জিতিলে বলিতে পারিবে-- ত্রিপুরাবাসী নিশ্চিতই 'পরিবর্তন' চাহিতেছে। 'অত্যাচারী দুর্নীতিবাজ স্বজনপোষণকারী নারী নির্যাতনকারী' বামফ্রন্ট সরকারকে মানুষ আর চাহিতেছে না।" অতএব, দেশের অবশিষ্ট একমাত্র বামপন্থী সরকারটিকে গণতন্ত্রের ইতিহাস হইতে মুছিয়া ফেলিবার তোড়জোড় জোরদার হইবে। কংগিরা আরও জঙ্গি হইবেন। আর বন্দুকধারী জঙ্গিরা পবিত্র 'লাল হটাও' কর্মযজ্ঞে আরও প্রকাশ্যে সঙ্গী হইবে। সেই সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের নতুন সভাপতি আয়নায় নিজেকে দেখিয়া নিজেই আরও বিমোহিত হইবেন। স্বপনের 'কুর্সি' আরও রঙিন হইয়া ধরা দিতে থাকিবে।

আর সি পি এম জয়ী হইলে বলিতে পারিবে– "বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা যে অটুট, আবার প্রমাণিত হইল। বিশেষ করিয়া তফসিলি জাতি অংশের মানুষের আস্থা। নির্বাচিত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটির মাধ্যমে মানুষকে লইয়া বামফ্রন্টের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের যে পদ্ধতি, তাহাতে মানুষের স্পষ্ট আস্থা রহিয়াছে। শান্তি সম্প্রীতি ও উন্নয়নের বর্তমান ধারা ব্যাহত হয় এমন কিছুই মানুষ সমর্থন করিবেন না।" অতএব, দেশ-বিদেশে বার্তা যাইবে,– 'ত্রিপুরার বামদুর্গ ধূলিসাৎ করা এত সহজ নহে'।

কে জিতিবে, কী ঘটিবে কেহ বলিতে পারে না। সুকুমার বর্মন বারে বারে এই তফসিলি জাতি সংরক্ষিত আসন হইতে বামফ্রন্টের বিধায়ক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পার্টি সি পি এম, এইবার যুবনেতা তপন দাসকে প্রার্থী করিয়া জোরদার প্রচার শুরু করিয়াছে। কংগ্রেস

এখনও প্রার্থী ঠিক করিতে পারে নাই। কখনই এত তাড়াতাড়ি পারে না। গোষ্ঠী-কোন্দল রহিয়াছে। না থাকিলে দলের নাম কংগ্রেস কেন! বয়স্ক নেতা দ্বিজেন্দ্র মজুমদারই প্রার্থী হইবেন, সেলুনে বসিয়া শুনিতেছি। তরুণদের মধ্যেও নাকি অনেক দাবিদার। প্রচারের জন্য এক মাসের বেশি সময় মিলিবে না। সাংগঠনিক শৃঙ্খলাহীন কংগ্রেসের পক্ষে বেশিদিন 'টেম্পো' ধরিয়া রাখা সম্ভব নহে। তাই দেরিতে প্রার্থী ঘোষণা হইলে এক দিকে তাহাদের পক্ষে মন্দের ভাল। কিন্তু সমস্যা অন্যত্র।

কংগ্রেস নেতারা মাঠে ময়দানে গরমাগরম অনেক কথা বলিতেছেন বটে, বামফ্রন্টের 'বিকল্প' হিসাবে নিজেদের দলটাকে কিন্তু কিছুতেই খাড়া করিতে পারিতেছেন না। নলছড়-সহ সোনামুড়া মহকুমার চার কেন্দ্রে কংগ্রেসের স্বঘোষিত 'অভিভাবক' বিধায়ক সুবল ভৌমিক প্রকাশ্যেই নতুন প্রদেশ সভাপতিকে অগ্রাহ্য করিতেছেন। নলছড়ে ঘনঘন যাতায়াতে আপাতত ছেদ টানিয়া নিজের দাম বাড়াইতেছেন মনে হয়। শেষ অবধি তাঁহার নিজের কিছু সুবিধা হইলেও গোষ্ঠীর সমর্থকদের কপালে কিছু জোটে কি না দেখিবার বিষয়। সদ্য অপসারিত প্রদেশ সভাপতি সুরজিৎ দত্ত 'বনবাস'-এ। ৩০ এপ্রিল প্রগতি-মঞ্চের বিষ-চুম্বনে তাঁহার সর্ব-অঙ্গ জর-জর! 'পুরান কাগজ'- এর ফিরিওয়ালার মতো পরিসংখ্যান লইয়া একা পাড়ায় পাড়ায় ছুটিতেছেন বিরোধী নেতা রতনলাল। এই কংগ্রেস কী করিয়া বিকল্প হিসাবে নিজেদের খাড়া করিবে! কোন জাদুমন্ত্রবলে!

সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক নিযুক্ত হইয়াছেন আশুতোষ জিন্দাল। এই প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলিয়াছেন — একজন অফিসার বদলাইয়া নির্বাচনী জয়লাভে বিশ্বাস করেন না তিনি। হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াই চিন্তা শীল ভাবিয়া দেখিয়াছে, একজন প্রদেশ সভাপতি বদলাইয়া ত্রিপুরায় কংগ্রেসের ভোটে-জিতিবার ভরসাতেও কোনও পরিবর্তন হইবে না! হইবার নহে! বরং, শান্তি সম্প্রীতি আর মানুষের জীবনমানের উন্নতিতে, রাজ্যের সমৃদ্ধিতে কংগ্রেস দলের এতকালের ভূমিকা কী ছিল— ভোটাররা বোধহয় ইহাই বিচার করিবেন বেশি। জোট আমলে নলছড়ে খুন সন্ত্রাস, বাড়িঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগ, সি পি এমের পার্টি অফিস ভাঙচুর, জবরদখল— ইত্যাদি ঘটনা ভুলিতে পারা কঠিন! শুনিয়াছি, নৃপেন চক্রবর্তীকে বসিবার জন্য বৈরাগীবাজারে একটি চেয়ার দেওয়ার অপরাধে (!) পরবর্তীকালে কংগ্রেসিদের হাতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এক গরিব দোকানি! দ্বিজেন্দ্রবাবুর মতন 'সত্তর ছুঁই ছুঁই' কেহ কংগ্রেস প্রার্থী হইলে— সেই সব দিনে তাঁহার ভূমিকা কী ছিল, সেই প্রশ্নও কিন্তু মানুষের মনে জাগিয়া উঠিতে পারে!

চিন্তা-গিন্নি বলিলেন, এমন ভোটারও তো রহিয়াছেন— যাহারা কংগ্রেসকে জয়ী দেখিতে চান না, আবার বামফ্রন্ট তথা সি পি এমের সব কাজও পছন্দ করিতেছেন না। কংগ্রেসকে

মনে প্রাণে বর্জনের পক্ষে, কিন্তু বামপন্থী পার্টি, গণসংগঠন বা শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের অনেক নেতা কর্মীর কাজকর্ম, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, কথাবার্তাও গ্রহণযোগ্য মনে করিতেছেন না। অভিজ্ঞতায় কংগ্রেসকে ঘৃণা করিতেছেন, কিন্তু কোনও প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি লইয়া হয়ত বামেদের প্রতিও বিরক্ত, ক্ষুব্ধ। বলিলাম— গিন্নি ইহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইতে হইবে বাম নেতা কর্মীদের। গরিব মানুষকে 'গরিব' হিসাবেই দেখিতে হইবে, 'কোন দলের সমর্থক' সেই হিসাবে নহে। নিজেদের ভুল থাকিলে সংশোধন করিয়া ইহাদের কাছে টানিতে হইবে। ভোটের আগে প্রলোভন আসিবে। সবসময় আসে। এইবার আরও বেশি আসিবে। সুতরাং, দিবানিশি গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় সতর্ক থাকিতেই হইবে।

বুঝিলে গিন্নি, এই উপনির্বাচনে নলছড়ের মানুষ কেবল নলছড়ের ভাগ্য নহে, ত্রিপুরার ভাগ্য নির্ধারণ করিতে, এমনকি দূর-বিচারে সারা দেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিতেই ভোট দিবেন। নলছড়কে একটা নতুন ইতিহাস লিখিয়া বিখ্যাত হইবার সুযোগ দিয়া গিয়াছেন যিনি, সেই প্রয়াত জননেতা সুকুমার বর্মনকে আসল শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের দিন ১২ জুন। সেদিন— একটি ভোট, তাঁহার উদ্দেশে একটি রক্তজবা ফুল।

(প্রকাশ : ০৭.০৫.২০১২)

রাজীব-ফর্মুলা

কাস্টমার নাই। সেলুনেই দিবানিদ্রা যাপন করিতেছিলাম। কে যেন স্বপ্নে ডাকিয়া বলিল – চিন্তা-রে, রিটায়ার কর! তোর পেটে গামছা বান্ধিবার ব্যবস্থা করিতেছেন নতুন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তিনিও 'দুইখান কথা' চালু করিয়াছেন। ২০১৩-র ভোটের জন্য তাঁহার 'তিনখান কমিটি আর দুইখান কথা' পত্রিকায় পড়িয়া লোকে ধন্য ধন্য করিতেছে।

চমক খাইয়া উঠিয়া বসিলাম। তিন কমিটির কথা জানি। ইস্তাহার কমিটি, প্রচার কমিটি আর নির্বাচন কমিটি। চিন্তা-গিন্নির সহিত একপ্রস্থ বিতণ্ডাও হইয়াছে এই ত্রিফলা কমিটি লইয়া। কত কবিরাজি করিয়া আমলকী-বয়রা-হরীতকী একত্র করিয়াছেন সভাপতি আর বিরোধী নেতা! এ আই সি সি নাকি ভীষণ চমৎকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ ইহাতে শিলমোহরের ছাপ্পা মারিয়া দিয়াছেন। ইস্তাহার কমিটি ভোটে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি-পুরাণ এবং প্রলোভনামৃত রচনা করিবে। প্রচার কমিটি সবরকমের প্রচার-সম্প্রচারের উপকরণ ও ব্যবস্থাদি সাজাইবে। আর নির্বাচনী কমিটি 'বাকি স–ব' করিবে। শুনিয়া অট্টহাস্য করিতে গিয়া গিন্নির গলায় সুপারির কণা আটকাইল। তিনি হাসিয়া-কাশিয়া-হাঁপাইয়া এবং সবশেষে অশ্রুজল ফেলিয়া বিচ্ছিরি কাণ্ড করিলেন। গালভরা পান-সুপারি গাল খালি করিয়া ছর্‌রা গুলির মতো ঘরময় নিক্ষিপ্ত হইল! অবশেষে বলিলেন– এই ত্রিফলা কমিটি কাগজেই থাকিবে, মগজে পৌঁছাইবে না। কংগ্রেসে রাতারাতি কীরকম ম্যাজিক-ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে – ইহা দেখাইতেই ওই কাগজ রচনা হইয়াছে। বলিয়া রাখিতেছি, মিলাইয়া দেখিও, কমিটির সুবল-গোপাল-বীরজিৎরা শেষমেশ সভাপতির উদ্দেশে কেবল ভক্তিগীতি গাহিবেন,– 'তোমার কর্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি!' সত্য সংগঠন আর সত্য ঐক্য থাকিলে ভোটের জন্য নতুন করিয়া কমিটি করিতে হয় না। সি পি এম কিংবা বামফ্রন্টকে ভোটের আগে কস্মিনকালেও এই রকম লোক-দেখানো কমিটি করিতে শুনিয়াছ?

অতএব, তিনখান কমিটি জানিয়াছি। কিন্তু সভাপতির দুইখান কথা কী? পাড়ার পুলিসবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতেই একটু ভাবিয়া বলিলেন – হুম্। নতুন সভাপতির দুইখান কথা খুবই স্পষ্ট। এক) জোট হইবে রাজীব গান্ধীর ৮৮-র ফর্মুলায়। দুই) এইবার বামফ্রন্ট হটাইয়া

কংগ্রেস সরকার গড়া হইবে যে-কোনও মূল্যে, 'অ্যাট এনি কস্ট'!

যে-কোনও মূল্যে? প্রাচীনকালে মূল্য মিটাইতে মোহর ছিল, কড়ি ছিল। তাহাও আগে ছিল সোনা-দানা-হীরা-জহরত, হাতি-ঘোড়া, দাস-দাসী কিংবা জিনিসের বদলে জিনিস। এখন টাকা কিংবা ডলারে মূল্য-বিনিময় হয়। কখনও প্রকাশ্যে, কখনও গোপনে। স্টেট ব্যাঙ্কে, অথবা সুইস ব্যাঙ্কে! কিন্তু, যে-কোনও মূল্যে—মানে তো কোনও অঙ্ক না-লেখা চেক। যে-কোনও অঙ্ক বসাইয়া লওয়া যায়! বিলিয়ন-ট্রিলিয়নও লেখা চলিবে। মূল্য হিসাবে মানুষের শান্তি, একতা, মান-মর্যাদা, ধনপ্রাণও লেখা চলিবে। গ্রাম শহর পাড়াতে টাকা-বৃষ্টি হইবে? নাকি অন্য মূল্য? হিটলার যেমন কয়েক কোটি লোকের জীবনের বিনিময়ে পৃথিবীর রাজা হইতে চাহিয়াছিলেন! 'বিসর্জন-এর নক্ষত্ররায় যেমন গোবিন্দ মাণিক্যের প্রাণের বিনিময়ে সিংহাসন চাহিয়াছিলেন। ১৯৮০-র দাঙ্গায় যেমন ১৪০০ নরহত্যা আর কয়েক হাজার গৃহদাহের মূল্যে নৃপেন চক্রবর্তীর প্রথম বাম সরকারকে উৎখাত করিতে চেষ্টা হইয়াছিল। ১৯৮৮-তে যেমন জঙ্গিবাহিনীর হাতে গণনিধনের মূল্যে 'উপদ্রুত আইন' করিয়া কাজ সমাধা হইয়াছিল! সেই রকম 'যে-কোনও মূল্যে' এইবার বাম সরকার হটানো হইবে?

১৯৮৮-তে 'জোট' গড়িবার রাজীব-ফর্মুলাই বা কী ছিল? খোলসা করিতে রাজি হন নাই নতুন সভাপতি। ১৯৮৩-তে কংগ্রেসের সহিত টি ইউ জে এসের প্রথম প্রকাশ্য জোট হইয়াছিল ইন্দিরা জমানায়। উহা কি ইন্দিরা-ফর্মুলা ছিল? কিন্তু কামের কাম হয় নাই। তাই ১৯৮৮-তে কংগ্রেসের জোট হইয়াছিল প্রকাশ্যে টি ইউ জে এসের সহিত, আর গোপনে টি এন ভি জঙ্গি বাহিনীর সহিত। দেশ-বিরোধী সশস্ত্র জঙ্গিদের সহিত প্রকাশ্য আঁতাতে অসুবিধা ছিল। দুনিয়া কী বলিবে! তাই রাজীব-রাঙ্খল গোপন চুক্তির মূল কথা ছিল— 'তুমি তোমার কর্ম কর, আমি আমার কর্ম করিব'। বিজয় রাঙ্খলের বাহিনী গণহত্যার পর গণহত্যা চালাইয়া গেলেন, আর রাজীব গান্ধীরা 'নৃপেন-দশরথের-সৃষ্ট টি এন ভি বাহিনী খুনখারাবি করিতেছে' প্রচার করিয়া সেনাবাহিনী নামাইলেন। ভোটের নামে প্রহসন করিলেন। কাম হইল। বামফ্রন্ট সরকার উৎখাত হইল।

ইহাই রাজীব-ফর্মুলা? ইহাই 'যে-কোনও মূল্যে' কংগ্রেস সরকার গড়িবার ঘোষণার সারাৎসার? রানীরগাঁও মাঠে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতা শুভঙ্কর সরকারের 'রক্তপাত'-এর ডাকের ইহাই নির্গলিতার্থ? তাহা হইলে তো চিন্তা শীলেরও দুইখান কথা আছে: এক) নতুন সভাপতি এক মুখে 'প্রেম' আর জোট জমানার জন্য 'ক্ষমা'-র বাণী ছড়াইতেছেন, আর অন্য মুখে ৮৮-র ভয় দেখাইয়া 'জয়' চাহিতেছেন! না হইলে হঠাৎ রাজীব-ফর্মুলা আর ৮৮-র কথা তিনি বলিতেন না! দুই) 'সংশোধিত কংগ্রেস' সেই কংগ্রেসেই রহিয়াছে!

মানুষের মন জয় করিবার কোনও নতুন ফর্মুলা তাহদের কাছে নাই।

গিন্নি বলিলেন, সারা বছর লেখাপড়া করা ছাত্র পরীক্ষার আগে 'যে-কোনও মূল্যে পাস করিব' বলে না। এ কথা বলিয়া থাকে সেই ছাত্র – অসদুপায় ভিন্ন যাহার আর কোনও উপায় নাই! ভাবিলাম – সেই অসদুপায় কী? হিংসা, রক্তপাত, টাকা নাকি 'সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ভোট'-এর আড়ালে অন্য কিছু? কোনও টাইম মেশিনেই ২০১৩-তে ১৯৮৮-কে ফিরাইয়া আনা যাইবে না সত্য, কিন্তু অসদুপায়-নির্ভর নষ্ট ছাত্রের দিকে নজর না রাখিলে যে গোটা পরীক্ষাই ভন্ডুল হইয়া যাইতে পারে! পরীক্ষকবৃন্দ, তথা রাজ্যের নির্বাচকমণ্ডলী শুনিতে পাইতেছেন কি?

(প্রকাশ : ১৪.০৫.২০১২)

ভাষা-শহিদ ট্রেন

কী অসম্ভব ঘটনা! চিন্তা-গিন্নির চোখে জল! শিলচর রেল স্টেশনের নাম 'ভাষা-শহিদ স্টেশন'। শিলচর হইতে আগরতলার ট্রেনটির নাম 'ভাষা-শহিদ এক্সপ্রেস'। এখনও হয় নাই। ধর্মনগরে ১৯ মে 'মাতৃভাষা প্রণাম দিবস' পালনের অনুষ্ঠানে দাবি উঠিয়াছে। পত্রিকায় এই সংবাদ পড়িয়াই গিন্নি কান্দিতে বসিলেন। পাথর গলিতে দেখিলেও এত অবাক হইতাম না। অকস্মাৎ বিহ্বল মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ চমক খেলিল। মনে পড়িল, ১৯৬১-র ১৯ মে শিলচর রেল স্টেশনের ভাষা-আন্দোলনে গুলি খাইয়া যে ১১ জন শহিদ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গিন্নির বাপের বাড়ির অতি দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ও নাকি ছিলেন। মনে মনে জুতসই সান্ত্বনার ভাষা খুঁজিতেছি, গিন্নি হঠাৎ একশো আশি ডিগ্রি ঘুরিয়া জিজ্ঞাসা ছুঁড়িলেন — হ্যাঁ গা, নতুন নাম কবে হইবে?

ঠিকই তো! 'ভাষা-শহিদ স্টেশন' হইতে আগরতলার উদ্দেশে ভাষা-শহিদ এক্সপ্রেস কবে রওয়ানা হইবে? কবে হইবে নতুন নাম? হইবে তো? পণ্ডিতেরা বলেন – মাতৃভাষা দ্বিতীয় মা। দিল্লিতে রেল দপ্তর 'মা-মাটি-মানুষ'-এর পার্টির হাতেই। দাবি নতুন নহে। মমতাজি শুনিয়াছেন। করেন নাই। দীনেশজি-কে ফিনিশ করিয়া এখন মুকুলের মাথায় মুকুট পরাইয়াছেন। তিনি করিবেন? সেলুনে কথাটা তুলিতেই রিটায়ার্ড অধ্যাপকবাবু বুঝাইলেন – বিষয়টা কেবল রেল মন্ত্রকের নহে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং আসাম সরকারেরও মতামত দরকার হইবে। তাহারা কেহই এই দাবি মানিতে চাহিবে না। বুঝিলে? কারণটা নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ চিন্তা!

ভাবিতে ভাবিতে কাস্টমারের মাথায় বার তিনেক কাঁচির খোঁচা দিয়া বেজায় ধমক খাইলাম। মাতৃভাষা মানে ১৯৫২, পূর্ব পাকিস্তান। শহিদ রফিক সালাম জব্বর বরকত। উত্তাল আন্দোলন। ১৯৭১-এ তারই জেরে পৃথিবীর প্রথম ভাষা-রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম। ফেব্রুয়ারি আসিলে একুশ আসে। মার্চ আসিলে তিন তারিখ আসে। ককবরক ভাষার শহিদ ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, ১৯৭৫। মার্চেই আসে ১৬ তারিখ, ১৯৯৬। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষার শহিদ সুদেষ্ণা সিংহ, ১৯৯৬-এর করিমগঞ্জে। মে মাসের ১৯শে, ১৯৬১-তে শিলচরে শহিদ— **শচীন্দ্রমোহন, চণ্ডীচরণ, বীরেন্দ্র, হিতেশ, তরণী, কুমুদ, সত্যেন্দ্র, সুকোমল, কানাইলাল, সুনীল এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কুমারী কমলা।**

কেন্দ্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার। মা-মাটি মানুষের তৃণমূল— তাহারই শরিক। আসামেও সরকার কংগেসেরই। 'ভাষা-শহিদ স্টেশন' নামকরণে তাহাদের তীব্র আপত্তি থাকাই স্বাভাবিক। ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে ভাষা-আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালাইযাছিল পাকিস্তান সরকারের পুলিস। কিন্তু, শিলচরে? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবর্ষে তাঁহারই মাতৃভাষা বাংলা-র মর্যাদা দাবি করায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় 'ভাষা-গণহত্যা' করিয়াছিল কে? আসামের কংগ্রেস সরকারের পুলিস। জোলাইবাড়িতে ধনঞ্জয়, করিমগঞ্জে সুদেষ্ণা কাহাদের গুলিতে খুন হইয়াছিলেন? কংগ্রেস সরকারের পুলিসের গুলিতে!

কেহ মুখে না বলিলেও সকলেই জানেন, ভাষা-শহিদদের বুকের রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে কংগ্রেস-এর 'হাত'-এ। সম্ভবত এই লজ্জাতেই ভাষা-শহিদ স্মরণের অনুষ্ঠান আজও কংগ্রেস নেতারা এড়াইয়া চলিতেই চেষ্টা করেন। এমনকি, একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসেও কংগ্রেস নেতৃত্বকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যেমন সর্বত্র দেখা যায় বাম নেতাদের। বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে ভাষা-রাষ্ট্র বাংলাদেশের সম্মান-জ্ঞাপন লইয়া কংগ্রেসি কলরব থামিয়া গিয়াছে। থামিবেই, কারণ ভাষা প্রসঙ্গে কংগ্রেসের ইতিহাস কেবল লজ্জার। ছোট ছোট সমস্ত ভাষা-গোষ্ঠীর মাতৃভাষা-কে ইজ্জত করা, তাহাদের বিকাশে সহায়তা করা – কখনও জাতীয় কংগ্রেসের অভিধানে ছিল না। আজও স্বাধীন দেশের কোনও ভাষা-নীতি নাই! দেশীয় ভাষার বিকাশের বদলে 'খিচুড়ি-ভাষা'-র রন্ধন এবং বিতরণকেই উৎসাহ দিতেছেন আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার।

কংগ্রেস দল নিজের এই লজ্জা মুছিতে চায়, হাতের রক্তের দাগ ধুইয়া ফেলিতে চায় – অন্তত এইটুকু প্রমাণ করিতেও শিলচর রেল স্টেশনের নাম 'ভাষা-শহিদ স্টেশন' করিবার উদ্যোগ লইতেই পারে। না লইলে কংগ্রেস মানেই 'সর্ব অঙ্গে ব্যথা ওষুধ দিব কোথা', কংগ্রেস মানেই 'ক্যান্সার, আর চিকিৎসা নাই', – কংগ্রেস মানেই 'সংশোধনের অতীত'– এই ধারণাই আরও বদ্ধমূল হইবে। অন্য দিকে দায়িত্ব স্কন্ধে তুলিয়া লইবে মানুষ। আম জনতা আন্দোলনের ভাষাতেই ভাষা- শহিদদের মর্যাদা আদায় করিয়া ছাড়িবে!

সেলুন বন্ধ করিতে করিতে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার আর শ্রদ্ধেয় কবিমন্ত্রীর প্রতি একটি জিজ্ঞাসা মনে জাগিয়া উঠিল। 'একুশে ফেব্রুয়ারি'কে এই দুনিয়ায় সকলের আগে যাঁহারা জাতি-ধর্ম-বর্ণ বা কোনও নির্দিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর বন্ধনী হইতে মুক্ত করিলেন, তাঁহারাই 'মাতৃভাষা প্রণাম দিবস' নাম রাখিলেন কী করিয়া? 'প্রণাম' শব্দটি একান্তই কি হিন্দুগন্ধী নহে? ইদানীং চারিদিকে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাইতে গিয়া সরকারি-বেসরকারি 'কবি প্রণাম' শব্দবন্ধের উৎপাতেও চিন্তা-র মন বড়ই ভারাক্রান্ত। ইহার পর 'মাতৃভাষা সালাম দিবস' কিংবা 'কবি আদাব' জাতীয় শব্দবন্ধ হাজির হইলে দোষ কোথায়? ভাষা-শহিদ লইয়া কংগ্রেসের ভাষাহীনতা বোধগম্য হইলেও বামপন্থীদের কোনও অগভীর অদূরদর্শী পদক্ষেপ কাম্য নহে।

(প্রকাশ: ২১.০৫.২০১২)

ধসিতেছে

ষষ্ঠীতে মেজাজ সপ্তমে। গিন্নি-র শাশুড়ি-গৌরব ধূলায় লুণ্ঠিত। গ্যাস নাই। লাক্‌ড়ি চুলায় ফুঁ মারিয়া তাঁহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ। অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস! জামাই বাবাজীবনেরা পাতে বসিয়া বলিলেন, মাংস সিদ্ধ হয় নাই! কী সর্বনাশ! এদিকে গরমে সকলেরই সিদ্ধ হইবার জোগাড়। সকল শ্বশুরের মতো চিন্তাচরণও সাত সকালেই বাজার হইতে সিদ্ধ হইয়া ঘরে ফিরিয়াছে! মূল্যবৃদ্ধির আগুনে পুড়িয়া। মাছ মাংস মিষ্টি জামা-কাপড় সর্বত্র সকল জিনিস জ্বলিতেছে! তবুও কিনিতেই হইবে। অদ্যকার জামাই-কল্যাণে আগামীকল্য-র কন্যা-কল্যাণ, না জানিলে বিপদ! খরচ জামাই বাবাজীবনদেরও কম নহে। অনেক আশা বুকে। তাহার উপর লাভ-ক্ষতির গোপন হিসাব মাথায় থাকিলেও থাকিতে পারে! গরমে সিদ্ধ দেহ লইয়া পাতে অসিদ্ধ মাংস পাইলে তাহাদের পোষাইবে কেন?

গ্যাস নাই! আসাম হইতে গ্যাস কেন আসিতেছে না, পত্রিকায় পড়িয়াও বোধগম্য হয় নাই। শুনিয়াছি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এইবার রান্নার গ্যাস এবং ডিজেলের দাম আরও একপ্রস্থ বাড়াইতে মনস্থ করিয়াছেন। অতি উত্তম! তাহা না হইলে ষোলো কলা পূর্ণ হইবে কী করিয়া! পেট্রলের দাম এক লাফে সাড়ে সাত টাকা বাড়ানো হইয়াছে ২৩ মে। রামায়ণের হনুমানের পর এতবড় লাফের দৃষ্টান্ত নাই। আরও একখান রেকর্ড মনমোহন সরকারের! তাঁহার দ্বিতীয় সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা (ইউ পি এ) সরকারের মাত্র তিন বছরে পেট্রলের দাম লিটারে ৩০ টাকা বাড়িয়াছে! সাধে কি ছোট জামাই-এর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইতেছি! ধার দেনা করিয়া ছোট মেয়ের বিবাহে বেকার বাবাজীবনকে বাইক দিয়াছিলেন গিন্নি। সেই বাইক এখন তেলশূন্য উপবাসে মৌন-ধ্যান করিতেছে। ফিস্‌ফিস-কানাকানি-গুঞ্জনে শুনিয়াছি, জামাইজীবনকে পেট্রলের জন্য মহার্ঘ ভাতা (বর্ধিত হারে) শ্বশুরালয় হইতেই প্রতি মাসে প্রদান করিতে হইবে! নহিলে, বাইক নাকি ফেরত আসিবে!

ফলে, কেবল গিন্নির নহে। এই ষষ্ঠীতে সকলেরই মেজাজ সপ্তমে। দেশসুদ্ধ জনতার। কী চলিতেছে দিল্লিতে! লক্ষ-কোটি টাকা লুণ্ঠনের এক-একখানা উপাখ্যান ফাঁস হইতেছে, নেতা-মন্ত্রীরা কেহ কেহ বিপাকে পড়িয়া জেল-এ যাইতেছেন বটে, কিন্তু দেশবাসীকেই সেই লুণ্ঠিত সরকারি কোষাগারের ঘাটতি পূরণ করিতে হইতেছে। উহারা প্রথমে ভোট করিবেন, পরে লুট করিবেন। আর জনগণের পিঠে চাবুক মারিয়া লুটের টাকা আদায়

করিবেন! ডিজেল পেট্রলের দাম বাড়িলে মুদ্রাস্ফীতির সহিত সমস্ত নিত্য পণ্যসামগ্রীর দামও সেই হারে অথবা আরও বেশি হারে বাড়িবে। ইহা চুল-দাড়ি-কাটা চিন্তা শীলও অনায়াসে বুঝিতে পারে। ইহার পর ডিজেলের দাম আরও বাড়ানো হইলে পরিস্থিতি কোথায় যাইবে, অনুমান করাও কষ্টকর। রান্নার গ্যাস মিলিতেছে না। কিছুদিনের মধ্যে হয়ত মিলিতে থাকিবে। কিন্তু দাম বাড়িলে মানুষ কিনিবে কী করিয়া! এত অবিবেচনা, এত নিষ্ঠুরতা, এতটাই দায়িত্বহীনতা-র ঘন কালো মেঘে আবৃত দেশের ভাগ্যাকাশ? কাহাদের হাতে স্বাধীন দেশের ভাগ্য সঁপিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে চাই?

বলা হইতেছিল ডলারের তুলনায় টাকার দাম ধসিয়া যাওয়াতেই নাকি পেট্রলের এই অভাবনীয় মূল্যবৃদ্ধি। দেখা গেল যুক্তিটা অর্ধসত্যও নহে। প্রায় অসত্য। বলা চলে, ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারা। ডলার দেখাইয়া রোলার চালাইবার যুক্তি হাজির করা। বামেরা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়ামের বর্তমান দরদাম, পরিবহণ ও পরিশোধনের খরচ এবং মুনাফা যোগ করিয়াও এক লিটার পেট্রলের দাম ৪৫ টাকার বেশি হওয়া উচিত নহে। অথচ দাম হইয়াছে ৭২ হইতে ৭৯ টাকা পর্যন্ত। প্রতি লিটারে প্রায় ৩০ টাকা করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা-র সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে একচেটিয়া তেল কোম্পানিগুলিকে। কে না জানে, এই কোম্পানিগুলির টাকাতেই কংগ্রেসের মতো দল ভোট করিযা থাকে! কিন্তু, ডলারের তুলনায় টাকা-র দাম ধসিবার জন্যে দায়ী করিব কাহাকে? সোনিয়া-মনমোহনজিদের প্রগতিশীল মোর্চা সরকারই তো এই কৃতিত্বের দাবিদার!

শুনিয়াছিলাম— পেট্রলের দাম কিছু কমানো হইবে! একলাফে অনেক বেশি দাম বাড়াইয়া পরে সামান্য কমানোর সেই পুরান খেলা! তৈলাক্ত বংশদণ্ড বাহিয়া বান্দরের উপরে উঠিবার গল্প! পাঁচ টাকা বাড়াইবার সিদ্ধান্ত লইয়া একলাফে সাড়ে সাত করা। তাহার পর 'সকলের অনুরোধে' আড়াই কমানো! কিন্তু এইবার ওই চালাকিতে দেশবাসীকে ভুলানো যাইবে বলিয়া মনে হয় না। দেশবাসী খেপিয়া গিয়াছে। কেবল 'দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি' নহে। জনজীবনের সর্বদেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিয়াছে দিল্লির ইউ পি এ সরকার। ৩১মে প্রতিবাদের ঝড় উঠিবে আসমুদ্রহিমাচল। বি জে পি বন্‌ধও করিবে। ত্রিপুরায় ১২ ঘন্টার ধর্মঘট হইবে বামফ্রন্টের ডাকে।

এখন প্রতিদিন, প্রতিবাদের দিন। সেলুনের সম্মুখ দিয়াই মিছিলের পর মিছিল। নলছড় উপনির্বাচনের মুখে পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে লোক-দেখানো প্রতিবাদও কবিতে শুনি নাই রাজ্যের কোনও 'জনদরদি' কংগ্রেস নেতাকে! অথচ, গতবছর রাজ্য সরকার মেয়াদ শেষে সাময়িক ভর্তুকি তুলিয়া লইতেই এই নেতারা রাস্তায় রাস্তায় প্রবল চিৎকার করিয়াছিলেন! তাই, তাঁহাদের আর আশা নাই। এখন প্রতিদিন দুইখান ধসের খবর। টাকা ধসিতেছে, কংগ্রেস ধসিতেছে। দুই ধসের জন্যই দায়ী কংগ্রেস। জাগিয়া ঘুমাইলে ইহাদের জাগাইবে কে!

(প্রকাশ: ২৮.০৫.২০১২)

ঐক্য

শূন্য এবং এক। এহ দুইখান সংখ্যা লইয়া বেজায় গোলমাল। শূন্য-তে যুগ যুগ মজিয়া আছেন বিজ্ঞানীরা। মহান ডিজিটখানার আবিষ্কার নাকি ভারতবর্ষেই। জিরো-র কৃষ্ণগহ্বরের টানে এখন দেশে আর্থিক প্রবৃদ্ধির ডিজিট ক্রমেই নামিতেছে, নামুক! তবুও, ভারতবাসী তো! জিরো-গৌরবে সকলেই নিজেকে একেক জন হিরো ভাবিতে দোষ কী! কেবল, চিন্তা-গিন্নির ওই জিরো বা শূন্যতে ঘোর অরুচি। তাঁহার সন্তান-দলের কোনও একজন যদি মহান ডিজিটখানা ইশ্‌কুলের অঙ্ক-খাতায় ধারণ করিয়া বাড়ি ফিরিতে পারে, তখন শিবের বদলে স্বয়ং শিবানীই বঁটি-হস্তে তাণ্ডব-নৃত্য শুরু করেন!

'এক' সংখ্যাটির দেহকান্তি বড়ই পিছল! ধরিতে চাই, ধরা দেয় না। ভাবি এক, হয় 'আরেক'! চাই এক, পাই 'আরেক'। এক আসিলে, যায় 'অনেক'। এক নম্বরি প্রায় কোথাও নাই। দুই-তিন-দশ নম্বরির অভাব নাই! শিশুকালে মায়ের হাত ধবিয়া কোনও এক আশ্রমে এক 'গুরুমাতা'কে চক্ষু মুদিযা গাহিতে শুনিয়াছিলাম – 'এক হইয়া যা-রে মনা, এক হইয়া যা ...।' বড় হইয়া সকলের মতো বুঝিয়াছি – এক হওয়া সহজ নহে। তবুও সকলেই এক হইতে বলে। ঐক্য বা একতার জন্য ভাষণে কান গরম করেন নীতিহীন রাজনীতির আদর্শ নেতারা! সেই যে – এক শয্যাশায়ী বৃদ্ধ তাঁহার চাবি পুত্রের হাতের চারিখানা বাঁশের কঞ্চি একত্রে বাঁধিয়া ভাঙিতে বলিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ছিল? পাঠক মাফ করিবেন। – সেলুন চালাই। নির্বুদ্ধিতায় যত প্রকাণ্ড, কাণ্ডজ্ঞানে ততখানিই শূন্যভাণ্ড। তবুও, কেন জানি না, জাতীয় কংগ্রেস নামক ১২৭ বছব বয়সী দলটার দিকে চাহিয়া চক্ষু ভিজিলেও গল্পের সেই হতভাগ্য বৃদ্ধকে ওই নামেই ডাকিতে বড় ইচ্ছা করে!

কংগ্রেসে ঐক্য নাই। কখনও ঐক্য হয় না, গড়িয়া উঠে না। তবুও নেতারা দোকান খুলিয়াই 'ঐক্য' নামক সোনার পাথরবাটি বিক্রয়ের হাঁকডাক শুরু করেন। 'এইবার ঐক্য হইবে' ভাবিয়া অনেক ক্রেতা আকৃষ্ট হন, অনেকে পাশ কাটাইয়া যান। কিন্তু ঐক্য হয় না। কেন হয় না – বুঝিতে পারেন না সরলমতি কর্মী-সমর্থকেরা। তলাইয়া দেখিলে বুঝিতেন – 'বহু'-র অস্তিত্ব না থাকিলে ঐক্যের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষাই জাগে না। জাগিতে পারে না। কংগ্রেসে 'এক' আছেন হাইকমান্ড। আর কিছু নাই, কেহ নাই। ঐক্য-র জন্য শুভ লক্ষ্য, শুভ আদর্শ

– আর জনস্বার্থের জন্য আত্মস্বার্থের ত্যাগ চাই। বালাই ষাট! কংগ্রেস বহুকাল আগেই এইগুলি বিসর্জন দিয়াছে।

কোনও গুরুর শিষ্যবাহিনীরও এক ধরনের ঐক্য থাকে। বিশ্বাসের ঐক্য। বি জে পি-রও একটা বিশ্বাস আছে। ক্ষতিকারক হইলেও আছে। কিন্তু, কংগ্রেসের নেতা কর্মী-সমর্থকেরা কোনও অভিন্ন বিশ্বাসের বন্ধনেও আবদ্ধ নহেন। সকলেই আপন-আপন স্বার্থ গুছাইতে ব্যস্ত, ক্ষমতা-র চেয়ারের পায়া ধরিবার স্বপ্নে বিভোর! ধরাধরি, তেলাতেলি, ঠেলাঠেলি, কাড়াকাড়ি হইতে মারামারি! নিছক সর্দার-প্রথায় যেটুকু ঐক্য সম্ভব, ডাকাতিতে বাহির হওয়া ডাকাত দলের মধ্যে যতক্ষণ ঐক্য সম্ভব, 'দাদা নাম কেবলম্' স্লোগানে গড়িয়া উঠা গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে যে ধরনের ঐক্য সম্ভব – অনেকটা সেই রকম ঐক্য কংগ্রেসে আছে বই কি! কিন্তু, জনস্বার্থহীন ব্যক্তিগত ধান্ধা আর চালাকিতে কোনও স্থায়ী ঐক্য কোথাও গড়িয়া উঠিতে পারে না।

তাই একতাহীন কংগ্রেস! এক 'দাদা' আগাইলে পিছন হইতে অনেক 'দাদা' মোলায়েম লেঙ্গি মারেন। একজনকে ভূপাতিত করিয়া আরেকজন আগাইলে তিনিও অল্পকালের মধ্যেই পশ্চাতের লেঙ্গি খাইয়া ধূলিশয্যা নেন। এই অনিবার্য ভবিতব্য প্রত্যেক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির। তবুও সভাপতি হইয়াই সুদীপ রায়বর্মণ তাঁহার পূর্বসূরিদের মতোই ঐক্যের দোকান খুলিয়াছেন। অন্য দিকে, আসল লক্ষ্যের পানেও তাঁহার চলার বিরাম নাই। ৬০ কেন্দ্রে টিকেট প্রার্থী (ধনবান) বাছিবার জন্য বিশ্বস্ত 'পর্যবেক্ষককুল' নিযুক্ত করিয়াছেন! তাই, পিছনে লেঙ্গিও প্রস্তুত হইতেছে। ভূপাতিত সুরজিৎ দত্ত খাড়া হইবার আগেই বেসুর গাহিতেছেন। স্বাভাবিক! সভার মধ্যে সভাপতির মাথা লক্ষ্য করিয়া মোবাইল ছুঁড়িলে ঐক্য হয়? মোবাইল ভাঙিলে মোবাইল মিলিবে। মাথা ভাঙিলে মাথা মিলিত কোথায়! সুদীপ ভুলিলেও সুরজিৎ ভুলিতে পারেন? কংগ্রেস ভবনে তালা মারিয়া এখন ঐক্যের ডাক? ভুলি কেমনে, আজও যে মনে ...! তাই – কংগ্রেসের ওষুধ নাই। দলের ভিতর 'এক' সংখ্যাটি হাইকমান্ডের ঘরে বন্দী। অতীত বিরাট হইলেও ভবিষ্যৎ-এর সংখ্যাটি 'শূন্য'!

(প্রকাশ: ০৪.০৬.২০১২)

১২ জুন

– কী হে চিন্তা, হাত কাঁপে ক্যান? নেশা করলা নাকি!

– না আইজ্ঞা। নেশা তো করি নাই, তবে জবর ভয়।

পুলিসবাবুর ধমকে এই পর্যন্ত বলিতেই তিনি সেলুনের চেয়ারে বিপুল পশ্চাদাঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কীসের ভয়? মৌন থাকিয়াই তাঁহার গোঁফের প্রজাপতি-ছাঁট সম্পন্ন করিলাম। ভাবিতেছি – চুল কাটিতে কচিৎ-চকিতে এক আধখান ভুল হয় না এমন শীলের বেটা নাই। কিন্তু, এখন দেখিতেছি প্রাণ-সংশয়! কানের পিছনে কাঁচির খোঁচা লাগিলেই সাত ধারার মামলা হইতে পারে। 'অ্যাটেম্প্ট-টু-মার্ডার'! খুনের চেষ্টা। সকালে পত্রিকা পড়িয়া মাথাখান নষ্ট করিয়া দিয়াছেন গিন্নি।

নলছড়ের জুমের ঢেপা বাজারে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে 'খুনের চেষ্টা' হইয়াছে শনিবারের বারবেলায়। দলের নেতাদের তিনখান খালি গাড়ি প্রায় রাস্তার উপরেই নাকি দাঁড় করানো ছিল। পশ্চাতের দিক হইতে আসিতে থাকা একখান বালু-র ট্রাক ব্রেকফেল করিয়া পশ্চাতের গাড়িটির পশ্চাতে ঢু মারিয়াছে। তেমন কোনও ক্ষতি হয় নাই কাহারও। কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের উর্বর মস্তিষ্কে এখনও জং ধরে নাই। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া ফেলিলেন – ইহা 'শাসক দলের ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র'! তরুণ প্রদেশ সভাপতি না হয় গাড়িতেই ছিলেন না, তাহাতে কী হইল? তাঁহাকে খুনের জন্যই তো সি পি এম ওই ট্রাকটিতে বালু ভরিয়া পাঠাইয়াছিল! থানায় মামলা হইল। আগরতলায় হইল সাংবাদিক সম্মেলন! পত্রিকায় পড়িয়া গিন্নি বলিলেন – '২০১৩ নির্বাচনের আগে চুল কাটিতে গিয়া কাহারও কান কাটিও না, এমনকি কাঁচির খোঁচাও মারিও না। 'সুপরিকল্পিত হত্যার চেষ্টা'-র অভিযোগে মামলা হইতে পারে। তোমার জেল হইলে আমরা খাইব কী, হ্যাঁ-গা!' সেই হইতে সত্যই হাত কাঁপিতেছে।

কিন্তু সি পি এম নেতারা বড়ই বেরসিক। তাঁহারা তীব্র নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন, 'নিছক একটি দুর্ঘটনা লইয়া মিথ্যা প্রচার করিতেছে কংগ্রেস।' হোক মিথ্যা! কার্য সমাধা করিতে

মিথ্যা বলা যাইবে না, এমন কথা কংগ্রেসের কোন্ অভিধানে লেখা রহিয়াছে? তাঁহারা ত্রিপুরায় পশ্চিমবাংলার ধাঁচে 'পরিবর্তন' আনিতে চাহিতেছেন। পশ্চিমবাংলাকে নকল করিতে হইবে না? সিঙ্গুর আন্দোলনের কালে তৃণমূল নেত্রীকে 'খুনের চেষ্টা' করিয়া এক ট্রাক ড্রাইভারকে হাজতবাস করিতে হয় নাই? মিথ্যা হইলে মিথ্যা! কার্য তো সমাধা হইয়াছে! মুশকিল হইল, ত্রিপুরায় কংগ্রেস নেতারা সকলেই মেধা-তালিকার সেরা রত্ন। ভবিষ্যতে কী হইবেন জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই এক কথা বলেন— 'মুখ্যমন্ত্রী'! নিজস্বতা বুঝা বড় দায়! তাঁহারা মাছিমারা কেরানির মতন নকল করিতে যাইয়া খাতা-র পাতায় মরা মাছিটিকেও বাদ দিতে পারিতেছেন না! একটি দুর্ঘটনা-কে বঙ্গেও 'খুনের ষড়যন্ত্র' বলিয়া প্রচার হইয়াছিল। এখানেও সুযোগ মিলিতেই তাহার কার্বন-কপি তুলিয়া আনিয়াছেন সুদীপবাবুরা। ইহার পূর্বে কমলপুরের হালহালিতে দুর্ঘটনায় কংগ্রেসের এক পঞ্চায়েত সদস্যের মৃত্যু লইয়া এমনই প্রচার চালানো হইয়াছিল। গাড়ির মালিক সিটু সমর্থক হওয়ায় গল্পের গরু গাছে চড়িয়াছিল। কিন্তু, এইবার কেস উল্টা হইবে কে জানিত! খোঁজখবর কবিতেই ভুস্ করিয়া বেলুন চুপসাইয়া গেল! জুমের ঢেপা-র বালু বোঝাই সেই ক্যান্টার ট্রাকখানির মালিক নাকি কাঁঠালিয়ার এক স্থানীয় কংগ্রেস নেতা সঞ্জিত ঘোষ। গ্রেপ্তার হওয়া চালকও কংগ্রেসেরই ইনটাক সদস্য!

তাহার পরেও 'প্রচার' চলিবে। চলিতেছে। নলছড় বিধানসভা কেন্দ্রের ভিতরেই জুমের ঢেপা কিনা! এই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সরব প্রচার শেষ হইয়াছে রবিবার। ত্রিপুরার জনগণ 'পরিবর্তন' চাহিতেছেন— এই অমৃতবাক্য কংগ্রেস বলিতেছে। তৃণমূল বলিতেছে। বিশ্বাসী অজয়-বিজয়রা বলিতেছেন। 'সর্বাধিক প্রচারিত'-রা প্রচার করিতেছেন। টিভি ভাই(রাস)রা শুনাইতেছেন। পড়িতে-পড়িতে, দেখিতে-দেখিতে, শুনিতে-শুনিতে জনগণের চোখ-কান টনটন করিতেছে! 'পরিবর্তন'-এর আকাঙ্ক্ষা নলছড়ের ভোটে যে প্রমাণ করিতেই হইবে। উল্টা প্রমাণ হইলে আছাড় খাইতে হইবে। সেমি-ফাইনালে হারিলে ফাইনালের আশা ধূলায় মিশিবে। তাই সর্বশক্তি নিয়া নলছড়ে ঝাঁপাইয়াছে কংগ্রেস।

পুলিসবাবু বুঝাইলেন, বুঝিলে চিন্তা— মিথ্যাও একটা শক্তি! ভোটযুদ্ধে কংগ্রেস ঘরানার অন্যতম প্রধান অস্ত্র। নলছড়ে ইহার প্রয়োগ এইবার ব্যাপকতব। বাম প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্টকে হুমকির ঘটনা চাপা দিতেই 'খুনের চেষ্টা'-র নাট্য-নির্মাণ? হইলেও হইতে পারে। কিন্তু কেবল তো মিথ্যা নহে, লোভের অস্ত্রও প্রয়োগ হইতেছে। নগদ টাকা, ঘড়ি, মোবাইল, টিভি এমনকি কম্পিউটারও বন্টনের অভিযোগ উঠিয়াছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। একটি 'সর্বাধিক প্রচারিত' প্রচার করিয়াছে— 'নলছড়ে পরিস্থিতি কংগ্রেসের অনুকূলে। সি পি এমের দুশ্চিন্তার অন্ত নাই।' শনিয়াছি, কংগ্রেসের চাপে ভোটের মেশিন আনা হইয়াছে জেলার বাহির হইতে। বি এস এফ দিয়া ভোট হইবে। কী জানি— বাংলাদেশ হইতে মানিক সরকারের কয়েক

হাজার 'ফ্যান' যদি ঢুকিয়া পড়েন? আর কোনও কারণ বাহির করা চিন্তা-র বুদ্ধিতে তো কুলাইতেছে না! তবে কেবল পুলিস-বি এস এফ নহে, ভোটে শান্তি বজায় রাখিতে নজর রাখিবেন ভোটাররাও, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

কী হইবে ১২ জুনের ভোটে? চিন্তা-গিন্নির এই জিজ্ঞাসার জবাব দিয়াছেন এক কংগ্রেস বিধায়ক। নিজের দলের প্রার্থীর সমর্থনে ভাষণ দিয়া তিনি বলিয়াছেন 'নলছড়ে ধনী আর গরিবের লড়াই। জয়ী হইবে গরিবের দল!' যিনি বলিয়াছেন – তিনিই রাজ্যের সবচেয়ে ধনী বিধায়ক। ২০০৮-এ ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ ঘোষণা দিয়াছিলেন মাত্র(!) ১৮ কোটি! আরও বহু কোটি গোপন করিয়াছেন – এই অভিযোগে ভারতের নির্বাচন কমিশন তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা শুরু করিতে বলিয়াছে। তবুও, তিনি ঠিকই বলিয়াছেন। নলছড়ে গরিবেরাই জিতিবে। সম্ভবত গতবারের তুলনায় আরও বেশি ভোটে। চিন্তা-র কাছে যে খবর আসিতেছে তাহাতে স্পষ্ট, ত্রিপুরার গ্রাম-শহর-পাহাড়ে উন্নয়নের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় যে পরিবর্তন দ্রুত ঘটিয়া চলিয়াছে, তাহাতেই নলছড়ের মানুষও খুশি। অন্য 'পরিবর্তন' আমদানিতে তাহাদের আস্থা নাই। ভরসা নাই। কংগ্রেস ঝাঁপাইলেও সুবিধা হইবে না।

শুনিয়া চিন্তা-গিন্নি চিতান সুরে গাহিয়া উঠিলেন, "ওলো সই – ইলিশ মাছ কি বিলে থাকে/কিলাইলে কি কাঁঠাল পাকে/মধু হয় না বল্লা-র চাকে ...!"

(প্রকাশ: ১১.০৬.২০১২)

রামধাক্কা!

আহা, কী শোভা কংগ্রেস নেতাদের মুখে! নলছড়ের কিলচড় হজম করিয়াও যেন কিছুই হয় নাই! কিছুই ঘটে নাই! প্রায় দ্বিগুণ ব্যবধানে বামফ্রন্টের কাছে গো-হারা হারিয়াও কংগ্রেস কেমন রোমান্টিক, কেমন নস্টালজিক! কেমন মৃদুমন্দ হাসিয়া নেতারা বুঝাইতেছেন – 'একটা উপনির্বাচনে জয়-পরাজয়, উহা কিছু নয় – কিছু নয়'! ইহাই কি পরিবর্তন? কেহ বিস্মিত, কেহ বিভ্রান্ত। কেহ ধন্য ধন্য করিতেছেন!

ভোট হইল নলছড়ে, আর পরিবর্তন আগরতলায়! সি পি এমের ব্যাপক রিগিং! সন্ত্রাস, বুথ দখল! ভোটযন্ত্রে কারচুপি অথবা সায়েন্টিফিক রিগিং! এই এত সকল 'শব্দ' অনাদরে অবহেলায় পড়িয়া থাকিল। কংগ্রেস নেতারা বরাবরের মতন ব্যবহার করিতেই পারিতেন। সাংবাদিক সম্মেলনে গরম হাওয়া উঠিত। কিন্তু উঁহু – সকলেই ডিপ-ফ্রিজে মাথা ঢুকাইয়া ঠান্ডা রহিলেন। হাসি-মশকরা করিলেন। ইহা পরিবর্তন নহে? 'মাথা'র পরিবর্তনে এত পরিবর্তন? চিন্তা-গিন্নি শুনিয়া কহিলেন – শব্দ হইল ব্রহ্ম! এই শব্দভাণ্ডার মহাভারতের 'একাঘ্নি বাণ' ব্রহ্মাস্ত্রের মতন। বারো-তে নলছড়-এর ঘটোৎকচ বধে নষ্ট না করিয়া কংগ্রেস তেরো-র বিধানসভা ভোটের পরে বলিবার জন্য রাখিয়া দিয়াছে!

তিলিস্মাৎ-কাণ্ডের শেষ নাই! কংগ্রেস নেতারা অকস্মাৎ কোথা হইতে নলছড়-এর সহিত বড়দোয়ালির তুলনা টানিয়া আনিলেন। বলিলেন, বড়দোয়ালিতে তাঁহারা জিতিয়াছিলেন, নলছড়ে বামেরা। সেমিফাইনাল ড্র! এইবার ফাইনাল তেরোতে! চিন্তাচরণ বিমোহিত। এই না হইলে কংগ্রেস! মস্তিষ্কের এই উর্বরতা কোন ব্র্যান্ডের সার প্রয়োগের ফল – জানিতে ইচ্ছা করে! ২০০৮-এর বিধানসভা নির্বাচনেব পরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদারের মৃত্যুতে ২০০৯-এর ২৮ মে বড়দোয়ালির উপনির্বাচন হইয়াছিল। উহা সেমিফাইনাল হইল কী করিয়া? 'মিশন ২০০৮'-এর ফাইনালে ধরাশায়ী কংগ্রেস ২০০৯-এর বড়দোয়ালিকে কখনও সেমিফাইনাল বলে নাই। কারণ ফাইনালের পরে সেমিফাইনাল হয় না – এই কাণ্ডজ্ঞান তখনও কংগ্রেস বোধহয় হারায় নাই। বরং, তেরো-র ভোটের আট মাস আগে নলছড় উপনির্বাচনকে কংগ্রেস নেতারাই 'সেমিফাইনাল' বলিয়াছিলেন। বলা হইয়াছিল

— নলছড় হইতেই বামফ্রন্টের বিসর্জনের যাত্রা শুরু হইবে। ত্রিপুরার মানুষ 'পরিবর্তন' চাহিতেছেন — প্রমাণ হহবে নলছড়ে। দলে দলে কংগ্রেস নেতারা নলছড়ে ঝাঁপাইয়াছিলেন। ভোটের দুই দিন আগেও বিরোধী নেতা নলছড়ে টিভি ক্যামেরার সামনে বলিয়াছিলেন — 'ঘরে ঘরে গিয়া বুঝিয়াছি মানুষ আর বামফ্রন্টকে চায় না, পরিবর্তন চায়!' ভোটের ফলাফলে দেখা গেল, পরিবর্তনের গাড়ি ব্যাক গিয়ারে ছুটিতেছে। পরিবর্তন চাওয়া দূরে থাক, লোকে আরও জোরে শোরে, আরও মজবুত বামফ্রন্টকে চাহিতেছে। 'সেমিফাইনাল ড্র' বলিয়া কংগ্রেস নেতারা দলের একজন কর্মী-সমর্থককেও কি 'টুপি' পরাইতে পারিবেন?

আরও একখান আবিষ্কার — 'সহানুভূতির ভোট'! রাজীব গান্ধী খুন হইবার পর কংগ্রেস দেশে ওই ভোট পাইয়াছিল। ঝোলা হইতে সেই শব্দযুগল বাহির করিয়া নলছড়ে বামেদের বিপুল তাৎপর্যের জয়টাকে খাটো করিবার কী করুণ প্রয়াস! সি পি এমের জনপ্রিয় নেতা সুকুমার বর্মন খুন হন নাই। স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল তাঁহার। বরং, সি পি এম দল তপনচন্দ্র দাসকে প্রার্থী করিবার পর সমালোচনার তুফান তুলিয়া এমনও বলা হইয়াছিল, সুকুমারবাবুর বিধবা পত্নী পারুলবালাকে প্রার্থী না করিয়া সি পি এম 'মহাভুল' করিল। পারুলবালা 'সহানুভূতির ভোট' টানিতে পারিতেন। তপনচন্দ্র কত বড় টাকার কুমির, কত ডজন রাবার বাগানের মালিক — ইত্যাদি লিখিয়া মামলাও খাইয়াছেন কেহ কেহ। সি পি এম রাজনৈতিক শক্তি পরীক্ষায় জনচেতনার গভীরতা জরিপ করিতেই পার্টির লোকাল সম্পাদককে প্রার্থী করিল। শান্তি আর উন্নয়ন, আরও উন্নয়নের কথা বলিয়া ভোট চাহিল। কেন্দ্রের নীতিকে আক্রমণ করিল। রাজ্যে বিরোধীদের 'জনবিরোধী' ভূমিকা ব্যাখ্যা করিল এবং সামনে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার গড়িবার পথ প্রশস্ত করিতে ভোট চাহিল। মানুষ বিপুল সমর্থন দিলেন। ইহা-কে 'সহানুভূতির ভোট' বলিয়া কংগ্রেস কি নিজেকেও প্রবঞ্চনা করিতেছে না?

অবশ্য, চিন্তা-গিন্নির কথা মানিলে এক দিক হইতে ঠিকই বলিয়াছেন কংগ্রেস নেতারা। 'সহানুভূতির ভোট'ই বটে! ভোটে ওই দলের দুর্দশা দেখিয়া 'সহানুভূতি' জাগিতেই পারে। কেরলের একটি কেন্দ্র বাদে এইবার দেশের সমস্ত উপনির্বাচনে কংগ্রেস দলের শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছে। কারণগুলি নলছড়ের ভোটারদেরও প্রভাবিত করে নাই— বলা যাইবে না। ৩৮টি বুথের মধ্যে মাত্র তিনটিতে কংগ্রেস সামান্য বেশি ভোট পাইয়াছে ফ্রন্টের তুলনায়। বাকি ৩৫টিতেই তাহারা অনেক পিছনে। তাই, চিন্তা-র ধারণা, নলছড়ের বার্তা খুব পরিষ্কার। বর্জনের তীব্রতা স্পষ্ট। অন্য দিকে বামফ্রন্টের প্রতি আস্থাও প্রবলভাবে দ্বিধাহীন। নলছড় এই বার্তা পাঠাইয়াছে গোটা ত্রিপুরার কাছে। হয়ত, এহ বার্তা টালমাটাল পরিস্থিতির শিকার সমগ্র দেশটার কাছেও। কেবল তেরো-র রাজ্য ভোট নহে, চৌদ্দোর-র দেশব্যাপী ভোটের দিকেও এই বার্তা ছুটিয়া চলিবে। 'কিছু নয়' বলিয়া ইহাকে মুছিয়া ফেলা কঠিন নহে কি?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া চিন্তা-গিন্নি বলিলেন, নাঃ, বাংলার সহিত ত্রিপুরার কিছুই মিল খাইতেছে না দেখিতেছি। বাংলায় অনেক আগে হইতেই সকল নির্বাচনে বামফ্রন্ট ধাক্কা খাইতে শুরু করিয়াছিল। ত্রিপুরায় জনগণ উল্টা ধাক্কা মারিতেছেন বাম-বিরোধীদের। লোকসভা, এ ডি সি, পঞ্চায়েত, ভিলেজ কাউন্সিল, পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত — সকল ভোটেই ধাক্কার পর ধাক্কা! শেষে রামধাক্কা নলছড়-এ! কংগ্রেস হার স্বীকার করিবে কেন? খেলার নিয়ম কে না জানে! সেমিফাইনালে হারিলে কখনও ফাইনাল খেলা যায় নাকি! তাই তো উহারা 'ড্র' বলিতেছেন। কিন্তু হ্যাঁ গা— বাছাদের 'মিশন' যে এইবার আরও ভীষণ হইয়া উঠিল!

(প্রকাশ ঃ ১৮.০৬.২০১২)

কারণ

দিল্লির দশ নম্বর জনপথ। দেশের ভাগ্যরেখার মাথা! দশ-এর ভিড় করিবার অনুমতি নাই। আম পাবলিক-এর প্রবেশ নিষেধ! তাই বোধকরি ত্রিপুরার কংগ্রেস নেতারা ভাবিয়া-চিন্তিয়া ৯ জনই গিয়াছিলেন!

ম্যাডাম-এর নিরাপত্তা রক্ষীদের বিরুদ্ধে 'ব্যাপক আন্দোলন' দরকার! ত্রিপুরায় হইলে বাপের নাম ভুলাইয়া দেওয়া যাইত! দিল্লিতে কিছুই করিবার নাই! আন্দোলন করিলে ফলপ্রসূ হইবে না! তবে, ম্যাডাম-কে একটু সাবধান করিয়া আসিতে পারিলে ভাল হইত! তাঁহার শাশুড়ি তো ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতেই খুন হইয়াছিলেন। এখনকার রক্ষীদের মতিগতি মোটেই ভাল নহে। নহিলে— ত্রিপুরার প্রদেশ কংগ্রেসের সর্বোচ্চ অভিভাবক, একজন প্রাক্তন, মুখ্যমন্ত্রীকে এই নিরাপত্তা রক্ষীরা কি-না গাড়ি লইয়া ম্যাডামের বাড়িতে ঢুকিতে দিল না? অথচ গোয়ার ফেলেইরো-কে দেওয়া হইল! কী অপমান! তিনি ফেলেইরোর তুলনায় কোন দিকে ফ্যাল্‌না?

ত্রিপুরার নেতারা বলিলেন, ম্যাডাম শুনিলেন। নেতারা ভয়ে ভয়ে জ্বলিলেন, ম্যাডাম মৃদু হাসিয়া জল ঢালিলেন! মনে ভাবিলেন— ইঁহারা অবুঝ। ইঁহারা সবুজ। ত্রিপুরায় কিলাইয়া কাঁঠাল পাকাইতে চাহিতেছে। ক্ষমা ইঁহাদের প্রাপ্য। ম্যাডাম আদেশ দিবার আগেই কংগ্রেসে ডজনে ডজনে মাথা খসিয়া পড়ে। ইঁহাদের যে খসিল না, সেই বিস্ময়ে, সেই পরম কৃতজ্ঞতায় ৯ জোড়া চক্ষু ভিজিয়া উঠিল! কোনওরকমে গদগদ কণ্ঠে ম্যাডামের শ্রীচরণকমলের উদ্দেশে 'নমস্তে' রাখিয়া ইঁহারা ফিরিয়া আসিলেন।

কী কথা হইল? জানিতে চাহিলেন চিন্তা-গিন্নি। দেশের সকল ক্ষমতার চাবিগুচ্ছ ম্যাডামের শাড়ির অঞ্চলে বাঁধা। তিনি চাহিলে কী না হইতে পারে। রেলের ব্রডগেজ এবং সাব্রুম রেলের কাজ অতি দ্রুত শেষ হইতে পারে, আখাউড়ার সহিত দ্রুত রেল চলাচল শুরু হইতে পারে। জাতীয় সড়ক চার লেন হইতে পারে, বিকল্প জাতীয় সড়কও অবিলম্বে চালু হইতে পারে। ম্যাডাম চাহিলে ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের বঞ্চনা ঘুচাইয়া ত্রিপুরা বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ পাইতে পারে। ত্রিপুরার হাজার হাজার বেকারের চাকুরি হইতে পারে, শিক্ষক-কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় হারে বেতনভাতা সহজেই পাইতে পারেন। তিনি চাহিলে ত্রিপুরা শিল্পে উন্নত হইতে পারে, প্রাকৃতিক গ্যাস কাজে লাগাইয়া সার-কারখানা সমেত নানান

আধুনিক শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে। ম্যাডাম ইঙ্গিত করিলেই ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের বরাদ্দ কয়েকগুণ বাড়িতে পারে। কিন্তু হায় – এইসব বিষয়ে একটিও কথা হইল না। ত্রিপুরার বিরোধী দলের নেতারা দলের হাইকমান্ড তথা ইউ পি এ চেয়ারপার্সনের কাছে ত্রিপুরার আম-পাবলিকের জন্য কিছুই ডিমান্ড করিলেন না।

বরং উল্টা ঠোঁট ফুলাইলেন। মহমোহন জি-র কেন্দ্রীয় সরকার কি আমাদের দলের সরকার নহে? তাহা যদি হয়, এই সরকারের মন্ত্রীরা ত্রিপুরার উন্নয়ন লইয়া এত নাচানাচি করিতেছেন কেন? ত্রিপুরার বাম সরকারকে এত সার্টিফিকেট, এত প্রশংসা করিতেছেন যে ত্রিপুরাবাসী আমাগো কথা কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতেছে না। আমরা বলিতেছি— ত্রিপুরায় রেগা-র টাকা সি পি এম লুটপাট করিয়া খাইতেছে, আর আমাদের দলের কেন্দ্রীয় সরকার 'রেগার কাজে দেশের সেরা' বলিয়া ত্রিপুরার সি পি এম সরকারকে বারে বারে পুরস্কার দিতেছে। এই রকম পঞ্চায়েতের ই-ব্যবস্থাপনা, আধার প্রকল্প রূপায়ণ, নারী- পুরুষের সাক্ষরতার ব্যবধান হ্রাস ইত্যাদি অন্তত ১৫টি ক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে 'সেরা' পুরস্কার দিয়াছে কেন্দ্র। 'আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি' বলিয়া আমরা গলা ফাটাইয়া রক্ত বাহির করিলাম – আর 'আমাদের রাষ্ট্রপতি' ত্রিপুরার পুলিসকে সবচেয়ে ভাল কাজের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দিতে উপরাষ্ট্রপতিকে পাঠাইলেন! ছিঃ ছিঃ। আমাদের কথা লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? সর্বক্ষেত্রেই আমরা যাহা বলিতেছি – কেন্দ্র ঠিক তাহার উল্টা করিতেছে।

ম্যাডাম মৃদু হাস্য সহযোগে জিজ্ঞাসা করিলেন -- সত্যটা কী? আসলে কি ত্রিপুরার উন্নতি হইতেছে না? ৯ মূর্তি একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া চুপ রহিলেন। একজন সম্ভবত বলিবার চেষ্টা করিলেন 'ম্যাডাম, সবই তো কেন্দ্রের টাকায়।' জিজ্ঞাসা আসিল– অন্য রাজ্যে হয় না কেন?

দশ জনপথের বৈঠকে হুবহু কী কথা হইল তাহা তো জানিবার উপায় নাই। তবে সংবাদপত্র পড়িয়া চিন্তা শীলের ধারণা, কথা এই রকমই হইয়াছে। ত্রিপুরার সকল নির্বাচনে কেন কংগ্রেস বারে বারে পরাজিত হয় এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রাণপণ চেষ্টা হইয়াছে! প্রদেশ নেতারা দায়ী করিয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে। ম্যাডাম ইঙ্গিতে রাজ্য কংগ্রেস নেতাদের অনৈক্য-কে দায়ী করিয়া তাহাদের ঐক্যবদ্ধ হইতেই বলিলেন।

চিন্তা-গিন্নি প্রবল মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না-- আসল কারণ বাহির হয় নাই। সেই কারণটা কী – ত্রিপুরায় আম-জনতা ভালই জানে। উল্টা পথের পথিক কংগ্রেস কখনও তাহা বুঝিতে পারিবে না। দশ জনপথের বৈঠকেও প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা দশের স্বার্থের চরম বিরোধিতাই করিলেন, ত্রিপুরার উন্নয়নের বিপরীতেই ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। ইহাই কারণ! এই ভূমিকার জন্যই কংগ্রেসকে ত্রিপুরাবাসী ক্রমশ ফসিল বানাইয়া তুলিতেছে!

(প্রকাশ : ২৫.১২.২০১২)

ভূতের নৃত্য!

বাজার হইতে বড়ই ব্যাজার মুখে ফিরিলেন গিন্নি। থমথমে গৃহাঙ্গন। পরিবেশ-সচেতন বিড়ালটিও সতর্ক! অন্যদিনের মতন গিন্নিরানীর ঘেমো গতর ঘেঁসিতে সাহস করিল না। সোহাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম – তোমার চিরণদাঁতের ওই হীরামন হাসিখানি কোন সবজির দোকানে ফেলিয়া আসিলে প্রিয়তমে!

আগুন, নিভিবার বদলে দ্বিগুণ জ্বলিল। গিন্নি হুঙ্কারিলেন – বাজারে তো যাও না! হোথায় ভূতের নৃত্য চলিতেছে। চাল ডাল তেল মাছ সবজি – যেখানে হাত দিবে, হাতে 'বান্দইর‍্যা ওলা' লাগিবে। দাম শুনিয়াই অধিকাংশ ক্রেতার হাসি খসিয়া পড়িতেছে। বিক্রেতারা সেই হাসি লুফিয়া লইতেছেন। অতঃপর টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া বাটিয়া, নিজেদের ঠোঁটে মুখে সেই হাসি মাখিয়া, তোমার দিকেই চাহিয়া কেমন মৃদু-মধুর হাসিতেছেন। 'ওলা'র চুলকানিতে তোমার গায়ের চামড়া উঠিলেও মলম নাই! পিত্তি জ্বলিলেও 'বার্নল' নাই! সাতশো টাকার ইলিশ নহে, অন্ধ্রের চালানি রুইয়ের দামই হঠাৎ কিলোপ্রতি ২০-৩০ টাকা বাড়িয়াছে! আলু ২৫-৩০ টাকা! চল্লিশ-পঞ্চাশের নিচে সবজি নাই! কাঁচালঙ্কা একশো টাকা! গুঁড়ো-কৌটো দুধ, চাল ডাল সরিষার তেল তো প্রায় প্রতি মাসেই বাড়িতেছে! আর ওষুধ? কে যে কোথা হইতে কী কল টিপিতেছে, বুঝি না। মনে হয় যমরাজার সহিত ওষুধ কোম্পানিগুলির 'গ্যাট' চুক্তির মতন কোনও চুক্তি হইয়াছে।

ভাবিয়া পাইতেছিলাম না কী বলি! কেন হঠাৎ এই প্রকার লাফাইয়া দাম বাড়িতেছে? পেট্রলের দাম? কিন্তু এখন তো আবার কিছুটা কমিয়াছে। আসামের প্রবল বন্যা, ধসের কারণে ট্রেন এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত? না কি ১ জুলাই হইতে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা আরও এক কিস্তি ডি-এ পাইলেন বলিয়া? কারণে দাম বাড়িতেছে না অ-কারণে? রাজ্য কর্মচারীদের তো আরও অনেক মহার্ঘ ভাতা পাওনা! কেন্দ্র টাকা কম দিয়াছে বলিয়া রাজ্য দিতে পারিতেছে না। মূল্যবৃদ্ধির আসল গোমর কোথায়?

ব্যবসায়ীরা বলিতেছেন – মালের জোগান কম। কেন কম, স্পষ্ট উত্তর নাই। কেহ আবার সেই ভাঙা রেকর্ড বাজাইয়া বলিতেছেন – 'দাম উৎসে বাড়িতেছে'। বড়ই রহস্যময় বাক্য।

দ্রব্য যেথায় উৎপন্ন হয় – তাহাকেই কি 'উৎস' বলে না? তাহা হইলে ফসলের দাম না পাইয়া দেশের কয়েক লাখ চাষী আত্মঘাতী হন কেন? অর্থাৎ, ওই উৎসে দাম বাড়ে না। চাষীগণ চাষের উৎস হইলেও, দামের উৎস নহেন। দাম বাড়াইবার আলাদা 'উৎস' রহিয়াছে। উহা কোথায়?

ভাবনা বগলদাবা করিয়া সেলুনে নিয়া ফেলিতেই প্রবল কলরব উঠল। রিটায়ার্ড দারোগাবাবু পত্রিকা দেখাইয়া তাস-তুরুপ করিলেন, আসামের বন্যায় পশ্চিমবঙ্গে দাম বাড়িবে কেন? দিদি-মুখ্যমন্ত্রী মূল্যবৃদ্ধির জন্য সি পি এম-কে দায়ী করিয়াছেন। পিছন হইতে আমিনবাবু ছড়া ছুঁড়িলেন, "যেখানে যা অনাসৃষ্টি, তার মূলে কে – কমিনিস্টি!" রিটায়ার্ড কহিলেন – আবে ধুর, উহা কথার কথা, মুখদোষ! হিসাবে ধরিও না। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন লইয়া কংগ্রেসকে দিদি বড়বেশি হতমান করিয়াছেন। এখন একটু মান ভঞ্জনের বাঁশি। সি পি এমের কাঁধে দোষ চাপাইয়া কংগ্রেসকে খুশ করিতে অভিলাষী। আর কিছু না!

এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন ব্যানার্জিবাবু। মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, চিন্তা-গিন্নির কথাই ঠিক। বাজারে ভূতের নৃত্যই চলিতেছে। কেবল বটতলা বা গোলবাজার কিংবা রাজ্যের বাজারগুলিতে নহে! গোটা দেশের বাজার-ব্যবস্থায় দেশি-বিদেশি ভূতেরা নৃত্য করিতেছে। নিত্যপণ্যের বাজারদর নিয়ন্ত্রণে সূতা আগে ছিল ফড়েদের হাতে। তারপর একচেটিয়া দেশি পুঁজির হাতে। এখন বিদেশি বহুজাতিকদের জন্য দেশের খুচরা পণ্যের বাজার খুলিয়া দিয়াছে কেন্দ্রের সরকার। ভুল অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি চড়িতেছে। শেয়ার বাজারে ধস নামিতেছে। টাকার দাম ধসিতেছে। নিটফল – লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি। লুণ্ঠন চলিতেছে সর্বস্তরে। বড়রা মাঝারিদের লুটিতেছে, মাঝারিরা ছোটদের লুটিতেছে। শেষ পর্যন্ত পকেট ফাঁক হইতেছে খুচরা ক্রেতাসাধারণের!

চিন্তাচরণের মাথা ঘুরিতেছিল। আলু-পটল তেল-ডালের সহিত এত কিছু? আমাদের উপায় কী? ব্যানার্জিবাবু কহিলেন – আরে ভাই, ১৪টা নিত্যব্যবহারের জিনিস, এই যেমন তোমার চাল-ডাল-নুন-চিনি-ভোজ্যতেল-আটা-কেরোসিন-ইত্যাদি, ভর্তুকিতে সারা দেশে একদরে রেশনে বিলিবন্টনের দাবি করিয়া আসিতেছেন বামপন্থীরা। দিলে ক্ষতি কী ছিল? বছরে যে টাকা খরচ হইবে – কেন্দ্রীয় নেতা-মন্ত্রীরা তাহার বহুগুণ নানান কেলেঙ্কারিতে হাপিশ করিয়াছেন বলিয়া শুনি। কেন্দ্রের কোনও সরকার ইহা চালু করিতে রাজি হয় না। কেন? কারণ – নিত্যপণ্যের কারবারিদের নিকট হইতে নির্বাচনের আগে শত শত কোটি টাকা আনিতে হয়। রেশনে ভর্তুকিতে ওই চৌদ্দ পণ্য বিলি হইলে মূল্যের নিয়ন্ত্রণ যে তাহাদের হাতছাড়া হইবে!

মুখ খুলিলেন রিটায়ার্ড দারোগা: ফরাসি দেশে সম্রাট যোড়শ লুই-এর পত্নী ভুখা মানুষকে

কেক খাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন! পশ্চিমবঙ্গের এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চাল-এর অভাবে জনগণকে কাঁচকলা খাইতে বলিয়াছিলেন! ত্রিপুরায় সেনগুপ্ত মন্ত্রিসভার আমলে বেতন কমিশন চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীদের বউদের ঝি-গিরি করিতেও উপদেশ দান করিয়াছিল! এখন বাংলার দিদি-মুখ্যমন্ত্রী কী খাইতে, কী করিতে বলিবেন জানা নাই।

কিন্তু, ত্রিপুরার মানুষের কী হইবে? তাহারা এখন আগের মতন উপবাসী থাকেন না, কিংবা রাজ্যে আর ভিক্ষাবৃত্তি নাই — ইহা জ্বলন্ত সত্য হইলেও যথেষ্ট নহে। দিদি-মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তি মানিলে বাংলায় মূল্যবৃদ্ধির জন্য 'বিরোধী দল সি পি এম' দায়ী তো ত্রিপুরায় দায়ী 'বিরোধী দল কংগ্রেস'! ধুর, ইহা কোনও যুক্তিই নহে। মূল দায়ী কেন্দ্রের নীতি। লড়াই জোরদার করিতে হইবে কেন্দ্রের নীতির বিরুদ্ধে। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার কালোবাজারি, বেআইনি মজুতদারির বিরুদ্ধে কী করিতেছেন — স্পষ্ট করিতে হইবে। বাম ছাত্র যুব সংগঠনগুলি এই ক্ষেত্রে আগের মতন সরব হইবে না কেন? ভূতেরা কি মহারাজগঞ্জ বাজারেও নৃত্য করিতেছে না? নাকি মজুতদার কালোবাজারিরা 'যুগোপযোগী ঘোমটা' পরিয়া থাকায় তাহাদের চিনা যাইতেছে না! খাদ্য দপ্তরের কিছু ফুড ইনস্পেক্টর অসাধু ব্যবসায়ীদের সুযোগ দিয়া নিজেরা 'ভেরি ভেরি গুড' থাকিলেও মানুষ কিন্তু তাহাদের 'ভূত-এর চ্যালা' হিসাবেই চিহ্নিত করিবে। সরি!

(প্রকাশ : ০২.০৭.২০১২)

একটি সফর এবং ১১/৭

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে/ '১১ জুলাই' পালন করিব হটাইতে বামে...।

'রা–জোনৈতিক কবিতা'-খানা সবে মক্‌শো করিতেছি, গিন্নি ঠোঁট উল্টাইয়া কহিলেন –টুক্‌লি!

জবর রাগ হইল। রবীন্দ্রনাথ না হয় প্রথম লাইনখানা অনেক আগে লিখিয়া গিয়াছেন। তাই বলিয়া আর কেহ লিখিতে পারিবে না? বঙ্গাভাষায় কবিতা চর্চার এই হইল মুশকিল! গুরুকবির ছায়া সর্বত্র। কিন্তু ত্রিপুরায় কংগ্রেস যে অধুনা 'দেবতার গ্রাস'-তুল্য পরিস্থিতিতেই পড়িয়াছে! চিন্তাচরণ কী করিবে! নহিলে প্রণব মুখার্জির সহিত দেখা করিতেও কি না বমফ্রন্টের নেতাদের পিছনে লাইন ধরিতে হয়! বামফ্রন্ট এই রাজ্যের সরকারে আছে, এমএলএ বেশি বলিয়া তাঁহাদের পরে কংগ্রেসের স্থান দিলেন প্রণব? রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী তো কী হইল! এতকালের সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা, কংগ্রেসি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এতকালের দুই নম্বর মন্ত্রী, সেই প্রণব মুখার্জিই তো এই প্রণব মুখার্জি! তিনি রাজ্যে আসিয়া কি না বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, এম এল এ, এমপি-দের কাছে আগে ভোট চাহিলেন? বামফ্রন্ট নেতাদের তুলনায় আপাত-লঘু গুরুত্বের স্থানে কংগ্রেস নেতৃবর্গকে ঠেলিযা দেওয়া হইল? বামফ্রন্ট নেতাদের পাশেই বসিলেন আই এন পি টি বিধায়কেরা। এই গণতন্ত্র চর্চা যে '১১ জুলাই'-এর থিম-এর ঘোর পরিপন্থী!

গিন্নি উৎসাহে কহিলেন, দেখিতেছ? মাত্র এক বছরে কত পরিবর্তন? ২০১১-এর ১১ জুলাই আর ২০১২-র ১১ জুলাই! এক বছর আগেব সেই দিন আগরতলা শহরে হিংসার তাণ্ডব, থানা আক্রমণ, ইট-পাথর বৃষ্টি, রাস্তায় রাস্তায় গাড়িতে অগ্নিসংযোগ, শূন্যে গুলি পুসিসের, রহস্যজনকভাবে গুলিবিদ্ধ হইয়া এক যুবক পাপাই সাহা-র মৃত্যু। জোটামলি (জোট আমলি) কংগ্রেসিদের মনে হইতেছিল – সিপিএমকে চিবাইয়া খাই! আর এখন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আসরে, 'কংগ্রেস-সিপিএম ভাই-ভাই'? বলা হইতেছে –প্রণব মুখার্জি 'শুভেচ্ছা' আর 'ধন্যবাদ' জানাইয়া 'জয়'করিয়া গেলেন। প্রণববাবু জিতিলেন। হারিল কে?

হারিয়াছে '১১ জুলাই'! একটু হইলেও ধাক্কা খাইল হিংসার রাজনীতি। শান্তির ত্রিপুরায়

রাতারাতি হিংসা ছড়াইয়া জনপ্রিয় সরকারকে উল্টাইয়া দিবার অন্যায় 'মিশন'-এর অংশ ছিল '১১ জুলাই'। নেতৃত্বে ছিলেন সুদীপ বায় বর্মন, রতনলাল নাথ। তখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হন নাই সুদীপ। তখনকার সভাপতি সুরিজৎ দত্ত সেই 'অরাজকতা'-র সমালোচনা করিয়াছিলেন। হয়তো তাঁহার মনে হইয়াছিল, এই 'আন্দোলন' যতটা না সিপিএমের বিরুদ্ধে, তাহারও বেশি তাঁহাকে হটাইবার জন্য। সুদীপ-রতনলাল সফল। '১১ জুলাই' কংগ্রেস বিধায়করা বামফ্রন্ট নেতাদের পরে একই জায়গায় প্রণববাবুর সহিত দেখা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অন্যত্র দেখা করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রণববাবু রাজি হন নাই। তাঁহার এই সৌজন্য-সফবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের যদি জয় হইয়া থাকে তাহা হইলে পরাজয় হইয়াছে এই রাজ্যেব ওই বাহুবলী মারমুখি কংগ্রেসি সংস্কৃতির। যদিও, ইহার পরেও এই সংস্কৃতি বদল হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেন না – প্রণববাবুর সফর লইয়া রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা আগে ভাগেই আশঙ্কিত ছিলেন। শুনা যাইতেছে, গত ৩ জুলাই সুদীপবাবুরা কংগ্রেস হাইকমাণ্ডকে গোপনে জরুরি বার্তা পাঠাইযা প্রণববাবুকে ত্রিপুরায় না পাঠাইতে অনুরোধ কবিযাছিলেন। হাইকমাণ্ড পাত্তা দেন নাই নাকি প্রণবাবু কার্ণপাত কবেন নাই – স্পষ্ট নহে। তবে ওই গোপন অনুবোধ মাঠে মাবা গিয়েছে। কাম হয় নাই।

অবশ্য অনেকেই বলিবেন – সুদীপ রতনলালদেব আশঙ্কা অমূলক নহে। ভোটেব দিন তো ধাইয়া আসিতেছে। নলছডেব সেমি ফাইনালে মিশন বিধ্বস্ত। একের পর এক ত্রিপুবাকে শ্রেষ্ঠত্বেব পুবস্কাব দিতেছে কেন্দ্র। একেব পব এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিপুরায় আসিযা বাম সবকাবেব কাজেব প্রশংসায পঞ্চমুখ হইতেছেন। প্রদেশ নেতারা দিল্লি গিয়াও এই পুবস্কাব আব প্রশংসাব স্রোতধারায ড্রপগেট বসাইতে হাইকমাণ্ডের হাতে-পায়ে ধবিয়া আসিয়াছেন প্রণব মুখার্জি এতদিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার আমলেই ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনেব 'গৌরবোজ্জ্বল' ভূমিকায় মানিক-বাদলবা জব্বব খাদে পড়িয়াছিলেন। এখনও পুরোপুবি উঠিতে পাবেন নাই। রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী 'নিরপেক্ষ' প্রণব মুখার্জিও যদি এখনও ত্রিপুরায আসিযা বাম সবকাবেব ঢালাও প্রশংসা শুরু করিযা দেন – তাহা হইলে প্রদেশ কংগ্রেসেব অফিসে এইবারের তালা হইবে পার্মান্যান্ট!

যাহা হউক, অল্পে রক্ষা! প্রণববাবু রাজ্য কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক সৌজন্য আর মূল্যবোধেব পাঠ দিতে চাহিলেও বামেদের প্রশংসা করেন নাই। নিন্দাও করেন নাই। কেবল, ধাক্কা খাইয়াছে '১১ জুলাই'। ইহার কালো বঙ আর একটু কালো হইয়াছে। পালন এবং লালন কংগ্রেসের ইচ্ছা। আমেরিকার ৯/১১, মুম্বই-এর ২৬/১১-এর মতোই আগরতলায় ১১/৭ যেন কখনও আর ফিরিয়া না আসে – ইহাই কিন্তু বিপুল গরিষ্ঠ জনমানুষের ইচ্ছা। অতঃপর, কবিতার লাইন দুটি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম।

(প্রকাশ ঃ ০৯.০৭.২০১২)

২ টাকা-র চাল

– নাঃ। কিছুই ভাল লাগে না। কইল্‌জাটা খালি-খালি। অন্ন মুখে দিলে লাগে ছালি-ছালি! মানিক সরকারের জন্য পাহাড়-সমতলে অঝোর হাত-তালি। আর, অমাগো আশার গুড়ে কেবলই কঙ্কর-বালি! এই তালি-বালি যে প্রাণে আর সহে না রে চিন্তা! কী করি, কী বলি, কী লিখি বলো দেখি! নেতারা বিপদে পড়িলে 'জরুরি কাজ'-এর অছিলায় দিল্লি-কলকাতার ত্রিপুরা ভবনে গিয়া বিশ্রাম করিতে পারেন। আমরা কী করিব? প্রতি ভোরে মুখ দেখাইতে হয়!

নির্ভীক নিরপেক্ষ (প্রাপ্তি-সাপেক্ষ) সংবাদপত্রের প্রবীণ সুশীলবাবু সেলুনে ঢুকিতেই ভদ্রতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম – 'দাদা, কেমন আছেন?' তাহার উত্তরে যে এমন বিলাপ আরম্ভ হইবে, মোটেই পূর্বানুমান করিতে পারি নাই। বলিলাম – দাদা-র এত উদ্বেগের হেতু...। জিজ্ঞাসাবাক্য সমাপ্ত করিবার আগেই হঠাৎ সুশীলবাবু বোমার মতন ফাটিলেন– 'টিট্‌কারি মারিতেছ? ২ টাকা কেজি চাল দিতেছে বামফ্রন্ট সরকার। বি পি এল আর অন্ত্যোদয়ের ৩ লক্ষ কার্ডে ১৫ লক্ষ লোক ১ আগস্ট হইতে মাসে ৩৫ কেজি চাল পাইবে। ১৫ লক্ষের মধ্যে কম-সে-কম ৮ লক্ষ ভোটার! আমাগো আর কোনও আশা আছে? মানিক সরকারের পলিটিক্যাল চালবাজিতে তেরো-র আশা শেষ!'

– অতএব কী লিখিলেন দাদা? সুশীলবাবু কহিলেন – কী যে লিখিতেছি মাথামুণ্ডু নিজেই বুঝিতেছি না। কংগ্রেসের কোটিপতি বিধায়ককে 'কোট' করিয়া লিখিয়াছি– বামফ্রন্ট লোভ দিয়া ভোট কিনিতেছে। এই সরকার চার বছর কোনও কাজ করে না, ভোটের জন্য বসিয়া থাকে। চার বছব বেকারদের চাকরি দেয় না, অর্থ কমিশনের বঞ্চনার কথা বলিয়া কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে বেতন ভাতা দেয় না। বলে টাকা নাই। রেগার কাজ ঠিকভাবে করে না। ভোটের বছর কল্পতরু হইয়া যায়। ২ টাকার চাল দিয়া ৮ লক্ষ ভোট চুরি করিতেছেন মানিক সরকার। লিখিয়াছি – রাজ্যের ২ লক্ষ কৃষক - পরিবার বিপন্ন হইবে (কেন হইবে নিজেও বুঝি নাই)! আরও লিখিয়াছি – কেন্দ্রীয় সরকারই তো সারা দেশে ২ টাকায় চাল দিবে, বামফ্রন্ট কেবল নাম কিনিতেই আগেভাগে দিতেছে।'

– বলো চিন্তা, আর কী লিখিতে পারি! তবুও আমাগো সোনার টুকরা ছেলেরা মাথা ফালইয়া দিয়েছে। 'উঠো-জাগো' চিৎকারেও মনে বল পাইতেছে না। দলে দলে তিনরঙা ছাড়িয়া লাল উড়াইতেছে। আমরা নিরপেক্ষভাবে এত বুঝাইতেছি, বামফ্রন্টকে নিরপেক্ষ ঝাঁটা মারিয়া প্রতিদিন কংগ্রেসকে এত নিরপেক্ষভাবে প্রায় সরকারে লইয়া আসিতেছি, তবুও জনগণ উল্টা বুঝিতেছে! নলছড় দ্বিগুণ উল্টা বুঝিল। এখন ২ টাকা-র মানুষেরা পায়ের তলা হইতে মাথার উপর লাফাইতেছে। তিন লক্ষ বি পি এল আর অন্ত্যোদয় রেশন কার্ড যেন তাঁহাদের হাতে হাতে তিন লক্ষ নতুন পতাকা।

ভাবিতেছিলাম, লোকে সুশীলবাবুদের ত্রিপুরায় এত উল্টা বুঝে কেন? বাংলায় তহাদের ভোটের আগের সেই বলবীর্য অবশ্য এক বছরেই স্খলিত। ট্রেনে বাসে পথে ঘাটে লোকে চিমটি কাটে শুনিতেছি। কিন্তু, ত্রিপুরায় ২ টাকার চাল ভোটের চালবাজি? লোভ দিয়া ভোট ক্রয়? তাহা হইলে ১৪ দফা দাবিতে গত পাঁচ মাস ধরিয়া সিপিএম রাজ্য তোলপাড় করিতেছে কেন? সারা দেশে বামপন্থীদের ডাকে খাদ্য-নিরাপত্তার দাবিতে এত মিছিল মিটিং কেন? সেখানেও তো ২ টাকা কেজিতে সারা দেশে সব পরিবারকে মাসে ২৫ কেজি চালের দাবি। কৃষকদের ফসলের ন্যায্য মূল্যের জন্য স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরের দাবি। ৩০ জুলাই হইতে ৩ আগস্ট দিল্লিতে এই দবিতে একটানা গণধর্না দিবেন বামেরা। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলিয়াছেন, আমাদের দবি বি পি এল-এ পি এল নহে, সকলের জন্য সরকারি ভর্তুকিতে সারা দেশে ২ টাকা দরে চাল। রাজ্য নিজের সীমিত সাধ্য মতো বিপিএল, অন্ত্যোদয়দের জন্য চালু করিতেছে।

চিন্তা-র মনে হয়, মানিক সরকার এই কথাও বুঝাইলেন, কেন্দ্রীয় হারে বেতন ভাতার তুলনায় গরিবতম মানুষের জন্য খাদ্য-নিরাপত্তা বিধান করাই তাঁহার সরকারের কাছে বেশি জরুরি! আর, কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় বেতন ভাতা দিতে বছরে অতিরিক্ত লাগিবে কয়েক হজার কোটি টাকা। ২ টাকা কেজি চাল-এর সিদ্ধান্তে অতিরিক্ত খরচ বছরে সাড়ে ৩৬ কোটির মতন। দুইটা এক হইল? চার বছর কোনও কাজ করে না, কোনও চাকরি দেয় না বামফ্রন্ট সরকার? এত নিরপেক্ষ মিথ্যা বলিলে বা লিখিলে লোকে উল্টা বুঝিবে না কেন দাদা?

কেন্দ্রীয় সরকার ২ টাকায় চাল দিবে বুঝি! খাদ্য নিরাপত্তা আইনে? সুশীলদাদা গো, খাদ্য নিরাপত্তা বিল-এ বিশ্বব্যাঙ্কের সুপারিশ মতো চাল-গমের বদলে নগদ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব রহিয়াছে। তখন গ্রাম-পহাড়ে টাকা মিলিবে। চাল-গম মিলিবে না! এখনও বিল সিলেক্ট কমিটিতে নহে, রহিয়াছে যেথায়–তাহার আসল নাম 'হিমঘর'। কেন্দ্রের এই আইন পাসের কোনও আগ্রহ যে নাই, এখন সকলেই জানিয়ে গিয়াছে। বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয়

অর্থ মন্ত্রকের দায়িত্ব মনমোহনজির হাতে যাওয়া মাত্র তিনি অর্থনীতিতে 'আবার প্রাণচাঞ্চল্য' আনিবার যে ঘোষণা দিয়াছেন – তাহা তো বিশ্বব্যাঙ্কের কণ্ঠস্বর! ভর্তুকিহীন অর্থনীতির কাঁসরঘণ্টা! পাঞ্জাব, হরিয়ানায় খোলা আকাশের নিচে ১ কোটি ৯০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য পচিয়া নষ্ট হইতেছে। সুপ্রিম কোর্ট ২০১০ সালে কেন্দ্রকে সেই সব খাদ্য বিনামুল্যে গরিবদের মধ্যে বিলি করিতে নির্দেশ দিয়াছিল। কেন্দ্র সেই নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের গরিব-দরদের মোক্ষম প্রমাণ রাখিয়াছে! ১৯৭৫-এ ইন্দিরাজি উচ্চ আদালতের নির্দেশ অমান্য করিতে ৪২তম সংবিধান সংশোধন করিয়াছিলেন। এখন সর্বোচ্চ আদালত অমান্য করিতেও মনমোহনজিদের তাহা করিতে হয় না।

চিন্তা-গিন্নির উল্টা যুক্তি! সব শুনিয়া কহিলেন, ত্রিপুরায় প্রতি বছরেই কোনও না কোনও ভোট। সরকার যদি ভোটের জন্য কাজ করে, মন্দ কী! ভোটের আগে সকলেই নানান কাজের কথা বলে। ভোটের পরে কেহ করে, কেহ করে না। কে কাজ করে আর কে চালবাজি করে, লোকে দেখিতেছে। তাহারা অন্ধ নহে। ছাড়ো এই সব। বরং ত্রিপুরায় কংগ্রেস দলের জন্য বিপিএল, অন্ত্যোদয়ের মতন এমন একখানা রেশন (মিশন) কার্ড আবিষ্কার করিলে কেমন হয়, যাহার দ্বারা ২ টাকা কেজি চালের মতনই, বিধানসভায় কেবল ২টি আসন পাইলেই সরকার গড়িবার ডাক মিলিতে পারে।

(প্রকাশ ঃ ১৬.০৭.২০১২)

এতটাই

আবার ছি ছি! ২০১১-র ১১ জুলাইয়ে পর রাজ্যময় 'ছিঃ'- অলঙ্কৃত পোস্টার পড়িয়াছিল। 'ছিঃ' যেন তখন যুদ্ধের বুলেট। পাল্টা 'ছিঃ' পেস্টার পড়িতেও দেরি হয় নাই। চোরও 'চোর চোর' চিৎকার করিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কে চোর, কে গৃহস্থ — বহু লেকের পক্ষে বুঝা বিষম দায় হইয়া উঠিয়াছিল। এইবার ব্যাপার বড়ই চমৎকার!

বিদ্বজ্জনেরা ছি ছি বলিতেছেন। ছাত্র যুবক শিক্ষক শিক্ষাপ্রেমী অভিভাবকেরা ছি ছি করিতেছেন। জনগণ ছি ছি করিতেছে। কিন্তু, ২০১২-র জুলাইতে, পাল্টা 'ছিঃ' নাই! 'জয়েন্ট এন্ট্রান্সে মেধা কেলেঙ্কারি' হইয়াছে বলিয়া যাহারা এত চিৎকার করিলেন, রিম-রিম নিউজপ্রিন্ট খরচ করিলেন, সিম কার্ড গরম করিলেন, এত স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ শব্দ-বাক্যস্রোত টিভির পর্দায় নির্গত করিলেন, তাহারা হঠাৎ চুপ! মুখে কুলুপ আঁটা; হেডিংয়ে-খবরে নিদারুণ সাদামাটা! নিরন্তব বক বক করা মোহনপুরের বাক্যবাগীশ বঙ্কলালও নীরব! সাংবাদিকেরা হাইকোর্ট রায়-এর প্রতিক্রিয়া জানিতে চাহিলে মুখপাত্রের মুখেও রা নাই! 'মেধা চুরি'-র জন্য দায়ী করিয়া যাহারা মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়াইয়াছিলেন, হাইকোর্টের আগুনে তাহাদের মুখ পোড়া গিয়াছে। পোড়ামুখ দেখাইবার জো নাই।

গুরুরা চুপ থাকিলে কী হইবে, চ্যালারা চুপ নাই। সেলুনে আসিয়া পাড়ার এক কংগ্রেসি দাদা কানে কানে এক অত্যাশ্চর্য থিওরি দিলেন। তাহার ধারণা, মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার গুয়াহাটি যাইয়া বৈশালী পালের উত্তরপত্রের ফরেনসিক রিপোর্ট বদল করিয়া দিয়াছেন! শুনিবামাত্র ব্যানার্জিবাবু এমন চাপিয়া ধরিলেন যে,দাদা-র কাঁদা ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। তাঁহার ত্রিশূল জিজ্ঞাসা — আসামের কংগ্রেস সরকারের ফরেনসিক ল্যাবরেটরি কবে হইতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর কথায় চলে? মানিক সরকার কি এখন আসামেরও মুখ্যমন্ত্রী? কংগ্রেসি রাজ্যে এইভাবেই ফরেনসিক রিপোর্ট নির্মিত হয় বুঝি! সবশেষে ব্যানার্জিবাবুর বুস্টার ডোজ — আপনাদের কি কোনও লজ্জা নাই দাদা, ছিঃ!

ভাবিতেছিলাম, বেচারা কংগ্রেস! বিসর্জনের বাজনা বাজিতেছে কানে। 'মা-কে (স্বপ্ন) ভাসাইয়া জলে, কী লইয়া ফিরিব ঘরে'! কয়েক বছর আগে গুঞ্জন দেব নামে এক বালিকাকে

দাবা-র ঘুঁটি করা হইয়াছিল। উচ্চমাধ্যমিকে তাহার 'উত্তরপত্র বদল হইয়াছে' গুজব তুলিয়া আদালতে মামলা করা হইল। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিরুদ্ধে 'ফলাফল কেলেঙ্কারি'-র অভিযোগে রাজ্য তোলপাড়। কংগ্রেস তাহাদের অত্যুগ্রবাদী ছাত্র-যুব কর্মীদের পাঠাইয়া পর্ষদ অফিস ভাঙচুর করিল । পর্ষদ কর্মীদের ঠেঙাইল। সবশেষে ব্যুমেরাং! আদালত হস্তলিপি-বিশারদের সাহায্য লইয়া রায় দিল, খাতা বদল হয় নাই। সব মিথ্যা প্রমাণ হইতেই লোকলজ্জায় গুঞ্জনকে লইয়া তাহার অভিভাবক রাজ্যান্তরী হইলেও ত্রিপুরার কংগ্রেস আর কোথায় যাইবে! কংগ্রেস যে কংগ্রেসেই রহিল তাহার প্রমাণ দিতেই ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা বানচলের চেষ্টা। 'সব লন্ডভন্ড করে দে মা, লুটেপুটে খাই'– এই মনোবাসনায় শহরে তাণ্ডব হইল, থানায় আক্রমণ হইল, আগুন জ্বলিল, পুলিসের রক্ত ঝরিল, এক যুবকের মৃত্যু হইল। মানুষ বলিল ছিঃ! তাহার পর এই বছরের জয়েন্ট এন্ট্রান্স।

বৈশালী পাল কেন, যে-কোনও ছাত্রছাত্রীর মনে হইতে পারে—আমার নম্বর কম হইয়াছে। উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষার নিয়ম-কানুন রহিয়াছে। যে কেহ আবেদন করিতে পারে, যেমন আরও ২৭ জন করিয়াছে। ২৬ জুলাই হাইকোর্টের মনোনীত কমিটির পুনঃপরীক্ষায় তাহাদের নম্বর বাড়িতেও পরে, আবার অপরিবর্তিত থাকিতেও পারে। কিন্তু, প্ররোচনা আর কুবুদ্ধির ফাঁদে পড়িয়া বৈশালী এবং তাহার রত্নপিতা রতন পাল হাইকোর্টে হলফনামা দিয়া কহিলেন, বৈশালীর 'উত্তরপত্র বদল হইয়া গিয়াছে'। তৎক্ষণাৎ পরিকল্পনামফিক ঝাঁপাইল কংগ্রেস, এন এস ইউ আই, যুব কংগ্রেস এবং অন্য বাম-বিরোধী কিছু সংবাদমাধ্যম। বিচারাধীন বিষয়, কিন্তু কালনেমির লঙ্কাভাগের আনন্দে কংগ্রেস নেতারা গোটা রাজ্যে 'মেধা চুরি'-র গুজব ছড়াইয়া তুলকালাম কাণ্ড বাধাইলেন। জবরদস্তি ত্রিপুরা বন্‌ধে ভাঙচুর, হামলা-হাঙ্গামা হইল। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের রায়ে প্রমাণিত হইল, জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের নামে আনা সব অভিযোগ মিথ্যা। খাতা বদলের মিথ্যা অভিযোগ করায় বৈশালীর পিতারত্নের জরিমানা করিল হাইকোর্ট। ফরেনসিক পরীক্ষার যাবতীয় খরচও মিটাইয়া দিতে হইবে তাহাকেই।

গুঞ্জন, বৈশালীরা মুখ লুকাইতে রাজ্যান্তরী হইতে পারিবে। কিন্তু কংগ্রেস মুখ লুকাইবে কোথায়? মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড-এর মতন স্বশাসিত সংস্থাসমূহের নামে মিথ্যা কলঙ্ক ছড়াইয়া, ত্রিপুরার সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জনমনে অবিশ্বাস জাগাইয়া, শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যের অভাবনীয় উন্নতির প্রতি চরম অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করিয়া বাজিমাত করিবার এই 'রাজনীতি' কেন? রাজ্যের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ, অসংখ্য পিতা-মাতা-অভিভাবকের উদ্বেগ, শত শত শিক্ষাকর্মীর নিষ্ঠা আর পরিশ্রম লইয়া এই নিষ্ঠুর প্রহসনের অধিকার কাহাকেও দেওয়া যায়? রাজনীতির নামে কাহারও দায়িত্বহীনতা এতটাই নির্মম হইতে পারে? কাণ্ডজ্ঞানহীনতা এতটাই সীমাহীন হইতে পারে? শান্তি সম্প্রীতি

নষ্ট করিতে ইহাদের আগুন লইয়া খেলিতে দেখিয়াছি। কিন্তু কোমলহৃদয় ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন-আশা-বিশ্বাস, শত দুঃখকষ্ট সহ্য করা বাবা-মায়ের গোপন অশ্রু লইয়াও ইহারা রাজনীতির ফুটবল খেলিবেন? এই কদর্য খেলা আর কতকাল চলিতে থাকিবে? এখন চুপ থাকিলে চলিবে? কৈফিয়ত দিতে হইবে না? সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর পদপ্রান্তে নতজানু হইয়া নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে না?

ব্যানার্জিবাবু বলিলেন– কাকস্যপরিবেদনা চিন্তা। তোমার কংগ্রেস দল এবং তাহাদের পৃষ্ঠপোষক (অপ)প্রচারক-কুল কখনও ওই পথে হাঁটিবে না। ভাবিয়া দেখ, ইহাদের হাতে ত্রিপুরার ভার ন্যস্ত হইলে কী ঘটিবে! উঃ ভাবিতেও গা ছমছম করিতেছে। মেরুদণ্ডে শীতল স্রোত নামিতেছে।

শেষাংকে চিন্তা-গিন্নি জবর খেপিয়া উঠিলেন। হুঙ্কারিয়া কহিলেন–ক্ষুর ধারণ কর স্বামী! ইহাদের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দাও। ঘরের ঘোল না খাইয়া মাথায় ঢালিব। সেলুন ফ্রি, ঘোলও ফ্রি! কেবল পিঠে বহিবার প্রাণীটি জোগাড় করিতে পারিব না। ব্যবস্থা করিবেন নির্বাচকমণ্ডলী। তেরো-তে।

(প্রকাশ ঃ ২৩.০৭.২০১২)

হায় হায়!

রাস্তায় 'হায় হায়' বৃন্দধ্বনি শুনিয়া আছাড়ি-পাছাড়ি দরজা পানে ধাবিতা চিন্তা-গিন্নির জোড়হাত কপালে ঠেকিল। মৃতের উদ্দেশে প্রণামের আবাল্য সংস্কার। কিন্তু, চৌকাঠ হইতে রাস্তায় উঁকি মারিয়াই তাঁহার হাত নামিয়া চক্ষু কপালে উঠিল। কাহারও কাঁধে কোনও শবদেহ নাই! বলিলাম — না গিন্নি, কেহ মরে নাই। মরিবার আগেই কংগ্রেসের জন্য 'হায় হায়' করিতেছে সিপিএম!

—বালাই ষাট! কংগ্রেস মরিবে কেন! আমাগো স্বাধীনতা সংগ্রামের কংগ্রেস, গান্ধী-নেহরু-কালামের কংগ্রেস যুগ যুগ জিয়ো! গিন্নি প্রায় ধমক মারিয়া উঠিলেন। ক্ষীণকণ্ঠে বলিলাম, এইভাবে 'সজ্ঞানে জানিয়া বুঝিয়া' কেহ আগুনে ঝাঁপ দিলে তাহাকে বাঁচাইবে কে! সিপিএমও পরিবে না। ত্রিপুরায় পরপর আগুন-ঝাঁপে কংগ্রেসের দেহ এ যাবৎ কত শতাংশ পুড়িল, কম্বল সরাইয়া ডাক্তারই বলিতে পারিবেন। তবে মুখখানা যে সম্যক পোড়া গিয়াছে তাহা তো এই মুখ্যসুখ্যু নাপিতের ব্যাটাও দেখিতে পাইতেছে।

সুকান্ত-র 'রানার' পড় নাই? ওই যে ...''কত চিঠি লেখে লোকে, কত সুখে প্রেমে আবেগে স্মৃতিতে কত দুঃখে ও শোকে ...।'' কিন্তু, এমন বেকার-বিরোধী চিঠির কথা সুকান্তও বোধকরি ভাবিতে পারেন নাই! পাঁচ হাজার অস্নাতক শিক্ষকের অফার রেডি। 'টেট' বাধ্যতামূলক হইবার আগের চাকরি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দিল্লিতে তাঁহাদের দলের পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারকে ('টেট' ছাড়া) এই সব চাকরি আটকাইতে চিঠি দিলেন। নহিলে, তাঁহার মতে — 'ভোটে সি পি এমকে সরাসরি সাহায্য করা হইবে।' চাকরি আটকাইয়া গেল। পাঁচ হাজার বেকারের সর্বনাশ হইল। সারা রাজ্যে ধিক্কার ধ্বনি উঠিল — 'হায় কংগ্রেস, কী করলি ...।' আবার সেই সব প্রশ্ন উঠিল -- কেন্দ্রীয় দপ্তরে চাকরি বন্ধ রাখিয়াছে কে? কংগ্রেস। বাম সরকার চাকরি বন্ধ না করায় অর্থ কমিশনের হাত দিয়া ত্রিপুরাকে দশ হাজার কোটি টাকা 'জরিমানা' করিয়াছে কে? কংগ্রেস।

অস্নাতক শিক্ষকের চাকরির জন্য তিন দফায় মোট প্রায় দেড় লক্ষ বেকার আবেদন জমা দিয়াছিলেন। তাহাদের প্রায় অর্ধেক হয়ত কংগ্রেস সমর্থক পরিবারের। অনেকেই ২০০৮ ভোটের আগে কংগ্রেসের 'চাকরি মেলা'-র প্রলোভনে মজিয়াছিলেন। অনেকেই হয়ত এইবারও আশায় আশায় কংগ্রেসের নতুন 'চাকরি কার্ড' বা 'রাহুল কার্ড'-এ নাম

লিখাইয়াছেন। ইঁহারাও এই চিঠিতে কংগ্রেসের বেকার-দরদের আসল চেহারা দেখিয়া ফেলিলেন। চিঠি ফাঁস হইবার পর প্রদেশ সভাপতি সাংবাদিকদের ডাকিয়া বলিয়াছেন — তাঁহাকে 'সব রাজনৈতিক দলের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত'। বুঝিলে গিন্নি, সব দল ধন্যবাদ দিবে কি না জানি না। তবে রাজ্যের শিক্ষিত বেকারদের আকুণ্ঠ ধন্যবাদ যে তাঁহার প্রাপ্য, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ তিনি তাহাদের চক্ষু উন্মীলনে বড়ই উদার সহায়তা করিলেন! অতত্রব, সি পি এমও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেই পারে।

শুন গিন্নি, গান্ধী-নেহরু-কালাম আজাদদের কংগ্রেস এখন শহিদ বেদিতে শায়িত। ৭১-এর বঙ্গে, ৮০-র ত্রিপুরা দাঙ্গায়, ৮৮-র গণহত্যা আর সেনাধীন ভোট-প্রহসনে নতুন কংগ্রেসের জন্ম হইয়াছে। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' — এই নীতির নব্য কংগ্রেস, ২০১৩-র ভোটের জন্য জঙ্গিদের গোপনে পুষ্ট করিতেছে, ধনু কলই ধরা পড়িতেই ইহা ফাঁস হইল। মেডিক্যালে ভর্তি বানচালের হাঙ্গামা হইতে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে 'মেধা চুরি'র গুজব — সর্বক্ষেত্রে কংগ্রেসের সব প্রয়াস বেদম ধাক্কা খাইয়াছে। নলছড়ের সেমিফাইনালেও ধরাশায়ী। কর্মচারীদের ভোট টানিতে কেন্দ্রীয় বেতনের মরীচিকাও আর তেমন কাজ করিতেছে না। অবসরের বয়সসীমা বাড়াইয়া সদিচ্ছার প্রমাণ দিয়াছে বামফ্রন্ট। ২ টাকা কেজি চাল মোকাবিলারও কোনও অস্ত্র নাই। ১৪ প্রকল্পে দেশের সেরা ত্রিপুরা। কোন পথে যাইবে কংগ্রেস? গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মুখে বারে বারে ত্রিপুরার প্রশংসা! অসহ্য! বন্ধ করিতে দিল্লিতে দল বাঁধিয়া গিয়াছিলেন প্রদেশ নেতারা। এই সময়ে পাঁচ হাজার চাকরি হইলে উপায় আছে?

— কিন্তু, সেনাবাহিনীর কর্নেলকে পিটাইতে হইল কেন? জোট আমলে পুলিস পিটাইয়া হাত পাকিয়াছে বলিয়া এখন খোদ সেনাকর্তার গায়ে হাত? হ্যাঁ গা, ইহাকেই বিনাশকালে বিপরীত-বুদ্ধি বলে? নাকি বিপরীতকালে বিনাশবুদ্ধি বলিব? কহিলাম —'গিন্নি, কেন যে বুঝিতে পার না! রাহুল গান্ধী তেরো-র যুদ্ধে প্রদেশ কংগ্রেস ব্রিগেডের তরুন সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন। কংগ্রেসি তারুণ্যের কিছু জ্বলন্ত বীরত্বের নমুনা স্থাপন না করিলে কর্মীরা শিখিবে কী! মাত্র তো তিন মাস। কান পাতিয়া থাক, আবার সভাপতি বদলের দাবি উঠিতে দেরি নাই। কিন্তু, 'আ-ই-তা-ছি' ধ্বনি এখন 'যা-ই-তা-ছি' হইয়া গিয়াছে। কোনও 'বদল' দিয়া এই ধ্বনি আর বদলাইবে না!

— কী বলিলে? কংগ্রেসের জন্য সি পি এম 'হায় হায়' করিতেছে কেন? জলবৎ তরলম গিন্নি। এই 'হায় হায়' কেবল প্র্যাকটিস। ভাবিয়া দেখ, তেরো-র ভোটের পরে কংগ্রেসের জন্য কান্দিবার কেহ থাকিবে কি? ১৯৭৭-এর ৩১ ডিসেম্বর বিধানসভা ভোটের পর কংগ্রেসের আসন ৪১ হইতে শূন্যে নামিয়াছিল। কান্দিবার কেহ ছিল না। দলে দলে কংগ্রেসিরা 'আমরা বাঙালি'-হইয়া গিয়াছিলেন। এইবার তেমন কিছু ঘটিলে সি পি এমকেই একটু কান্দিয়া সাহায্য করিতে হইতে পারে। তাই ...

(প্রকাশ: ৩০.০৭.২০১২)

পায়ে পিঁপড়া

'মিশন'-এর ইলিউশন ফরসা! লোকের চোখে ঘোর লাগিতেছে না। হইলটা কী! আসিতেছে ইলেকশন, আর চৌদিকে কেবল ইরোশন! শয়ে শয়ে ভোটার, সমর্থক-কর্মী-নেতা দল ছাড়িয়া বামে পা ফেলিতেছেন। ইংরাজিতে নেশা হইতেছে না। তাই বাংলা হইতে বাংলা-র আমদানি। 'মিশন' ফেলিয়া এইবার 'পরিবর্তন যাত্রা' করিবে কংগ্রেস।

যাত্রা-শিল্পীরা খুশি হইলেও হইতে পারেন। তবে 'পরিবর্তন' স্লোগান-খানা শুনিতে সুন্দর। যাহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সরাইয়া অন্য কিছু আনো। যাহা আর কিছুতেই মানা যাইতেছে না, ফেলিয়া দিয়া মান্য কিছু স্থাপন কর। খুব ভাল। কিন্তু, ওই অন্য কিছুটা কী — তাহা আগেভাগে না ভাবিলে সর্বস্বান্ত হইতে হয়। আর, অতি লোভে পড়িলে তাঁতি নষ্ট হইতেই পারে। ছু-মন্তরে সোনা-নগদ টাকা 'ডবল' করিতে গেলে প্রতারিত হইতে হয়। কত দেখিলাম! ঘটনা হইল — 'পরিবর্তন'-এর স্লোগান দিয়া এ যাবৎ যাঁহারা 'সফল' হইয়াছেন, তাঁহাদের কেহই কিন্তু ভাল নাই। বাংলাদেশের বেগম জিয়া হইতে আমেরিকা-র বারাক হুসেন ওবামা কিংবা বাংলার মমতা, সকলেই ইহার উদাহরণ হইতে পারেন।

চিন্তা-গিন্নি জিজ্ঞাসা ছুঁড়িলেন — ত্রিপুরায় কেন পরিবর্তন চাহিব? বাম সরকার কি লোকের কাছে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে? মানিকবাবুর সরকারের কাজকর্ম কি আর কিছুতেই মানা যাইতেছে না? কী যে বল, সেলুনে খরিদ্দারদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ। সব দলের সমর্থকেরাই তো তোমার সেলুনে চুল দাড়ি কাটাইতে আসেন, তাহাদের যাচাই করিয়া দেখিলেই উত্তর মিলিবে।

গিন্নির কথা মনে ধরিল। সেলুনে সব শুনিয়া ব্যানার্জিবাবু সোজাসাপ্টা উল্টা জিজ্ঞাসা করিলেন। নিজেই বিচার কর — ত্রিপুরা আগাইতেছে কি পিছাইতেছে? লোকের গণতান্ত্রিক মত প্রকাশের অধিকার আছে কি নাই? পাঁচ-সাত জনে সব সিদ্ধান্ত লয়, নাকি গ্রাম শহর পাহাড়ে ওয়ার্ড স্তরেও নির্বাচিত সংস্থা কাজ করিতেছে? টাকা এক জায়গায় স্তূপীকৃত, নাকি গ্রামেগঞ্জে ছড়াইতেছে? শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কৃষি-শিল্প-মৎস্যচাষ-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হইয়াছে না অবনতি হইয়াছে? অশান্তি দাঙ্গা হাঙ্গামা বাড়িয়াছে না শান্তি-সম্প্রীতি

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? সাধারণ আইন শৃঙ্খলার অবনতি হইয়াছে না প্রভূত উন্নতি হইয়াছে? সারা দেশের তুলনায় আর্থিক শৃঙ্খলা ভাল না খারাপ? দুর্নীতি বেশি না কম? শিশুমৃত্যু প্রসূতি-মৃত্যু বেশি না কম? মহিলা, তফসিলি জাতি, উপজাতি, ও বি সি, মণিপুরি, হিন্দুস্তানি জনগোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু মুসলিমদের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে না অবনতি হইয়াছে? এই সব প্রশ্নের জবাব চিন্তা করিয়া দেখ, তাহা হইলেই বুঝিবে 'পরিবর্তন' চাহিবার যুক্তি আছে কি নাই!

রিটায়ার্ড শিক্ষক যদুবাবু নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, অর্থাৎ ব্যানার্জির কথায় — বামফ্রন্টের বিকল্প নাই। কিন্তু ইহার পরও কেহ কেহ বিকল্প সন্ধান করেন কেন? বাংলায় 'পরিবর্তন' ঘটিতে পারিল কেন? বাংলা কেবল ত্রিপুরার বাম-বিরোধীদেরই শিখায় নাই। বামেদেরও শিখিবার সুযোগ দিয়াছে। না শিখিলে আজ না হোক কাল কিন্তু লোকে বিকল্প খুঁজিবে।

এতক্ষণে পত্রিকা হইতে মুখ তুলিয়া সেনগুপ্ত-দা কহিলেন, বামফ্রন্টের বিকল্প নাই কে বলিল? বিকল্প উন্নততর বামফ্রন্ট। উহা গড়িতে হইবে। দরকার উন্নততর নেতা, কর্মী। আচারে ব্যবহারে, নিঃস্বার্থ কাজে লোকে আকৃষ্ট হইবে। উঁহারা আকাশ হইতে আসিবেন না। অবিচল আদর্শে লাগাতার প্রয়াসে গড়িয়া উঠিবেন। উঠিতেছেনও। দম্ভ ঢাকিয়া বিনয়ের অভিনয় করিলে, কিংবা নেতার বক্তৃতা মুখস্থ বমি করিলে লোকের মনে বিতৃষ্ণা জাগে। মনে প্রাণে জনগণের কাছে নত থাকা, জনগণের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করা, গণমনের আয়নায় নিজেকে প্রতিনিয়ত দেখা আর শোধরানোর গুণ একমাত্র কমিউনিস্টদেরই থাকে। টাউট-পরিবৃত নেতাকে লোকে অন্তর হইতে ঘৃণা করে। হামবড়া ভাব, নিজেকে ক্ষমতাবান হিসাবে জাহির করা, সাধারণ মানুষ বা অধস্তন কর্মীদের সঙ্গে গলা মোটা করিয়া কথা বলা আর বড় নেতার সামনে ভাঁড়ের ন্যায় স্তাবকতা করা কাহারও চোখ এড়ায় না। লোকে ইহাদের ভালবাসিবে না। এলাকায়, অফিসে কিংবা ইস্কুলের কর্মক্ষেত্রে পার্টি বা সংগঠনের নাম ভাঙাইয়া, ধান্ধাবাজি, ফাঁকিবাজি, 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল'-গিরি করা, পার্টি-সিদ্ধান্তের নামে নিজের মনগড়া সিদ্ধান্ত চাপাইয়া দেওয়া কোনও বামপন্থী কর্মীর লক্ষণ নহে।

সেনগুপ্ত-দা আরও যোগ করিলেন, এমনও দেখিয়াছি, উপরের ঠিক সিদ্ধান্ত কেহ ভুলভাবে চাপাইতেছেন, আবার কেহ নিজের ভুল ধারণা সাবলীলভাবে পেশ করিতেছেন। দুই ক্ষেত্রেই ভুল হইতেছে, বুঝিতেছেন না। লোকাল ও বিভাগীয় স্তরেও কোনও কোনও নেতা ভাবেন — আমি এখন আর লোকের দোরে দোরে যাইব কেন? লোকে আমার দোরে লাইন দিবে! সাধারণ মানুষের কথা শুনিবার ধৈর্য নাই, এমনকি দুর্ব্যবহার করিতেও দ্বিধা করেন না। মিথ্যা আশ্বাস দেন কিংবা মিথ্যা যুক্তি দিয়া 'আপদ' বিদায়ের চেষ্টা করেন। এমন নেতা-কর্মীরা

আসলে 'পার্টিকর্মী' হিসাবে নিজের আসল কাজটাই বুঝিতে পারেন নাই অথবা বুঝিবার দরকারই মনে করেন নাই। ইহারাই নিজেদের চারিপাশে কোটারি বা গোষ্ঠী গড়িয়া তোলেন অথবা গড়িয়া উঠিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত জোগাইয়া থাকেন। কিছু লোকের মনে 'পরিবর্তন'-এর ধ্বনি ইহাদের কারণেই এখনও প্রতিধ্বনি তুলিতে সক্ষম হয়।

সামনে ভোট। অনেকে বলিবেন এখন আত্মশুদ্ধির সময় নহে। কিন্তু ভুল চিন্তাচরণ। নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রাম। বামপন্থীদের আত্মশুদ্ধি কেবল পার্টি ক্লাস করিয়া বা করাইয়া সম্পন্ন হয় না। সংগ্রামের আগুনে পুড়িয়াই বামপন্থীরা আরও খাঁটি হন। বুঝিলে চিন্তা, সেই কবে ১৬৪ বছর আগে, বিশ্বের দুই মহান চিন্তানায়ক একটি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া গ্রিক পুরাণের এক অপরাজেয় দৈত্যের তুলনা টানিয়া বলিয়াছিলেন, যতক্ষণ এই দৈত্যের পা মাটিতে, ততক্ষণ তাহাকে কেহই হারাইতে পারে না। কমিউনিস্টরাও তাই। যতক্ষণ জনগণের মধ্যে কমিউনিস্টদের শিকড় থাকিবে, ততক্ষণই তাঁহারা অপরাজেয়। পা আলগা হইয়াছিল বাংলায়। ত্রিপুরায় তাহাদের পা এখনও দৃঢ়ভাবেই মাটিতে। কিছু বিষ-পিঁপড়া অবশ্য পায়ের তলা হইতে সুড়সুড়ি মারিতেছে। কামড়াইবার আগে সকল সময় মালুম করা যায় না। পিষিয়া মারিতেও ঝুঁকি রহিয়াছে। তাই ইহাদের সম্পর্কে খুব সাবধান!

(প্রকাশ ঃ ০৬.০৮.২০১২)

৬৬তম

মানুষকে 'কুকুর' বলা মোটেই সঙ্গত নহে। ঘোরতর অপমান হয়। ভাবিতেছি কুকুরকে 'মানুষ' বলিলে কী প্রতিক্রিয়া হইবে! তবে দিনকাল যা, কিছু মানুষের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া মনে হয়, কুকুরেরা আর খুশিমনে 'মানুষ' হইতে চাহিবে না! অবশ্য, সংবাদ-জগতের সহিত কুকুরদের ঘনিষ্ঠতা বহু যুগ হইতেই। সাংবাদিকেরা অনেকে নিজেদের 'ওয়াচ ডগ' বলেন। বলিতে ভালবাসেন। আবার, কোনটা খবর, কোনটা খবর নহে বুঝাইতেও কুকুরের উদাহরণ অতি আবশ্যক। বলা হয় — মানুষকে কুকুরে কামড়াইলে খবর হয় না। কিন্তু মানুষ কুকুরকে কামড়াইয়া দিলে আল্‌বত খবর!

চিন্তা-গিন্নি পত্রিকা নামাইয়া কহিলেন— হ্যাঁ গা, ইদানীং দেখিতেছি, না কামড়াইয়াও কুকুরেরা খবর হইতেছে! সংবাদপত্রে কুকুরের ছবি ছাপা হইতেছে। এই যেমন, ৬৬তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পুলিসের হাতে শৃঙ্খলিত কুকুর বিস্ফোরকের গন্ধ শুঁকিতেছে। কেন শুঁকিতেছে ইহাদের তো মাথাব্যথা নাই। কারণ ইহাদের মাথা পরাধীন। জঙ্গিদেরই মতন। জঙ্গিরা নাকি স্বাধীনতা দিবসে নাশকতার ছক করিয়াছে। জনবহুল স্থানে বিস্ফোরণ ঘটাইবার ছক। ১৫ আগস্ট উহাদের কাছে 'কালা দিবস'। ভারত-বিরোধী, ভারতের স্বাধীনতা-বিরোধী বিদেশি শক্তি নাকি এই জঙ্গিদের চালায়?

— কেবল বিদেশি? পাড়াতে চ্যালা না থাকিলে বাহিরের চোর চুরি করিতে পারে না। দেশেও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের চ্যালা রহিয়াছে! বুঝিলে গিন্নি, এইবারের স্বাধীনতা দিবসেও আমরা দেশনেতাদের ভাল ভাল কথা শুনিব। তিনরঙা পতাকা উড়াইয়া সেলাম করিব। আমাদের অভাব, আমাদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, স্বাস্থ্য-বঞ্চনা, পথকুকুরদের পাশে গাছতলায় কিংবা আকাশ-ছাউনির বিশ্বনিখিল ফুটপাতে কোটি মানুষের স্বপ্ন-সমাধি ঢাকিয়া টুনি জ্বালাইব, বেলুন সাজাইব। এই ৬৬তম স্বাধীনতা দিবসেও দেশের লক্ষ লক্ষ বেকারের দল কাজের খোঁজ বন্ধ রাখিয়া পেটে রঙিন গামছা বান্ধিবেন। কৃষকের দল অন্তত একদিন আত্মহত্যা বন্ধ রাখিবেন। বঞ্চিত শ্রমিক কর্মচারীরা ছাঁটাই হওয়া ভাইবোনদের পাশে লইয়া রামধুন গাহিবেন। গ্রামে-পাহাড়ে-শহরে, চায়ের দোকানে, ইটভাটা, চা-বাগানে অপুষ্ট শিশুর দল সরকারি চকোলেট মুখে পুরিয়া 'স্বাধীনতা-র স্বোয়াদ' চাটিবে। মহিলারা তাঁহাদের

মান সম্ভ্রম আর সমান অধিকারের আওয়াজ বন্ধ রাখিয়া মনু-সংহিতার পূজা করিবেন!

অন্য দিকে এই স্বাধীনতা দিবসেও সাম্রাজ্যবাদের কাছে স্বাধীনতা-র সওদা বন্ধ হইবে না। লুণ্ঠন-দুর্নীতি বন্ধ হইবে না। বরং তিহার জেলেও দুর্নীতিবাজ কেন্দ্রীয় নেতা মন্ত্রীর দল 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি কলঙ্কিত করিবেন। বেসরকারিকরণের চক্রান্ত বন্ধ হইবে না। উদারীকরণের কণ্ঠ আরও উদার হইবে। ৬৫ বছরের স্বাধীনতায় দেশের ৭০ ভাগ মানুষকে দিনে ২০ টাকাও খরচের সাধ্য হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারার সাফল্যে বুক ফুলাইবেন দেশনেতারা। না, ইঁহারা কেহ জঙ্গি নহেন। দেশসেবার ভঙ্গি করিয়া ইঁহারা দেশের মানুষকে লুণ্ঠন করেন। চরম দেশ-বিরোধী হইলেও প্রতিদিন টিভি-সংবাদপত্রে পরম দেশ-দরদির ছদ্মবেশে জনতার সামনে আবির্ভূত হন। এই ছদ্মবেশ এমনই নিখুঁত যে, আয়না দেখিয়া নিজেরাই অনেক সময় বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। প্রশিক্ষিত পুলিস-কুকুরও গন্ধ শুঁকিয়া এই অপরাধীদের শনাক্ত করিতে পারে না।

ব্যতিক্রমি এই ছোট্ট ত্রিপুরা। এখানকার বিপুল সংখ্যাগুরু মানুষের চক্ষু বড় সজাগ, দৃষ্টি বড় পরিষ্কার, কান বড় সতর্ক। ছদ্মবেশে আর বিভ্রান্ত হন না তাঁহারা। ধনু কলই ২৫ লক্ষ টাকা সমেত ধরা পড়িবার পর বহু তথ্য ফাঁস করিয়াছে। জঙ্গিরা কীভাবে নাশকতার ছক করিয়াছে, অস্ত্র কিনিবার টাকা কাহারা জোগাইতেছে, কীভাবে বাংলাদেশের জঙ্গি-শিবিরে নতুন যুবক পাঠানো হইতেছে এবং সর্বোপরি দেশের প্রধান শাসক দল কংগ্রেসের রাজ্য নেতারা কীভাবে জঙ্গিদের 'প্রস্তুত' করিয়া তুলিতেছেন। এমনকী প্রদেশ কংগ্রেসের উপজাতি বিভাগের শীর্ষ নেতা নিজে কীভাবে এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত, তাহাও ফাঁস করিয়াছে ধনু কলইরা। লোকে কিন্তু মোটেই অবাক হন নাই। কারণ, এই কংগ্রেস তাহাদের অচেনা নহে। দেশের দুশমনদের সহিত হাত মিলাইয়া নির্বাচিত সরকার উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র যেথায় রচিত হয়, স্বাধীনতার বড় বিপদ তো সেইখানেই।

না, আজ অবধি ধনু কলই প্রসঙ্গে কংগ্রেস দলের কোনও শীর্ষ নেতা টু-শব্দটি করিতেছেন না। কোনও প্রতিবাদ নাই, মন্তব্য নাই। হাতেনাতে ধরা পড়িলে যেমন আর কিছু বলিবার থাকে না, এ যেন তেমনই। কংগ্রেসের জোটসঙ্গী আই এন পি টি-র গোসা হইবার কথা। এতকাল যে 'গোপন ডিল' তাহারা করিতেন, এইবার কংগ্রেসের নেতারা নিজেরাই সেই 'জঙ্গল ডিল' করিতে উদ্যোগী। ধনু ধরা পড়ায় বেশ হইয়াছে!ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়া এত সহজ নহে! শহরের মিছিলেও সেই রাগের প্রকাশ ঘটিয়াছে আই এন পি টি-র। তাহাদের দাবি, বনবাসী অনুপজাতিদের কোনওমতেই পাট্টা দেওয়া চলিবে না। কংগ্রেসের জোট কমিটির চেয়ারম্যান বলিয়াছেন — আই এন পি টি-র এই দাবির কথা তাঁহারা এখনও জানেন না। জ্বলজ্যান্ত মিথ্যা কথা গিন্নি। গত এ ডি সি ভোটের আগেও বিজয় রাঙ্খলরা

ছাপানো ইস্তাহারে এই দাবি রাখিয়াছিলেন। কংগ্রেস বিরোধিতা করে নাই। এখন ঢঙ করিতেছে।

গিন্নি মাটিতে জোরদার চাপড় মারিয়া কহিলেন, ঠিক বলিয়াছ। ত্রিপুরায় বৈষ্ণব সাজিলেও কাজ হইবে না। ১৫ আগস্টের আগে পুলিস-কুকুর জঙ্গি-বোমার গন্ধ শুঁকিতেছে। আর অভিজ্ঞ ত্রিপুরাবাসী, কী যেন বলিলে? ও হ্যাঁ 'ওয়াচ ডগ'! ত্রিপুরাবাসী ওই 'ওয়াচ ডগ'-এর মতনই জঙ্গিদের সুপারিদাতা, দেশ-বিরোধী, গরিব-বিরোধীদের দিকে কড়া নজর রাখিয়া এইবারের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করিবেন।

(প্রকাশ : ১৩.০৮.২০১২)

ভোটমুখী

দাদু-র মুখের গপ্পো। গেরামের গোব্‌রা ঠাকুর (শ্রীযুক্ত গোবর্ধন আচার্য)-কে নাকি কেহই খাওয়াইয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিত না। রান্নাবান্না যতই উত্তম হউক, গোবরা ঠাকুর ঠোঁট উল্‌টাইয়া 'ভাল না' বলিবেনই। মন্দারবাড়ির (মজুমদার বাড়ির) রন্ধনপটিয়সী বড়গিন্নি একবার চ্যালেঞ্জ লইয়া রাঁধিয়া-বাড়িয়া পরিপাটি করিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন। ঠাকুর গলা অবধি খাইলেন, সব আইটেম দুই-তিনবার করিয়া লইলেন। হাত চাটিলেন, আঙুল চুষিলেন। বিস্তর আহা উহু করিলেন। শেষে প্রকান্ড খান-দুই ঢেকুর তুলিয়া আচমন সারিলেন। বড়গিন্নি সবিনয়ে জানিতে চাহিলেন — ঠাকুর মহাশয়, রান্না কেমন হইল? একটু থতমত গোবর্ধন আচার্য কহিলেন, নাঃ — ভাল নাঃ। রান্না এত ভাল হওয়াটা মোটেই ভাল না!

এই গোব্‌রাগণ আগেও ছিলেন এখনও আছেন। বিরোধী দল কংগ্রেসকে দেখিলেই মালুম হইবে। বাম সরকারের সব খারাপ, সব নিন্দনীয়। কিছুই ভাল না! সব কাজের বিরোধিতা করিতে হইবে। আরে ভাই, মহা-পাজি সরকারও পাঁচ বছরে অন্তত দুই-একটা ভাল কাজ করিয়া থাকে। চক্ষু বুজিয়া সমস্ত কিছুর বিরোধিতা করা কোনও বিরোধী দলের কর্ম নহে। জনগণের পক্ষে সরকারের কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ দেখাইয়া দেওয়াই তো বিরোধীদের দায়িত্ব, না কী! ইহা না করিয়া, সবকিছুর বিরোধিতা করিলে জনগণযে 'জন-বিরোধী' ছাড়া কিছু বলিবে না!

ত্রিপুরার বাম সরকার বিপিএল কার্ডধারী এবং আন্ত্যোদয়ভুক্ত সব পরিবারকে ২ টাকা দরে মাসে ৩৫ কিলো চাল দেওয়া শুরু করিয়াছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কহিলেন, 'কৃষকদের চরম ক্ষতি হইবে।' ঢাক বাজাইলেন বিরোধী নেতা। কাঁশা-তে তাল ঠুকিলেন সুবল-সখা। কিন্তু, রাজ্য সরকার নিজের কোষাগার হইতে ভর্তুকি দিয়া ২ টাকাতে চাল দিলে কী করিয়া যে কৃষকের ক্ষতি হইবে, কংগ্রেসেব নেতারা কেহই বুঝাইতে পারিলেন না, কৃষকও কিছুই বুঝিল না। তবে হ্যাঁ, একখান গোপন কথা আন্দাজ করা গেল। আগে বিপি এল কার্ডধারীরা মাসিক কোটার সবটা চাল রেশন দোকান হইতে তুলিতে পারিতেন না। ফলে, কিছু কালোবাজারি আর চোরাকারবারির বিশেষ সুবিধা হইত। ইহাদের অবশ্যই কিঞ্চিৎ ক্ষতি

হইবে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ইহাদেরই 'কৃষক' বুঝাইতে চাহিলে অন্য কথা!

রাজ্যের বিচারে গরিব, কিন্তু কেন্দ্রের বিচারে গরিব নহেন (তাই কার্ডবিহীন!) এমন প্রায় ৮৬ হাজার বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবারকেও ৬ টাকা ১৫ পয়সা দরে চাল দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা। কিলো প্রতি ৪ টাকা ৫০ পয়সা সরকারি ভর্তুকি। এইবার আর 'কৃষকের ক্ষতি' নহে! 'কৃষকের ক্ষতি' বলিয়া ল্যাজে-গোবরে হইয়াছেন সপারিষদ প্রদেশ সভাপতি। এইবার চিকনবুদ্ধির প্রদেশ মুখপাত্র আসরে আসিয়া কহিলেন, ভোটমুখী সিদ্ধান্ত! কাম হইবে না। কেরলে, বাংলায় কাম হয় নাই, ত্রিপুরায়ও হইবে না। তাহাতেই গোব্‌রা ঠাকুরের গপ্‌পো মনে পড়িল।

সেলুনে দাড়ি-ছাঁটা দুই গালে প্রকট হইয়া উঠা দুই লুঙ্গায় সযতেন হাত বুলাইয়া ব্যানার্জিবাবু কহিলেন — থামো হে চিন্তাচরণ, থামো! গোব্‌রা ঠাকুর খাইয়াও অসন্তুষ্টির ভান করিতেন। কিন্তু কংগ্রেসি দাদাদের ২ টাকা কিংবা ৬ টাকার চাল খাইতে হয় না। ইঁহারা যাহাদের লোক, সেই তাহারাও এইসব 'ছোটলোকের চাল' খান না। দাদারা ভোটলোচন! ভোট ছাড়া আর কিছুই দেখেন না। খুবই সহজ সরল প্র্যাকটিকাল মন। জনগণের জন্য কাজ-এর মানে — টুপি পবানো! ভোটের জনাই সবকিছু! ভোটের আগে ভোটক্রয়ের জন্য কেবল কিছু নোট-বিয়োগ। তাহার পর ভোটে ক্ষমতালাভের যোগ! আর ক্ষমতালাভেই লুটপাটের সুযোগ! ইহাই তো জনসেবা! যাহারা করেন —তাহারাই তো জনসেবক! দেশময় চক্ষু বিছাইয়া দেখ চিন্তা, ইহাদেরই দেখিবে।

তাই, তাহাদের চক্ষে ২ টাকা চাল ভোটমুখী, ৬ টাকা ১৫ পয়সার চালও ভোটমুখী! গত সাড়ে চাব বছরে ২৭ হাজার চাকুরি যেমন ভোটমুখী, আরও পাঁচ হাজার অস্নাতক বেকারের চাকরিও 'ভোটমুখী' বলিয়াই চিঠি দিয়া বন্ধ করিতে হইয়াছে। ১৯৭৯-এ ককবরক ভাষাকে সরকাবি ভাষার মর্যাদা দেওয়া যেমন 'ভোটমুখী' ছিল, এখন ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষার বিকাশে পৃথক ডাইরেক্টরেট গঠনও ভোটমুখী। চাকমা ভাষায় লেখাপড়াও তো ভোটমুখীই! বাম সরকাবের সর্বক্ষেত্রের সমস্ত উন্নয়ন কাজ, সবই তো ভোটমুখী!

ব্যানার্জিবাবু সেলুনের আয়নায় একবার নিজের বিয়োগান্তক দন্তপঙ্‌ক্তির দশা দেখিয়া যোগ করিলেন, ভোটের আগে সব দল প্রতিশ্রুতি দেয়। ভোটে জিতিয়া সরকার গড়িতে পারিলে সেই সব প্রতিশ্রুতি পালন করিবার কথা। দুই ভোটের মধ্যিখানে পাঁচ বছর হইল কাজের সময়। কাজের সময় 'ভোট'-এর কথা মাথায় রাখিতে হইবে না? ইহা তো ভোটদাতাদের প্রতি দায়বদ্ধতারই প্রমাণ! যে সরকার সারা বছর মানুষের জন্য কাজ করে তাহারা সাড়ে চার বছরের মাথায়ও কাজ করিবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। নিছক ভোটমুখী আখ্যা দিয়া ইহাকে অবজ্ঞা করা চলিবে? ত্রিপুরায় কোনও বাম সরকারের এমন একটি বছরের রেকর্ড

নাই, যে বছর কমপক্ষে পঞ্চাশটি বড় উন্নয়নের সিদ্ধান্ত হয় নাই। জঙ্গি-সন্ত্রাসের ভয়ঙ্কর দিনগুলিতেও উন্নয়ন কাজ বন্ধ হয় নাই। তাহা না হইলে ত্রিপুরায় এই অভূতপূর্ব অগ্রগতি কীভাবে সম্ভব হইত? প্রতি গ্রামে পাকা রাস্তা, প্রতি গ্রামে ইস্কুল, এত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এত হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যুতে কৃষিতে, মৎস্যচাষে, সেচ-এ এত উন্নতি কী করিয়া হইতে পারিত? ত্রিস্তরপঞ্চায়েত, পুরসভা, এ ডি সি, ভিলেজ কমিটি হইতে জেলা, মহকুমা ব্লকের সংখ্যাবৃদ্ধি, সর্বোপরি — রাজ্যের মরণপণ লড়াইয়ের ফসল রেল লাইন— এই সবই কেবল ভোটের জন্য?

ঘরে ফিরিয়া সমগ্র আলোচনা রিপোর্ট করিলাম। চিন্তা-গিন্নি মুখঝামটা মারিয়া রায় দিলেন— আলোচনা একপেশে। কহিলেন— ভুলিয়া গিয়াছ, সকলেই সরকারে গিয়া প্রতিশ্রুতি পালন করে না। কেন্দ্রের কংগ্রেসি উপা মন্ত্রিসভাকে দেখ! বছরে এক কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি শপথের সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। ত্রিপুরায় জোট আমলের পাঁচ বছরে ইহাদের প্রধান কাজ ছিল দুটি। লুট কর আর সন্ত্রাস কর, সন্ত্রাস কর আর লুট কর। ভোটদাতাদের কথা, তাঁহাদের হাতের মূল্যবান গণতান্ত্রিক অস্ত্র 'ভোট'-এর কথা যাহারা মনে রাখেন না, তাহারাই পেশিশক্তি আর গুন্ডামিতে ভরসা রাখেন। ভোটের সময় রিগিং, গণনা-জালিয়াতিতে বিশ্বাস করেন। ইহারাই জনগণের ভোটক্রয়ের চেষ্টা করেন। এইবার নলছড় উপনির্বাচনেও ইহাদের দেখিয়াছি। লোকে ইহাদের যা করিবার করিয়া দিয়াছে।

ভাবিলাম— কংগ্রেস মুখপাত্র শাক দিয়া মাছ ঢাকিতেছেন। কেরল, আর বাংলায় বামেরা ভোট কিনিতে ১ টাকায় চাল দেন নাই। দেশের সমস্ত পরিবারকেই ২ টাকা কিলো দরে চাল দেওয়ার জন্য লড়িতেছেন কেবল বামেরাই। কেরলে, বাংলায় বাম নেতা-কর্মীদের অন্য ভুল ছিল। জনগণ বরং শোধরাইবার সুযোগ দিয়াছেন। ত্রিপুরায় সেই পরিস্থিতি নাই। অনেক আগে হইতেই গোটা ত্রিপুরা প্রস্তুত। ভোটমুখী। মেজাজ দেখিয়া তো মনে হইতেছে এইবার আরও শক্তপোক্ত করিয়াই তাঁহারা সপ্তম বাম সরকার গড়িতে ইচ্ছুক।

(প্রকাশ ঃ ২১.০৮.২০১২)

আঃ মরণ!

ভোটের টিকিট-প্রত্যাশী পাড়ার এক কংগ্রেসি দাদা প্রবল উত্তেজনা লইয়া সেলুনে প্রবেশ করিলেন। এতদিন কম্পিউটার ফ্যাকাল্টির 'আমরণ'-এ ব্যস্ত ছিলেন। দাড়ি কাটাইবারও সময় পান নাই। ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রায় চিৎকার করিয়া কহিলেন, সাতশো ফ্যাকাল্টি ছেলেমেয়ের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছেন মানিক সরকার। অন্য রাজ্য হইলে ...!

তাঁহার ফোঁসফোঁসানি একটু কমিতেই গালে কস্‌মো মারিলাম। ব্রাশ ঘষিয়া ফেনা তুলিতে তুলিতে জিজ্ঞাসা করিলাম — তা, মধ্যপথে অনশন তুলিলেন কেন দাদা? 'আমরণ' মানে তো 'মরণ পর্যন্ত'। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে! হয় নিয়মিতকরণের দাবি আদায়, নয়ত মৃত্যু! দাবিও আদায় হইল না, কেহ মরিলও না! বরং, ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া লিখিত রিপোর্টে কহিলেন — ইহাদের সকলের শারীরিক মানসিক তরতাজা ভাব বজায় রহিয়াছে। দশদিন অনশন (ন + অশন) বা অনাহারের পর ইহাদের নাড়ি ও রক্তচাপ এত স্বাভাবিক যে, উহা খুবই অস্বাভাবিক। রিপোর্টের পরদিনই অনাহার প্রত্যাহার? টিকিট-প্রত্যাশী দাদা ধমক দিয়া বলিলেন — ধ্যাৎ, প্রত্যাহার নয়, স্থগিত বলো। বলিলাম — সরি দাদা! আমরণ অনশন স্থগিত! মানে, ইহার পরে দরকার হইলে আবার আমরণ। কিন্তু তখন 'স্থগিত আমরণ' যে দশদিন খালি পেটে থাকিবার পরই আরম্ভ করিতে হইবে! মরণ!

প্রত্যাশী দাদা লালগোলা চক্ষু মেলিয়া কহিলেন, মশকরা করিতেছ চিন্তা? আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক ফ্যাকাল্টিকে ১০ হাজার টাকা দিতে বরাদ্দ পাঠাইয়াছে। আর বামফ্রন্ট সরকার প্রবঞ্চনা করয়া তিন হাজার দিতেছে। এখন পাঁচ হাজার দিবে বলিয়াছে। কত বড় ধড়িবাজ এই সরকার । অন্য রাজ্য হইলে...।

— রাখেন, রাখেন দাদা! এতক্ষণে পত্রিকার আড়াল হইতে মুখ বাহির করিলেন চৌধুরিবাবু। রিটায়ার্ড শিক্ষা-অফিসার। কহিলেন, দাদাভাইগো, উল্টা-সিধা কী সব বকিতেছেন? প্রদেশ কং নেতারা ভোট-নোটঙ্কিতে যখন যেমন খুশি মনগড়া তথ্য-পরিসংখ্যান ছাড়েন। আর আপনারা মহাপ্রসাদ জ্ঞানে গিলিয়া যত্রতত্র তাহাই বমি করেন। মরণ! কান খুলিয়া শুনেন দাদা। ২০০৭-০৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার 'ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি

ইন স্কুলস' নামে এই প্রকল্পটি করেন। পুরা টাকা কিন্তু কেন্দ্রের নহে। ৯০ ভাগ দিবে কেন্দ্র, ১০ ভাগ রাজ্যের। ইশকুল পড়ুয়াদের কম্পিউটার শিখাইবার প্রকল্পটিতে মূল শর্তই হইল, সরকার কোনও ফ্যাকাল্টি নিয়োগ করিবে না। বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানিকে কাজে লাগাইতে হইবে। তাহারাই ইশকুলের ছেলেমেয়েদের কম্পিউটার শিখাইবার জন্য ফ্যাকাল্টি দিবে। প্রতি ইশকুলের জন্য বরাদ্দ হয় মোট ১ লাখ ৩৬ হাজার টাকা। প্রকল্পের কোথাও ফ্যাকাল্টিদের কত বেতন ভাতা হইবে, তাহার বিন্দুমাত্র উল্লেখ ছিল না। রাজ্যের ৩৫০টি ইশকুলে মোট ৭০০ ফ্যকাল্টি নিযুক্ত করা হয় কয়েকটি বেসরকারি কোম্পানির মাধ্যমে।। প্রায় সব রাজ্যেই ইহা চালু হয়। অধিকাংশ রাজ্যেই কিন্তু ফ্যাকাল্টিদের বেতন ত্রিপুরার তুলনায় বেশি নহে! অন্য রাজ্য হইলে...? শুনেন দাদা, কংগ্রেস-শাসিত পড়শি রাজ্য আসামে ফ্যাকাল্টিদের বেতন দুই-আড়াই হাজার টাকা মাত্র! সেথায় 'আমরণ' হইবে? মরণ!

টিকিট-প্রত্যাশী কংগ্রেসি দাদা কিছু একটা বলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। বাধা দিয়া চৌধুরিবাবু কহিলেন — খাড়ান, কথা শ্যাষ হয় নাই। ২০০৯-১০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সংশোধিত নতুন প্রকল্প হাজির করিয়াছেন। তাহাতে প্রতি ইশকুলের জন্য বর্ধিত বরাদ্দ মোট ২ লাখ ৭০ হাজার টাকা। ত্রিপুরার আরও ২৭২টি ইশকুলকে এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব আছে। ইহা এখনও চূড়ান্ত হয় নাই, আরম্ভও হয় নাই। নতুন এই সংশোধিত প্রকল্পেই কম্পিউটার ফ্যাকাল্টিদের মাথাপিছু ১০ হাজার করিয়া দিবার কথা এক জায়গায় বলা হইয়াছে। এইবার কংগ্রেসি দাদা প্রায় থাবা মারিয়া কহিলেন — তবে?

চৌধুরিবাবু বলিলেন — রাখেন, শ্যাষ হয় নাই। দশ হাজার ভাতা বলা হইলেও প্রকল্পের ব্যাখ্যা বা 'এক্সপ্ল্যানেশন'- এ স্পষ্ট বলা হইয়াছে — কেবল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বা এম সি এ করা ফ্যাকাল্টিরাই দশ হাজার পাইতে পারেন। বি সি এ বা গ্র্যাজুয়েটরা পাঁচ হাজার। আরও আছে। বলা হইয়াছে, প্রতি ইশকুলে একজনের বেশি ফ্যাকাল্টি নিযুক্ত করা চলিবে না। কাছাকাছি হইলে দুই-তিনটি ইশকুলে একজন ফ্যাকাল্টিই শিক্ষা দিবেন। অর্থাৎ গ্র্যাজুয়েট ফ্যাকাল্টি হইলে পাঁচ হাজার টাকায় তিন ইশকুলে পড়াইতে হইবে! আগের প্রকল্পে রাজ্যের ৩৫০ ইশকুলে ফ্যাকাল্টি ৭০০ জন! অর্থাৎ প্রতি ইশকুলে দুই। বাম সরকার ইহাদের প্রত্যেককে মাসে পাঁচ হাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ছিনিমিনি কে খেলিতেছে দাদা? প্রবঞ্চনা কে করিতেছে? রাজ্য সরকার, নাকি আপনাদের কেন্দ্রীয় উপা সরকার? মরণ!

টিকিট-প্রত্যাশী কংগ্রেসি দাদার মুখে আর কোনও শব্দ নাই। তিনি একমনে আয়না দেখিতে ব্যস্ত। বার কয়েক আয়নায় নিজেকে ভেংচি কাটিয়া বলিলেন, চলিলাম রে চিন্তা। খাতায় লিখিয়া রাখিস — ! তাঁহার গমনপথের পানে তাকাইয়া ভাবিতেছিলাম কংগ্রেস নেতাদের

কথা। দাঙ্গার সময় মর্গে মৃতদেহ আসিতেছে শুনিলেই ফুলের মালা লইয়া ছুটিতেন। এখন ধোঁয়া দেখিলেই সকলে মিলিয়া ঝাঁপাইতেছেন। ফুঁয়াইয়া আগুন জ্বালিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। শেষে হয় মুখ পুড়িতেছে নয় দম ফুরাইতেছে। ফ্যাকাল্টি যুবক-যুবতীদের সমস্যা গভীর। শিক্ষক নিয়োগে তাহাদের কথা সহানুভূতির সহিত বিবেচনার আশ্বাস রাজ্য সরকার বারবার দিয়াছে। চাকুরি নিয়মিত্ করিবার সংস্থান কেন্দ্রীয় প্রকল্পেই নাই। কেন্দ্রকে তবুও এই দাবির কথা রাজ্য জোরের সঙ্গেই জানাইয়াছে। আবার জানাইবে। আরও আলোচনা হইবে। কোনওভাবে আরও কিছু করা যায় কিঁ না কথা বলা যাইতেই পারে। সেই গণতান্ত্রিক পরিবেশ এই রাজ্যে আছে। যে কোনও অংশের মানুষ তাহাদের যে কোনও দাবি তুলিতে পারেন, সর্বস্তরে কথা বলিতে পারেন। কিন্তু মাননীয় কংগ্রেস নেতারা এই ফ্যাকাল্টিদের বিভ্রান্ত করিয়া 'আমরণ '- এ পর্যন্ত বসাইলেন। দফায় দফায় নিজেরাই 'পথ অবরোধ' করিলেন। পুলিসকে প্ররোচিত করিবার চেষ্টা করিলেন। লাঠি, গুলি চলিল না। লাশ পড়িল না। পুলিস এত সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবে কে জানিত! আঃ মরণ!

শেষ পর্যন্ত ফ্যাকাল্টিদের বড় অংশ এই হঠকারী আন্দোলন হইতে নিজেদের বিযুক্ত করিয়াছেন। কং নেতাদের হতাশা ছাড়া কিছুই জুটিল না! কী করিবেন ইঁহারা? কোনও দায় নাই, দায়বদ্ধতা নাই, কোনও কর্ম নাই, কোনও সূচি নাই, কোনও ধারাবাহিকতা নাই। ইস্যুও নাই। কোথাও একটি কিছু পাইলেই হইল! কেবল 'ট্রাই' করিয়া দেখিতেছেন! এই ছেলেমানুষিতে বামফ্রন্টের মোকাবিলা করিবেন? আঃ মরণ!

(প্রকাশ: ২৭.০৮.২০১২)

স্বপ্ন-সংলাপ

চিন্তা শীলের শেষ রাত্রের স্বপ্নে তিনি দেখা দিলেন। সঙ্গে কেবল একখানা চেয়ার। কোমরের সহিত নাইলনের দড়ি দিয়া পিছনে বান্ধা! সঙ্গে আর কেহ নাই, কিছু নাই। বিনীত নমস্কার জানাইয়া কহিলাম, দাদা — গরিবের ঘরে বসিবার কিছু নাই ভাবিয়া বুঝি চেয়ার সঙ্গে আনিলেন? শশব্যস্ত দাদা কহিলেন, আরে নো নো, ডোন্ট ওরি চিন্তা। এইটা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির চেয়ার। হারাইবার ভয়ে সঙ্গে লইয়া ঘুরি। জানো তো, স্বপ্নেও এই চেয়ার লইয়া টানাটানি। তাই কোমরে দড়ি দিয়া বান্ধিয়া রাখি!

— আচ্ছা দাদা, কাজটা কি ভাল হইল, গান্ধীগ্রামে? শত হইলেও মহামহিম রাষ্ট্রপতিজির পুত্র, বাংলার কংগ্রেস নেতা, নলহাটির বিধায়ক, জঙ্গিপুরে পিতার শূন্য লোকসভা আসনে দলের প্রার্থী। জাতির জনক অহিংস গান্ধীজির নামে যে গ্রামের নাম, সেই খানেই কিনা কংগ্রেসের অফিসে ঢুকাইয়া তাঁহাকে এইরকম সহিংস লাঞ্ছনা? বাবা প্রণব মুখার্জির রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথের ঠিক ৪৪ দিনের মাথায়? ছি! পত্র-পত্রিকায় বাহির হইবার পর আবার 'প্রতিবাদ'! মুখপাত্রের মুখ দিয়া কহিলেন — 'এমন কোনও ঘটনা ঘটে নাই'! ফলাফল কী বিষম হইতেছে বুঝিতেছেন তো? হাইকমাণ্ডও জানিবার বাকি নাই। আপনার সঙ্গী, প্রাক্তন মন্ত্রী, দলের এস সি ডিভিশনের নেতা প্রকাশ দাসের হাল বেহাল। আপনি প্রবল চাপে।

— আরে ধুস্, আমি চাপে থাকিব কেন? দাদা কহিলেন, আমি এই ব্যাপারে কিছুই জানি না। তুমিও সুবল ভৌমিকের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হইলে নাকি? সুরজিৎ বীরজিৎ গোপাল সুবলরা ঘোঁট পাকাইলে পাকাক। আমার কিছুই যায় আসে না! আমাকে রাহুলজি বসাইয়াছেন। দশ নম্বর জনপথে এখন মাতার মুখে তরুণ পত্র-সূর্যের আলো! তাঁহাকে ছাড়া কাহারও তোয়াক্কা করি না। এই চেয়ার সঙ্গে লইয়াই তো ঘুরিতেছি। কাহারও ক্ষমতা থাকিলে কাড়িয়া লইতে বল। হাতে সিগারেটের ছ্যাঁকা লাগাইয়া দিব! বেশি ফটং ফটং করিলে মুখেও তালা মারিব!

আচ্ছা, ধর লাঞ্ছনা কিছু হইয়াছে। তো কী হইল? ত্রিপুরায় আসিয়া কোনও কেন্দ্রীয় নেতা

এইরকম লাঞ্ছিত হন নাই? অজিত পাঁজার ধুতি খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই তো জয়কুমার তো শহরেই আছেন। ফেলেইরো অসিভেছেন। জিজ্ঞাসা করিও। ইহারা কম লাঞ্ছিত হইয়াছেন? ইহাকে লাঞ্ছনা বলিও না। কংগ্রেস কর্মীদের মনের ভাব প্রকাশ করিবার একটি পন্থা মাত্র! কেবল ত্রিপুরায় কেন ভাই! কোন রাজ্যের কংগ্রেসে এমন মারামারি, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা হয় না? রক্ত-টক্তও পড়ে। বুঝিলে — এটা স্বৈরাচারী সি পি এম দল নহে যে সকলে এক সুরে এক কথাই বলিতে হইবে! কংগ্রেসে ফ্রি-স্টাইল ডেমোক্রেসি আছে। যার যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। আর, এত হই চই-এর কী আছে? রাষ্ট্রপতি-পুত্র তো আর রাষ্ট্রপতি নহে। পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস দল অভিজিৎ-এর বাপের জমিদারি হইতে পারে, ত্রিপুরার কংগ্রেসে জমিদারিটা কিন্তু আমার বাপের!

হাতজোড় করিয়া কহিলাম, দাদা —ত্রিপুরার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ বাঁচিয়া থাকিলে ১০৪ বছর পূর্ণ করিতেন। তাঁহার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি-পুত্র আসিলেন। আর আপনারা বাপ-বেটা অনুপস্থিত! ইহার পরে, বিষ্যুদবারের বারবেলার আগেই, কালীবাজারে শচীন্দ্রলালের নামে পাঠাগার উদ্বোধন করিয়া ফিরিবার পথে...। লোকে বলিতেছে —আপনিই গান্ধীগ্রামের নেপথ্য নায়ক? দাদা গর্জিয়া কহিলেন, বলিলে বলুক। কাহার পারমিশনে কংগ্রেসের পক্ষে কাজ করিতে আসিয়াছে অভিজিৎ? কহিলাম, দাদা — বিধায়ক সুবল ভৌমিক তো কংগ্রেসেরই সাধারণ সম্পাদক। তাঁহারাই তো কমিটি করিয়া শচীন্দ্রলালের স্মৃতি-টিতি রক্ষা করিতেছেন! প্রদেশ কংগ্রেস তেমন কিছু করে টরে না। আরও ক্ষেপিয়া দাদা কহিলেন, কচু করিতেছে। স্মৃতি রক্ষা না ছাই। গোষ্ঠীবাজি করিতেছে। স্রেফ গোষ্ঠীবাজি! সভাপতির পাল্টা-গোষ্ঠী শক্ত করিতেছে। প্রকাশ দাসের বদলে বামুটিয়াতে কৃষ্ণধনকে তুলিবার চেষ্টা। সি পি এমকে সুযোগ দিবার ব্যবস্থা। প্রকাশ-বলাই-অমিতরা ক্ষেপিবে না? ছাড়িয়া দিবে? ইহা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত গণরোষ! আর শুন, অফ দি রেকর্ড বলিতেছি। ইদানীং তৃণমূল নেতাদের সহিত সুবলদের অতিরিক্ত মাখামাখি দেখিতেছ? স্মৃতিরক্ষা কমিটির মঞ্চেও তৃণমূল সভাপতিকে পাশে বসাইল! কংগ্রেস কর্মীরা কড়া নজর রাখিতেছে। ঘোর ষড়যন্ত্র! কংগ্রেসের ভিতরে সি পি এমের দালালরা ভিড় করিয়া রহিয়াছে। ইহারা সি পি এমে গেলেই পারে।

কহিলাম, গেলে দোষ কী দাদা? আপনার পিতাও এককালে জনতা পার্টি করিয়া সি পি এমের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। সুধীর মজুমদার, রতন চক্রবর্তীরাও তৃণমূলে গিয়াছিলেন! দাদা থামাইয়া কহিলেন — আরে, কংগ্রেস দল জীবন্ত নদীপ্রবাহ! স্রোত আসে, আবার চলিয়া যায়! আসা-যাওয়াই তো কংগ্রেস! রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি নিজে ১৯৮৪-তে ইন্দিরা খুনের পর কংগ্রেস ছাড়িয়া রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী কংগ্রেস গড়েন

নাই? এত যে শচীন্দ্রলালের কথা বলিতেছ, ১৯৭৭-এ শচীন্দ্রলাল কংগ্রেস ছাড়িয়া লোকসভা ভোটে সি এফ ডি প্রার্থী হন নাই? এখন কেহ কোথাও যাইতে চাহিলে যাক। ছয় কংগ্রেস বিধায়কের ঘোঁট নাকি আমার বিরুদ্ধে দিল্লি অভিযান করিবে। তবে হ্যাঁ, সময় কম। সবকিছু তাড়াতাড়ি করিতে হইবে। টিকিট বন্টনের কাজটা দুই মাস আগেই সারিয়া লইতে চাই। ইহার পর এই চেয়ারও গেলে যাক্ —!

হঠাৎ, গিন্নির ঠেলায় ঘুম ভাঙিল। গান্ধীজি, রাষ্ট্রপতি, প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, নীতি-আদর্শ, পূর্বসূরিদের প্রতি সম্মান, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ স — ব মাথার মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে দ্রুত আবছা হইয়া গেল। শুধু স্পষ্ট জাগিয়া রহিল কংগ্রেস আর ইলেকশনের টিকিট: গিন্নি হাঁকিয়া কহিলেন — চা খাইয়া সেলুনে যাও। আমি যাই, খাদ্য নিরাপত্তার দাবিতে গণধরনা আছে।

(প্রকাশ: ১০.০৯.২০১২)

হতাশ হইবেন না

২০ সেপ্টেম্বর,২০১২।

প্রতিবাদ, হরতাল, বন্‌ধ। মনে হইতেছে সেদিন বাহির হইতে তালা ছাড়াই গোটা দেশ বন্ধ থাকিবে! কেন্দ্রের মনমোহনী কাণ্ডকীর্তিতে দেশবাসী বিমূঢ়, বিস্মিত। ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ। এতদিন সঙ্গী নেতা-মন্ত্রীরা যখন লক্ষ-কোটি লুটিয়া খাইতেছিলেন, তিনি চুপমোহন! জোকস-এ পড়িলাম, 'কেহ খাইবার কালে কথা বলিতে নাই' — ছোটবেলার এই 'উপদেশ' এখনও নাকি মানিয়া চলেন প্রধানমন্ত্রী! কিন্তু, তাঁহার মুখেও কয়লার কালি। কী দিয়া কী ঢাকিবেন! তাই কি চরমপন্থা নিলেন? খুনের আসামি আরও একটা খুন করিলে কী আর হইবে! সাজা তো একই, ফাঁসি কিংবা যাবজ্জীবন। দুর্নীতির দায়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়াই এক শ্বাসে দাম বাড়াইলেন ডিজেলের, ভর্তুকি ছাঁটিলেন রান্নার গ্যাসে, মৃত্যুঘন্টা বাজাইলেন ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার, বিমান পরিবহনেরও ৪৯ শতাংশ দিলেন বিদেশিদের হাতে এবং সেরা কীর্তি — খুচরা পণ্যের ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষ বিদেশি পুঁজি ঢুকাইয়া দিলেন।

চাপ? তাহা তো আছেই। দেশে খলনায়ক হইতে রাজি, কিন্তু বিদেশ, মানে আমেরিকার কাছে 'মহানায়ক' হইয়া আহ্লাদিত প্রধানমন্ত্রী এখন কিন্তু আর চুপমোহন নহেন। বলিতেছেন, 'যাহা করিয়াছি, ঠিক করিয়াছি।' নহিলে কি আর রাতারাতি আমেরিকার বড় পত্রিকা তাঁহাকে 'ভারতের সবচেয়ে অকর্মণ্য প্রধানমন্ত্রী' হইতে 'সবচেয়ে বড় কর্মবীর প্রধানমন্ত্রী' বানাইয়া হেডিং করিয়া ফেলিল? অবশ্য, বহুজাতিকদের গোসাও ছিল সঙ্গত। কেবল তোমরাই দিল্লির তখ্‌তে বসিয়া লুট করিবে, আর আমার দূরে বসিয়া আঙুল চুষিব? তাই খুচরা পণ্যের বাণিজ্যে এফ ডি আই। ঠিক আছে বিদেশি দাদারা, এইবার তোমরাও খাও! আসো, মিলিয়াজুলিয়া খাই। দেশবাসী কিছুদিন মিছিল করিবে, বন্‌ধ ইত্যাদি করিবে। উহাতে কিছু হইবে না। রবিঠাকুর বলিয়াছেন, 'পেটে খাইলে পিঠে সয়!'

২০ সেপ্টেম্বর। দিনটা বৃহস্পতিবার। এমনিতেই সেলুন বন্ধ। নো চিন্তা। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিব — সাপ্তাহিক বন্ধের জন্যও বন্ধ, আবার ত্রিপুরা বন্‌ধের জন্যও বন্ধ! চিন্তা-গিন্নি শুনিয়া হাততালি দিয়া উঠিলেন। হঠাৎই আবার মুখ কালো করিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, কিন্তু হ্যাঁ গা — ত্রিপুরার কংগ্রেস কী বলিবে? সামনে বিধানসভার ভোট। এই সম-সম কালে কী বলিয়া মনমোহনী কীর্তি সমর্থন করিবে? কী করিয়া কেন্দ্রের পক্ষে দাঁড়াইবে? খুচরা পণ্য ব্যবসায়ে যুক্ত দেশের কয়েক কোটি পরিবারের মধ্যে ত্রিপুরার ছোট দোকানদার ও ব্যবসায়ীরাও আছেন। রহিয়াছেন স্থানীয় পণ্য উৎপাদকেরাও। নিজেদের ভবিষ্যতের এই সর্বনাশ তাঁহারা মানিয়া লইবেন? ডিজেলের দামবৃদ্ধিতে সমস্ত পণ্যের দাম বাড়িবে। মানুষকে কী ভাষায় বুঝাইবেন কংগ্রেস নেতারা? বলিলাম, ভাষার জন্য চিন্তা করিও না গিন্নি। কংগ্রেস দলে ভাষাবিদের অভাব নাই! ভাষা জোগানদারেরাও রহিয়াছেন। তবে ঘটনা হইল, রাজ্যে কংগ্রেসের গতিক এমনিতেই খুব একটা সুবিধার নহে। বিধায়ক তথা পি সি সি-র সাধারণ সম্পাদক সুবল ভৌমিক সাংবাদিক ডাকিয়া প্রদেশ সভাপতি এবং তাঁহার গোষ্ঠীকে দল হইতে বহিষ্কারের দাবি করিয়াছেন। সাত দিনেও তাঁহার গুরুতর অভিযোগ সমূহের কোনও জবাব নাই। সুবলের দাবার চালে সুদীপ কালহরণের কৌশলে পাল্টা বাজিমাত করিতে চাহিতেছেন। কর্মী-সমর্থকেরা বিভ্রান্ত, হতাশ। সুদীপ উভয়সঙ্কটে। সুদীপ নিজের 'পরিণত বুদ্ধি'-র পরিচয় দিতে সচেষ্ট হইলেও দক্ষ সংগঠক সুবল ভৌমিকের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা লইবার মুরোদও যে তাঁহার নাই, এই বার্তাই চাউর হইয়া গিয়াছে কর্মীদের মধ্যে। ১২ তারিখের সমাবেশ কংগ্রেস সমর্থকদের মনোবল ফিরাইতে ব্যর্থ হইয়াছে বহু কারণে। জোলাইবাড়িতে দলের দুই গোষ্ঠীর মারামারিতে কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি হইয়াছে।

তবে হ্যাঁ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীররঞ্জনবাবু জলজ্যান্ত সত্য বলেন। রবীন্দ্রনাথ অক্ষম! তাই লিখিয়াছিলেন — 'সহজ কথা যায় না লেখা সহজে!' সমীরবাবু রবীন্দ্রনাথকে ভুল প্রমাণ করিয়াছেন। ১২ তারিখের বক্তৃতায় সহজ কথা সহজেই বলিয়া দিলেন, 'সোনিয়া গান্ধী চাহিলেই ত্রিপুরার বাম সরকার উচ্ছেদ সম্ভব'। প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ। ঘুরাইয়া বলিলেন, সোনিয়া না চাহিলে ওই কাজটি অসম্ভব! অর্থাৎ বাস্তব পরিস্থিতি মোটেই কংগ্রেসের অনুকূলে নাই। সোনিয়া চাহিলে অনুকূলে আসিতে পারে। ১৯৮৮-তে রাজীব চাহিয়াছিলেন বলিয়াই সব হইয়াছিল। জঙ্গিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, পরপর গণহত্যা, নোটভর্তি ট্রাঙ্কের সারি, উপদ্রুত ঘোষণা, সেনা টহল এবং গায়ের জোরে ভোটের ফল ছিনতাই! এইবারও তেমন হোক। জঙ্গি চাই, নোটভর্তি ট্রাঙ্কের সারি চাই ...।

সমীররঞ্জনের মনের কথা মনেই রহিয়াছে! ভোটের পরে বলিবেন — মনমোহন সরকারের *জনবিরোধী কাণ্ডকীর্তির জন্যই এই যাত্রায়ও পারিলাম না! হতাশ হইবেন না প্রিয় কংগ্রেসি* বন্ধুরা। ইহার পরে 'মিশন ২০২০'!

(প্রকাশ : ১৭.০৯.২০১২)

বাহুতেই বল!

দিল হুম হুম করে গো ভাই! হাতে ক্ষুর-কাঁচি উঠিতেছে না! ঘরের নারী পরের স্বপ্ন দেখে! বাঁচি কী সুখে! মনটা বড়ই বিচ্ছেদ-বিচ্ছেদ লাগে! এমনিতেই, বাংলার 'বিচ্ছেদ'-এ নাকি ত্রিপুরায় 'উচ্ছেদ'-এর স্বপ্ন আরও খানিকটা চটকাইয়া গিয়াছে! তাহার উপর ঘরে গিন্নি দিবানিশি 'বন্ধু-বন্ধু' করিতেছেন! 'বন্ধু বিহনে প্রাণ যায়' অবস্থা! বোঝেন কাণ্ড। এই বন্ধু আবার যে সে বন্ধু নহেন, বিশ্ববন্ধু!

ধর্মনগরের কংগ্রেস বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন। বলবান, রূপবান, গুণবান। সুপুরুষ। শুনিয়াছি উত্তরাধিকার সূত্রেই ধনবানও। পিতার একচেটিয়া মদ্য-ব্যবসা ছিল ধর্মনগরে। বিধায়ক-পুত্রের আছে হোটেল-ব্যবসা। গুণবান যাত্রাভিনেতা বিশ্ববন্ধু বামফ্রন্টের আমলেই তিন-তিনবছর শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কারও নাকি ঘরে তুলিয়াছেন। রাজনীতিতেও গুণী! কংগ্রেস ছাড়িয়া মাঝখানে কিছুকাল তৃণমূল-ভ্রমণে গিয়াছিলেন। পাটিগণিতে শেষমেশ শূন্য পাইবেন বুঝিতেই ডিগবাজি খাইয়া ফিরিলেন বীরজিৎ সিংহের গুহায়! 'ধর্মনগরের বীরজিৎ' সাজিয়া অনেক পালা অভিনয়ের শেষে আবার ডিগবাজি। এখন তিনি নিদারুণ সুদীপ-ভক্ত! সাধে কি আর চিন্তা-গিন্নি বিশ্ববন্ধুতে এত মুগ্ধ! রূপমুগ্ধ, গুণমুগ্ধ। ধনমুগ্ধ তো বটেই। ক্রমেই তাঁহার বাহুবলেও মুগ্ধ!

ধর্মনগরের বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয় বড়ই অবিবেচক, অদূরদর্শী! নহিলে কি আর বিশ্ববন্ধুর বিরুদ্ধে পুলিসে এফ আই আর করেন? অফিসে ঢুকিয়া তাঁহাকে পিটানো, মুখে কিছু নোংরা মাখিয়া গলায় নোংরার মালা পরাইবার মধ্যে কতবড় বীরত্বগাথা রচিত হইল, একবার ভাবিলেন না? রাজ্যশ্রেষ্ঠ অভি-নেতা হইয়া থাকিলেই চলিবে? এইবার নেতার মতন নেতা হইতে হইবে! কেবল ধর্মনগরের নহে, ত্রিপুরার কংগ্রেসিদের রাজ্যশ্রেষ্ঠ নেতা হইবার কঠিন পথে বিশ্ববন্ধুকে ঠেকাইবে একটি এফ আই আর? ফুঃ! সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া বিশ্ববন্ধু অবলীলায় বলিয়া দিলেন, সব অভিযোগ মিথ্যা। বিদ্যালয় পরিদর্শককে অনেকবার বলিবার পরেও একটি দাবি পূরণ না করায় অফিসে গিয়াছিল মহিলা কংগ্রেস, তাঁহাকে আদর করিয়া মালা পরাইতে! বাহ্ — বাঃ! সত্য আর মিথ্যার কী মহান লুকোচুরি-শিল্প! শিল্পী বটে বিশ্ববন্ধু!

কিন্তু, কতবার? আর কতবার শাক দিয়া এই মাছ ঢাকিবার চেষ্টা? ২০১০ সালের স্বাধীনতা দিবসে ধর্মনগর গার্লস-এর শিক্ষক বিপ্রজিৎ পালকে 'পিটাইয়া শিক্ষা' দিবার অভিযোগ বিশ্ববন্ধুর বিরুদ্ধে। মিথ্যা? চন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের সি পি এম সদস্য দুলু মিয়াঁকে থানা রোডে পিটানোর অভিযোগ মিথ্যা? বরুয়াকান্দি কলোনি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক উত্তম বিশ্বাসকে দৈহিক লাঞ্ছনার অভিযোগও মিথ্যা? কংগ্রেস পরিচালিত বরুয়াকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে গিয়াছিলেন পঞ্চায়েত দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা রণজিৎ কর এবং অন্য আধিকারিকেরা। অভিযোগ, বিশ্ববন্ধুর নেতৃত্বে তাঁহাদের বেধড়ক পিটাইয়া, গাড়ি ভাঙিয়া আগরতলায় ফেরত পাঠানো হয়। মিথ্যা? বি এল ও শুভ্রজ্যোতিকে টেলিফোনে বিশ্ববন্ধু নিজে যে কুৎসিত ভাষায় খিস্তি করিয়া হুমকি দিয়াছেন, কোনও নিম্নশ্রেণীর ভাড়াটে গুন্ডাও তাহা শুনিয়া লজ্জিত হইবে! সেই টেলিফোন-কথোপকথন বি এল ও নিজের মোবাইলে রেকর্ড করিয়া রাখায় অনেকেরই শুনিবার দুর্ভাগ্য হইয়াছে! অভিযোগ মিথ্যা? টেলিফোনে বি এল ও-কে হুমকি দিবার সময় বিশ্ববন্ধু জাহির করিতে ভোলেন নাই, বরুয়াকান্দিতে — 'চুরি ধরিতে আসায়' কীভাবে 'পঞ্চায়েত ডিরেক্টরকে পিইট্যা গাড়ি ভাইঙ্গা' দেওয়া হইয়াছে! সব মিথ্যা? ভাগ্যপুর পঞ্চায়েতের সচিব শাহাবুদ্দিনকেও পিটানোর অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে! মিথ্যা বিশ্ববন্ধুবাবু?

বিশ্ববন্ধু ভুলিয়া গিয়াছেন — গত নির্বাচনে মানুষ তাঁহার বাহুবল দেখিয়া তাঁহাকে ভোট দেন নাই। অনেক ভাল মানুষ যেমন 'আরও ভাল' চাহিয়া সমর্থন দিয়াছিলেন, তেমনি অনেক ভাল মানুষ এখনও সারা রাজ্যের কংগ্রেসে রহিয়াছেন। ইঁহাদের সমর্থন আর প্রয়োজন নাই কংগ্রেসের বিশ্ববন্ধুদের? কোথায় গান্ধীজি-নেহরুজিদের কংগ্রেস, কোথায় সেই সদ্ভাবনা, অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত গণসত্যাগ্রহ আর কোথায় আজিকার এই কংগ্রেস! সারা দেশে কোথায় তাহাকে টানিয়া নামাইয়াছে ক্ষমতালিপ্সু, দুর্নীতিবাজ, স্বেচ্ছাচারী, হিংসাশ্রয়ী, গণশত্রুর দল! দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁহাদের কোনও শিকড় নাই, তাঁহারাই আজ দিল্লির মসনদে বসিয়া দেশ বেচিতেও কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেছেন না! সবই চলিতেছে 'দেশের স্বার্থ'-এর নামে!

রাজনীতিতে ব্যক্তি সাধারণভাবে দলেরই অংশ। কিন্তু, দলেই যেথায় নীতি-আদর্শের বল অবশিষ্ট নাই, লক্ষ্য-কর্মসূচির বল অবশিষ্ট নাই, সেথায় দলের নেতা-কর্মীরা বা দলভুক্ত ব্যক্তিরা মানসিক সম্পদে বলীয়ান থাকিবেন কী করিয়া? নীতি-আদর্শহীন দলের এই নিছক বাহুবল সমগ্র সমাজের পক্ষেই অকল্যাণকর ও বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারে। ১৯৮৮-৯২ -এর জোট আমল তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। বিশ্ববন্ধু কোনও আলাদা 'রোগ' নহেন, রোগীও আলাদা নহেন। 'হেড-স্ট্রং' বলিয়াই তিনি এই সব করিতেছেন, এমনও নহে। পাটিগণিত আছে। দলের শীর্ষ নেতা হইতে গেলে এইরকম 'ম্যারকাটারি প্রতিবাদী জঙ্গি' ইমেজ

গড়িতে হইবে! ইহাই ঘটনা।

আসল রোগের নাম কংগ্রেস। ক্ষমতা পাইবার আগে যথেচ্ছ লোভ দেখানো আর ক্ষমতা পাইলে সরকারি কর্মচারী-অফিসারদের 'সাত পুরুষের ভৃত্য' ধরিয়া লইয়া, একহাতে উচ্ছিষ্ট ছুঁড়িয়া , অন্য হাতে চাবুক মারিয়া 'শক্ত হাতে' শাসন করাই কর্তব্য মনে করে কংগ্রেস! তাই পুলিসকে সি আর পি-বি এস এফ-টি এস আর দিয়া বেদম পিটাইতে তাহাদের দ্বিধা হয় নাই। খোদ অর্থসচিব-কমিশনার ইটের ঘায়ে রক্তাক্ত হইয়া রাজ্যছাড়া হইলে গর্বে তাহাদের বুক ফুলিয়াছে। সরকারে বহু বছর না থাকিলেও কংগ্রেসের সেই একই মনোভাব বহুরূপী-মুখোশের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। একজন সেনা কর্নেলকে যদি দিবা-দ্বিপ্রহরে পিটাইতে পারেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, রাষ্ট্রপতির পুত্রকে কংগ্রেস নেতা হইয়াও যদি কংগ্রেসিদের হাতেই লাঞ্ছিত হইতে হয়, ধর্মনগরে একজন বিদ্যালয় পরিদর্শককে পিটাইলে এমন কী হইল! ' এত তারই কলরব'?

পুনশ্চ : বন্ধু-বিরহে কাতর চিন্তা-গিন্নি ঘুমাইতেছেন। এই অবসরে কানে কানে বলি — ত্রিপুরাবাসী সাবধান! চতুর্দিকে পতন আর ধসের ধ্বনি শুনিয়া কংগ্রেস নেতাদের চিত্ত চঞ্চলিয়া উঠিতেছে। তাঁহাদের ধমনীতে 'পরিবর্তন'-এর নৃত্য ক্রমেই কিন্তু তাণ্ডব-নৃত্যে পরিণত হইতে পারে। অতএব , পুনরায় চেতাবনি করিতেছি — সাবধান!

(প্রকাশ : ২৮.০৯.২০১২)

একটি সুপারিশ

সিনেমার নাম 'বরফি'! রণবীর -প্রিয়াঙ্কার হট জুটি। পত্রিকায় দেখিলাম বক্স অফিস হিট। অস্কার-এর নমিনেশনও পাইয়াছে। চিন্তা-গিন্নি পিচাৎ করিয়া পানের পিচ্‌কি ফেলিলেন। হ্যাঁ গা— এই যে বলে বক্স অফিস, সেই অফিসটা কোথায়? বক্সটা কোন ধাতুর? এত হিটেও তো দেখি ফাটে না! আর অস্কার বুঝি, কংগ্রেসের অস্কার ...?

মুখে হাত চাপা দিয়াই গিন্নির জ্ঞানবৃক্ষের পাতা-ঝরা বন্ধ করিতে হইল। কহিলাম— এই হিট বা হট, সেই হিট-হট নহে! বুঝিলে না তো! যেমন ধর— কী উদাহরণ দিই ...। হ্যাঁ, যেমন ধর — এইবার ভোটের আগে তিনখানা হিট স্লোগান চারিদিকে চোখে পড়িতেছে। বেকারদের জন্য—'আমরা বেকার, কাজ চাই' নিচে লেখা 'যুব কংগ্রেস'। সরকারি কর্মচারীদের জন্য—'আমরা রাজ্য সরকারি কর্মচারী। আমাদের পাওনা—লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা।' আর সকলের জন্য স্লোগান — 'পরিবর্তন চাই'। কেবল হিট নয়, ফাটাফাটি! মানে এত হিটে বাক্সও ফাটিয়া গিয়াছে কিনা! হট হোর্ডিংয়ে লেখা হিট স্লোগানগুলি রাস্তার মোড়ে মোড়ে কাত হইয়া রহিয়াছে। আর 'অস্কার'? শুনিয়াছি ইহা একটি বিদেশি পুরস্কার। পরিচালনা, নাচ, গান, ফটোগ্রাফি ইত্যাদি নানান ভাগে ভাগ হয় বলিয়াই বোধকরি পুরস্কার বা পুরা-অস্কার কেহ পায় না! তবে হ্যাঁ, এইবার এই তিন হিট স্লোগানের রচনাকার নির্ঘাত পুরস্কার দাবি করিতে পারেন।

যুব কংগ্রেস কহিতেছে, 'আমরা বেকার, কাজ দাও'। হঠাৎ দেখিলে সকলেরই মনে হইবে, ইহারা বুঝি রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের কথা বলিতেছেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখ গিন্নি, যুব কংগ্রেস বেকারদেব চাকরির কথা বলিবে কোন দুঃখে! কাহার কাছে বলিবে! বৎসরে দেশের এক কোটি বেকারের চাকুরির প্রতিশ্রুতি ছিল। ভোটের পরেই বেমালুম হজম! *কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সরকার বহুকাল চাকরি বন্ধ করিয়া দিয়াছে। চুপ, এখন সংস্কার চলিতেছে।* কেবল বেসরকারিকরণ, আর কী যেন বলে —ও হ্যাঁ ' আউট সোর্সিং'! রাজ্যকে চাকরি বন্ধ করিতে চাপ! ত্রিপুরার বাম সরকার কেন্দ্রের হুমকি, হুকুম আর সাড়ে দশ হাজার কোটি 'জরিমানা'— সব অগ্রাহ্য করিয়াই চাকুরি দিয়া চলিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী সাফ বলিয়াছেন — *'কেন্দ্র যত হুমকি দিক, চাকুরি বন্ধ করিব না।'* গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প এম এন রেগা-তে,

কেন্দ্রের বিচারেই দেশের সেরা ত্রিপুরা। এমনকি, ভূ-ভারতের কোথাও যাহা কেহ শুনে নাই, শহরেও 'টুয়েপ'-এ গরিবদের কর্মসংস্থান হইতেছে কেবল ত্রিপুরাতেই। দাবি করিলে তো যুব কংগ্রেসকে কেন্দ্রের নিকটই দাবি করিতে হয়। পাঁচ হাজার অস্নাতক বেকারের চাকরির পথে কাঁটা দেওয়া চিঠির জন্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির কুশপুতুল পোড়াইতে হয়! পারিবেন কংগ্রেসের যুব নেতারা?

আসলে, যুব কংগ্রেসের জঙ্গি যুবাদের হাতে সত্যই কাজ নাই! জোট আমলের মতো 'ভোট' হয় না। অফিস ভাঙাভাঙি নাই, আগুন লাগানো, বাম নেতা কর্মীদের বাড়ি ঘরে হামলার কাজ, বীরচন্দ্রমনু-নলুয়ার মতন রক্তের হোলি নাই। সব নিরামিষ! যাহা খুশি করিবার স্বাধীনতা নাই! পকেটে চাকুরির অফার রাখা, মাসি-পিসি-কাকু-জেঠুর জন্য চাকুরি বাগানো, মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে— এমনকি তাঁহারই চেয়ারে বসিয়া খুনের আসামিদের পা দুলাইবার গণতন্ত্র নাই! লাল পিটাইতে না পারিলে নিজেদের 'গোষ্ঠী-পিটাপিটি' তেজি থাকিলেও হাতটা চালু থাকে। কিন্তু, রাষ্ট্রপতি-পুত্রের গায়ে হাত পড়িতেই কেস খারাপ হইয়া গিয়াছে! তাহা ছাড়া, চেয়ারের আশা না জাগিলে তেজ বীর্য জাগে না। বামেদের যুব-ঢলে গ্রাম-গঞ্জ-শহর একাকার। বিপুল লাল-উচ্ছ্বাসের ছবিই সব দিকে। আর, কংগ্রেসের মিছিলে মুখে স্লোগান দিতেও যেন উৎসাহ নাই। সব কেমন নির্জীব। সামনে হোর্ডিং লইয়া কেবল মৌন মিছিল। এই সব মিছিল-ফিছিলে পোষায় না। কাজ চাই! আমাদের কাজ চাই! কাজ না পাইলে রূপকথার সেই দৈত্যের মতন হইব। আপন প্রভুর ঘাড় মটকাইব! যুব কংগ্রেসের জন্য কী চমৎকারী দক্ষতায় এই স্লোগান রচিত হইয়াছে, ভাবিলে লোমকূপে শিহরণ জাগে!

গিন্নি,সরকারি কর্মচারীদের জন্য রচিত স্লোগানখানি আরও নিপুণ মস্তিষ্কের শিল্পকর্ম! 'আমরা রাজ্য সরকারি কর্মচারী। আমাদের পাওনা লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা'। বাম সরকারের আমলে কর্মচারী লাঞ্ছনার কথা বাড়াবাড়ি নহে? একটি উদাহরণও কি আছে? জোট আমলের নিগ্রহ, লাঞ্ছনা, আর বঞ্চনার প্রশ্ন উঠাইলে আবার কংগ্রেস দলের নিজের দিকেই যে বন্দুকের নল ফিরিবে। বাম সরকার কিছু গোপন করে নাই। সব কথা সরকারি কর্মীদের কাছে খোলসা করিয়াছে। কেন্দ্রকে কেন্দ্রীয় হারে বেতনভাতার টাকা দিতে বলিয়াছে। কেন্দ্র দেয় নাই। বরং ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনকে দিয়া শিক্ষক কর্মচারী সমেত গোটা রাজ্যের মানুষকেই ঠকাইয়াছে। কিন্তু গিন্নি, 'আমাদের পাওনা-লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা' বলিলে তো বুঝানো হইল— বাম আমলে 'লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা' নাই! কী করিয়া? বলিতেছি —।

'পাওনা' মানে তো এখনও পাওয়া হয় নাই! কংগ্রেসের স্লোগানে অসাবধানে আসল সত্যটাই বাহির হইয়া গিয়াছে। সরকারি কর্মচারীরা— তোমাদের লাঞ্ছনা পাওনা, বঞ্চনা পাওনা। পাইবে বন্ধু, আগে 'পরিবর্তন' হউক!

চিন্তা-গিন্নি বলিলেন, এইবার বুঝিলাম — 'পরিবর্তন চাই' স্লোগানের মাহাত্ম্য। ত্রিপুরায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে। বাম সরকারের হাতে মনে হয় আলাদিন-এর প্রদীপ! এই রাজ্যের আরও উন্নতি, আরও সমৃদ্ধি, আরও শক্ত একতা ও শান্তির কামনা তো সকলেরই। তাই, কংগ্রেসের জন্য স্লোগানটি এই রাজ্যে হট নহে, হঠকারী! শুনিয়াছি 'বরফি' সিনেমা-র নানা দৃশ্য বিদেশি ছবি হইতে চুরি করা। 'পরিবর্তন চাই' স্লোগানটিতে কিন্তু পুরাটাই চুরি। তাই রচনাকারের পুরস্কার — মানে পুরা-অস্কার পাওয়া উচিত!

(প্রকাশ ঃ ০১.১০.২০১২)

গ্যাসের আগুন!

বিষয় রান্নার গ্যাস। সেলুনে তুমুল উত্তেজনা। এই পক্ষ, ওই পক্ষ। আবার কেহ 'নিরপেক্ষ' থাকিয়া আরেক পক্ষ! এই ভিড়ে চুল দাড়ি ছাঁটিব কী, সেলুন হইতে নিজেই ছাঁটাই হইবার জোগাড়! 'গিন্নি সমিতি' গ্যাস সিলিন্ডার লইয়া ঘরে ঘরে অরন্ধন এবং বাহিরে রাস্তা-অবরোধের পরিকল্পনা করিতেছে। যাত্রী সাধারণের সম্ভাব্য অসুবিধা বিবেচনায় কিঞ্চিৎ আপত্তি তুলিয়া ব্যানার্জিবাবু ঘরের বাহিরে নিক্ষিপ্ত! ডোমেস্টিক গ্যাস লইয়া রীতিমতো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের উপক্রম। নিজের হেঁশেলের আগ্নেয় মুখচ্ছবিটি মনে পড়িতেই আন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল।

ব্যানার্জিবাবু কহিলেন — একখানা প্রস্তাব শুন চিন্তা। ভরা নদীর ঘূর্ণিতে পড়িয়া একবার এক শিয়াল চিৎকার করিতে লাগিল —'মহাপ্রলয় আসিতেছে! দুনিয়াদারি ধ্বংস হউক! প্রাণীকুল নিপাত যাক!' নদীর পাড়ে এক কৃষক চারিদিক শান্ত দেখিয়া শিয়ালকে শুধাইলেন -- 'কী হে, কোথায় মহাপ্রলয়? দুনিয়াদারি ধ্বংস হউক বলিতেছ কেন?' জলের ঘূর্নিপাকে ডুবিতে ডুবিতে শিয়াল কহিল , 'যে ঘূর্ণিতে পড়িয়াছি রে ভাই, আমার আর রক্ষা নাই। দুনিয়ায় আমি-ই যদি না থাকি, এই দুনিয়া থাকিয়া আর কী হইবে! সব ধ্বংস হউক!' ব্যানার্জিবাবু যোগ করিলেন, কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের ঠিক যেন ওই শিয়ালের দশা হইয়াছে। লক্ষ-কোটি টাকার দুর্নীতি, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সঙ্কটের ঘূর্ণিতে পড়িয়া সোনিয়া-মনমোহনজিরা বুঝিয়া ফেলিয়াছেন, এইবার নিস্তার নাই। আগামী লোকসভা ভোটে ভরাডুবি অনিবার্য। তাই আমেরিকার বাণিজ্যপতিদের নামে কসম খাইয়া একের পর এক ভয়ঙ্কর জনবিরোধী, দেশবিরোধী সিদ্ধান্ত চাপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কোনও দ্বিধা-সঙ্কোচ নাই, কাহাকেও ডর-ভয় নাই! ভাবখানা হইল — 'আমরাই যখন আর থাকিব না, তখন জনসাধারণ বাঁচিল কি মরিল, দেশ থাকিল কি জাহান্নামে গেল—আমাদের কী'!

ভাবিয়া দেখিলাম — কথা মিথ্যা নহে। ডিজেলের দাম একলাফে কোনও কালে এত বাড়ানো হয় নাই। ফলাফল হাতে হাতে। পূজার আগেই রাতারাতি সমস্ত জিনিসের দাম

অবিশ্বাস্য বাড়িয়া গিয়াছে। শিশুর দুধ, সরিষার তেল, চাল-ডাল-নুন-সাবানগুঁড়া-মশলা-চিনি- জামাকাপড় — জুতা কিছুই বাকি নাই। সকালের টুথপেস্ট হইতে রাতের ঘুমের ওষুধ, এমনকী সমস্ত ধরনের ওষুধপত্র, সবকিছুই আকাশছোঁয়া। বাড়িতেছে বাস-অটোর ভাড়াও। এর আগে দফায় দফায় পেট্রোলের দামও বাড়ানো হইয়াছে। কিন্তু, সবচেয়ে গণবিধ্বংসী মারাত্মক অস্ত্রটি প্রয়োগ হইল খুচরা পণ্যের ব্যবসায়ে ১০০ ভাগ বিদেশি বিনিয়োগ ডাকিয়া। পরপর বিমা এবং পেনশনেও ৪৯ ভাগ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত। সংসদে শেষোক্ত দুইটি পাস করাইতে তোড়জোড় চলিতেছে। এখনই 'হালুম' না করিলেও ইহাদের পরিণতি ধীরে ধীরে মালুম হইবে বই কী!

ব্যানার্জিবাবু কহিলেন, রান্নার গ্যাসের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার যাহা করিল— তাহাতে দেশের কোটি কোটি নিম্নআয়ের মানুষ এবং মধ্যবিত্তরা এত বড় ধাক্কা খাইয়াছেন যে, বিপর্যয়ের গভীরতা সম্যক বুঝিবার সম্বিতও এখনও অনেকে ফিরিয়া পান নাই! বৎসরে ৬টি সিলিন্ডার ভর্তুকিতে কিনিতে পারিবে প্রতি পরিবার। দাম ৪০৫ টাকা হইলেও ঘরে পৌঁছাইতে পড়িবে প্রায় ৪৫০ টাকা। সপ্তমটি হইতে পরের সমস্ত সিলিন্ডারের প্রতিটির ন্যূনতম দাম পড়িবে ১০৩৩ টাকা ৫০ পয়সা। অর্থাৎ, ঘরে পৌঁছানো পর্যন্ত কমপক্ষে ১০৫০ টাকা। ধর চিন্তা, পাঁচ জনের পরিবারে প্রতি মাসে গড়ে একটি সিলিন্ডার লাগে। তাহা হইলে এক বছরে ১২টির মধ্যে ৬টি ভর্তুকিতে, আর বাকি ৬টি বিনা ভর্তুকিতে কিনিতে সর্বমোট ব্যয় হইবে প্রায় ৯ হাজার টাকা। সম্বৎসরের হিসাবে গড়ে প্রতি সিলিন্ডারের দাম পড়িল ৭৫০ টাকা! সব ঠিক থাকিলে বলা যাইবে, কেন্দ্র ৪০০ টাকার গ্যাসের দাম বাড়াইয়া ৭৫০ টাকা করিল! বৃদ্ধি সিলিন্ডার পিছু (মাত্র) ৩৫ টাকা! যাঁহাদের পরিবার বড়, গ্যাস বেশি লাগে — তাঁহাদের জন্য এই বৃদ্ধির পরিমাণ দ্বিগুণও হইতে পারে!

কিন্তু, না- হে চিন্তাচরণ। বিপর্যয়ের হিসাব এত সংক্ষিপ্ত নহে। প্রথমত, ভর্তুকিতে ৬টি গ্যাস মিলিবেই তাহার গ্যারান্টি কোথায়? যখন দরকার তখন মিলিবে? নাকি সারা বৎসর বিনা-ভর্তুকিতেই কিনিতে হইবে! তাহারও সরবরাহ নিশ্চিত করিবে কে? বৃষ্টি, ধস আরও নানা কারণে ত্রিপুরার মতন পার্বত্য রাজ্যে যখন-তখন গ্যাসের সঙ্কট দেখা দিতে পারে। তখন কী হইবে! কালোবাজারে প্রতি সিলিন্ডারের দাম কত উঠিবে? দেড় হাজার? দুই নাকি তিন হাজার! ত্রিপুরার লাখো ছাত্রছাত্রীর জন্য ইস্কুলে মিড-ডে-মিল রান্না হয় গ্যাস সিলিন্ডারে। অতিরিক্ত দাম কেন্দ্র মিটাইবে? হাসপাতালগুলিতে রোগীদের জন্য খাবার রান্না করিবার খরচও বাড়িবে। কেন্দ্র বাড়তি খরচ মিটাইবে? আরও আছে...। এতকাল তাড়াতাড়ি গ্যাস সিলিন্ডার পাইবার জন্য প্রায় প্রতিটি পরিবার দুটি বা তিনটি সিলিন্ডার কিনিয়া রাখিয়াছিলেন। এইগুলি এখন কী কাজে লাগিবে? পাইপলাইন গ্যাসের দামও কি না বাড়িয়া থাকিবে?

শুন চিন্তা, খুচরা পণ্যের ব্যবসা পুরাপুরি বিদেশি (মানে আমেরিকার) বণিকদের হাতে দিয়া কেন্দ্র বলিতেছে, কেবল দশ লাখ জনসংখ্যার শহরে ইহা চালু হইবে। দেশের মানুষ যেন বিচার-বুদ্ধিহীন পুতুল! সারা দেশের প্রায় সমস্ত নিত্যপণ্যই তো মুম্বই-এর মতো বড় শহরগুলি হইতেই সরবরাহ হয়। ওয়ালমার্ট-দের পক্ষে বড় শহরে ঘাঁটি করাই তো সুবিধা! ইহা তো দেখিতেছি নির্মমভাবে হত্যা করিয়া আত্মহত্যা সাজাইবার চেষ্টা! রান্নার গ্যাসের ক্ষেত্রে সোনিয়াজিরা বলিতেছেন— রাজ্য সরকারগুলিই ভর্তুকি দিক! বাঃ কী চমৎকার পরামর্শ! সমস্ত ক্ষমতা, অর্থ কেন্দ্রের হাতে। তাহারা ভর্তুকি তুলিয়া দিয়া বলিতেছেন, রাজ্য ভর্তুকি দিক! ত্রিপুরার মতো রাজ্যও ভর্তুকি দিবে? কোথা হইতে দিবে? বিদ্যুতে কৃষি সারে ভর্তুকি বহাল রাখিয়াছে রাজ্য! কেন্দ্র ভর্তুকি ছাঁটিতে বলিয়াছে। রাজ্য ছাঁটে নাই। ট্যাক্স বসাইতে বলিয়াছে। বাম সরকার প্রতিবছর নিষ্কর বাজেট পেশ করিয়া বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি তুলিয়া ধরিয়াছে। কেন্দ্র গরিবের জন্য চালু গণবন্টন ব্যবস্থা তুলিয়া দিতে চায়। অথচ, দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার গত অর্থ বছরেও দেশের বড় বাণিজ্যপতিদের ৫৮ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়াছে। তাহাদের গডফাদার আমেরিকা সরকারও কোটি কোটি ডলার ভর্তুকি দিতেছে বড় পুঁজির মালিকদের। এমনকী কৃষিক্ষেত্রে এই বছরও আমেরিকা নিজের দেশে প্রায় ৩০ হাজার কোটি ডলার ভর্তুকি ধার্য করিয়াছে। আর সেই আমেরিকার নির্দেশে সমস্ত ক্ষেত্রে ভর্তুকি ছাঁটাই করিয়া মনমোহনজি-সোনিয়াজিরা এখন কোন মুখে রাজ্যগুলিকে ভর্তুকি দিতে উপদেশ দিতেছেন? লজ্জা-শরম বলিয়া কোনও শব্দ কি তাঁহাদের অভিধানে আর অবশিষ্ট নাই?

চিন্তা রে, দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্ম বুঝি নাই। বামেরা দিল্লিতে দাঁতে দাঁত দিয়া প্রথম ইউ পি এ সরকারকে কী পরিমাণ বাধা দিয়াছেন। তখন এই সব জনবিরোধী সিদ্ধান্তের একটাও লইতে দেন নাই। কতখানি চাপে ফেলিয়া ১০০ দিনের কাজ, বনাধিকারের আইন পাস করাইয়া লইয়াছিলেন। এখন একটু একটু বুঝিতেছি — গত লোকসভা ভোটে বামেদের দুর্বল করিতে কেন এত তৎপর ছিল আমেরিকা! জানিতে বড় ইচ্ছা হয়, এত কালা-মুখ লইয়া ত্রিপুরার বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের নেতারা সাধারণ মানুষের কাছে ভোট চাহিতে পারিবেন তো! 'জোট আমল' ক্ষমা করিতে চোখের জল ফেলিতেছেন তাঁহারা। কিন্তু গ্যাসের আগুন তো জলে নিভে না দাদা!

(প্রকাশ : ০৮.১০.২০১২)

কামড় উৎসবেও!

সর্জন হইতে বিসর্জন। ভালয় ভালয় কাটিল। হাসিতে হাসিতে আনন্দময়ী আসিলেন। উৎসবের আনন্দে ভাসিলেন। ভাসাইলেন। শেষমেশ ভক্তদের চোখে জল আনিয়া হাসিতে হাসিতেই অসুর-সমেত শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশে জলে ঝাঁপ দিলেন!

একাদশীর ভোরে চিন্তা-গিন্নির গজ গজে ঘুম চৌচির! 'শুভ বিজয়া' আর বলা হইল না। তাঁহার বাঘিনি-থাবায় 'ইঁদুর মারার যম' দেখিয়া প্রবল সন্ত্রস্ত-চিত্তে বিছানায় কাঁড়া পাকাইয়া পড়িয়া রহিলাম! মনের পর্দায় অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল, 'হ্যারিকৃষ্ণ' ক্যাসেট বাজানো শব-শকট আর থানা-পুলিসের ভীষণ সব ছবি ভাসিতেই গিন্নির বাগ্‌ধারা কানে বাজিল — 'দুর্গতিনাশিনী না ঢেঁকি! দুর্গতি বাড়ানোই কর্ম! ব্যাটা গণ্‌শা-কে আগামী বছর একবার হাতের নাগালে পাই —! প্রতিবার আসে আর বাহনটাকে ছাড়িয়া দিয়া যায়। ইঁদুরের উৎপাতে ঘর উজাড়!' এতক্ষণে কেসটা বুঝিয়া, উঠিয়া বসিলাম।

— শুন গিন্নি, ডিজেল পেট্রলের দাম প্রতিদিন বাড়িতেছে। দুর্গা পরিবারের তাহাতে মাথাব্যথা নাই। দুর্গার সিংহ, কার্তিকের ময়ূর, গণেশের ইঁদুর, সরস্বতীর রাজহাঁস হইতে লক্ষ্মীর প্যাঁচা— কাহারও বাহন ডিজেল পেট্রলে চলে না। 'পশুপাখি নির্যাতন' লইয়া যতই চেঁচামেচি হউক, দেবতাদের সাজা দিবে কে! গণেশ বাবাজীবনের চারিদিকেই এখন রমরমা। তাঁহার শিষ্য বাণিজ্যপতিরাই দেশের চালক। দিল্লির সরকারের পালক। শুনিতেছি, ওয়াল মার্টের মতন বিদেশি হাঙরেরাও এখন এদেশে 'গণপতি বাপ্পা'-র শিষ্য-তালিকায় নাম লিখাইয়াছে। সিংহ হইতে প্যাঁচা পর্যন্ত সকলেই সংখ্যায় কমিতেছে। কেবল প্রবলভাবে বাড়িতেছে গণেশের বাহন ইঁদুরের সংখ্যা। ইহারা দেশের কোটি কোটি টন শস্য সাবাড় করিতেছে। দিনরাত খাই-খাই বাই। ঘরের বেড়া কাটিতেছে, বই দলিল দস্তাবেজ কাটিতেছে। কাপড় চোপড়, প্লাস্টিক, ইলাস্টিক, বিদ্যুতের তার সবকিছু কাটিয়া ছারখার করিতেছে। টেলিভিশনের ভিতরেও ঢুকিয়া আত্মঘাতী হামলায় গোটা যন্ত্রটি অকেজো করিতেছে। ওষুধ দিয়া আর কয়টা ইঁদুর মারিবে! ইহারা বাড়িবে। বাড়িতেই থাকিবে। বড় বিপদ হইল — কিছু মানুষের মধ্যেও এই ইঁদুর-স্বভাব সঞ্চারিত হইতেছে। নহিলে দেশে এই রকম দুর্নীতি, এত কেলেঙ্কারি আর কখনও দেখিয়াছ?

— গিন্নি, এইবার একটু বিজ্ঞানের কথা বলি। বিজ্ঞানীরা বলেন, এই যে ইঁদুরেরা দিনরাত কেবল কুটকাট কাটিতেছে — ইহা তাহাদের অভাবের দোষ নহে। স্বভাবের দোষ। অস্তিত্ব রক্ষার দায়। দুনিয়ার প্রাণীকুলের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত নাকি বাড়িতে থাকে ইঁদুরের দাঁত। লাগাতার কুটকুট করিয়া ইহারা দাঁতের ক্ষয় করে। নহিলে একেকটি নেংটি ইঁদুরের দাঁত নাকি হাতির দাঁতের চাইতেও বিশালাকার হইয়া পড়িত! স্বভাবেই উহারা কেবল দাঁতে কাটিয়া সবকিছু ছারখার করিতে চায়। কথায় বলে স্বভাব যায় না ম'লে! শুনিতে শুনিতে গিন্নির দন্তপঙ্‌ক্তি 'ক্লোজ -আপ' বিজ্ঞাপনের ন্যায় বিকশিত হইল। বলিলাম — গিন্নি, এইবার আমায় প্রশ্ন করিতে পার — বাচ্চাদের দুধের দাঁত পড়িলে ইঁদুরের গর্তে ফেলা হয় কেন? ইঁদুরের দাঁতের মতন চিরণ দাঁত দিয়া বাছারা কী চিরিবে? কী করিবে? ঠোঁটকাটা গিন্নি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই সোৎসাহে বলিলেন — কেন? ইহারা বড় হইয়া কংগ্রেস দলের 'রত্ন' হইবে এবং নামের পিছনে 'লাল' লাগাইয়া লাল সি পি এমকে দিনরাত চিরিবে! কুটকুট করিয়া কাটিতে চেষ্টা করিবে! কিছু না পাইলে শারদোৎসবের আনন্দও কাটিতে ছাড়িবে না।

— সর্বনাশ , গিন্নি থামো! প্রাণপণে তাঁহাকে থামাইতে চহিলাম। কিন্তু, সরিষার বস্তা ইঁদুরে কাটিলে সরিষার গতি থামায় কে! গিন্নির মুখ হইতে হড়গড় করিয়া শব্দ-সরিষার দানা বাহির হইতে লাগিল। কহিলেন — দেখ না, পূজায় নাকি এইবার লোক কম হইয়াছে! কোথায় কম? আগরতলা শহরই ত্রিপুরা নাকি! সবকিছু ছড়াইতেছে, শিক্ষা স্বাস্থ্য বাজার রাস্তাঘাট, সরকারি প্রশাসন, ক্ষমতা-টাকা-পয়সা। উৎসবের ভিড় ছড়াইবে না? ইহা লইয়াও ইঁদুর-দাঁতের কুটকুট? এই যে সারা রাজ্যে পূজার সংখ্যা বাড়িল, মফস্‌সলের প্রতিটি শহরে গঞ্জে, এমনকি উপজাতি এলাকাযও এইবার অনেক বেশি সংখ্যায় আকর্ষণীয় পূজা হইল, এত মানুষের ঢল নামিল — এই সব চোখেই পড়িল না? আগরতলার মানুষও দলে দলে রাজধানীর বাহিরে গিয়া পূজা দেখিলেন, সর্বত্র মহিলারাও সারা রাত নির্বিঘ্নে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরিলেন, ইহা কিছুই নহে? মানুষের ঢল আগরতলায় জমাট না বাঁধিয়া রাজ্যময় ছড়াইয়া পড়ায় দাদাদের এত রাগ কেন?

গিন্নির মুখ যেন জ্বলন্ত তুবড়ি! গণেশ-চিন্তার নদী জনগণেশ-চিন্তার সাগরে মিশিয়াছে। কহিলেন — এত শান্তি-সম্প্রীতি মেলা আর কোথায় কোন উৎসবে হয়? এই তো, সোনামুড়ার ব্লাড ড্রপস ক্লাবে দেখিলাম — পূজা কমিটির মুসলমান সভাপতি বসিরউদ্দিন ভুঁইয়া! আর কোনও রাজ্যে এমন শুনিয়াছেন দাদা-রা? পূজা কমিটিগুলির এত সামাজিক কাজ, শৃঙ্খলাবোধ, এত ভাল নিরাপত্তা, ট্রাফিক ব্যবস্থা, অ-ব্যাহত বিদ্যুৎ, পালাটনার বিদ্যুৎ ব্যবহার — কিছুই নজরে পড়িল না? হাজার হাজার পুলিস-নিরাপত্তা কর্মী, ট্রাফিক-বিদ্যুৎ কর্মীকে ন্যূনতম ধন্যবাদ না জানাইয়া কহিলেন —মুখ্যমন্ত্রী আতঙ্ক

ছড়াইয়াছেন!

ঠিক ঠিক ঠিক! জঙ্গি-অন্তর্ঘাতের গোপন পরিকল্পনার কথা মানুষকে জানাইয়া সতর্ক থাকিতে বলায় মুখ্যমন্ত্রীর অতি গুরুতর অপরাধ হইয়াছে বই কি! আসলে, ধনু কলইকে জঙ্গিদের বিপুল টাকা সমেত পাকড়াও করাই তো অন্যায় হইয়াছে! নহিলে কংগ্রেস নেতার সহিত এই ষড়যন্ত্রের সাজশ ফাঁস হইত না। পূজার ভিড়ে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিলে ভোটের নৌকা রকেটের বেগে ছুটিত! প্রদেশ সভাপতি কংগ্রেস ভবনের সামনে নতুন জামাকাপড়ে সাজিয়া পূজোতে কেবল ভোটের গানের ক্যাসেট বাজাইলেন! বুঝাইলেন — পুজাতেও ভোট-চিন্তা ছাড়া কংগ্রেসের মাথায় আর কাহারও জন্য কোনও চিন্তা নাই!

কিঞ্চিৎ দম লইয়া গিন্নি জুড়িলেন, হ্যাঁ গা -- আকাশে মেঘ দেখিলে মেয়েটাকে ঘরের বাহির করিবার কালে আমিও তো বলি -- অ্যাই মাইয়া, ছাতি লইয়া মাস্টারের বাড়ি যা! অভিভাবক হিসাবে ইহা আমার কর্তব্য নহে? মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের নির্বাচিত অভিভাবক। তিনি সতর্ক করিবেন না তো কে করিবে! অসহায় দন্তক্ষয়ের স্বভাবে ভুল জায়গায় কামড় বসাইতে দাঁত ভাঙিবার সম্ভাবনাই যে প্রবল। ইঁদুর-দাঁতে প্লাস্টিক কাটে, লোহা কিন্তু কাটে না!

(প্রকাশঃ ২৬.১১.২০১২)

বয়কট!

সাব্‌বাশ কংগ্রেস! সাপও মরিল না, লাঠিও ভাঙিল না।

গিন্নি-কে কত বলি, হ্যাঁ গো— জ্ঞানী হও। ধৈর্যশীলা হও। কথায় কথায় চিৎকার করিয়া অমন ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ করিয়ো না। হাতের থালা-বাসন, হাতা-খুন্তি-কাটারি আমার পানে অমন নিষ্ঠুরভাবে ছুঁড়িয়ো না। আহত-নিহত হইতে পারি! তখন, কে বিধবা হইবে? অমন চোখ পাকাইয়া, শাড়ি গুঁজিয়া ভয়ঙ্করী পতি-ত্রাসিনী চেহারায় তাণ্ডব-নৃত্য করিয়ো না। তোমার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। হার্ট দুর্বল। সর্বনাশ হইবে! তাহার চাইতে, রাগ চড়িলে 'বিলাতি বর্জন'-এর মতন, আমাকে সাময়িক বর্জন কর। মানে 'বয়কট' কর। দেখা দিয়ো না, কথা কহিয়ো না। ভাত না বাড়িয়া, নিজে ভরপেট খাইয়া বিছানায় ওপাশ ফিরিয়া মড়ার মতন পড়িয়া থাকিয়ো। চিন্তা নাই, আমি সময়মতন আলবৎ ডাকিয়া লইব!

আমার এই মহত্ত্বপূর্ণ প্রস্তাব নাকি 'চালাকি'! গিন্নি প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এইবার নির্বাচনের মুখে কংগ্রেসের 'বয়কট' ঘোষণায় উৎসাহিত হইয়া আবার.

চেষ্টা করিলাম। কহিলাম, দেখিলে তো গিন্নি—তোমাদিগের চুলের 'বয়-কাট' এর মতনই রাজনীতির বয়কটও শক্তিশালী অস্ত্র। আবেদনময়, নির্ঝঞ্ঝাট! গিন্নির পাল্টা সংলাপ—তোমার মাথা! নারীমাত্রই বয়-কাট চুল কাটে না, কিংবা রাজনীতি-মাত্রই বয়কট নহে। গ্রীবার সৌন্দর্য দেখাইতে বয়-কাট, আর রাজনীতিতে মুখ ঢাকিতে বয়কট। প্রদেশ সভাপতি তাঁহার মুখপাত্রের মাধ্যমে কংগ্রেসের মুখ ঢাকিতেই 'মুখ্যমন্ত্রীকে বয়কট'-এর ঘোষণা দিলেন। তবে হ্যাঁ, বয়-কাট আর বয়কট দুই-ই নির্ঝঞ্ঝাট বটে! দলের সকল নেতা ভোটের আগে এই পলায়নী সিদ্ধান্ত মানিবেন বলিয়া মনে হয় না। একদিন পরই প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি সুরজিৎ দত্ত কালিকাপুরে মুখ্যমন্ত্রীর সহিত রক্তদান শিবিরে হাজির থাকিয়া স্পষ্ট বুঝাইলেন বয়কট-এর সিদ্ধান্ত তিনি মানেন না।

তাই তো! বিষয়টা কী দাঁড়াইল? সেলুনে এক খদ্দেরের শির-মালিশ সারিয়া ভাবিতেছিলাম। ব্যানার্জিবাবু আসিতেই তাঁহাকে ধরিলাম। শুনিয়া তিনি একচোট হো-হো হাসিলেন।

বলিলেন, শুন চিন্তা, তোমার গিন্নি মিথ্যা বলেন নাই। ইহা প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্বের মুখ বাঁচাইবার করুণ প্রয়াস ছাড়া কিছু নহে। দলের সাধারণ কর্মী রা, এমনকি ছোট মাঝারি নেতারাও কিছু না বুঝিয়া অনেকে লাফাইতেছেন। তাঁহাদের বল, নেতাদের আপনারা জিজ্ঞাসা করুন — ২০১০ সালেও মুখ্যমন্ত্রীকে 'বয়কট' করা হইয়াছিল। কংগ্রেসের জোটসঙ্গী আই এন পি টি-র সহিত জঙ্গিদের যোগসাজশের অভিযোগ করায়। কবে সেই 'বয়কট' প্রত্যাহৃত হইল? কেন হইল? মুখ্যমন্ত্রী কি তাঁহার বক্তব্য প্রত্যাহার করিয়াছেন? বরং, ধনু কলই ধরা পড়িবার পর তাহার স্বীকারোক্তি হইতে সন্দেহ আরও গভীর যে, কিছু কংগ্রেস নেতার সহিতও সশস্ত্র জঙ্গিদের সরাসরি যোগ আছে। মুখ্যমন্ত্রী সমেত বাম নেতারা সর্বত্র আরও জোরে শোরে কংগ্রেস-আই এন পি টি নেতাদের জঙ্গি-সাজশের কথা বলিতেছেন। তবে? দশ-এর সেই বয়কট প্রত্যাহার হইয়াছিল কেন?

একটু থামিয়া ব্যানার্জিবাবু কহিলেন, এইবারের অভিযোগ কী? মুখ্যমন্ত্রী গত ৪ নভেম্বর তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতির সমাবেশে নাকি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে 'ব্যক্তিগত আক্রমণ করিয়া অশালীন উক্তি' করিয়াছেন। কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে কর্মীরাও একই কথা মুখস্থ বলিতেছেন। পত্রিকায়ও লেখা হইতেছে। কিন্তু, মুখ্যমন্ত্রীর সেই 'অশালীন উক্তি'-টা কী, কেহ খোলসা করিতেছেন না। বুঝিলে চিন্তা, আমিও সেই সমাবেশের ভাষণ শুনিয়াছি। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সি পি এমের পলিটব্যুরো সদস্য। ভদ্র, মার্জিত ভাষায় রাজনৈতিক কথা বলেন। তিনি কখনও কাহাকেও ব্যক্তিগত আক্রমণ করিয়াছেন, এমন কোনও নজির নাই। সমাবেশে কী বলিয়াছিলেন তিনি?

সেদিন মুখ্যমন্ত্রী দেশের অর্থনীতির চরম দুর্দশা ব্যাখ্যা করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতিকে আক্রমণ করেন। বলেন, এফ সি আই খাদ্যশস্য কিনিতেছে না। কৃষকরা তাহাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের দাম না পাইয়া কীভাবে কালোবাজারি, মজুতদার, ফড়িয়াদের কাছে জলের দরে বেচেন, আবার একসময় সেই খাদ্যশস্যই কীভাবে দ্বিগুণ দামে কিনিতে বাধ্য হন, কীভাবে ঋণের দায়ে দেশের তিন লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করিয়াছেন ব্যাখ্যা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁহার বক্তব্য ছিল — এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার, মনমোহন সিং, চিদম্বরম, আলুওয়ালিয়ারা বলিতেছেন — অর্থনীতির হাল নাকি খুব ভাল, দেশ তর তর করিয়া আগাইয়া যাইতেছে! পাগল আর কাহাকে বলে? ব্যস এইটুকুই। এইবার তুমিই বল চিন্তা, মুখ্যমন্ত্রীর এই কথাটিকে কোনওভাবেই কি ব্যক্তিগত আক্রমণ বলা যায়? বরং তিনি , কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের নেতারা যে একটা সর্বনাশা রাজনৈতিক পাগলামিতে আক্রান্ত তাহাই স্পষ্ট করিয়াছেন! অবশ্য কংগ্রেসের কাছে তিন লক্ষ অসহায় কৃষকের মৃত্যু কিছুমাত্র অশালীন নহে! দেশের মানুষের দেওয়া ট্যাক্সের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা চুরি করা

মোটেই অশালীন নহে! আমেরিকার কাছে ভারতের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, ভারতবাসীর মান-ইজ্জত বন্ধক দিয়া খুচরা ব্যবসা বিদেশি পুঁজির হাতে তুলিয়া দেওয়া অশালীন নহে, কোটি কোটি শ্রমিক কর্মচারীর ভবিষ্যনিধির জমা টাকা ফাটকা শেয়ার বাজারের জুয়াতে খাটানোর উদ্যোগ অশালীন নহে! এই পাগলামির বিরোধিতা ও সমালোচনা করাই 'অশালীন'!

ব্যানার্জিবাবুর কথায় মনটা বড়ই চঞ্চল ও ক্ষুব্ধ হইল। ভাবিলাম হিটলারকেও অনেকে পাগল বলিয়াছেন। মনমোহন সিং যেভাবে নীরবে দেশবাসীর সর্বনাশ ডাকিয়া আমেরিকার সেবা করিতেছেন, তাঁহাকে সরাসরি 'আমেরিকা-প্রেমে পাগল' বলিলে খুবই অপরাধ হইবে? দাসত্বের নাম দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক? কই আমেরিকার ওবামা-কে ভারত-প্রেমে কখনও পাগল হইতে দেখি না তো! মনমোহনজিরা এত পাগলপারা কেন? আহা-হা, গিন্নি পাশে থাকিলে গাহিয়া উঠিতেন, 'বন্ধু পাগল করিয়া গেলা, নিজে পাগল হইলা না ...'!

প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা দিল্লির নেতাদের স্তাবকতায় অভ্যস্ত। কোনও রাজ্যে কংগ্রেস সরকার থাকিলে দিল্লির টেলিফোনেই মুখ্যমন্ত্রী বদল হয়। ত্রিপুরায়ও সুধীররঞ্জনকে সরাইয়া সমীররঞ্জনকে বসানো হইয়াছিল। ছয়-সাত মাস পর পর দলের সভাপতির চেয়ার উল্টাইয়া যায়। ইহাকেই গণতন্ত্রহীন কংগ্রেস দলের 'কালচার' বলা হয়। সুতরাং, রাজ্য সরকারকে তাঁহারা 'কেন্দ্রীয় সরকারের একটি দপ্তর' মনে করিবেন— তাহাতে অবাক হইব কেন! প্রধানমন্ত্রী একটি নির্বাচিত সরকারের প্রধান। মুখ্যমন্ত্রীও তেমনই একটি নির্বাচিত সরকারের প্রধান। মুখ্যমন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর 'কর্মচারী' নহেন। তাঁহাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি, নীতি-আদর্শ ও কর্মসূচির সঙ্ঘাত হইতেই পারে। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ১৯৮৮-তে আগরতলায় আসিয়া অবিবাহিত মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীকে 'টি এন ভি-র জন্মদাতা' বলিয়া মিথ্যা অপবাদে বিদ্রুপ করিয়াছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার তো কোনও মিথ্যার আশ্রয় নেন নাই। কোনও নিম্নরুচির পরিচয় দেওয়ার তো প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

আসলে, কেন্দ্রের রাশি রাশি অশুভ কর্ম, রাজ্যে প্রতিদিন দলে দলে কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের দলত্যাগ, প্রণব-পুত্রের লাঞ্ছনা আর সেনা কর্নেল নিগ্রহের মতন ঘটনায় কোণঠাসা দল আর তাহার প্রদেশ সভাপতির গোষ্ঠী মুখ ঢাকিতেই 'বয়কট'-এর পলায়নী ডাক দিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সি পি এমের গণমুক্তি পরিষদের বিশাল উপজাতি সমাবেশ এবং তফসিলি জাতি সমন্বয়ের শহর ভাসানো জনঢল প্রত্যক্ষ করিয়া কংগ্রেস যাহা বুঝিবার বুঝিয়া গিয়াছে। তাহারা এখন পথ খুঁজিতেছে। পলাইবার পথ! এই পলায়নটা কতখানি 'বীরত্বপূর্ণ' দেখানো যায়— ইহাই কি একমাত্র চেষ্টা?

(প্রকাশ: ১২.১১.২০১২)

টোট্‌কা-ফাট্‌কা

মাথায় প্রকাণ্ড টাক। ভদ্রলোক সটান চিন্তা-র সেলুনে সেঁধিয়া ধপাস্‌ শব্দে চেয়ারে অবরোহণ করিলেন। শুনিয়াছি, টাক থাকিলে ট্যাঁকে টাকা থাকে! সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলাম, স্যার— কী করিব? আগন্তুক নিজের টাকে হাত বুলাইয়া কহিলেন, 'ইহাতে চুল ভর্তি করিয়া দাও!' থতমত খাইয়া মনে ভাবিলাম, আজকাল বৃক্ষরোপণের চাহিতে টাকে কেশ-রোপণের কদর বেশি! মিডিয়ার বিজ্ঞাপন সাক্ষী! ওপেন বলিলাম, স্যার — সেলুনে কর্তন হয়, রোপণ হইবে না। খেপিয়া প্রস্থান করিতে করিতে ভদ্রলোক কহিয়া গেলেন— ধুত্তোর, মান্ধাতার ব্যাটা! পরিবর্তন আনো, পরিবর্তন!

কী পরিবর্তন আনিব ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইলাম না। ভদ্রলোক কি কংগ্রেসি? চিন্তা-কে 'পরিবর্তন'-এর ডাক দিয়া গেলেন! সন্ধ্যাকালে ঘরে ফিরিতেই গিন্নি শুনিয়া কহিলেন — কংগ্রেসি কিনা জানি না। তবে কংগ্রেসের হাল যে ওই বেহায়া টেকো লোকটির মতন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। না বুঝিয়া হাঁ করিয়া রহিলাম।

গিন্নি বলিলেন, চাহিয়া দেখ—এই রাজ্যে কংগ্রেসের টাক মাথায় কোনও নতুন চুল গজাইতেছে না। যে চুলটুকুন ছিল, তাহাও প্রতিদিন কিছু কিছু ঝরিতেছে। মানে সি পি এমে যোগ দিতেছে। এখন ভোটের মুখে রাতারাতি লোক টানিতে কত রকমের টোট্‌কা আর ফাট্‌কা! টাকে নতুন চুল গজাইবে বাসনায়! কিন্তু কাম হইতেছে না। বাকি রহিয়াছে সার্জারি করিয়া কেশ-রোপণ। তাহার জন্য জঙ্গি-সাজশেরও বিরাম নাই। সভাপতি হুমকি মারিতেছেন—'যা যা করিবার সকলি করিব, তবুও সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার হইতে দিব না!'

মনে মনে গিন্নির বুদ্ধির তারিফ করিলাম। জামা-কাপড় হইতে কাটা-চুল ঝাড়িতে ঝাড়িতে ভাবিলাম, ২০০৮ নির্বাচনের পর প্রথমে সহিদ চৌধুরি, তাঁহার পর পার্থ দাস। এখন দুই বিধায়ক শঙ্কর দত্ত এবং তপনচন্দ্র দাস। পাঁচ বছরে বামফ্রন্টের ৪৯ বিধায়কের মধ্যে মাত্র ৪ জনকে টার্গেট করিয়া শোরগোল! বাকি ৪৫ বিধায়ককে 'কভার' করিতে হইলে তো আরও ১০ বছরেও কুলাইবে না কংগ্রেসের! সহিদ চৌধুরি আদালতে অভিযোগমুক্ত হইয়া সসম্মানে মন্ত্রিত্বে ফিরিয়াছেন। পার্থ দাস ইস্যু হইতে সুবিধা মিলিবার আর সময়ও নাই,

সম্ভাবনাও নাই। এখন দুই বাম বিধায়ককে লইয়া পড়িয়াছে কংগ্রেস।

থানায় ঢুকিয়া বিধায়ক শঙ্কর দত্ত পুলিসকে গালি দিয়া ঠিক করেন নাই। সি পি এম দলও তাঁহাকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করিয়াছে। পুলিসের সকল অফিসার ধোয়া তুলসীপাতা হইয়া গিয়াছেন, কেহ আর ঘুষ খান না, তোলা আদায় করেন না — এমন কথা জনসাধারণ বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু,সামগ্রিকভাবে অতীতের মতন পুলিসকে ''জনগণের শত্রু, জুলুমবাজ বাহিনী'' বলা যাইবে না। 'জনগণের বন্ধু' হইবার 'প্রয়াস' কর্মসূচি চালাইতেছে পুলিস। ব্রিটিশ ধাঁচায় জন্ম হওয়া পুলিসের এই বিকল্প ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হইতে আরও অনেক-অনেক সময় লাগিবে। অন্তত, কানা-কে 'কানা' বলিয়া গাল না পাড়িবার সৌজন্যটুকু একজন বাম বিধায়ক ভুলিয়া যাইবেন — ইহা প্রত্যাশিত নহে!

কংগ্রেসের বিধায়ক কিংবা মন্ত্রীরা থানায় ঢুকিয়া ওসির কলার ছিঁড়িতে পারেন, ভোট গণনা কেন্দ্রে ঢুকিয়া নির্বাচনী অফিসারদের হুমকি দিয়া ঘোষিত ফলাফল উল্টাইয়া দিতে পারেন, 'জাল ব্যালট' ছাপানোর ডাহা মিথ্যা রটনা করিয়া অফিসারকে হেনস্থা করিতে পারেন, পুলিসকে লাঠিপেটা করিতে পারেন, পুলিসের গাড়ি আগুনে পোড়াইতে পারেন, ডি এস পি-কে রক্তাক্ত করিতে পারেন, কংগ্রেসি পঞ্চায়েতের দুর্নীতির তদন্তে গেলে অফিসারকে পিটাইয়া গাড়ি ভাঙিয়া দিতে পারেন, সেনা কর্নেলকেও চরম লাঞ্ছনা করিতে পারেন! কংগ্রেস দলের তাহাতে কোনও লাজ নাই, সমালোচনা নাই, অনুশোচনাও নাই। কিন্তু, বামফ্রন্ট বিধায়ক উচ্চস্বরে কথা বলিলেও দলের তিরস্কার জুটিবে। ইহাই অনুশাসন, সভ্যতা, শৃঙ্খলা। লোকের কাছে এই কারণেই অদ্যাবধি বামফ্রন্টের কোনও বিকল্প নাই। গিন্নি কহিলেন, আসল গোমর অন্যত্র। শঙ্কর দত্তকে লইয়া পড়িবার মূল কারণ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সুদীপ বর্মনের কৃষ্ণনগর (আগরতলা-৬) কেন্দ্র। সকলেই জানে, বিধায়ক শঙ্কর দত্তের শক্তিক্ষয় না করিতে পারিলে আগরতলায় সুদীপবাবুর জয়ের আশা ক্ষীণ। তাই, সকল ইস্যু ছাড়িয়া তিনি দক্ষরাজার শঙ্কর-লাঞ্ছনার যজ্ঞে নামিয়াছেন! কহিলাম, গিন্নি—পুলিস মামলা লইয়াছে। আইন নিজের পথে চলিবে। চলিতে দাও।

নলছড় উপনির্বাচনের 'সেমি-ফাইনাল'-এ কংগ্রেসকে গো-হারা হারাইয়া মহা অপরাধ (!) করিয়াছেন বিধায়ক তপনচন্দ্র দাস! সেই জ্বালা কী করিয়া ভুলিবেন বিধ্বস্ত সেনাপতি সুবল ভৌমিক! তাই, একটি দুঃখজনক দুর্ঘটনা লইয়া ফাট্‌কা খেলিতে নামিয়াছেন। তাঁহার রোমহর্ষক অভিযোগ, ১। তপনচন্দ্র দাসের বিরুদ্ধে একাধিক খুনের মামলা রহিয়াছে (নলছড় উপনির্বাচনের আগে কিন্তু কংগ্রেস বা সুবলবাবুরা এই গুরুতর 'তথ্য' বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছিলেন।) ২। বাষট্টি বছরের বৌদিকে জমির বিবাদে বিধায়ক নিজেই গুলি করিয়াছেন! ৩। জমির বিবাদ লইয়া তপনচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র কয়েকবার সুবলের কাছেও

গিয়াছিলেন। চ্যালেঞ্জ জানাইয়া বিধায়ক তপনচন্দ্র দাস বলিতেছেন, জোট আমল হইতে আজ অবধি কখনও তাঁহার বিরুদ্ধে কোনও মামলা হয় নাই, খুনের মামলা তো দূরের কথা। পুলিস প্রাথমিক তদন্ত করিয়া বলিতেছে, নিজের জামাতার সার্ভিস রিভলবার হইতে দুর্ঘটনাক্রমে গুলি বাহির হইয়া বিধায়কের বৌদি আরতি দাস আহত হইয়াছেন। ভ্রাতুষ্পুত্রও পুলিসের একজন এস আই। বলিয়াছেন, তিনি কখনও কোনও জমির বিবাদ লইয়া সুবল ভৌমিকের কাছে যান নাই। তবুও সুবলবাবুদের অভিযোগ সত্য মানিতে হইবে?

আসল কথা, আই সি ইউ-তে শায়িত রাজ্যের কংগ্রেসকে 'কোরামিন' দিয়া সতেজ রাখিবার শেষ চেষ্টা করিতেছেন নেতারা। কোনও টোট্‌কা-ফাট্‌কায় টাক মাথায় যদি চুল গজাইয়া যায়, যে যা পাইতেছেন তাহাই আনিয়া কংগ্রেসের মাথায় ঢালিতেছেন। তবে, আরতি দাস সুস্থ হইয়া উঠিলে সুবলবাবুর মুখ আবারও পুড়িবে সন্দেহ নাই।

(প্রকাশ : ১৯.১১.২০১২)

নাও ভাসিবে তো?

মতিলাল ঘরে ফিরিয়াছেন। বে-ঘর হইয়া পথে পথে ঘুরিতেছিলেন —এমন নহে। তবুও তাঁহার প্রত্যাবর্তন সব পত্রিকায় টিভিতে ছবি-সমেত বড় খবর হইল। চিন্তা-গিন্নির মনঃপূত হয় নাই। তাঁহাকে বুঝাইলাম, জঙ্গি নেতাও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিলে বড় খবর হয়, ইহা হইবে না কেন?

এই অধম চিন্তা আগেও বলিয়াছিল, ত্রিপুরা রাজ্যখানা বাংলা নহে। বাংলায় যাহা ঘটিয়াছে, ত্রিপুরায়ও 'ঘটিবার দেরি নাই' বলিয়া যাহারা বগল বাজাইতেছিলেন তাহারা কত ভ্রান্ত, ভোটের আগেই এখন বুঝা যাইতেছে। মতিলালের প্রত্যাবর্তনেও তাহাই প্রমাণিত। গিন্নি হুঙ্কার ঝাড়িলেন, কী যে বলিতেছ মাথা-মুন্ডু নাই! কহিলাম, গিন্নি ঠিকই বলিতেছি। চাহিয়া দেখ, ত্রিপুরার উল্টা স্রোত বাংলায়। এত অনাচারেও বামেরা সুবিধা করিতে পারিতেছেন না। আবার বাংলার উল্টা স্রোত বহিতেছে ত্রিপুরায়। দিদির তৃণমূল বাংলায় কংগ্রেস ভাঙিয়া গুঁড়া করিতেছে। রাতারাতি কংগ্রেসিরা তৃণমূলে গিয়াই মন্ত্রিত্বও জুটাইয়া ফেলিতেছেন! আর এইখানে, তৃণমূলকে ভাঙিতেছে কংগ্রেস। ইহাদের একত্রে গুঁড়া করিতেছে সি পি এম!

মতিলাল সাহা জঙ্গি নেতা নহেন। তবে, জঙ্গিপনার ইতিহাসে নাম না থাকিলে বাম-বিরোধী নেতা হওয়া যায়? সি পি এম বিধায়ক গৌতম দত্ত হত্যাকাণ্ডে প্রি-মেডিক্যাল পড়া মতিলাল এবং তাঁহার ভাই পরিমল সাহার বিরুদ্ধেই প্রধান অভিযোগ উঠিয়াছিল। রাত্রে বাড়ি ফিরিবার কালে ব্রিজ পার হইতেই রিকশা হইতে টানিয়া নামাইয়া নৃশংস খুন! হইলে কী হইবে! সাক্ষী পাওয়া যায় নাই। অভিযোগও প্রমাণ হয় নাই। এমনকি, সেইকালে নৃপেনবাবুর 'ভদ্রলোক পুলিস' চার্জশিটও দিতে পারে নাই! তবে, শুনিয়াছি গৌতম দত্তের হৃদ্‌যন্ত্র এঁফোড়-ওফোঁড় করিযা যেভাবে কিরিচ জাতীয় সরু অস্ত্র চালনা করা হইয়াছিল, ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক তাহাতে গভীর বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন! খুনি অত্যন্ত পেশাদার অথবা মেডিক্যাল জ্ঞানসম্পন্ন না হইলে এমন হইতে পারে না, মন্তব্য ছিল পুলিসেরও! পরবর্তীকালে বিধায়ক পরিমল সাহা-ও নিষ্ঠুরভাবে খুন হন। তখনই ছোটভাই মতিলাল

সাহার উত্থান কংগ্রেস রাজনীতিতে। জোট আমলে মন্ত্রীও হন। কিন্তু, বিশালগড়ে কংগ্রেসি রাজনীতির মাটি লইয়া সমীর বর্মন এবং তাঁহার পুত্র সুদীপ বর্মনের সহিত মতিলালের ঠান্ডা-লড়াই প্রায়শই 'গরম' হইয়া উঠিত। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মতিলাল-সমর্থক ছাত্রের পিঠে সিগারেটের ছেঁকা তাহারই জের বলিয়া জনশ্রুতি। এখন, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে সেই সুদীপ বর্মণ এই 'মতি-বিজয়' পর্বকে নিজের রাজনৈতিক মেধা এবং কূটনৈতিক পক্কতা-র নজির বলিয়া অনায়াসেই দাবি করিতে পারেন।

কেন ফিরিলেন? কেন ছাড়িলেন তৃণমূল কংগ্রেস? মতিলালের জবাব বড়ই চিত্তাকর্ষক। তিনি বলিয়াছেন, 'যে উদ্দেশ্যে তৃণমূলে গিয়াছিলাম তাহা পূরণ হয় নাই।' কী উদ্দেশ্য ছিল খোলসা করেন নাই। তিনি কি ধারণা করিয়াছিলেন বাংলার পর ত্রিপুরায়ও তৃণমূলের সরকার হইবে? নাকি কংগ্রেস-তৃণমূলের জোট সরকার হইবে? হইলে তিনি দাম পাইবেন, মন্ত্রী হইবেন, নতুবা সাংসদ! তৃণমূল আর কংগ্রেসের ডিভোর্সের পরও অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু দেখিলেন, ডিভোর্সের পর দুই দলের 'টিসুম-ঢাসুস' বাড়িয়া চলিয়াছে। ত্রিপুরায়ও জোটের কোনও সম্ভাবনা নাই! তাই 'কমলাসাগর' লইয়া দর-কষাকষি শুরু করিলেন কংগ্রেস সভাপতির সহিত? প্রদেশ সভাপতি আগেই কমলাসাগরের 'সম্ভাব্য প্রার্থী' হিসাবে তিন নেতা দীপক মজুমদার, অরুণকান্তি ভৌমিক এবং বীরজিৎপন্থী জাহির আলির নাম ঘোষণা করিয়া দিল্লিতে 'পাঠাইয়াছেন'। আরও এক টিকেট-প্রার্থী, কমলাসাগর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সুধাংশু ধর বুকে ক্ষোভের তুষের আগুন জ্বালাইয়াই রাখিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে হঠাৎ দরকষাকষি সম্পন্ন! 'কমলাসাগর' কিনিয়া বা জিনিয়া লইলেন মতিলাল? এইবার দীপক, অরুণকান্তি, জাহির বা সুধাংশুদেরও 'জয়' করিতে কত মন তেল পুড়িবে কে জানে!

— গিন্নি, কেবল 'উদ্দেশ্য' নহে, 'বিধেয়'ও ছিল! দলে টিকিয়া থাকিতে না পারিয়া তৃণমূলে যোগদান। লাঞ্ছনা, অপমান, অবহেলার অন্ত ছিল না। ইহাই আসল কারণ। একই রকম কারণে কংগ্রেস ছাড়িয়া এক কালে সমীররঞ্জন বর্মনও জনতা পার্টিতে যোগদান করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্যও ছিল বই কি! 'উদ্দেশ্য' ছিল সুধীররঞ্জন মজুমদারের। ছিল রতন চক্রবর্তীরও। তাঁহারাও উদ্দেশ্য-বিধেয় যোগেই তৃণমূলে গিয়াছিলেন। মতিলাল 'সহসভাপতি' হন প্রদেশ তৃণমূলের। সভাপতি মানিক দেব-এর কথায়, মতিলালের যাওয়াতে দলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইবে না। তিনি জানাইয়া যান নাই— ইহাই বড় দুঃখ! উদ্দেশ্য পূরণ হয় নাই বলিয়াই তাঁহার মতো সুধীর, রতনরাও আগেই ফিরিয়াছিলেন। সুধীরবাবু প্রয়াত। রতন চক্রবর্তীও সুখে নাই। মতিলালের ভাগ্যে কী আছে? জানেন একমাত্র সুদীপ বর্মনই! মতিলালের ফিরিয়া আসা সেই অর্থে প্রত্যাবর্তন? নাকি আত্মসমর্পণ? তবে ফিরিবার আগে সুধীর-রতন-মতিলাল সকলেই বুঝিয়াছেন — দিদি-র দলে 'পোস্ট' একখানাই! বাকি সবই 'ল্যাম্প-পোস্ট'! সুতরাং কোনও দিকেই কোনও আশা অবশিষ্ট ছিল না।

বৃত্তান্ত শুনিয়া চিন্তা-গিন্নি হঠাৎ হেঁড়ে গলায় ট্যাঁড়া-পিটানো সুরে 'শ্যামাসঙ্গীত' ধরিলেন — *'আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল'! করজোড়ে কহিলাম — ভাগ্যবান, থামো!* কংগ্রেস ছাড়িয়া কে তৃণমূলে গেল, কিংবা তৃণমূল ছাড়িয়া কে কংগ্রেসে গেল — ইহাতে কিছুমাত্র তফাত নাই। বোধকরি ,গুরুত্বও নাই। কিন্তু, লক্ষ্য করিও, জোট জমানার 'হীরা-মোতি-মুক্তা আর রত্নরা' সকলে আবার এক নৌকায় উঠিতেছেন! এই ভারী নৌকা ভাসিবে তো! নিচে যে জল নাই! বালুচর বাড়িতেছে! সামনে পিছনে ডাইন বাঁয়ে—কেবল ধু ধু বালুচর ...!

(প্রকাশ ঃ ২৬.১১.২০১২)

ধাঁধা!

শীতে চুল কাটার হিড়িক কম। দাড়ি কাটিতেও ঝক্কি। গালে ঠান্ডা জল লাগিতেই কাস্টমার হি-হি-করিয়া উঠে! চিন্তার সেলুন ফাঁকা। গালে হাত দিয়া গিন্নির দেওয়া ধাঁধা-র উত্তর খুঁজিতেছি! জব্বর রাজনৈতিক ধাঁধা!

২০১৩-র ভোট কোন সনের মতন হইবে! বামেরা বলিতেছেন, এইবার ১৯৭৮-এর মতন হইবার সম্ভাবনা। কংগ্রেস নেতারা বলিতেছেন, ১৯৯৩-এর মতন ভোট হউক। কিন্তু ক্যান? ১৯৮৮ না চাহিয়া ১৯৯৩ চাহেন ক্যান?' ৮৮-ই তো উঁহাদের 'লাকি' নম্বর! সেই ভোটেই ইঁহারা সরকারে আসিয়াছিলেন।' ৯৩ তো বামেদের। সে ভোটে বামেরাই বিপুলভাবে জয়ী হইয়াছিলেন! ধাঁধা-র আরও আছে দাদা। বাম বা ডান কেহই ১৯৮৩, ১৯৯৮, ২০০৩ বা ২০০৮-এর মতন ভোটের কথা বলিতেছেন না কেন? এই ধাঁধা ভাঙিতে পারিলেই গিন্নি বাড়ি ফিরিতে বলিয়াছেন, নহিলে ...!

বামেদের যুক্তি কিছুটা অনুমান করিতে পারি। ইঁহারা ধারণা করিতেছেন, কংগ্রেস দল এইবার ১৯৭৮-এর মতনই বিধানসভায় শূন্য হইয়া যাইতে পারে। অন্য দিকে কংগ্রেস, ভুলিতে পারিলে বাঁচে বলিয়াই ১৯৭৮ ভুলিয়া গিয়াছে! ১৯৮৮-তে যে 'নির্বাচন' হইয়াছিল, কংগ্রেস এইবারও তেমনটা চাহিলেও মুখে স্পষ্ট বলিবার সাহস পাইতেছে না। গণহত্যা, সেনা, উপদ্রুত আইন, গণনাকেন্দ্রে বেনজির জালিয়াতি! সেই কলঙ্কিত ভোটে গোটা দেশ শিহরিত হইয়াছিল। আর ১৯৮৩, ১৯৯৮,২০০৩ এবং ২০০৮-এর প্রতিটি বিধানসভা ভোটের আগে কংগ্রেস 'আইয়া পড়তাছি' মুখে বলিলেও ভাল করিয়াই জানিত – স্বাভাবিক, শান্তিপূর্ণ, অবাধ ভোট হইলে বামফ্রন্টই বিপুল ভোটে জিতিবে। জিতিয়াছেও। কংগ্রেসের কাছে শান্তিপূর্ণ, অবাধ উৎসবমুখর ভোটের কোনও বৈশিষ্ট্য থাকে না। কোনও আশাও অবশিষ্ট থাকে না।

ত্রিপুরায় 'অস্বাভাবিক' পরিস্থিতিতে ভোট হইলেই কংগ্রেসের যা কিছু আশা! ১৯৯৩ সালে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস-টি ইউ জে এস জোট সরকার নির্বাচন পরিচালনা করিতে পারে নাই। নির্বাচন কমিশন নিজেরা তদন্ত করিয়া অবাধ ভোট সম্ভব নহে বুঝিবার পর নির্বাচন

পাস করিয়া দিয়াছিল। বিধানসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়। গোটা রাজ্য তখন জোট সরকারের চূড়ান্ত অপশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে-ক্রোধে টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। জোট শাসনের সেই বীভৎসার জন্য দুই-একজন কংগ্রেস নেতা এখন লোক-দেখানো 'ক্ষমা' চাহিলেও, আসলে তাঁহারা ইহাকে 'বাড়াবাড়ি'-র বেশি কিছু মানিতে রাজি নহেন!

বাড়াবাড়িই বটে! ১৯৮৮-তে অন্যায়ভাবে ক্ষমতায় আসিয়া সমস্ত নির্বাচিত সংস্থা ভাঙিয়া ফেলা, পঞ্চায়েতে পুরসভায় আর ভোট না করা – বাড়াবাড়ি ছাড়া বেশি কী! বিরোধী দলের শত শত পার্টি অফিস, সংগঠনের অফিস পোড়ানো, লুট করা, নেতা-কর্মীদের নির্বিচারে খুন করা, হাজারে-হাজারে এলাকাছাড়া করা – সামান্য বাড়াবাড়িই তো! বীরচন্দ্র মনু-নলুয়ার মতো প্রকাশ্য দিবালোকে পরিকল্পিত গণহত্যা, উজান ময়দান- সিদ্ধাপাড়ার মতো পাইকারি হারে ধর্ষণ একটু বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কী? পুলিসের গুলিতে ছাত্র খুন, বুভুক্ষু উপজাতি জননী হত্যা – শুধুই তো 'একটু বাড়াবাড়ি'! প্রাণ খুলিয়া 'বাড়াবাড়ি'-র সুযোগ পান নাই বলিয়া আপশোস যায় নাই!

কিন্তু, ১৯৯৩-তে জোট সরকারকে নির্বাচন কমিশন ভোট করিতে দিল না কেন? অবাধ ভোট করিবার ব্যাপারে জোট সরকারের হাতযশ (!) তো সংসদেও আলোচিত! ফটিকরায়ের চমৎকার উপনির্বাচনে সকল বুথ দখল করিয়া কী অবাধে কংগ্রেসিরা ছাপ্পা মারিতে মারিতে কবজির ব্যথা ধরাইলেন! ভোট দেখিতে আসা সাংসদকেও পিটাইয়া দিল্লি পাঠাইলেন। সিমনা উপনির্বাচনে সি পি এমের প্রার্থীর পক্ষের ব্যালটে কী শান্তিপূর্ণ ডবল-স্ট্যাম্পিং হইল! সংসদের ভোটে সন্তোষমোহন সমগ্র সৌরমণ্ডলে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জিতিবার রেকর্ড গড়িলেন! এ ডি সি ভোটে কী নিদারুণ লাল রক্তের স্রোত বহিল! ভোটকেন্দ্রেই বাঁধাবাপির মতো কুচি-কুচি কাটা হইল সি পি এমের পোলিং এজেন্ট অরুণ দেব-এর দেহ! আর, আগরতলা শহরের উপর বামের জয় ঠেকাইতে বি জে পি প্রার্থী শ্যামহরি শর্মাকে উপ-নির্বাচনী সভার বক্তৃতা মঞ্চেই খুন করিয়া ভোট স্থগিত করিয়া দেওয়া হইল ! জোট জমানায় গণতন্ত্র-চর্চার এই সব মহান দৃষ্টান্ত দেখিয়া নির্বাচন কমিশনও বোধকরি কাঁপিতেছিলেন। তাহার উপর, গণহারে পিটানি খাওয়া পুলিস আর সরকারি আধিকারিকরা হুমকির মুখে কী করিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না!

এখন ত্রিপুরায় সেই ৯৩-এর পরিস্থিতিই দেখিতে পাইতেছেন সুবলবাবুরা। তাই রাষ্ট্রপতির শাসনে ভোট মাঙিতেছেন। অর্থাৎ, এখনও সুবলবাবুর মতন দুই-একজন আছেন – যাঁহারা মনে করেন, রাষ্ট্রপতির শাসনে ভোট না হইলে – 'ক্ষমা প্রার্থনা'র কারণ হইয়া উঠা সেই অত্যাচারী জোট-জামানার পতন হইত না! দীর্ঘতর হইতে পারিত। বামফ্রন্ট আসিতেই

পারিত না! একই সঙ্গো ভাবিতেছেন, এখন আর রাষ্ট্রপতির শাসন না হইলে বামফ্রন্ট হটানো যাইবে না! বুঝি দাদা, মানুষ বামফ্রন্টের প্রতি বিরক্ত, ক্ষুব্ধ হইলে 'রাষ্ট্রপতি' চাহিবার দরকার পড়িত না। ঘরের পিছনে সিঁদ কাটিবার পথ খুঁজিতে হইত না!

কিন্তু কী করিবেন দাদা, আপনারা তো আর গত দুই বছর কম চেষ্টা করেন নাই। আগে সি পি এম আপনাদের 'ভোটের পাখি' বলিত। এই বদনাম ঘুচাইতে কত 'ইস্যু' বাহির করিলেন! ধারাবাহিকতা থাকিবে কী করিয়া! মানুষ সঙ্গো না পাইলে, সংগঠন না থাকিলে, ক্ষমতা ছাড়া কোনও লক্ষ্য না থাকিলে – কোনও ইস্যু ধরিয়া রাখা যায়? তাই যখন যাহা তখন তাহা! বহু চেষ্টা করিয়াও রাষ্ট্রপতি শাসনের অবস্থা তৈয়ার করিতে পারিলেন না! দিল্লিরও কোমরে বাতের ব্যথা! উঠিয়া বসিতে তিনজন লাগে! উপনির্বাচন কমিশনার বিনোদ জুৎসি দিল্লি হইতে আসিয়া, সরজমিনে সমস্ত কিছু দেখিয়া শুনিয়া বলিয়া গেলেন, 'নির্বাচন যথাসময়েই হইবে'। অর্থাৎ, রাষ্ট্রপতি শাসনের সম্ভাবনা উড়াইয়া দিলেন। ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজেও কমিশন সন্তুষ্ট। একশো ভাগ সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র সম্পূর্ণ করিয়া চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে ত্রিপুরা।

গিন্নিকে বলিব, ধাঁধার উত্তর মিলিয়াছে। ত্রিপুরা বহুদূর আগাইয়া গেলেও ১৯৯৩ সাল হইতে কংগ্রেস দল এখনও এক কদমও অগ্রসর হইতে পারে নাই! তাহাদের এখন সত্যই 'সময় খারাপ', ১৯৯৩ সালের মতনই!

(প্রকাশ : ০৩.১২.২০১২)

গৃহশান্তি

সেলুনের উদ্দেশে দুগ্‌গা-দুগ্‌গা করিয়া বাহির হইবার কালে পশ্চাৎ হইতে গিন্নির খন্‌খনে চিৎকার — 'রাত্রি ৮টার মধ্যে না ফিরিলে দরজা খোলা হইবে না!' শুনিয়া পিত্তি জ্বলিলেও মুখে কিছুই বলিলাম না।

— কী যে এক ফাজিল আইন হইয়াছে! মাথামুন্ডু নাই! গিন্নি-রা যখন যাহা খুশি বলিবেন, করিবেন। গালি দিবেন, ভাতের বদলে পাতে ছালি দিবার হুমকি দিবেন! পাল্টা কিছু বলিলেই বিপদ! ১১ হাজার ভোল্ট! 'গার্হস্থ্য হিংসা রোধ'— এর নামে স্বামীকণ্ঠ রোধ! এখন কী আর করা, 'সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি ...' ভাবিয়া সকলি সহ্য কর!

চিন্তা শীল একা নহে। ধৈর্য আর সহ্যশক্তি ছাড়া গত্যন্তর নাই প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদেরও। আই এন পি টি এখনও তাঁহাদের পাত্তা দিতে রাজি নহে! চিন্তা-গিন্নির মতন বিজয় রাঙ্খলরাও দিল্লি গিয়া কংগ্রেসকে 'চরম সময়সীমা' বান্ধিয়া দিয়াছেন। ২৫ ডিসেম্বর খ্রিস্টানদের বড়দিনের মধ্যে তাঁহাদের ১৪ (নিদেনপক্ষে ১৩) আসনের দাবি মানিয়া না লইলে জোট-এর দরজা বন্ধ থাকিবে! এই 'সময়সীমা'-র দিন বাছাইয়ে দিল্লিকে বুঝানো হইয়াছে, আই এন পি টি-র পিছনে কাহারা রহিয়াছে! বাস্তবে যাহা-ই হউক, দিল্লি 'খ্রিস্টানগন্ধী' কিছু বুঝিয়া লইলে রাঙ্খলদের গুরুত্বে অন্যমাত্রা যুক্ত হইতে পারে বই কি!

প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা মনে করিতেছেন, আই এন পি টি জঙ্গলের বাঘ, তবে এখন মৃতপ্রায়। লেজটি কেবল ইষৎ নড়িতেছে! তাই কংগ্রেস প্রদেশ নির্বাচনী কমিটির চেয়ারম্যান বীরজিৎ সিন্‌হা ৬-৭টির বেশি আসন আই এন পি টি-কে ছাড়িয়া নষ্ট করিতে রাজি নহেন! কংগ্রেস এস টি ডিভিশনের নেতা দেবব্রত কলইরা তাঁহার কাছের লোক। ক্ষুব্ধ হইলেও ইঁহারা নিরুপায়। জোট থাকিবে — ইহাই যে দিল্লির ইচ্ছা! তবে রাঙ্খলদের যতটা সম্ভব ছাঁটিয়া দিতে তাঁহারা অনেক আগে হইতেই তৎপর। আসাম-সহ পড়শি কংগ্রেসি রাজ্যের মন্ত্রী-নেতাদের ধরিয়া আনিয়া কিছু ট্রাইবেল ময়ালে ঘুরাইয়াছেন বীরজিৎরা। আই এন পি টি নেতৃত্বের উপরে চাপ বাড়াইতে। এমনকি, ধনু কলই সংক্রান্ত গোপন জঙ্গি-সাজেশেও কংগ্রেসের এস টি নেতাদেরই নাম আসিয়াছে! অর্থাৎ, যে জঙ্গিশক্তির

জোরে আই এন পি টি দর-কষাকষি করে বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে, সেই শক্তি এখন 'আমরাই অর্জন করিয়াছি'! সুতরাং, আর আই এন পি টি নামক মৃতপ্রায় ব্যাঘ্রটি লইয়া টানাটানি কেন!

গিন্নিকে দিয়াই চিন্তা বুঝিতে পারে — মান অভিমান, দড়ি টানাটানি, সাময়িক গৃহত্যাগ ঘটিলেও বিচ্ছেদ হইবে না। দীর্ঘকাল একসঙ্গে ঘর করিতে করিতে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা গড়িয়া উঠে। একজন আরেকজনকে ছাড়া চলিতে পারে না, বাঁচিতে পারে না। অতএব গত বিধানসভা নির্বাচনের মতো এইবার আই এন পি টি ১১ আসন না পাইলেও ৯-১০য়েই খুশি থাকিবে। ২০টি উপজাতি আসনের ১১টিতে প্রার্থী দিয়া মাত্র শখানেক ভোটে গতবার একটি আসনে জয়ী হন স্বয়ং রাঙ্খল। ৯ আসনে প্রার্থী দিয়াও কংগ্রেস ছিল শূন্য। অর্থাৎ, ১৯ উপজাতি আসনেই সি পি এমের জয়জয়কার। এইবার? অবস্থার কিছু হেরফের হইয়াছে? তেমন লক্ষণ নাই। তবুও কংগ্রেস-আই এন পি টি জোট থাকিবে। থাকিতেই হইবে।

কংগ্রেসের পরিকল্পনা, আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে ১৯৬৭-তে যে উপজাতি যুব সমিতির জন্ম, তাহাই আজ আই এন পি টি। জন্মলগ্নে ইহাদের ঘোষণা ছিল — 'আমার সাদা নহি, লালও নহি'। ১৯৭৮-এর ভোটে কংগ্রেস বিধানসভায় একটিও আসন পায় নাই। বাম সরকার আসিতেই দলে দলে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা ভিড়িয়া ছিলেন 'আমরা বাঙালি'-তে। উপজাতিদের মধ্যে কংগ্রেস বরাবরই দুর্বল ছিল, ইহার পর আরও খালি হইল। অথচ, উপজাতি ভোট তো চাই। ১৯৮০-তে কংগ্রেস নেত্রী 'মহারানী'র উপস্থিতিতে তৈদু-তে উপজাতি যুব সমিতি 'বিদেশি বিতাড়ন' ও 'বাজার বয়কট'- এর সিদ্ধান্ত নিল। রাঙ্খল ঘোষণা করিলেন — 'স্বাধীন ত্রিপুরা'। দাঙ্গা বাধানো হইল। কংগ্রেস 'বাঙালিদের দল' আর যুব সমিতি 'উপজাতিদের দল'। তাহাদের মৈত্রীর অর্থ (!) বাঙালি-উপজাতি ঐক্য! এই মারাত্মক লাইন ধরিয়া ইন্দিরা গান্ধীর বুদ্ধিতে ১৯৮৩-তে কংগ্রেস-যুব সমিতি জোটের যাত্রা শুরু। সেই যুব সমিতি ভাঙিয়া আই পি এফ টি, পরে আই এন পি টি, এন সি টি ইত্যাদি। রাঙ্খলের পদচিহ্ন ধরিয়া এখনও সক্রিয় দুই নিষিদ্ধ জঙ্গি গোষ্ঠী এন এল এফ টি এবং টাইগার ফোর্স।

কিন্তু, সেই লঙ্কাও নাই, সেই রাবণও যে নাই! বহু রক্ত খরচে শান্তি প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। উন্নয়নের ঢেউ রাজ্যের প্রতি পাহাড়-লুঙ্গাতেও। বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবনা, 'স্বাধীন ত্রিপুরা' গড়িবার চিন্তা, সমগ্র উপজাতি জনসমাজের কাছে পরিত্যক্ত। রাজ্যের লাগাতার চাপে সীমান্তে কাঁটাতার, দক্ষ টি এস আর বাহিনী হইয়াছে। জঙ্গিরা সর্বাত্মক প্রতিরোধের মুখে সম্পূর্ণ কোণঠাসা। কিন্তু, তাহারা আছে। থাকিতেই হইবে! ভোটের আগে তাহারা আস্তিত্বের

প্রমাণ দিতে চেষ্টা করিতেছে। নহিলে দিল্লি 'সময়সীমা'-র হুমকিকে পাত্তা দিবে কেন?

সুতরাং, চিন্তা-র মনে হইতেছে— কংগ্রেস-আই এন পি টি জোটের আগে এই দর-কষাকষিও কেবল দুটি দলের গৃহশান্তির বিষয় নহে। রাজ্যের গৃহশান্তিও ইহার সহিত ওতপ্রোত জড়িত। প্রতি নির্বাচনের আগেই ইহা ঘটিয়া থাকে। দিল্লিতে আই এন পি টি নেতারা ছুটিয়া যান। 'কথা-বার্তা' চলে। আর ত্রিপুরার জঙ্গালে শ্বাপদকুলের নড়াচড়া বাড়ে। সীমান্তে জঙ্গিরা সক্রিয়তার স্বাক্ষর রাখিতে মরিয়া হইয়া উঠে। এইবারও উঠিবে। জনগণ সাবধান না থাকিলে বিপদ! রাজ্যের গৃহশান্তি সুরক্ষায় গৃহ-দপ্তরকেও সতর্ক থাকিতেই হইবে।

(প্রকাশ ঃ ১০.১২.২০১২)

কাঁচা মাছ!

— 'ও চিন্তা-কাকা, চল কংগ্রেস ভবন যাই। বেকারভাতার ফরম পূরণ করিবে।' পাড়ার বখাটে বিশুর হাঁক শুনিয়া দারুণ শীতেও কান গরম হইয়া উঠিল। শুধাইলাম —'মশকরা করিতেছ না কি! আমি তোমার বাপের বয়সী'। বখাটে কহিল —'না কাকা, কংগ্রেস তোমাকেও বেকারভাতা দিবে। ফরম ভরিয়া দাও। ব্যস, ভোটের পরে মাসে দুই হাজার টাকা খাড়া! আর, কোনও ঋণ থাকিলে বল, মকুবের কার্ড পাইবে। ভোটের পরে ব্যাঙ্কে দেখাইলেই ঋণ মকুব'। তেজ দেখাইয়া কহিলাম — 'না, আমার কোনও ব্যাঙ্ক ঋণ নাই। যাহা কিছু ঋণ, সবই তোমার কাকিমার কাছে। মকুব তো দূর, জন্মেও শোধ হইবে না রে ...।'

ব্যাজার মনে সেলুন বন্ধ করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। গিন্নি বলিলেন, বেকারদের ভোট কিনিতে ভোটের আগে বেকারভাতার নামে ঘুষ দিবার প্রস্তাব করিতেছে কংগ্রেস। আর কৃষক সমেত গ্রামের গবিবদের ভোট কিনিতেই ঋণ মকুব কার্ডের টোপ। ১৯৮৮-র ভোটের আগে ঋণমেলা-র নামে সরকারি ব্যাঙ্কের টাকা ঘুষ দেওয়া হইযাছিল। এইবার আবার। ঘুষ ছাড়া আজকাল কংগ্রেস আর কিছুই কি পাইবার আশা করিতে পারে না?

— গিন্নি, 'ঘুষ' শব্দটি বড়ই শ্রুতিকটু। যাহারা ঘুষ দেন, তাহারা যেমন মুখে 'ঘুষ' বলেন না, যাহারা খান তাহারাও 'ঘুষ' বলেন না। বোফর্স হইতে কয়লা খাদান — রাশি রাশি কেলেঙ্কারিতে বহু লক্ষ কোটি টাকা ঘুষের কলঙ্ক কংগ্রেসের দেহে মনে। কিন্তু কোথাও ঘুষদাতা বা গ্রহীতা কেহই 'ঘুষ' শব্দটি উচ্চারণ করেন নাই। এমনকী সর্বশেষ , খুচরো পণ্যে বিদেশি বিনিয়োগের ব্যবস্থা পাকা করাইতেও ওয়ালমার্ট নাকি ১২৫কোটি ঘুষ দিয়াছে। তবুও ঘুষ প্রকাশ্যত কখনই 'ঘুষ' নহে! কত শ্রুতিমধুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে — কমিশন, কাট-মানি, লবি-খরচ, তদ্বির-ব্যয় ইত্যাদি। দেশের সমগ্র সমাজজীবন আজ ঘুষ-পরিব্যাপ্ত। বিবাহের বাজারেও পাত্রের 'বাড়তি আয়', 'আলগা রোজগার', 'উপরি-পাওনা' — বিশেষভাবে বিবেচিত হইয়া থাকে। সরকারি অফিসে ঘুষ দিয়া কেহ বলে — 'স্যার, এইটা রাখেন'। কেহ বলে — 'চা পানের খরচা দিলাম'। আবার অনেক

বেহায়া কর্মী দাঁত মেলিয়া বলিয়া থাকেন — 'আমরা কিছু পাইয়া থাকি'! ঘুষ-গ্রহীতার যেমন ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স বাড়ে, তেমনই ঘুষদাতা কয়েকগুণ বেশি সুবিধা আদায় করেন। কিন্তু, 'ঘুষ'শব্দটির যে কী দুর্ভাগ্য, মুখে উচ্চারণ করিতে সকলেরই যেন শরম! কংগ্রেসও 'ঘুষ' না বলিয়া 'বেকারভাতার ফরম' এবং 'ঋণ মকুবের কার্ড' বলিতেছে, — ইহাই কি কহিতে চাও?

— কী করিবে গিন্নি, গ্রহণ করিবার লোক আছে বলিয়া ঘুষ দেওয়ার লোকও থাকে। গিলিবার লোক আছে বলিয়া টোপ দিবার লোকও থাকে। 'মৃত্যুর হাতছানি' বুঝিতে পারিলে মাছেরা কি বঁড়শির টোপ গিলিত? গত কয়েক দশক ধরিয়াই দেখিতেছি নদীর এই পারে জনগণ বা নির্বাচকমণ্ডলী আর ওই পারে বসিয়া কংগ্রেস টোপ-লোভ আর প্রলোভনের বঁড়শি জলে ফেলিতেছে। জনগণ প্রলুব্ধ হইয়া কোনও কোনও রাজ্যে জলে ঝাঁপায়, কোথাও অবজ্ঞা করে। আবার কখনও কখনও টোপ-লোভে কাজ না হইলে নির্বাচনে বুথ-দখল, গণনা জালিয়াতি অথবা বিচ্ছন্নতাবাদী -মাওবাদী-কামতাপুরি জঙ্গি-বন্দুক কিংবা একসঙ্গে সব পথই অবলম্বন করে। কেবল ঘুষে হইবে না বুঝিলেই ঘুসোঘুসি, রক্তারক্তি, দাঙ্গা-ফ্যাসাদ ইত্যাদি গণতান্ত্রিক দাওয়াই(!) প্রয়োগ করা হয়।

কিন্তু গিন্নি, সমস্যা অন্যত্র। কংগ্রেসের বেকারভাতার ফরম কিংবা ঋণ মকুবের কার্ড তো ঘুষ নহে, নির্জলা ভাঁওতা। ঘুষ-এ গ্রহীতা কিছু না কিছু পায়। এখানে বেকার বা কৃষকরা তো কিছুই পাইবেন না! কেন এই কথা বলিলাম? বুঝাইতেছি।

ধরা যাক, ত্রিপুরায় এইবার ভোটে কংগ্রেস -আই এন পি টি-র জোট জয়লাভ করিল। সরকারও গঠন করিল। নতুন সরকার যদি বেকারভাতা দিতে চায় কিংবা ঋণ মকুব করিতে চায়, সে কি এই কথা বলিতে পারিবে যে — নির্বাচনের আগে যাহারা কংগ্রেসের দেওয়া বেকারভাতার ফরম পূরণ করিয়াছিল, কেবল তাহারাই বেকারভাতা পাইবে, অন্যরা পাইবে না? এইরকম কথা কোনও সরকার বলিতে পারে? কখনই বলিতে পারে না। বেকারভাতা দিতে হইলে যে কোনও সরকারের নিয়মনীতি প্রণয়ন করিতে হইবে, বেকারদের নিকট হইতে আবেদনপত্র আহ্বান করিতে হইবে। একই কথা ঋণ মকুব কার্ডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ভোটের আগে পূরণ করা কোনও দলের বিলিকৃত ফরম বা কার্ডের কোনও মূল্যই নাই। বেকার ছেলেমেয়ে বা কৃষকদের জন্য দরদ থাকিলে (কংগ্রেসের এমন বদনাম নাই!) কোনও দল ভোটের আগে বলিতেই পারে — আমরা সরকারে আসিলে বেকারভাতা দিব, ঋণ মকুব করিব। এমনকী নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতি ছাপাইতেও পারে। কিন্তু হাস্যকর এই 'ফরম' বা 'কার্ড' বিলি করিবার অর্থ কী? ভাঁওতা ছাড়া ইহাকে আর কী বলিব?

শুন গিন্নি, এই বেকারভাতা আর ঋণ মকুব-এর ধ্বনিটাও কংগ্রেস চুরি করিয়াছে কম্যুনিস্টদের

ঝোলা হইতেই। কম্যুনিস্টরাই যুগ যুগ ধরিয়া এই দাবিতে চিৎকার করিয়াছে, পোস্টার মারিয়াছে। কেন্দ্রের এবং ত্রিপুরার কংগ্রেস সরকারগুলি ইহার চূড়ান্ত বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে। আজ অবধি দেশের কোথাও কোনও কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে বেকারভাতা চালু হয় নাই। কেন্দ্রও কাজের অধিকার-কে সংবিধানে 'মৌলিক অধিকার' হিসাবে স্বীকার করিতে রাজি হয় নাই। বরং শুনিয়াছি, কম্যুনিস্টদের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে এখনও কাজের অধিকার সকলের সাংবিধানিক অধিকার। শিক্ষান্তে ইচ্ছুক প্রার্থীকে কাজ দিতে না পারিলে রাষ্ট্র বেকারভাতা দিতে বাধ্য। ইহার পরেও অনির্দিষ্টকাল বেকারভাতা দিলে চলিবে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও বেকারকে কাজ দিতে না পারিলে, সেই বেকারটি নাকি সরকারের বিরুদ্ধে মামলাও করিতে পারেন। এই দেশেও সেই ভাবনা হইতেই বোধহয় কম্যুনিস্টরা বেকারভাতার দাবি তুলিয়াছিলেন, ভোটের জন্য নহে!

আর ঋণ মকুব? গিন্নি, কংগ্রেস নেতৃত্বে চলা কেন্দ্রের সরকার ২০১১-১২ অর্থ বছরেও ৬৬ হাজার ৮৩০ কোটি টাকা ঋণ মকুব করিয়াছে। কাহাদের ঋণ জানো? বড় পুঁজিপতি, শিল্পপতিরা ব্যাঙ্ক হইতে এই টাকা ঋণ নিয়া ফেরত দিতে চাহিতেছেন না। তাই, তাহাদের আর বিরক্ত না করিয়া ঋণ মকুব করা হইয়াছে! প্রতি বছরই এই রকম বিশাল অঙ্কের ঋণখেলাপি ধনীদের ছাড় দেয় আমাদের সদাশয় কেন্দ্র সরকার। ত্রিপুরায় জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কগুলিতে মোট আমানতের মাত্র ৩৩ ভাগ ঋণ দেওয়া হয়। তাহার মধ্যে কৃষক ও গ্রামীণ গরিবদের ভাগে ১০-১১ শতাংশের বেশি যায় না। সব মিলাইয়া পাঁচশো কোটি টাকার বেশি হইবে না। ২০০৮-এর আগের কোনও ঋণ আর বকেয়া নাই এই রাজ্যে। অর্থাৎ, সেই অর্থে কোনও ঋণখেলাপিও নাই। ভুল বুঝাইয়া ঋণ কার্ড বিলির একমাত্র উদ্দেশ্য ভোট-বৈতরণী পার হওয়া। তাই, 'ফরম' আর 'কার্ড'-এর বাগাড়ম্বরের ভিতরে সারবস্তু বলিতে কিছুই নাই। ইহা ঘুষ বা উৎকোচও নহে। সেরেফ ভাঁওতা। বুঝি না, কংগ্রেস এইবার এত আগে হইতে এত পাঁয়তারা কষিয়া, এত লম্ফঝম্ফ করিয়া শেষকালে এইরকম কাঁচা মাছ পাতে পরিবেশন করিতেছে কেন! ত্রিপুরার মানুষ কি কাঁচা মাছ খান?

(প্রকাশ ঃ ২৪.১২.২০১২)

জাদু-ঘট!

বুঝিলে গিন্নি, এ যেন পি সি সরকারের জাদু! ওয়াটার অব ইন্ডিয়া! আহা-হা-হা! যতবার জল ঢালিয়া শূন্য কর, কলসি আবার পূর্ণ! গিন্নি, তোমার পরামর্শ ছিল, ছোট্টমোট্ট ঘট-আকৃতি কলসিখানা কোনওক্রমে রাখিয়া দিতে পারিলে ওয়াটার সাপ্লাই দপ্তরের শত-কোটি সাশ্রয় হইবে। সরকার শুনে নাই। কিন্তু, এখন মনে হইতেছে পি সি সরকার তাঁহার জাদু-ঘটখানা বিরোধী কংগ্রেস দলের হাতে গোপনে থুইয়া গিয়াছেন। জলের বদলে কংগ্রেস সেই ঘটের ভিতরে ' ৮হাজার নামের অভিযোগ' ঢুকাইয়া লইয়াছে। যতবার ওই '৮ হাজার ভোটার' লইয়া কমপ্লেন-এর নিষ্পত্তি হয়, ততবার ঘট উপুড় করিলেই ' ৮ হাজার কমপ্লেন' পড়িতে থাকে! কমপ্লেন কখনও শেষ হয় না। 'ওয়াটার অব ইন্ডিয়া' নহে, " ভোটার্স লিস্ট কমপ্লেন অব কংগ্রেস"!

আইজ্ঞা হ্যাঁ! ভোটার তালিকা। গত ১৯ অক্টোবর ভোটার তালিকায় নাম তোলা কিংবা বাদ দেওয়ার কর্মসূচি একবার শেষ হইল। প্রকৃত ভোটার নহে কিংবা একাধিক স্থানে নাম উঠিয়াছে এমন লোকদের সম্পর্কে আপত্তি এবং নতুন নাম তুলিবার দাবি বিষয়ে শুনানি নিষ্পত্তির শেষ তারিখ ছিল ২ নভেম্বর। কংগ্রেস বলিল — সকলে শুনানিতে আসিতে পারে নাই। আট হাজার 'ভুয়া' ভোটারের নাম রহিয়া গিয়াছে। নির্বাচন কমিশন ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত শুনানির সময় বর্ধিত করিল। দিল্লির নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকরা দুই দফায় আসিলেন। জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায় ঘুরিলেন। কংগ্রেসের ঘট উপুড় করিয়াও দেখা হইল। শেষে রাশি রাশি সাদা কাগজ বাহির হইল! তাহাও পরীক্ষা করা হইল। সত্যতা মিলিল না!২৮ নভেম্বর স্বয়ং উপ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বিনোদ জুৎসি আগরতলায় আসিলেন। সব দলের সঙ্গে বৈঠক করিলেন। রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে সন্তোষও ব্যক্ত করিলেন। মজার ব্যাপার হইল, বিনোদ জুৎসি আসিবার দুই দিন আগে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সুদীপ রায়বর্মন হঠাৎই রাজ্য ছাড়িয়া দিল্লি পাড়ি দিলেন। জুৎসি চলিয়া যাইতেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন— দিল্লিতে '৮ হাজার অভিযোগ' জমা দিয়া আসিয়াছি!

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আবার দিল্লি হইতে চার (প্রথমে তিন, পরে এক) পর্যবেক্ষক আসিলেন। ঘুরিলেন, দেখিলেন পরীক্ষা করিলেন। ফিরিয়া গিয়া রিপোর্ট দিলেন — 'ত্রিপুরায় ভোটার তালিকার কাজ সন্তোষজনক'! কিন্তু, হইলে কী হইবে? কংগ্রেসের হাতে যে জাদু-ঘট! ১৯ ডিসেম্বর কংগ্রেস রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক আশুতোষ জিন্দালকে বলিল — '৮ হাজার ভোটার সম্পর্কে অভিযোগ' আছে। দুই দিন পর আবার দিল্লি গিয়া, জাদু-ঘট উপুড় করিয়া '৮ হাজার অভিযোগ' ঢালিয়া দিয়া ২৩ ডিসেম্বর রাজ্যে ফিরিলেন প্রদেশ সভাপতি।

এইবার ঝোলা হইতে বিড়াল বাহির হইল। ভোটার তালিকা-ফালিকা নহে। যেনতেন বিধানসভা নির্বাচন পিছাইয়া 'রাষ্ট্রপতির নামে' দিল্লির শাসনে ভোট করিতে চায় কংগ্রেস। কোনও রকমে ২০-২৫ উঠিতে পারিলে বাকিটা ৮৮-র কায়দায় গণনাকেন্দ্রে সশস্ত্র হামলা করিয়া ৩১ করিতে ঝাঁপানো যাইতে পারে! কিন্তু, পথ কই? 'যেমন শ্রীরাধা কাঁদে ...তেমনি করে কাঁদি আমি পথের লাগি..'। বাংলাদেশের ঘাঁটিতে জঙ্গি-বান্ধবেরা বন্দুক কাঁধে লেফট-রাইট করিতে করিতে ক্লান্ত! সীমান্ত পার হইয়া রাজ্যে ঢুকিতে পারিতেছে না। পারিলে ৮৮-র মতন গণনিধন ঘটিতে পারিত। সেনা উপদ্রুত আইন বা সেইরকম কিছু। সেইবার এত কিছু করিয়াও ২৭-২৮ পর্যন্ত হইয়াছিল। গণনাকেন্দ্রে মজলিশপুর, গোলাঘাটির ফল উল্টাইয়া তবে ৩০ হয় (৫৯ আসনের নির্বাচনে)! কিন্তু, এইবার? জঙ্গাল-বান্ধবেরা না পারিলে কী হইবে! মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের মূর্তি সাধে কি পোড়াই দাদা? সকলে ভোট লইয়া ব্যস্ত। আর মুখ্যমন্ত্রী কিনা রইস্যাবাড়ি হইতে কাঞ্চনপুরের সীমান্তে-সীমান্তে বি এস এফের পিঠ চাপড়াইতে ছুটিয়া যান! কেন রে ভাই? জঙ্গিরা রাজ্যে ঢুকিতে না পারিলে যে আমাগো খেল খতম — এই সাদা কথাটাও বুঝ না দাদা?

বুঝি বই কী! তাই তো এখন কংগ্রেসের নতুন ধ্বনি— রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকও নিরপেক্ষ নহেন। আই এ এস-টি সি এস অফিসার ই-আর-ওরা সকলেই সি পি এমের 'চামচা'! ইহাদের সকলকে ঘেরাও কর! গন্ডগোল কর, যে-কোনও গন্ডগোল! কোনও মতেই ১২ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করিতে দিয়ো না। নির্বাচন কমিশন বলিয়াছে, ১৬ মার্চের আগেই নতুন বিধানসভা হইবে। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়েই ভোট। বলিলেই হইল? দরকার হইলে কমিশনকেও ঘেরাও করিব!

হায়রে হায়, জাদু-ঘট বারবার উল্টাইলে একঘেয়ে লাগে। লোকের বিশ্বাস হইতেছে না। দিল্লি কান মলিয়া বলিয়া দিয়াছে, 'রাষ্ট্রপতি শাসন চাই' কহিয়ো না বাছা-রা! বড়ই 'অগণতান্ত্রিক' শুনায়। দিল্লির বড়ই দুর্দিন। প্রবল শীত। চারিদিকে কু-আশা! ১৪-তে কোথায় হোঁচট খাইয়া কে কাহার কান্ধে কাৎ হইয়া পড়িবে, কাহার পাযে মাথা ঠুকিবে কেহ বলিতে

পারে না। তাই প্রদেশ নেতারা কান ঢাকিয়া বলিতে শুরু করিয়াছেন—'রাষ্ট্রপতি শাসন চাই না (হইলে মন্দ হইবে না)!' নেতারাও জানেন, ত্রিপুরার মতন স্বচ্ছ ভোটার তালিকা দেশের কোথাও আজ অবধি প্রস্তুত হয় নাই। কমিশনও বলিয়াছে — 'ত্রিপুরায় ১০০ ভাগ সচিত্র পরিচয়পত্র, সচিত্র ভোটার তালিকা সম্পন্ন হওয়া এক অনন্যসাধারণ ঘটনা'। উপ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জুৎসি সাহেব বলিয়া গিয়াছেন — ইন্টারনেটে ত্রিপুরার সমস্ত ভোটারের নাম, ঠিকানা, ছবি, বুথ নম্বর ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় রহিয়াছে। এমনটি দেশের কোথাও এখনও সম্ভব হয় নাই। পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তে বসিয়া ইন্টারনেটে ত্রিপুরার ভোটারদের সবকিছু জানা সম্ভব। স্বচ্ছতা আর কাহাকে বলে? বাম আমলে নির্বাচন? বরাবরই উৎসবের মতন। স্বচ্ছ, অবাধ, শান্তি-সম্প্রীতিপূর্ণ। ত্রিপুরায় কংগ্রেস-টি ইউ জে এসের জোট আমলেই কেবল নির্বাচন কলঙ্কিত হইয়াছিল, জনগণের ভোটের অধিকার লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা সকলের মতন কংগ্রেস নেতারাও বিলক্ষণ জানেন, বুঝেন। কিন্তু কী করিবেন? তাঁহাদেরও তো অনেকের এইবারই শেষ চান্স। বয়সও হইয়াছে, হইতেছে। 'আর কি হবে মানব জনম, ভাঙিলে মাথা পাষাণে'!

২৫ ডিসেম্বর ছিল বড়দিন। পারতপক্ষে কেহ সেদিন মিথ্যা বলে না। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর প্রশান্ত মুখখানা মনে ভাসিয়া বাধা দেয়। সেকেরকোটের নিউমার্কেট কমপ্লেক্সে সেদিনই পুত্র প্রদেশ সভাপতিকে পাশে বসাইয়া প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীররঞ্জন বর্মন দলীয় সভায় বলিলেন, 'ভোটার তালিকা ঠিক হইলে ৪৯ আসন পাইব। না হইলেও এখনই ৪৩ নিশ্চিত।' অর্থাৎ, রাজ্যে মোট ২১-২২ লক্ষ ভোটারের মধ্যে মাত্র ৮ হাজার ভোটারের গন্ডগোল 'ঠিক' করিলেই ৬টি আসন বাড়ে? ওরে বাপরে! চিন্তা-চরণের নিরেট ঘিলুতে এই পাটিগণিত ঢুকে নাই। কেবল, ভাবিতেছি, দিল্লির নির্বাচন কমিশন নিশ্চয়ই এহেন সরল পাটিগণিত জলবৎ তরলম বুঝিতেছে! নহিলে কংগ্রেসের ঘট-জাদু তাহাদের কাছ এত আমল পাইতেছে কেন! কেন তাহারা গণতন্ত্রপ্রিয় ত্রিপুরাবাসীকে ধোঁয়াশায় রাখিতেছেন! নেপথ্যে অন্য কেরামতি নাই তো? থাকিলেও কি শেষ রক্ষা হইবে? চিন্তা-গন্নি পত্রিকায় সমীরবাবুর সত্যভাষণে বড়ই বিহ্বল। শুধাইলেন, হ্যাঁ গা — প্রাক্তন জোট মুখ্যমন্ত্রী কি আবার দল বদল করিয়া বামফ্রন্টে যোগ দিয়াছেন? ৪৯ পাইবেন বলিতেছেন কিনা ...!

(প্রকাশ: ৩১.১২.২০১২)

২০১৩

দাদাভাইকে

দাদাভাই --দণ্ডবত!

হঠাৎ আপনাকে ভীষণ গম্ভীর দেখিয়া ভীষণ উদ্বেগে এই পত্র লিখিতেছি। না না, আজ আপনাকে বেশি বিরক্ত করিব না। মধ্য অংকে আপনার নাটকে এখন ঘোর সঙ্কট উপস্থিত। নাট্য-দলের কুশীলবেরা এতদিনের মুখস্থ ডায়লগ আর বলিতে চাহিতেছে না। আপনার রচিত 'ভোটার-তালিকা' নাট্য-পাণ্ডুলিপি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তাহারা এখন 'প্রার্থী-তালিকা' নামক আসল নাটকের আসল ডায়লগ বলিতেছে! নায়কের পোশাক টানিয়া খুলিয়া আপনাকে কিনা 'ভিলেন'-এর পোশাক পরাইতেছে! ছি!

আসল প্রার্থী-তালিকা এখনও বহু দূর! শুনিয়াছি, খসড়া তালিকা-র খসড়া ম্যাডামের টেবিলে। দিল্লিতে কাটাকুটির সত্য-মিথ্যা খবরে রাজ্যে আপনার (নাট্য) দলে কাটাকাটি লাগিবার জোগাড়। কোথাও কংগ্রেস ভবনে তালা, কোথাও 'সম্ভাব্য' কং-প্রার্থীর গাড়ি ভাঙিয়া গুঁড়া-গুঁড়া, কোথাও লাঞ্ছনা, কোথাও মারধর, বিক্ষুব্ধদের সাংবাদিক সম্মেলন, এক সম্ভাব্য-র নামে আরেক সম্ভাব্য-র 'চোর-খুনি- বদমাশ-অস্ত্র চালানকারী' ইত্যাদি মহা-বিশেষণ প্রয়োগ চলিতেছে। 'ভোটার-তালিকা' নাটকের ক্লাইম্যাক্স-দৃশ্য ই-আর-ও অফিস ঘেরাও, 'আবার ঘেরাও'-এর বদলে এখন গাড়ি-বোঝাই-কংগ্রেসিরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবন 'ঘেরাও' করিতেছে। আপনার সন্ধানে এম এল এ হস্টেলেও হামলা করিতেছে! এই ব্যস্ত সময়ে আপনাকে বিরক্ত করিয়া লাভ নাই। কংগ্রেসিরাই কংগ্রেস-সভাপতিকে 'মিঠা আলোচনার জন্য' খুঁজিতেছে, অকাতরে অবিরাম খিস্তি-বাক্য ছুঁড়িতেছে! 'নাপিতের পুত' চিন্তা আপনাকে পাইবে কোথায়!

দাদাভাই – ইয়ে তো হোনা-হি থা! কংগ্রেসে ইহাই দস্তুর। আপনি বা আপনারা ইহা আলবত জানেন। কেবল থিওরিতে নহে, রীতিমতো প্র্যাকটিসেও মানেন। তবে? আপনি আচমকা এত গম্ভীর কেন দাদা? দিল্লি হইতে লাল-দা সমেত ফিরিয়া আসিলেন গম্ভীর মুখে। অন্য নেতারা বুঝিতেই পারিলেন না—কী ঘটিল! দলের 'প্রার্থী নির্বাচন কমিটির' চেয়ারম্যান বীরজিৎ সিন্‌হাও কিছু ঠাহর করিতে পারিলেন না। আপনি এবং লাল-দা গম্ভীর। যেন –

আপনারা বড়ই দুঃখিত! যেন– কী চাহিয়াছিলেন আর কী হইল! যেন–কাহাকে আপনারা প্রার্থী করিতে চাহিয়াছিলেন আর কাহাকে দিল্লি হইতে চাপাইয়া দেওয়া হইল! এবং, যেন– দিল্লি চায় না বলিয়াই কিছু কবিতে পারিতেছেন না, পারিলেন না। আ হা-হা, কিশোর কুমারেব কবুণ সঙ্গীত মনে পড়িতেছে, "ও গো নিরুপমা করিয়ো ক্ষমা ... পারিলাম না যেন কিছুতেই!"

দাদা গো, নাকি সবটা আপনারই সযত্ন-রচিত নাটক? নাটকের ভিতরে আরেক নাটক? কোন কেন্দ্রে কাহাকে টিকিট দিলে কে বিদ্রোহ করিবে আপনি জানেন। কে কতটা হইচই করিবে, আবার কাহাকে কতটা নগদ সান্ত্বনায় শান্ত করা কঠিন হইবে না– বিলক্ষণ জানেন। এমনকি, কোথায় প্রথম 'সম্ভাব্য' হিসাবে অন্য একটি নাম ছড়াইয়া দিয়া 'তুমুল বিক্ষোভ' করানো যাইবে এবং পরে তাহাকে বাতিল করিয়া 'আসল লোক'-কে টিকিট দেওয়া সহজতর হইবে- ইহাও আপনার নখদর্পণে। ব্লকস্তরের কত নেতা, কত হবু-নেতা বা কর্মী-সমর্থক কংগ্রেসের এই টিকিট-বন্টনের মায়া-খেলায় ধনে মানে সর্বস্বান্ত হইয়াছেন বলিয়া শুনি, এইগুলি কি মিথ্যা দাদাভাই?

শনিবারের 'বারবেলায়'-ও আপনি গম্ভীর। রাজ্য অতিথিশালাতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সহিত দেখা করিয়া বাহিরিলেন সেই গম্ভীরমুখে! নির্বাচন পিছানোর দাবি করিলেন না। ভোটার তালিকায় 'হাজার হাজার ভুয়া নাম' আছে বলিয়া এতদিন কর্মীদের তাতাইয়াছেন। 'বিশুদ্ধ' না করা পর্যন্ত ভোট হইবে না বলিয়াছেন। এমনকি, কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা বেশির ভাগই বিশ্বাস করিতে শুরু করিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করিয়াই ভোট হইবে। ভোটের আগেই বাম সরকার হটানো হইবে। কারণ, দাদাভাই – আপনিই বারে বারে ভাষণ দান করিতেছিলেন- 'যা যা করিবার সবই করিব। সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার হইতে দিব না।" এখন, নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ-এর সামনে গিয়া সেই ফেব্রুয়ারিতেই ভোটের দাবি করিলেন কেন? বাহির হইবার সময় এত গম্ভীর থাকিয়া কী বুঝাইলেন? নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাইকমান্ডের ইচ্ছাতেই এইরকম দাবি করিতে হইয়াছে – এই কথা বুঝি বুঝাইতে চাহিলেন!

কেয়া বাত দাদাভাই! আপনি ত্রিপুরার কংগ্রেসি তারুণ্যের মুক্তিসূর্য! কোনও তাবড় নটসূর্যও নাট্যাভিনয়ে আপনার ধারে কাছে আসিতে পারিবেন না। দিল্লি যেমন জানে, আপনিও জানেন যে, ত্রিপুরার জনমানসে মানিক সরকারের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের কোনও বিকল্পের স্থান নাই। এখনও নাই। জানেন বলিয়াই আপনি অংক করিবার আগেই অংকের ফলটা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "দিল্লি ৮৮-র মতন ভূমিকা না লইলে ত্রিপুরার সি পি এম সরকারকে কিছুতেই হটানো যাইবে না।" ৮৮-তে কেন্দ্রীয় সরকারের

ভূমিকা যে চরম অগণতান্ত্রিক ছিল এই বিষয়ে দেশে বোধকরি কাহারও সন্দেহ অবশিষ্ট নাই। ২০১৩-তে সেই ভূমিকা অসম্ভব না হইলেও খুবই কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ। মিডিয়ার ব্যাপক প্রসারও একটি কারণ। সবই আপনি জানেন বুঝেন দাদাভাই। তবুও 'পরিবর্তন'-এর তর্জন-গর্জনে দর তুলিয়াছেন। 'প্রার্থী -তালিকা'-র গোপন পাণ্ডুলিপি ঢাকিয়া রাখিতে 'ভোটার-তালিকা' নাটকের দরকার ছিল। এখন আর দরকার নাই। আসল দেনাপাওনা সমাধা হইয়াছে। সব দোষ দিল্লির ঘাড়ে ঠেলিয়া 'আমি কী করিতে পারি' বলিবার পথ খুলিতেছেন। কেয়া বাত ! কেয়া বাত !

দাদাভাই, লড়াই এখনও বাকি। ভোটের তারিখ শীঘ্রই ঘোষণা হইয়া যাইবে। ফেব্রুয়ারিতেই ভোট। ১৬ মার্চের মধ্যে নতুন বিধানসভা। বলিয়াছে কমিশন। লড়াইয়ে অনেক সামনে বামফ্রন্ট। জয়ের ব্যাপারেও তাহারা নিশ্চিত। কংগ্রেসের লাখো কর্মী-সমর্থক আবারও আশাহত, ক্ষুব্ধ। ২০০৮-এ আপনার পিতা-র নেতৃত্বে দল গো-হারা হারিয়াছিল। এইবার আপনার সেনাপতিত্বেও হারিবে। কেবল হারের 'হার' বা শতাংশটা কিছু হ্রাস করিতে পারিলেই আপনি 'সফল'! মুখে গাম্ভীর্য আবশ্যক হইলে থাক, হৃদ্‌মাঝারে আনন্দ রাখিতে বাধা নাই। এই ভোটই তো শেষ ভোট নহে! বুঝি দাদাভাই, বুঝি! কংগ্রেসের প্রার্থী যত কম জিতিবে ততই আখেরে ভাল। 'সিটিং' বিধায়করা তো টিকেট পাইবেনই। নড়চড়ের সম্ভাবনা বড় বেশি থাকে না। যত বেশি আসনে 'ডিফিট', পাঁচ বছর পরে তত বেশি দরদামের সুযোগ আসিবে। অর্থাৎ বর্তমান-এর সহিত ভবিষ্যতেরও গ্যারান্টি রহিল! নাটক জিন্দাবাদ!

(প্রকাশ: ০৭.০১.২০১৩)

১৪ ফেব্রুয়ারি

ভোট ১৪ ফেব্রুয়ারি। ঘোষণামাত্র ডিগবাজি খাইলেন বিরোধী নেতা। দিল্লি হইতে দূরভাষে কহিলেন, কংগ্রেস খুশি। আমরা এই সময়েতেই ভোট চাহিয়াছিলাম!

পত্রিকায় খবর পড়িয়া চিন্তা-গিন্নির হাঁচি উঠিল। সেই বিশ্ব-বিকট হাঁচি আর থামে না। আউটডোরের ডাক্তার কহিলেন, অ্যালার্জি! কিন্তু কীসে অ্যালার্জি? সংবাদপত্রে না রতনলালে? নাকি ডিগবাজিতে? শেষেরটিই সত্য ধরিয়া এখন টিভিতে ব্যাট-বল দেখাও স্থগিত গিন্নির। কে জানে ধোনি -রা কে কখন উইকেটের পিছনে ডিগবাজি খাইবেন!

কংগ্রেস খুশি? তবে যে ভোট পিছাইতে বলিয়া আসিতেছিলেন দলের নেতারা? দফায় দফায় কত দাবি, কত ডেপুটেশন! কেহ কেহ ১৬ মার্চের পরে রাষ্ট্রপতি শাসনেও ভোটের দাবি করিতেছিলেন। এমনকী, নির্বাচন কমিশন ১১ জানুয়ারি ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করিবার আগের দিন, ১০ জানুয়ারিও ভোট পিছানোর দাবি! দিল্লিতে এ আই সি সি-র সাধারণ সম্পাদক ফেলেইরোর নেতৃত্বে রতন চক্রবর্তী, আশিস সাহা, সুবল ভৌমিকরা নির্বাচন কমিশনে গিয়া ত্রিপুরার ভোট পিছাইতে বলেন। 'নির্ভুল' না হওয়া তক্ ভোটার তালিকা প্রকাশ না করিতেও দাবি জানান। কিন্তু ১২ জানুয়ারি পূর্ব ঘোষণা মতনই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হইল! ইহার পূর্বে প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা সাংবাদিক সম্মেলন করিয়াই কমিশনকে গালমন্দ করেন। নির্বাচন কমিশন ত্রিপুরায় নাকি পিকনিক করিতে আসেন। সবাই অবাক হইলেও দিল্লি হইতে ফিরিয়া প্রদেশ সভাপতি এবং বিরোধী নেতা হঠাৎই ১৪ ফেব্রুয়ারির পরে ভোট করিবার দাবি জানাইয়াছিলেন। কেবল সি পি এম তথা বামফ্রন্ট আগাগোড়াই ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি ভোট চাহিয়া আসিতেছিলেন। তাহাই তো ঘোষণা হইল। এখন ডিগবাজি খাইয়া এই সব কী বলিতেছেন রতনলাল!

চিন্তা-গিন্নি কহিলেন, কংগ্রেসের খুশি-অখুশিতে কী হইবে! নেতারা আগেই জানেন যথাসময়েই ভোট হইবে। দলের কর্মী-সমর্থকদের দৌড় করাইতে ভোটার তালিকা লইয়া হই-হুল্লোড়। এখন এই চালাকির পালা শেষ। কেবল প্রার্থী তালিকা 'শেষ হইয়াও শেষ হইতেছে না'। দলের কর্মীরা নেতাদের আদ্যশ্রাদ্ধ করিতেছেন। দলের পতাকা, দলের অফিস, প্রচারসজ্জায় আগুন দিয়া গা গরম করিতেছেন। কিছু দিন চলিবে। ইহার পর সবাই ফিরিবেন নিজ কর্মে!

– কিন্তু গিন্নি, দুই শিবিরের দুইটি প্রার্থী তালিকা প্রকাশে কী বিপরীত দৃশ্য! বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা বাহির হইবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে সারা রাজ্যে অভিনন্দন জানাইয়া শত শত মিছিল বাহির হইল। একটি জায়গাতেও বামফ্রন্টের একজন কর্মী-সমর্থকও কোনও প্রার্থী লইয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিল না। ইহা কোন মন্ত্রবলে? নিদারুণভাবে লোভ-চালিত দুনিয়ায় বামপন্থী আদর্শের এখনও এত শক্তি? সেই শক্তির জোরেই এত নিখাদ একতা সম্ভব? বামপন্থার প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইবার জন্য কেবল ইহাই কি যথেষ্ট নহে?

– গিন্নি, দিশাহীন কংগ্রেসকে প্রতিদিন যাহারা 'হেডলাইন' সরবরাহ করিয়া দিশা দেখাইতে সচেষ্ট, তাহাদের দোষ দিয়ো না। তাহারা সাধ্যমতো করিতেছেন। সোনামুড়া কেন্দ্রে সুবল রুদ্রের জায়গায় সি পি এম এইবার শ্যামল চক্রবর্তীকে প্রার্থী করায় ইহারা 'পাইছি রে পাইছি' বলিয়া ঝাঁপাইলেন। আপন প্রতিভা অনুযায়ী রন্ধন করিয়া চমকদার 'হেডলাইন'-পরিবেশন করিলেন। কিন্তু, সুবল রুদ্র যে সেই দিনই নিজে শ্যামলকে লইয়া বাড়ি-বাড়ি প্রচারে যাইবেন কে জানিত! দিশাদাতাদের বড়ই বে-দিশা করিয়া বামপন্থী শৃঙ্খলার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন সুবল রুদ্র।

– হ্যাঁ গা, দুইটি প্রার্থী তালিকার দুইটি প্রধান নাম কী? গিন্নির গুগ্‌লি জিজ্ঞাসা। কহিলাম, বামফ্রন্টের তালিকায় প্রধান নামটি সবাই জানে, মানিক সরকার। রাজ্যের জনপ্রিয়তম মুখ্যমন্ত্রী। আর, কংগ্রেস – আই এন পি টি-র তালিকায় প্রধান নাম? কেহই জানে না। কৃষ্ণ কেমন- যাহার মনে যেমন! গিন্নি কহিলেন, আমি জানি। সমীররঞ্জন বর্মন, অথবা সুদীপ বর্মন, কিংবা বীরজিৎ সিন্‌হা, নতুবা রতনলাল নাথ, হয়ত বা সুরজিৎ দত্ত বা গোপাল রায় অথবা বিজয়কুমার রাঙ্খল! জোট আমলের পাঁচ বছরে ছিলেন দুই মুখ্যমন্ত্রী, ভবিষ্যতে পাঁচ বছরে সাত মুখ্যমন্ত্রীতে কুলাইবে কি না, কেবল ইহাই নিশ্চিত বলিতে পারিতেছি না! চিন্তা-র মনে হইল, তালিকা কমপ্লিট হয় নাই। মহিলা, তফসিলি জাতি, ওবিসি এবং মাইনরিটি (মুসলিম) কোটা-র দাবি উঠিতেই পারে। তাহা হইলে আরও চারটি নাম বাছিয়া রাখিতে হইবে!

গিন্নি কহিলেন– যাহাই বল নির্বাচন কমিশন বড়ই বেরসিক। আগের দিন ভোট হইলে, পরদিন সরস্বতী পূজায় শাড়ি পরিয়া তোমার আইবুড়া কন্যারা ভাবী বর ধরিতে পথে বাহির হইতে পারিবে। অসুবিধা নাই। কিন্তু ১৪ ফেব্রুয়ারি যে 'ভ্যালেনটাইন্স ডে' বা পিরিতি-দিবস, এই কথা কেহ মনে রাখিল না? সরস্বতী পূজায় পাত্র-শিকার (!) এখন ব্যাক-ডেটেড। এখন সকলেই ভ্যালেনটাইন। জঙ্গালের চার্চ-প্রভাবিত জঙ্গিরা তো বটেই। হয়ত তাহাদের খুশিতেই কংগ্রেস খুশি! এই 'পিরিতি পিরিতি বিষম পিরিতি' এইবারের 'পিরিতি দিবস'-এ কংগ্রেসকে নতুন কী সুখ দিতে পারে? তবুও কংগ্রেসের পৌষ-মাস – জনতার সর্বনাশ। অতএব আমজনতা সাবধান! সাবধানের মার নাই!

(প্রকাশ : ১৪.০১.২০১৩)

বাবু রতন চক্রবর্তীকে

শ্রীযুক্ত রতন চক্রবর্তী মহোদয় সমীপেষু,

সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। আপনার মন ভাল নাই। কাহারও কোনও পত্র পাঠের এক বিন্দু অভিপ্রায় নাই। জানি। কিন্তু কী করিব, চিন্তা-গিন্নি যে আপনার পরম ভক্ত, গুণগ্রাহী। দিবানিশি তাঁহার খোঁচা-নিপীড়ন আর সহিতে পারিতেছি না। তাই... । লোকে বলে, কংগ্রেসের রাজ্যপাট হইলে আপনি 'কিং' হইতে পারিতেন। কিন্তু, সেই সম্ভাবনা ধুলায় লুণ্ঠিত। সম্ভাব্য 'কিং' -কে বড়ই কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া চিন্তা-গিন্নি বিচলিত। আপনি কী বলিবেন, কী করিবেন বুঝিতে পারিতেছেন না। সুদীর্ঘকাল কংগ্রেসের সেবক থাকিয়া, বহু দুঃসময়ে দলকে নেতৃত্ব দিয়া, বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা-দুর্বিপাক পার করিয়া ২০১৩ নির্বাচনের মুখে ইহাই কি আপনার পাওনা ছিল? আপনি কেন, স্বপনেও এতখানি কেহ আন্দাজ করিতে পারে নাই। প্রথমেই নাম বাদ দিলে না হয় কিছুটা সম্মান বাঁচিত। আত্মমর্যাদার গৌরবে শির উন্নত করিয়া বিদ্রোহের ডাক দিতে পারিতেন। কিন্তু, ইহা কী ঘটিল! দলের 'চূড়ান্ত' প্রার্থী-তালিকায় আপনাকে খয়েরপুর কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করা হইল। প্রদেশ সভাপতি আপনাকে বামে বসাইয়া সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা দিলেন। মিডিয়ায় ছবি দেখিয়া পুলকিত চিন্তা-গিন্নিও। কিন্তু, দুই দিন পরই তালিকা আবার 'সংশোধিত' হইল। খয়েরপুরে হাঁটুর বয়সীকে প্রার্থী করা হইয়াছে। আপনার নাম নাই! খয়েরপুরে নাই, বনমালীপুরে নাই। কোথাও নাই! এমন অপমান, এতবড় মানসিক নির্যাতন, রাজনীতির ক্যারিয়ার এইভাবে ধুলিসাৎ করিবার ঘটনা কংগ্রেস দলে বিরল নহে। কিন্তু অজাতশত্রু রতন চক্রবর্তীর সহিত এমন হইবে এই কথা কে অনুমান করিয়াছিল!

রতনবাবু, আপনাকে এক সময় 'কংগ্রেস দলের মানিক সরকার' বলা হইত। হয়ত এখনও অনেকেই বলিয়া থাকেন। কারণ, আপনি সজ্জন, ভদ্রলোক। আপনি সুবক্তা। আপনি জোট আমলের মাননীয় তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী। কংগ্রেসে সবচেয়ে কম কলঙ্কিত আপনার নাম। আরও একটি কম-কলঙ্কিত নাম প্রাক্তন মন্ত্রী বিভা নাথের। তিনি আবার শুধু মহিলাই নহেন। প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রীও। এই তো, সেইদিনও দীপা দাশমুন্সিকে পাশে বসাইয়া 'নারী নির্যাতনকারী বাম সরকার'-কে তুলাধুনা করিয়া জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন রাজধানীতে। কী আশ্চর্য, দলের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকায় তাঁহার নামও বাদ। চিন্তা-গিন্নির

কথায়– আপনারা দুইজনই সেকেলে কংগ্রেসি! দলের পরিবর্তনের সহিত তাল মিলাইতে চূড়ান্ত ব্যর্থ। গান্ধীজির ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কংগ্রেস সোনিয়াজি-রাহুলজি-মনমোহনজিদের হাতে আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উমেদার কংগ্রেস! দলের আদর্শ এবং লক্ষ্য কেবল 'ক্ষমতা'। প্রায় মূল্যহীন ব্যক্তিগত সততা, নীতিনিষ্ঠা। ইহাদের জায়গা দখল করিয়াছে শঠতা আর দুর্নীতি। প্রকৃত মূল্যে ভদ্রতা-র নাম দাঁড়াইয়াছে 'ন্যাকামি'! যুক্তিপূর্ণ বাগ্মিতা-র স্থান লইয়াছে যথেচ্ছ কুৎসা, প্রলোভন, গলাবাজি আর পেশিশক্তির আস্ফালন। দলের সংগঠনে গণতন্ত্রের সুস্পষ্ট কাঠামো কখনই ছিল না, এখন আছে কেবল বারান্দাবাজি (লবিয়িং)! আপনারা সত্যই বড় সে -কেলে।

রতনবাবু, আপনি এবং বিভাদেবী যে সমস্ত গুণকে 'যোগ্যতা' ভাবিতেছিলেন, ভদ্রতা-বাগ্মিতা, লবিবাজি না করা, দিল্লির অলিন্দে উপঢৌকন না পাঠানো, এইগুলিই তো আপনাদের 'অযোগ্যতা' বা ডিস্‌কোয়ালিফিকেশন! এই এক সারি 'অযোগ্যতা'-র কারণেই আপনারা বাদ, বরবাদ। আরও একখান কারণ বোধহয় পর্দার আড়ালে ঘাপ্‌টি মারিয়া রহিয়াছে। রতন চক্রবর্তীকে কিছুতেই 'কংগ্রেসের মানিক সরকার' হইতে বা থাকিতে দেওয়া চলিবে না। 'সি পি এমের মানিক সরকার'-কে লইয়াই দাদা ল্যাজেগোবরে, ইহার উপরে কংগ্রেসেও যদি আরেক 'মানিক সরকার'-কে মোকাবিলা করিতে হয়, দাদার কপালে কী হইবে? অন্য দিকে, উপজাতিদের অন্তরে এখনও 'রাজভক্তি' সম্পূর্ণ অন্তর্হিত নহে। অতএব কোনও 'যুবরাজ' কিংবা 'মহারাজ'-কে সিংহাসনের দিকে গুটি গুটিও অগ্রসর হইতে দেওয়া হইবে না। সুতরাং, টিকিট-বঞ্চিত মহারাজের কানে দাদা-র বাণী ধ্বনিল, 'তোমায় এম-পি করিয়া দিল্লি পাঠাইব, অসুখী হইও না!' সত্যই আশা বড় কুহকিনী! কানমন্ত্র শুনিয়া 'রাজপুরীর অভাগা' চলিল পুনঃ ভিক্ষার সন্ধানে!

জানি রতনবাবু, আপনি 'মহারাজ' প্রদ্যোৎকিশোর নহেন, বিভা নাথ-ও নহেন। চরম অপমানেও আপনি ক্ষুব্ধ হইতে জানেন না, কেবল দেবদাসের মতন নীরব অভিমানে নিজেকে ক্ষয় করিতে পারেন। আপনার বুক ফাটে তবুও মুখ ফোটে না। ইহার পরেও রতনবাবু? আরও অপমান, আরও লাঞ্ছনা সহিতে থাকিবেন? দিল্লির লবিবাজ নেতাদের টেলিফোন-মলমে আপনার বেদনা উপশম হইয়া গিয়াছে? আপনার হৃতমান সমর্থক, আপনার ব্যথিত-ক্ষুব্ধ অনুগামীদের কথা একবার ভাবিবেন না? আপনার গুণগ্রাহী চিন্তা-গিন্নির কথা একবার বিবেচনা করিবেন না? কংগ্রেস এই নির্বাচনে দুই অংকের আসন পাইবেই এমন গ্যারান্টি দাদাদের চিত্তেও নাই। খয়েরপুরে, বনমালীপুরে আপনার কয়েক শত কর্মী-সমর্থক বামফ্রন্টে যোগ দিয়া নতুন আত্মমর্যাদায় উদ্ভাসিত। কিন্তু আপনি রতনবাবু? কংগ্রেসে আপনি যে আজ বড়ই বেমানান। কী করিবেন? এই কংগ্রেসে আরও? জানিবার প্রত্যাশায় ইতি ...

(প্রকাশ : ২৮.০১.২০১৩)

কল্কি-টা কাহার!

লোকটির পকেটে মিলিল গাঁজা-র কল্কি। বাম হাতের তালুতে গাঁজা টিপিবার দাগ। কিন্তু, পুলিসের ধমকে সে কহিল, 'স্যার – আমি গাঁজা খাই না। আমার হাত দিয়া অন্য কেহ হয়ত খাইয়া গিয়াছে!'

শরৎচন্দ্র চাটুজ্জের 'পথের দাবী'-তে কিছুটা এইরকম বোধকরি পড়িয়াছি। সেই 'অন্য কেহ'টি কে, গঞ্জিকা খাইয়া সে কোথায় গেল, শরৎবাবু খোলসা করেন নাই। সম্প্রতি, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বড় ভাই সন্দীপ রায়বর্মনের পিস্তল-কাণ্ডের খবর পড়িয়াও ওই 'কোথায় গেল' জিজ্ঞাসাটি মাথার মধ্যে কামড়াইতেছে।

চম্পকনগরের ইটভাটাটির নাম 'রীতা ব্রিক ইন্ডাস্ট্রিজ'। সন্দীপবাবুর নাম কোথাও নাই। শুনিয়াছি 'রীতা' তাঁহার স্ত্রী-র নাম। ভাটাতে সন্দীপের বিশ্রাম-কক্ষের বিছানার বালিশের নিচে আসাম রাইফেলস জওয়ানরা উদ্ধার করিলেন একটি বিদেশি(?) ৯ এম এম পিস্তল, ৮ রাউন্ড গুলি, এন এল এফ টি জঙ্গিবাহিনীর চিঠি লিখিবার প্যাড, বাংলাদেশি ও ভারতীয় টাকা, জঙ্গিদের পিঠে বহিবার পিট্টু ব্যাগ এবং চারটি মোবাইল ফোন। জওয়ানরা হাতেনাতে ধরিলেন সন্দীপ সমেত তিনজনকে। সন্দীপরা কহিলেন, এই পিস্তল ইত্যাদি তাহাদের নহে। বাক্যটি সত্য হইলে এইগুলি কাহার? চারটি মোবাইল, লোক তিনজন। 'বহুৎ বে-ইনসাফি হ্যায়!'আরও একজন ছিল? সন্দীপদের হাত দিয়া 'অন্য কেহ গাঁজা খাইয়া' কোথায় গেল?

সন্দীপ নিজে এন এল এফ টি-র সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি, এমন কথা শুনি নাই। জঙ্গিপনা তাঁহার পছন্দের বস্তু হইতে পারে। সেনা কর্নেল বি ডি যাদব সাক্ষী। গত বৎসরের ১৫ অক্টোবর তিনি এবং ভাই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সুদীপ মিলিয়া ওই কর্নেলকে পিটাইয়া জামা কাপড় ছিঁড়িয়া দিয়াছিলেন, থানায় এমনই অভিযোগ রহিয়াছে। সন্দীপ নাকি রাজনীতি করেন না। পিতা ডাকসাইটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং ভাই কংগ্রেস সভাপতি অবশ্য রাজনীতি করেন। তাঁহাদের রাজনৈতিক শক্তিতে তিনিও 'শক্তিমান'। তিনি এমনই 'অরাজনৈতিক' যে, পিস্তল সমেত ধরা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে সাংবাদিক

সম্মেলন ডাকিতে হয়! কেন্দ্রীয় বাহিনী তথা আসাম রাইফেলসের হাতে ধরা পড়িলেও মিথ্যার আশ্রয়ে রাজ্য পুলিসকে জড়াইয়া দিতে হয়। 'অরাজনৈতিক' সন্দীপের গ্রেপ্তারকে 'সি পি এমের চক্রান্ত' বলিতে হয়। নির্বাচন কমিশনের বিধি নিষেধকে পর্যন্ত বুড়া আঙুল দেখাইয়া জঙ্গি কংগ্রেস কর্মীদের মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে হামলা করিতে পাঠাইতে হয়। জিরানিয়া থানায় এক বিধায়কের নেতৃত্বে কংগ্রেসের যুব বাহিনীকে একটানা ইট-পাথর ছুঁড়িতে হয়! সন্দীপের মতন এতবড় 'অরাজনৈতিক দাদা' কংগ্রেসের ভিতরেও কি আর কেহ আছেন?

ইটভাটা 'সন্দীপ দাদা'-র না হইয়া যদি অন্য কাহারও হইত, যদি অন্য কেহ এইভাবে আসাম রাইফেলসের হাতে পিস্তল, জঙ্গি-প্যাড ইত্যাদি সমেত ধরা পড়িত, এমনকী যদি অন্য কোনও 'রাজনৈতিক' কংগ্রেস কর্মী ধরা পড়িতেন, প্রদেশ কংগ্রেস একইভাবে মাঠে নামিত? একইভাবে সভাপতির তড়িঘড়ি সাংবাদিক সম্মেলন হইত? একইভাবে সমস্ত আইন-কানুন ভাঙিয়া মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে হামলার চেষ্টা হইত? শহরের পথে পথে 'ধোলাই-পেটাই'-এর রণহুঙ্কার উঠিত? জিরানিয়ায় গাড়িভর্তি কর্মী পাঠাইয়া থানা আক্রমণ হইত? এবং, সর্বোপরি মারাত্মক অভিযোগে আসাম রাইফেলসের ধরা আসামিকে একইভাবে থানা হইতেই ব্যক্তিগত জামিনে পুলিস ছাড়িয়া দিতে পারিত?

প্রদেশ সভাপতির কথায়, তাঁহার দাদা 'অরাজনৈতিক'। কিন্তু, কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের কাছে স্পষ্ট, তিনি তাহাদের সকলের চাহিতে বড় কংগ্রেসি! ভাইয়ের জন্য সমগ্র কংগ্রেস দলকে যে-কোনও কাজে লাগাইতে দ্বিধাহীন তাহাদের তরুণ প্রদেশ সভাপতি! ভাই-এর বিপদে যে-কোনও আগুনে ঝাঁপ দিতে নির্দেশ দিতে পারেন কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের! বিধানসভা নির্বাচনের চার মাস আগেও ভাই-এর কারণে একজন সেনা কর্নেলকে শারীরিক হেনস্থা করিয়া প্রদেশ সভাপতির পদ কলঙ্কিত করিতে পারেন! ভোটের ১৭দিন আগেও সহোদরের জন্য দলকে মারাত্মক ঝুঁকির খাদে ফেলিতে পারেন। এমনকী, সম্ভবত নির্বাচন বানচাল করিবার ভাবনাও ভাবিতে পারেন। দলের চাহিতে তাঁহার কাছে ভাই, পিতা কিংবা পরিবার বড়? এই জিজ্ঞাসা কংগ্রেস কর্মীদের মনে আসিতে পারে না কি?

কিন্তু না, কংগ্রেস কর্মীরা আপনারা ভুল বুঝিবেন না। ক্ষতি করিতে নহে, কংগ্রেসকে বাঁচাইতেই চাহিয়াছেন প্রদেশ সভাপতি। তিনি অতি স্বচ্ছন্দেই বলিতে পারিতেন, 'আমাদের পরিবার ঐতিহ্যগতভাবেই কংগ্রেস দলের রাজনৈতিক পরিবার। এই পরিবারের কোনও সদস্য কোথাও কোনওভাবে আক্রান্ত(!) হইলে উহা কংগ্রেসের উপরেই আক্রমণ!' কেন এই সত্য (!) তিনি বলেন নাই? কেন 'অরাজনৈতিক' শব্দটির আমদানি করিলেন? কারণ, ভোটের আকাশে-বাতাসে আই এন পি টি-এন সি টি-র জোটসঙ্গী ভারতীয় জাতীয়

কংগ্রেসের সহিত ত্রিপুরার কুখ্যাত নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির গোপন সম্পর্কের অভিযোগ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। 'অরাজনৈতিক' না বলিলে কংগ্রেসের জঙ্গি-নির্ভরতার 'রাজনীতি' লইয়া সন্দেহ বাড়িবে। জঙ্গি নেতা ধনু কলইয়ের সহিত বিধায়ক আবাসে কংগ্রেস নেতার গোপন সভা, ২৫ লক্ষ টাকা সীমান্তের ওই পারে জঙ্গি ডেরায় লইয়া যাইবার পথে ধনু-র গ্রেপ্তার হওয়া, পুলিসের নিকট তাহার স্বীকারোক্তি, আত্মসমর্পণকারী অন্য জঙ্গি নেতাদের দেওয়া চাঞ্চল্যকর তথ্য ইত্যাদি কংগ্রেসকে আগেই বড় বেকায়দায় ফেলিয়া রাখিয়াছে। এখন তড়িঘড়ি আগ বাড়াইয়া সন্দীপ-কে 'রাজনীতিমুক্ত' না বলিলে কিছুই যে আর বাকি থাকিবে না!

কিন্তু, চিন্তা-র সেলুনে সকলেই যে জানিতে চাহিতেছেন– 'গঞ্জিকার কল্কি'টা কাহার? ইটভাটার ওই বিশ্রামকক্ষে ভোটের আগে কে বা কাহারা কী উদ্দেশ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল? কতদিন ধরিয়া কতজন হেথায় আনাগোনা করিতেছিল? আগরতলা হইতে কোনও 'অরাজনৈতিক নেতা' তাহাদের সহিত মিটিং করিতে যাইতেন কি? কাহারা যাইতেন? যাহারা সেখানে ছিল, তাহাদের পিস্তল লাগে, গুলিবারুদ লাগে, পাহাড়ে-জঙ্গালে জিনিসপত্র লইয়া দীর্ঘপথ হাঁটিবার জন্য পিট্টু ব্যাগ লাগে, এন এল এফ টি জঙ্গিবাহিনীর তরফে চিঠি লিখিতে 'লেটারহেড' লাগে, বাংলাদেশে এবং ভারতে যাতায়াত করিতে হয় বলিয়া দুই দেশেরই টাকা-পয়সা সঙ্গে থাকে! ইহারা কাহারা? তিনটি মোবাইল যদি ধৃত তিনজনের হইয়া থাকে, চতুর্থটি কাহার?

(প্রকাশ : ০৪.০২.২০১৩)

উদ্‌ভ্রান্ত কেন?

– দাদা, কত?

সেলুনে এক উদ্‌ভ্রান্ত আগন্তুকের জিজ্ঞাসা। শুধাইলাম, চুল না দাড়ি? উদ্‌ভ্রান্তের বিভ্রান্ত করা জবাব, আরে না না। চুলও না, দাড়িও না। বামফ্রন্ট কত আসন পাইতে পারে, যদি বলেন!

নিশ্চিন্ত হইলাম, পৈতৃক ব্যবসাখান লাটে উঠিতে আর বেশি বাকি নাই! কোন দুর্বুদ্ধিতে যে চিন্তাচরণ-এর 'চরণ' খসাইয়া 'চিন্তা শীল' হইতে গিয়াছিলাম! ১৪ ফেব্রুয়ারির ভোটের পরে যাহার সহিত যেথায় সাক্ষাৎ ঘটিতেছে, সকলেরই ওই এক জিজ্ঞাসা! কী হইবে, কত হইবে! আরে দাদা, চিন্তা কি গনত্‌কার যে, চমৎকারি ভবিষ্যদ্বাণী করিবে? তাহার উপর, সদাশয় নির্বাচন কমিশন রক্তবর্ণ চক্ষু পাকাইয়া রহিয়াছেন। নাগাল্যান্ড, মেঘালয়ে ২৩ তারিখের ভোটের আগে কোনও আগাম হিসাবনিকাশ চলিবে না। ই ভি এম-রা সি পি এমে মজিয়াছে, নাকি কংগ্রেসে ঘেঁষিয়াছে, জানিবার উপায় নাই। তাহারা বোধ করি রহস্যময় হাসিয়া আপাতত নজরুল গাহিতেছে, 'তুমি শুনিতে চেয়ো না আমার মনের কথা ...'!

তবে দাদা, চিন্তা-গিন্নি ভোটের পরেই একটা ফলাফল ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কথার নির্গলিতার্থ– জিতিয়া গিয়াছে ত্রিপুরাবাসী। 'শান্তি' আর 'গণতন্ত্র' তাহাদের কাছে কোনও 'শুষ্কং কাষ্ঠং ভাষণ' কিংবা 'পুস্তক-শোভন' পাসের পড়া নহে। শান্তি-গণতন্ত্র তাহাদের নিকট হৃদয়ের ভুবনভরা আলোর দিশা, তাহাদের জীবনধারা। তাহাদের শ্বাসে-প্রশ্বাসে, বিশ্বাসে শান্তি আর গণতন্ত্রের অধিষ্ঠান। সুবিশাল ভারতবর্ষে প্রতি নির্বাচনে ভোটদানের নতুন রেকর্ড (এইবার ৯৩.৫৭ শতাংশ) গড়াও এখন তাহাদের অভ্যাসে পরিণত। এই উন্নত চেতনার সহিত কোনও টোট্‌কা-ফাট্‌কা কিংবা নিছক প্রলোভন-নির্ভর 'পরিবর্তন'-এর ডাকে জনগণের হঠাৎ ডিগবাজি খাওয়াটা খাপ খায় কি? সুতরাং, গিন্নি একশো ভাগ নিশ্চিত, বামফ্রন্ট আবার বিপুল জয়ের মুখোমুখি।

উদ্‌ভ্রান্ত কহিলেন, কিন্তু দাদা, ওই যে 'নীরব বিপ্লব'-এর হুঙ্কার শুনিতেছি? এত ভোট

নাকি তাহারই লক্ষণ? বামেরা ২২, জোটেরা নাকি ৩২? কর্মচারীরা নাকি স্বপ্নে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় হারের হাড়মাংস গিলিয়া 'চুপচাপ হাতে ছাপ' মারিয়াছে? টি এস আরেরা নাকি ...!

– খাড়ান দাদা খাড়ান! এত ভোট? ২০০৮ -এ সারা রাজ্যে 'আইয়া পড়ছি'-র উদ্বাহু নৃত্য ভুলিয়া গিয়াছেন বুঝি? শহরে বাজারে বাজি ফুটাইয়া, সবুজ আবির উড়াইয়া ভোটগণনার x yöl ¥zö!i I öë ÿë¨ i ööë i ü I Äyi y!¥ë ÿl é D 2 0 0 3 ëë i ü7 8 % হইতে ভোট প্রায় ৯২ % পড়ায় কালনেমির লঙ্কাভাগ কমপ্লিট হইয়া গিয়াছিল। হুমকি-হামলাও চলিতেছিল। গণনার পরে সব বন্ধ। বামফ্রন্ট ৪২ হইতে ৪৯! কমলপুর আর বাধারঘাটে ঘরের ইন্দুর বেড়া না কাটিলে ৫১ হইত। এইবার ভোটার তালিকার আরও কড়া সংশোধন হইয়াছে। ফলে ভোটদানের প্রকৃত হার প্রায় ২০০৮-এর মতনই রহিয়াছে। বরং, বিরোধীদের দখলে থাকা প্রায় প্রতিটি আসনে ভোটের হার কমিয়াছে। কেন? পরিবর্তন-এর ভোটের লক্ষ্মণ তো ইহা নহে!

এইবার শুধাই, এই রাজ্যের সরকারি কর্মচারী শিক্ষকরা কি হাওয়ায় ভাসমান ধুলাবালি নাকি দাদা? তাঁহাদের এত সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, এত আত্মত্যাগ, এত সংগঠন, সম্বৎসরের এত সাংগঠনিক কার্যক্রম – সব হঠাৎ বুদ্বুদের মতন ফুস্ করিয়া ফাটিয়া যাইবে? গত ভোটেও এই একইরকম গুজব হইয়াছিল। শিক্ষক-শ্রমিক- কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি যাহাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ নাই, তাহারাই এমন গুজবে কান দিতে পারেন। আর টি এস আর? রাজ্যের বাম সরকারের হাতেই টি এস আরের জন্ম। জঙ্গি-মোকাবিলায় সারা দেশে এই বাহিনীর জওয়ানরা নজির গড়িয়াছেন। ইহাদের বিরুদ্ধে কুৎসা, অপপ্রচার, প্রত্যাহারের দাবি, 'অবরোধ' নতুন নহে। এখন ইহাদের 'বিশ্বাসঘাতক' দেখাইবার পরিকল্পনাটি যে বেশ ঝানু মস্তিষ্কের রচনা, ইহা বুঝিতে অসুবিধা হইবার কথা নহে।

উদ্‌ভ্রান্ত কহিলেন, দাদা ওই ২২-২৩ টা তাহা হইলে কী বস্তু? মুশকিলে পড়িলাম। ইহাকে বুঝাই ক্যামোনে! কহিলাম, ইহা একটি সরল শুভঙ্করী ধাঁধা! ২২ আর ৩২ এ যোগ করিলে কী হয়? ৫৪ তো? ইহাই বামফ্রন্টের আসনসংখ্যা দাঁড়াইতে পারে। না না, নির্বাচন কমিশনকে কহিতেছি, ইহা আমার কথা নহে। যাঁহারা সমীক্ষা করিয়া পত্রিকায় ছাপাইয়াছেন, তাঁহাদেরই মনের গোপন কথা। আর ২২ হইতে ৩২ বিয়োগ করিলে হয় 'মাইনাস ১০'! মানে কংগ্রেসের আসনসংখ্যা বর্তমান ১০ হইতে মাইনাস হইবে। বাড়িতে ফিরিয়া গিন্নিকে নবাবিষ্কৃত এই 'ফর্মুলা' বলিতেই তিনি প্রবল উল্লাসে হাতে তালি দিয়া নাচিয়া উঠিলেন। আহ্লাদে মোমের মতন গলিতে যাইতেছি, হঠাৎ গিন্নির ধমক খাইয়া সটান হইলাম। ভয়ঙ্করী কহিলেন,

তোমার বুদ্ধির বাক্সে জং ধরিয়াছে। কেরোসিন ঢালো। এইবারের ভোটে আসল রেকর্ড মহিলাদের। তাঁহাদের কথাই বাদ? ভোটের হারে পুরুষরা হারিয়া ভূত। তাঁহারা এত বিপুলভাবে কাহাকে ভোট দিলেন? কী দেখিয়াছ এতদিন? বামেদের সমস্ত মিছিলে, সমাবেশে সংখ্যায় মহিলারা পুরুষদের ছাড়াইয়া যান নাই? মহিলারাই নাচিয়া-গাহিয়া প্রতিটি মিছিল-সমাবেশে উৎসবের আবেগ ঢালিয়া দেন নাই? দেখো নাই? বুঝো নাই কিছু? তাঁহারাই তো ১৪ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের সমস্ত ভোটকেন্দ্র ভাসাইয়া দিলেন। তাঁহারাই আসল রায় দিয়াছেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি মিলাইয়া লইয়ো!

(প্রকাশ : ১৮.০২.২০১৩)

মৃত সৈনিকের পার্ট

– হুনছনি চিন্তা, 'তৃণমূলও কইতাছে – বামফ্রন্ট আইতাছে!'

পত্রিকাটা ঠাস্ করিয়া আয়নার তাকে ফেলিয়া বলিলেন ব্যানার্জিবাবু। পাশেই এক খরিদ্দারের পিঠে মালিশের নরম ঘুসি মারিয়া কহিলাম, ইহা এমন কী কথা! সকলেই জানে বামফ্রন্ট অসিতেছে। কেহ বলে, কেহ বলে না। কেহ 'রাম রাম', কেহ উল্টা করিয়া 'মরা মরা' বলে। জিহ্বার দোষ, 'রাম' আসে না! কথা কিন্তু একই। তৃণমূলে বলুক আর ছিন্নমূলে বলুক!

ব্যানার্জিবাবু পুলকিত। কহিলেন, উরে বা-ব্বা, সেলুনে রামায়ণ চর্চাও করিতেছ নাকি!বেশ বেশ! তা, শুন হে-- রাম জন্মের আগেই নাকি রামায়ণ লিখিয়াছেন বাল্মীকি! কিন্তু, রত্নাকর তো ছিলেন ডাকাইত। তাঁহার বাল্মীকি হইবারও বহু আগে হইতে সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলিতেছে! পাপী রত্নাকরের পাপের ভাগ তাহার আপনজনেরাও কেহ নিতে রাজি হয় নাই। উহাই ছিল টার্নিং পয়েন্ট! নহিলে রত্নাকরও কোনওদিন বাল্মীকি হইতেন না, রামায়ণও লেখা হইত না। তা, এখনও দেখ, পুণ্যের ভাগ নিতে চায় সকলেই। পাপের ভাগ কেহ নিতে চাহে না। জয়ের ভাগ নিতে জিহ্বা লক্‌লকায়। পরাজয়ের ভাগী কেহ হইতে চাহে না। তৃণমূল কংগ্রেসকে দেখ, সহজেই বুঝিয়া যাইবে!

চিন্তার মাথায় এতক্ষণে টিউবলাইট জ্বলিল! ব্যানার্জিবাবুর ইঙ্গিতটা এখন জলবৎ তরলম। নির্বাচনের আগে শুনিলাম – দিদি-র নির্দেশে ত্রিপুরার তৃণমূল কংগ্রেস, ৬০ আসনেই লড়িবার জন্য ৬০ জন পালোয়ানকে রেডি করিয়া ফেলিয়াছে! পালোয়ানেরা গাত্রে তৈলমর্দন করিয়া লাফ-ঝাঁপ দিতেছেন, ফাঁস-ফোঁস করিতেছেন। কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী পাইতেছেন না! হঠাৎ পালোয়ানেরা কোথায় পলাইলেন! কোনও আসনেই তৃণমূল নাই! ঘাসফুলের নামগন্ধও নাই! সর্বত্র তাহারা কংগ্রেস-আই এন পি টি-এন সি টি-কে সমর্থন করিলেন। কংগ্রেসের ভোট ভিক্ষা করিয়া ভাষণ দিয়া বেড়াইলেন। ভোট হইল। ২৮ তারিখ গণনা। কিন্তু, তৃণমূল প্রদেশ সভাপতি অধ্যাপক মানিক দেব অপেক্ষা করিলেন না। ১৯ তারিখই ঘোষণা করিয়া দিলেন, ত্রিপুরায় পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নাই। বামফ্রন্ট আবার সরকার গঠন করিতেছে। তৃণমূল নেতাদের আবেদনে জনগণ কংগ্রেসকে ভোট দিল কি না তাহা

জানিবারও চেষ্টা করিলেন না। যেন সেইরকম কোনও আগ্রহও নাই!

তৃণমূলের প্রদেশ সভাপতি মানিকবাবু কংগ্রেস রাজনীতির পোড়াখাওয়া নেতা। কংগ্রেসকে ভিতরে-বাহিরে জানেন। সেই কারণেই তিনি আগেই জানিতেন, সপ্তম বাম সরকার ঠেকানো যাইবে না। জনগণের প্রতি ঘোর অবিশ্বাস লইয়াই কংগ্রেস ভোটের আগে তাহাদের দ্বারে দ্বারে যায়। অর্ধসত্য আর অসত্যের খিচুড়িতে লোককে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করে। লোভ দেখাইয়া ভোট টানিতে চায়। তৃণমূলও ওই একই পথের পথিক। তাই, ভোটগণনার আগেই প্রদেশ তৃণমূল সভাপতি সম্ভাব্য বড়সড় পরাজয়ের দায় এড়াইতে চাহিতেছেন। 'পরিবর্তন'-এর বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেও তিনি সম্ভবত উল্টা কথা বলিতেন। আগে হইতে বড় করিয়া পাত বিছাইতেন। তিনি বা তাঁহার দল কেবল জয়ের ভাগ নিতে রাজি, পরাজয়ের ভাগী হইতে চাহেন না!

নিগূঢ় সত্যটা হইল– পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই তৃণমূল ত্রিপুরায় তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া ফেলিতে চাহিতেছে। ৬০ কেন্দ্রে যদিও প্রার্থী শেষ অবধি দিয়া উঠিতে পারিতেন, কোথাও তাহাদের জামানতের টাকা বাঁচাইতে পারিতেন না। বাংলার গ্রাম-ভোটে ইহার প্রভাব যে খুবই খারাপ হইতে পারিত তাহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না। তাই 'চিরশত্রু' সি পি এমের বিরুদ্ধে 'গৃহশত্রু' কংগ্রেসের কোমর ধরিয়া 'মহাজোট' নামক যাত্রাপালায় মৃত সৈনিকের পার্ট লইয়াছিলেন মানিকবাবুরা। কিন্তু আলো নিভিবার আগেই 'বাংলা মশা'-র কামড়ে তড়াক করিয়া মঞ্চের পিছনে দৌড় মারিলেন! লোকে হাসিলে হাসুক!

(প্রকাশ: ২৫.০২.২০১৩)

জনগণেশ

গ্রাম-শহর টিলা-টঙ্করে বিজয়-উৎসব। লাল পতাকা আর লাল আবির উড়িতেছে। লাল-ভূতের মূর্তিতে নাচিতে নাচিতে পাড়ার পুরুষ মহিলারা সেলুনে সেঁধিয়া চিন্তা-কেও লাল করিয়া গেলেন। চুলে-গালে-বুকে লাল আবির লইয়া ঘরে ফিরিতেই যাহা দেখিলাম, চক্ষু কপালে উঠিল!

'এক মিছিল' কন্যারত্ন লইয়া গিন্নি কোনও একটা পূজা করিতেছেন! তাঁহারই শ্রীহস্তে লিখিত একখানি সাইনবোর্ডও চোখে পড়িল—'সর্বজনীন জনগণেশ বন্দনা!' কিছু বুঝিবার আগেই কথামৃত বিতরণের ঢঙে গিন্নি কহিলেন —'জনগণই সত্য, জনগণই সত্য, জনগণই সত্য। বলো— জনগণেশ কি জয়!' মনের অগোচরেই সকলের সঙ্গে চিন্তা-র মুখ হইতেও 'জয়ধ্বনি' নির্গত হইল। পরে ভাবিয়া দেখিলাম – এইবারের বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরার জনগণ সত্যই যে চৈতন্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহারাই প্রকৃত পূজ্য। ১৯৭৭ সালের ৩১ ডিসেম্বরের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ৫৬ আসন দখল করিয়া কংগ্রেসকে শূন্য হাতে ফিরাইয়াছিল। কিন্তু সেই ৫৬ হইতেও এইবারের ৫০ বেশি। অনেক উজ্জ্বল, অনেক চৈতন্যময়, অনেক মূল্যবান। গিন্নির সর্বদা বিস্ফোরণ-উন্মুখ গুরুমস্তিষ্কেও উহা ধরা পড়িয়াছে। তাই তিনি আপন ধারায় জনগণবন্দনা করিতেছেন।

কিন্তু, ৫৬ হইতে ৫০-এর দাম বেশি হইল কী করিয়া? গুছাইয়া ভাবিতে চেষ্টা করিলাম। ৩০ বছরের অত্যাচারী জমানায় অতীষ্ট মানুষ চরম ক্ষমাহীনতায় কংগ্রেসকে সাজা আর বামেদের সুযোগ দিয়াছিলেন সেই ৭৭-৭৮ এ। দুইটি স্বল্পায়ু কোয়ালিশন সরকারের অপূর্ণ অভিজ্ঞতায় বামেদের প্রতি রঙিন প্রত্যাশার পাত্র তখন উপচাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ৩৫ বৎসর অতিক্রান্ত। প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ বাম সরকারকেও দেখা হইয়া গিয়াছে। জনগণের চোখে আর কোনও অলীক রঙ নাই। আছে তিল-তিল অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথর। ঝুটা-সাচ্চা যাচাইয়ের জহুরি নজর। সাতাত্তরের আগের কিংবা ৮৮-৯২ জোট জমানার প্রজন্মও সংখ্যায় কম। ত্রিপুরায় নৃপেন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার আসিবার আগেই পশ্চিমবাংলায় জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বাম সবকার আসিয়া গিয়াছিল। এমনকী ৮৮-৯২-তেও

পাশে ছিল বাংলার প্রবল জনপ্রিয় বাম সরকার। ২০১৩-তে বাংলা-কেরলে বামেরা নাই সরকারে। ত্রিপুরার শেষ বাম দুর্গটি তিতুমিরের বাঁশের কেল্লার মতন স্পর্ধায় মাথা তুলিয়া সারা দেশে বিকল্প দেখাইতেছে। এই বার – আকাশে-বাতাসে জলে-স্থলে এমনকী সম্ভবত 'পাতালপুরী'-তেও, পৌঁছিয়া গিয়াছিল 'পরিবর্তন'-এর হা-রে-রে-রে ধ্বনি। লোভের ইস্তাহারে, সীমাহীন আধুনিক অপপ্রচারে সর্পকে রজ্জু, শিকলকে 'ফুলহার' বুঝাইবার অভূতপূর্ব প্রয়াস।

মনে করিয়া দেখুন–উহাদের পত্রিকায়-চ্যানেলে দিবারাত্র 'পরিবর্তন-এর হাওয়া-ঝড়'! হেডলাইন–'জনসমুদ্রে' দাঁড়াইয়া রাহুলজির ঘোষণা–'পরিবর্তন অনির্বায'! কেহ লিখিলেন 'ভূমিকম্প', কেহ 'রাহুল-সুনামি'! কেহ কহিলেন –'পরিবর্তনের টর্নেডোতে উড়িয়া যাইবে বাম সরকার'। পত্রিকায়, টিভিতে বিধানসভা কেন্দ্র ধরিয়া একে একে প্রায় সব বামপ্রার্থীকে 'পরাস্ত' করা হইল। 'বি বি সি ওয়ার্ল্ড' এর নামে 'সমীক্ষা' ছাপা হইল –'কং জোট ৩২ পাইয়া সরকার গড়িতেছে'। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীগুলির 'গোপন রিপোর্ট ফাঁস' করিয়া দেখানো হইল–'কংগ্রেস ৩৩ নিশ্চিত, বামেরা বড়জোর ২০'! ভোটের পরে আগরতলা হোয়াইট হাউসের 'দাদা' কহিলেন, 'নীরব বিপ্লব হইয়া গিয়াছে' সামনের বোর্ডে কাউন্ট ডাউন–'পরিবর্তন আর ১০ দিন, ৯ দিন, ৮ দিন ...'। প্রচার চলিল-'কর্মচারীরা', টি [illegible] আরেরা বামের বিরুদ্ধে ঢালাও ভোট দিয়াছে!' [illegible] কহিল 'কং জোট ৪০, বাম ২০'। কলম লিখিল –'কং ৩৬, সি পি এম ২৪'। পোস্টাল ব্যালটে 'হেরাফেরি' আবিষ্কার করার চেষ্টা আগেই হইয়াছিল। এইবার স্ট্রং রুমের জানালায় 'ষড়যন্ত্র'-এর গন্ধ মিলিল! এক ওয়েবসাইটে 'বামেরা ৪০ ৫২ পাইতে পারে' বলায় গালাগালির অন্ত রহিল না। পাল্টা 'ওয়েব' খাড়া করিয়া সমীক্ষা-লাড্ডু খাওয়ানোর চেষ্টা হইল– কোনও এক 'ইনফো ইলেকশন' নাকি বলিয়াছে-- কংগ্রেস ৬৪.৯ শতাংশ ভোট পাইতেছে। আর এক 'পূর্বাভাস অ্যাসেম্বলি' সমীক্ষা করিয়াছে--কং জোট ৩৪ পাইবে। 'হাউ টু গাইড'– এর সমীক্ষা সকলের চুল খাড়া করিয়া 'সি পি এম কেবল ২টি আসন পাইবে' দেখাইয়াছে! এই 'মিডিয়া-সন্ত্রাস' দেখিয়া-শুনিয়া এক 'বিশেষজ্ঞ' আগে বামফ্রন্টের পক্ষে দেওয়া নিজের মতটি বদল করিয়া লিখিলেন, 'চোরাস্রোত' বহিয়া গিয়াছে। যাঁহারা এখনও এই চোরাস্রোত ধরিতে পারেন নাই তাঁহাদের 'কানা' বলিয়া তিরস্কারও করিলেন তিনি! এবং সর্বশেষে দাদা-র সেই 'বিমানের টিকিট বাতিল' সংক্রান্ত ঐতিহাসিক (!) প্ররোচনা-!

২৮ ফেব্রুয়ারি জনগণেশের রায় বাহির হইল। সকল কুয়াশা-ধোঁয়াশা নিমেষে কাটিয়া সূর্য উঠিল: 'হাওয়া -ঝড় -টর্নেডো-নীরব বিপ্লব-চোরাস্রোত' এবং 'সমীক্ষা' সবই কর্পূরের মতন বাতাসে উড়িয়া গেল। সীমান্ত-বেষ্টিত অতি ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের এই ভয়হীন, দ্বিধাহীন, অস্পষ্টতাহীন রায় সূর্যের মতনই তেজোদ্দীপ্ত সত্য হইয়া সকলের সকল টেনশন

দূর করিল। জনচেতনার অভাবনীয় উচ্চতা সমস্ত সংশয়ের খাদ-কে লজ্জিত করিল। অনেকেই আয়নার মুখ দেখিয়া নিজেকেই আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন– 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ'! মনে পড়িল–জনগণই সত্য, জনগণই শক্তি ...। ফল প্রকাশের পরে অতি উৎসাহেই হউক কিংবা সেই ঐতিহাসিক প্ররোচনার ফাঁদে পা দিয়াই হউক, কোনও অশান্তি সৃষ্টিতে কেহ যদি কোথাও ইন্ধন জোগাইয়া থাকেন– তিনি জনগণের বন্ধু নহেন। বরং শত্রু। উদ্ভাসিত জনচেতনার সহিত ওই অশান্তি বা কোনও উচ্ছৃঙ্খলতা কিছুতেই খাপ খায় না।

গিন্নিকে কহিলাম– তোমার জনগণেশকে শান্ত সংযত থাকিতে কহিও। কংগ্রেস ভবনে কিলোকিলি ঘুসি-খিস্তি চলিতেছে। চলিতে দাও। ইহাই উহাদের সংস্কৃতি। মুখে বলিলেও কংগ্রেস আসলে কিছুই 'পরিবর্তন' করিতে পারে না। নিজেদের স্বভাব-সংস্কৃতিরও পরিবর্তন হইবে না। তবে কংগ্রেস এবং তাহাদের প্রচারকেরা ধন্যবাদও পাইবার যোগ্য। এই নির্বাচনে তাঁহারা যে কাণ্ড দেখাইলেন, শুনাইলেন এবং ঘটাইলেন, তাহা ভুলিবার নহে। ত্রিপুরাবাসী ইহা হইতে অনেক শিখিয়াছে।

(প্রকাশ ঃ ০৪.০৩.২০১৩)

কী করিবেন

অতঃপর? কী করিবেন বাবু জওহর সাহা?

একেবারে দল হইতেই 'বহিষ্কার'? তাহাও কি না ছয় বৎসরের জন্য? অবৈধ কিংবা 'কলাপাতা' বলিতেই পাবেন। আপনি পি সি সি সদস্য, একদা-র এ আই সি সি মেম্বর, বিরোধী নেতা, এমনকি জোট সরকারের জাঁদরেল মন্ত্রীও। অথচ, কোনও সতর্ক করা নাই, শো-কজ করা নাই! পি সি সি-র কোনও বৈঠক নাই! আপনার আত্মপক্ষ সমর্থনেরও কোনও সুযোগ নাই! কোনও স্বৈরাচারী রাজনৈতিক দলেও এমন ঘটনা বৈধ হইতে পারে না! আপনি জলে বাস করিয়া কুমিরের পেটে খোঁচা মারিয়াছেন! ইহা 'অন্যায়' নহে? যখন কেবল চুপ থাকিবার 'নির্দেশ', তখন মুখ খুলিয়া ফেলিয়াছেন। 'শৃঙ্খলা-বিরোধী' নহে? বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের মহা-ভরাডুবির জন্য প্রদেশ সভাপতি আর বিরোধী দলনেতাকে সরাসরি দায়ী করিয়া সাংবাদিক সম্মেলন করিয়াছেন। বিশ্বাসঘাতকতা। অন্তত ২২টি আসনে দলের টিকেট বিক্রয়, কয়েক কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলিয়াছেন। 'দল-বিরোধী' বক্তব্য নহে? অভিযোগের কোনও তদন্ত নাই! সাংবাদিকেরা খবর লিখিবার আগেই, ৪ ঘন্টার মধ্যে 'বহিষ্কার'! এতখানি নিশ্চয়ই আপনিও আশা করেন নাই জওহরবাবু!

বুঝি দাদা, আর চুপ থাকিতে পারিতেছিলেন না। অমরপুর কেন্দ্রে টিকেট-বঞ্চিত হইয়া ভোটের আগেই বিদ্রোহ করিতে পারিতেন। করেন নাই। আপনার মতন বঞ্চিত রতন চক্রবর্তী, প্রদ্যোৎকিশোর, বিভা নাথ, অশোক বৈদ্যরা চুপ ছিলেন। আপনিও মুখে প্লাস্টার মারিয়া পড়িয়া ছিলেন। ভাবিলেন, ভোট শেষ। বিদ্রোহ আজ। কিন্তু প্রদেশ নেতৃত্বের ইচ্ছা—এখন দলের সকলেই মৌন থাকিবে। জনগণ কঠোর রায় দিয়া কংগ্রেসকে মৌন থাকিতে বলিয়াছে! তাই, সহিংস 'প্রতিরোধ' হইবে মৌন, আইন-শৃঙ্খলা কংগ্রেস কর্মীরা মৌনভাবে হাতে তুলিয়া লইতে পারিবে। গ্রাম-পাহাড়ে রাত্রের অন্ধকারে মৌনভাবে বাম কর্মীদের ঘরে আগুন লাগানো যাইবে. খড়কুটা ঝরাপাতা জড়ো করিয়া কিংবা খড়ের গাদায় অথবা পরিত্যক্ত বুথ অফিসে আগুন দিয়া গুজব ছড়ানো যাইবে। কিন্তু, মুখে কোনও কথা বলা যাইবে না! কথা বলিতে দিলেই পরাজয়ের কারণ লইয়া 'আ-কথা কু-কথা' মুখ হইতে বাহির বইতে পারে! 'পরিবর্তন-এর ভাঁওতা'-র আড়ালে কাহার কী উদ্দেশ্য ছিল, কংগ্রেস

কর্মীরা বুঝিয়া ফেলিতে পারে। 'প্রতিরোধ'-এর মিছিলও থাকিবে মৌন! ৮ মার্চ দেড়-দুইশো-র বেশি কর্মী না আসিলে কাহার দোষ? 'মৌন মিছিল' কীভাবে করিতে হয় কংগ্রেস কর্মীরা জানে না? ২০১১-র ১১ জুলাই থানায় হামলা করিয়া, গাড়ি পোড়াইয়া, পুলিস অফিসারকে রক্তাক্ত করিয়া তাহারা 'অহিংস মৌন মিছিল' করিয়া দেখায় নাই?

জওহরবাবুও মৌন থাকিয়া যা খুশি করিতে পারিতেন। শুধুমুধু মুখ খুলিয়া সুখের ব্যাঘাত ঘটাইলেন! প্রাইমারিতে পড়িবার কালে জওহরবাবুও হয়ত "সদা সত্য কথা বলিব" লিখিয়াছিলেন পাতার পর পাতা। কিন্তু "অপ্রিয় সত্য বলিব না" লিখাইবার কালে নিশ্চয়ই তিনি ক্লাস ফাঁকি দিয়াছেন! এখন কী করিবেন বাবু জওহর সাহা এবং তাঁহারা সতীর্থরা? 'ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের শিকার' তথা সম-বঞ্চিত, সম-ভাবাপন্নদের এক শামিয়ানার তলে জড়ো করিতে চেষ্টা করিবেন? অন্যরা কি সঙ্গে আসিবেন? সকলেই একজোটে বিদ্রোহ করিলে গুরুতর ভয়ের ব্যাপার! প্রদেশ সভাপতি, বিরোধী নেতা এবং তাঁহাদের ঘনিষ্ঠরা 'পোস্টকার্ড'-কে 'টেলিগ্রাম' বিবেচনায় আপনাকে বিদ্যুৎবেগে 'বহিষ্কার' করিয়াছেন এই ভয়েই কিনা কে জানে! অনেকটা প্রথম যামিনীতেই 'বিড়াল মারিয়া কড়া বার্তা' দিবার মতন! এখন কী করিবেন? অন্য দলে যাইবেন? কোথায়? তৃণমূল এখনও আপনার জন্য নহে। ভাজপা-তে পা রাখিবার সুযোগ থাকিলেও ত্রিপুরায় ভবিষ্যৎ নাই। জোট আমলে বনমালীপুরের কেচ্ছায় ধরা খাওয়াইয়া আপনার মন্ত্রিত্ব কাড়িয়া লইয়াছিল দলের যে গোষ্ঠী, এইবারও কি তাহাদেরই 'জয়' মানিবেন? বামেরাও আপনাকে সঙ্গে লইতে চাহিবে বলিয়া ঠাহর হয় না। না-না, কেবল সম্ভাবনার কথা কহিলাম। সি পি এম আপনার 'জাতি-শত্রু'! তাহাদের সহিত হাত মিলাইবেন কেন?

জওহরবাবু, আপনি প্রবীণ, অভিজ্ঞ এবং পোড়খাওয়া কংগ্রেস নেতা। অতীতে টিকেট-বঞ্চিত হইয়া 'নির্দল' হিসাবে একই সঙ্গে নিজের দল কংগ্রেসের 'অফিসিয়াল প্রার্থী', এবং সি পি এম প্রার্থীকে পরাস্ত করিবার বিরল হিম্মত দেখাইয়াছেন। সেই সময় বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির রাজনীতিতে হাতেখড়িও হয় নাই। তাই, আপনি বলিতে পারেন–'কে কাহাকে বহিষ্কার করে! এই বহিষ্কার সম্পূর্ণ অবৈধ। দলের সংবিধান – বিরোধী'। হইতে পারে আপনি আবার কংগ্রেসে কিংবা তৃণমূলে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবেন। আবার তলাইয়াও যাইতে পারেন। নিন্দুকেরা বলিতেছে– জওহর সাহা-র সেই দিন আর নাই। "চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়।" জবাবে আপনি বলিয়া দিতেই পারেন – এই কথা জওহরের জন্য সত্য হইলে সুদীপ-রতনলালের জন্যও সত্য। "চিরদিন কাহারও সমান নাহি ..."!

(প্রকাশঃ ১১.০৩.২০১৩)

লোভ

সেলুন হইতে ঘরের পইঠায় পা রাখিতেই কানে আসিল, "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু"! কনিষ্ঠা কন্যাকে চুপি-চুপি আচারের বয়াম খুলিতে দেখিয়া গিন্নি বেশ 'গঠনমূলক সমালোচনা'-র ভঙ্গিতে বাল্যশিক্ষার প্রাচীন নীতিবাক্য আবৃত্তি করিতেছেন! বাহ্! গিন্নি-গৌরবে চিত্তার প্রাণ ছলাৎ ছলাৎ! কিন্তু, কন্যার পাল্টা জিজ্ঞাসায় নিমেষেই জলস্তর নামিয়া খরা! সে শুধাইল, মা কাহার লোভে কাহার পাপ?

ভাবিতে বসিলাম। ব্যক্তিগত লোভ, কিছু পাইবার লিপ্সা সকলেরই বোধগম্য। কিন্তু, যখন সংগঠিতভাবে লোভ-এর জাল বিছানো হয়? কেবলমাত্র লোভের মানদণ্ডেই যখন মানুষের বিচারবুদ্ধি, বিবেক আর মান-মর্যাদার দাম নির্ধারণের চেষ্টা হয়? গোটা সমাজ, এমনকি গোটা বিশ্ব-সংসারকেই ' লোভ দ্বারা চালিত' একটা জঞ্জাল-ব্যবস্থার শিকলে বাঁধিয়া ফেলিবার বিপুল আয়োজন যখন চলে, তখন প্রকৃত বিচারে কে লোভী, কাহার লোভে কাহার পাপ--- বোধগম্য হওয়া একটু কঠিন বই কি! তবে সেলুনে ক্ষুর কাঁচি চালাইলেও অভিজ্ঞতায় বুঝি, সমাজের প্রকৃত মঙ্গল কামনাই ব্যক্তিকে লোভের ফাঁদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। লেখক আজিজুল হক-এর কথাখানি হক-কথা। 'স্রোতে ভাসিয়া চলে পচাগলা মৃতদেহ, আবর্জনা। স্রোতের বিপরীতে উজায় প্রাণ'। বিশ্বজোড়া লোভের স্রোতের বিপরীতে চলিবার শক্তি জোগায় বামপন্থী চেতনা। উগো সাভেজ হইতে শাহবাগ, সর্বত্র।

সোনামুড়ায় নির্বাচনী ফল বিশ্লেষণের পর--- সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক বিজন ধর সম্প্রতি বলিয়াছেন, সোনামুড়া শহর কেন্দ্রে ফ্রন্ট পার্টীর জয়ের ব্যবধান আরও বেশি হইবার কথা ছিল। কিন্তু, শিক্ষক-কর্মচারীদের একটি অংশ কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে 'কেন্দ্রীয় হারে বেতন' ইত্যাদির লোভে পড়িয়া বামফ্রন্টকে ভোট দেন নাই।

ভাবিয়া দেখিলাম, বিজনবাবুরা নিশ্চিত যে, শিক্ষক কর্মচারীদের ওই অংশটি বামফ্রন্টকেই ভোট দিবার কথা ছিল। অর্থাৎ, উহারা বাম শিক্ষক-কর্মচারী সংগঠনেই রহিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এমন ঘটিয়া থাকিলে কেবল সোনামুড়া শহরে ঘটে নাই। গোটা রাজ্যেই 'বাম' *শিক্ষক-কর্মচারীদের একটি অংশ এই নির্বাচনে 'লোভে পড়িয়া' কংগ্রেসকে ভোট দিয়াছেন।*

বিজনবাবু খোলসা করেন নাই। ৩০-৩১ মার্চ সি পি এমের রাজ্য কমিটির বৈঠকে নির্বাচনী ফলাফলের বিস্তারিত পর্যালোচনার পর হয়ত প্রকাশ্যে আরও কিছু বলিবেন। পার্টিকেও হয়ত দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, আদর্শগত এবং সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

বাংলার ঘটনাবলি ত্রিপুরার বাম নেতৃত্বকে ভোটের অনেক আগেই সতর্ক করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু, একই পার্টির নেতৃত্বে একই কর্মসূচি লইয়া 'পরের জায়গা পরের জমিতে ঘর বানাইয়া' এই প্রান্তিক অঙ্গারাজ্যেও একই রকম বাম সরকার। রোগ-জীবাণুও একই। নেতৃত্ব সতর্ক হইলেও মাঝারি ও নিচু স্তরে সচেতনতার শিকড় কতখানি গভীরে গিয়াছে? কাছারি -অফিসে ইশকুলে-কলেজে সমিতির নামে কিছু নেতার জমিদারি চাল সেই সচেতনতার শিকড় উপরেই কাটিয়া দিতেছে কি? নহিলে ২৭টি কেন্দ্রের পোস্টাল ব্যালটে বিরোধীরা বেশি ভোট পান কী করিয়া? ইহার মধ্যে ভোটের কাজে যুক্ত পুলিস কর্মী এবং মোটর শ্রমিকদের পোস্টাল ভোটও রহিয়াছে। জোট আমলের শুরুতে মোটর শ্রমিকদের কিছু ইউনিয়ন অফিসে লাল ঝান্ডা নামাইয়া রাতারাতি তিরঙ্গা উড়াইতে দেখিয়াছি। এখন সিন্দুইরা মেঘ-এর আড়ালে কোনও ইঙ্গিত আছে কি?

জমি উর্বর না থাকিলে লোভের বীজ হইতে গাছের জন্ম হয় না। সুতরাং, সেই জমির সুলুক সন্ধান জরুরি। প্রলুব্ধ কেবল কি শিক্ষক-কর্মচারীদের একাংশ? বেকারভাতা-র টোপ কিছু 'বামপন্থী' তরুণ-তরুণীকে প্রলুব্ধ করে নাই? যুবফ্রন্টের বহু সদস্য গোপনে কংগ্রেসের বেকারভাতা-র ফরম পূরণ করিতে যান নাই? উপজাতি এলাকার কিছু ভিলেজে চেয়ারম্যান আর অন্য কর্তাদের গণতন্ত্র-বিরোধী ভূমিকা, মর্জিমাফিক সুবিধা বন্টন এমনকি দুর্নীতিতে জড়াইয়া পড়িবার অভিযোগ জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নাই? নহিলে বিরোধীদের ভোট বাড়ে কী করিয়া? সমতলের গ্রাম পঞ্চায়েতে, শহর এবং শহরতলির পার্টি ও গণসংগঠনে মোড়লগিরির ছবি কি খুব অস্পষ্ট? এক সময়ে নির্বাচনে প্রার্থী হইতে বলিলে পার্টি নেতারা রাজি হইতেই চাহিতেন না বলিয়া শুনিয়াছি। এখন ছবিটি এত বদলাইতে পারিল কেন? এম এল এ কিংবা মন্ত্রী, কিংবা নিদেনপক্ষে একটা চেয়ারম্যানের চেয়ার পাইতে অনেক 'কম্যুনিস্ট' নেতার সাম্প্রাতিক 'কংগ্রেসি তৎপরতা' জনগণ স্পষ্টত টের পাইতেছেন। পার্টির সিদ্ধান্ত পায়ে ঠেলিয়া গোপনে নির্বাচনী অন্তর্ঘাতের অবিশ্বাস্য ঘটনাও এখন বিরল নহে! গত ভোটের 'কমলপুরিয়া ভূত' এইবা র কৈলাসহরের ঘাড় মটকাইয়াছে! সেই ভূত বাদেও বাধারঘাট, ধর্মনগর, উদয়পুর, বড়জলা কেন্দ্রে হারের নেপথ্যে আরও কী রহিয়াছে, কংগ্রেস ছাড়া আরও কাহারা রহিয়াছেন, বাহির করিতে হইবে না?

ইহা ঠিক, জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কোনও প্রচারেই শেষ বিচারে বিভ্রান্ত হন নাই। ৯৪ শতাংশ ভোটদান, মহিলাদের নজিরবিহীন অংশগ্রহণ, ৬০-এ বামফ্রন্টের ৫০ আসন এবং

৫১ শতাংশের বেশি ভোটপ্রাপ্তি ইহাই প্রমাণ করিয়াছে। 'শান্তি এবং উন্নয়ন মানেই বামফ্রন্ট'–এই কথাতেই অধিকাংশ মানুষ সম্মতিসূচক ভোট দিয়াছেন। কিন্তু, ওই ৫১ শতাংশেরও কিছু অংশের মাথার কোনও গুপ্তকোণে কিছু বিভ্রান্তি ঘাপটি মারিয়া আছে। নতুন সরকারের প্রতি অতিরিক্ত আশা যখন 'অতিরিক্ত হতাশা' ডাকিয়া আনিতে চাহিবে, তখন ওই বিভ্রান্তির ভূতেরা বাহির হইয়া আসিবে। 'বামপন্থী' বিজয় মিছিলে মদ্যপান করিয়া যে যুবকবৃন্দ পরোয়াহীন নৃত্য করিতে পারেন, তাহারাই সেই ভূতবাহিনীর বাহন হইবেন– এমন আশঙ্কা জাগিয়া উঠা অন্যায়?

৪৯ শতাংশ ভোটার ৭ম বামফ্রন্ট সরকার চান নাই, এখনও চান না কেন, গভীর গুরুত্ব দিয়া ভাবিতেছেন বাম নেতৃত্ব? লোভের ইস্তাহারের লোভে পড়িয়া ভুল ভোটদান কিংবা মন্ত্রিত্বের লোভ, চেয়ারের লোভ, টাকা-ক্ষমতার লোভ সবকিছুই কি লোভের বিশ্বায়নের যুগে স্বাভাবিক? না! – তাহা হইতে পারে না। স্রোতের টানে স্রোতে ভাসিয়া চলা বামপন্থার ধর্ম নহে। ত্রিপুরার বামফ্রন্টের কাছে এই নির্ঘোষই শুনিতে চাহিতেছেন ত্রিপুরার মানুষ, সারা দেশের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ।

(প্রকাশ: ২৫.০৩.২০১৩)

হিট(নিট্)লার!

বিবাহ করিব না!

শ্রীমান রাহুল গান্ধীর এহেন ইচ্ছা-প্রকাশে চিন্তা-গিন্নি শোকে (কাতর না হইলেও) কাৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন! অনেক বুঝাইয়া খাড়া করিয়াছি। শ্রীমানের সিদ্ধান্ত মর্মান্তিক, কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ। দলে পরিবারতন্ত্র ধ্বংসের কত সহজ রাস্তা! আমাদের রাজ্যের একমাত্র 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি' বা নিট্-এর মাননীয় অধিকর্তার কিন্তু ওই কর্মটি 'করিব না' বলিবার সুযোগ নাই। কেন না, তিনি বহুকালের বিবাহিত। পরিবারতন্ত্রেও তাঁহার অরুচি আছে বলিয়া মনে হয় না। দুর্মুখেরা বলেন, নিট্-এ নাকি এখন একটি 'বোস অ্যান্ড কোং' চলিতেছে! যথাবিহিত-যোগ্যতা-বিচারপূর্বক তাঁহার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়, তস্য আত্মীয়, ঘনিষ্ঠজন, শিষ্য স্কলারদের পরিজনদেরও নিট্-এর নানান গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা হইয়া থাকিলে কী অপরাধ হইয়াছে?

বরং গুরুতর অপরাধ করিয়াছে নিট্-এর ৫৭ জন হস্টেল-ছাত্রী! অধিকর্তা সায়েবের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়া জানিয়াও সুপার ম্যাডামকে ফেসবুক-এ 'হিটলার' বলা! সেই মন্তব্যকে আবার কি না 'লাইক' করা, মন্তব্য পাস করা! এতবড় দুঃসাহস? অধিকর্তার নির্দেশ বা উপদেশ-এ 'শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি'-র মিটিংয়ে ৫৭ জনকেই হস্টেল হইতে বহিষ্কারের 'সিদ্ধান্ত' নেওয়া হইল। নিকটাত্মীয়া সুপার-এর স্বাক্ষরিত নির্দেশ নোটিস বোর্ডে লাগাইয়া ছাত্রীদের বলা হইল বেডিংপত্র সমেত বোর্ডিং (হস্টেল) ছাড়িয়া দিতে!

কী হইতে কী হইল! ফেসবুকে (বয়সের ধর্মেই হয়ত) একটু মজা-মিশানো সমালোচনা করিতে যাইয়া সরলমতি ছাত্রীদের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত! অভিভাবকদের বকাঝকায় তাহারা কাঁদিল, লিখিত ক্ষমা-প্রার্থনা করিল, ফেসবুক হইতে মন্তব্য প্রত্যাহারও করিল। কিন্তু বড়-সায়েব কিংবা ম্যাডাম অথবা আড়ালে কলকাঠির মাস্টার তথা 'স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স'-এর ডিন, ছোট সায়েব– কাহারও মন ভিজিল না। কেহ কেহ ভাবিলেন, বাংলায় দিদি-র কার্টুন ফেসবুকে পোস্ট করিয়া যদি অম্বিকেশ মহাপাত্রকে বেদম মার খাইয়াও শ্রীঘরে যাইতে হয়, তাহা হইলে এইখানে পুচ্‌কে ছাত্রীদের ইহার কমে ছাড়া হইবে কেন?

কিন্তু না। ত্রিপুরাটা বাংলা হয় নাই ভোটেও। হইল না নিটেও। তুমুল প্রতিবাদ আর নিন্দা-ধিক্কারের চাপে নিট্ কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার-এর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে বাধ্য হইলেন।

অধিকর্তা সায়েব অবশ্য ভাঙিবেন, তবুও মচকাইবেন না। তিনি নিজেই বলিয়া দিলেন– বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত করি নাই। সুপার ম্যাডাম বহিষ্কারের আদেশ দিবেন কী করিয়া! তাঁহার সে ক্ষমতা নাই, তিনি দেনও নাই। তাহা হইলে ম্যাডামের স্বাক্ষরিত ওই নোটিস? অধিকর্তার অদ্ভূত সাফাই – অন্য কেহ 'ষড়যন্ত্র' করিয়া মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত নোটিস বোর্ডে লাগাইয়া দিয়াছিল! তাই সুপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবার প্রশ্ন উঠে না। সেই - 'আমি গাঁজা খাই না। আমার হাতে অন্য কেহ গাঁজা খাইয়া গিয়াছে'-এর মতন! কিন্তু 'ষড়যন্ত্রটা'কে করিল বাহির করিবেন তো বোস সায়েব? শুনিলাম পত্র-পত্রিকাতে অধিকর্তার কাজকর্মকে 'তুঘলকি' বলায় তিনি দুঃখিত, ক্ষুব্ধ। পত্রিকাওয়ালারা ইহার পর নিশ্চয়ই ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। কারণ, কানাকে 'কানা' না বলাই বাল্যশিক্ষায় পঠিত শিষ্টাচার!

চিন্তা-গিন্নি বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন, ইশ্‌কুল-কলেজে পড়িবার কালে ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের আড়ালে নানান 'নাম' দিয়া থাকে। ইহা যুগ যুগ চলিয়া অসিতেছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও জানেন। কিন্তু, কখনও রাগেন না। বরং পড়ুয়াদের দুষ্টুমি উপভোগ করেন। শুনিয়াছি, বর্তমান নিট্- এও একজন শিক্ষকের নাম পড়িয়াছে 'গাঞ্জা' (সম্ভবত গপ্-এর জন্য), একজন শিক্ষক সুন্দর সাজগোজ করেন বলিয়া তাঁহাকে বলা হয় 'স্টাইলিস্ট'। একজন অতি দ্রুত কথা বলেন, তাই নাম পড়িয়াছে 'হড়বড়ে'! আরেকজনের প্রেমিক-প্রেমিক চাহনির জন্য ছাত্রীরা আড়ালে বলে 'প্রেমচাঁদ'। শিক্ষকরা নিজেরাও সব জানেন, কিছু মনে করেন না। হস্টেলের সুপার-ম্যাডামের বিরুদ্ধে স্বৈবাচারী খিটখিটে আচরণের অভিযোগ ছাত্রীদের। তাই বলিয়া কোনও নেটওয়ার্কে ছাত্রীরা তাঁহাকে স্বৈরাচারী বলিয়া প্রচার করিবে – ইহাও সমর্থনযোগ্য নহে। তবে বেরসিক ছাত্রীরা তাঁহাকে অন্য কোনও নাম দিলে তিনি বোধকরি এত গোঁসা করিতেন না। কত নাম ছিল, যেমন - আঁতোয়ানেৎ (ফ্রান্সের কুখ্যাত ষোড়শ লুই-এর অতি কুখ্যাত স্ত্রী), থ্যাচার, ইন্দিরা কিংবা নিদেনপক্ষে মমতা! ম্যাডামকে 'হিটলার' নাম দিয়া তাহারা অত্যন্ত 'বে-ইনসাফি' করিয়াছে। চিন্তা-গিন্নি যোগ করিলেন, কোনও মহিলাকে একজন ধ্বজগজ রুক্ষ পুরুষ একনায়কতন্ত্রীর সহিত তুলনা করিলে হৃদয়ে ক্ষোভের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠাই স্বাভাবিক! তোমরা পুরুষেরা ইহার কী বুঝিবে?

– কিন্তু গিন্নি, আসল রহস্য বোধ করি অন্যত্র। হস্টেল-ছাত্রীদের মাথাপিছু খরচ ২১০০ হইতে বাড়াইয়া ২৯০০ টাকা করিয়াছে নিট্ কর্তৃপক্ষ। হস্টেলে মোট ৪১০ জন ছাত্রী থাকে। মাসিক ঊনত্রিশশো টাকার বিনিময়ে তাহাদের যে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে, তাহার মান মোটেই নাকি ভাল নহে। ছাত্রদের হস্টেলে ছাত্ররা প্রতিবাদে মুখর

থাকে বলিয়া এতটা সুবিধা হয় না। কিন্তু নিরীহ ছাত্রীদের আপত্তি কেহ শুনে না। সুপার-ম্যাডামকে বলিয়া উল্টা ফল হয়। অভিযোগ আছে, সরবরাহকারী ঠিকাদারের সহিত ভাগ-বাটোয়ারা নিষ্কন্টক করিতে ছাত্রীদের টাইট দিয়া মুখে কলুপ আঁটিয়া দিতেই এই 'বহিষ্কার'-এর বাড়াবাড়ি। নেপথ্যে কে--ম্যাডাম না ছোট সায়েব? তদন্ত করিলেই বাহির হইবে। কিন্তু, দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বেচ্ছাচার, অনৈতিক কাজকারবার, স্বজনপোষণ, ভাগ-বাটোয়ারার অজস্র অভিযোগে কালিমালিপ্ত এই কেন্দ্রীয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করিবার দায় যে আমাদেরও গিন্নি। দায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের, রাজ্যের সকল মানুষের।

(প্রকাশ: ০১.০৪.২০১৩)

ভুল যুদ্ধ

'ব্যালেন্স' করিবার নামে পুলিস নিজেদের ব্যালেন্স শিট-এ গোঁজামিল দিলেও কাজটা ঠিক করিল কি? সেলনের আয়নায় আপন চক্ষুর পিচুটি খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা রিটায়ার্ড ব্যাঙ্কবাবুর। কহিলেন, বুঝিলে চিন্তা, এক জুনিয়র ডাক্তার এবং তিন মেডিক্যাল ছাত্রকে গ্রেপ্তারের পরে পুলিস টেনশন 'ডিফিউজ' করিতে তিনজন চিত্র-সাংবাদিককেও গ্রেপ্তার করিল। পুলিসের গৎ-বাঁধা ব্যালেন্সের খেলা। একটি পরিকল্পিত ও সংগঠিত দুর্বৃত্তপনাকে লঘু করিয়া রাজ্যবাসীকে বুঝানো হইল, ইহা দুই পেশার লড়াই! ডাক্তার বনাম সংবাদমাধ্যমের মল্লযুদ্ধ!

ভাবিয়া দেখিলাম, কথায় কিছু সারবত্তা আছে। সেইদিন জিবি হাসপাতালে যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা কখনও দুইটি পেশার লড়াই ছিল না। কোনও চিকিৎসকই যে রোগীর মৃত্যু চান না, সাধারণ মানুষ ইহা বিশ্বাস করেন। করেন বলিয়াই হাসপাতালে আসেন। চিকিৎসকদের সব চেষ্টার পরেও রোগীর মৃত্যু হয়। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগও উঠে কখনও কখনও। সকল ক্ষেত্রে উঠে না। রোগীর মৃত্যু ঘিরিয়া আত্মীয় পরিজনদের অভিযোগ ও উত্তেজনাও নতুন নহে। বিশেষ করিয়া রোগীটি যদি একজন ২২ বছরের সন্তানসম্ভবা তরুণী বধূ হন, উত্তেজনা অনভিপ্রেত হইলেও অস্বাভাবিক নহে। এমনকি ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের শারীরিক নিগ্রহ, ভাঙচুরের মতো অতি নিন্দনীয় ঘটনা কেবল এই রাজ্যেই নহে, সর্বত্রই মাঝে-মধ্যে ঘটিতে শোনা যায়। এই জন্যই রাজ্যে রাজ্যে ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী এবং হাসপাতাল-সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষায় আইন করা হইতেছে। ত্রিপুরায়ও এই ঘটনার আগেই সেই আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন রাজ্য সরকার। কিন্তু, কিছু চিকিৎসক এবং মেডিক্যাল ছাত্র ধাইয়া আসিয়া আইন নিজেদের হাতে তুলিয়া লইবেন, রোগীর পরিজনদের হাসপাতালের ভিতরে যথেচ্ছ পিটাইবেন, মহিলাদেরও টয়লেটে ঢুকাইয়া তালাবন্দি করিয়া রাখিবেন, চিত্র-সাংবাদিকরা সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করিতে থাকিলে আছাড় মারিয়া ক্যামেরা ভাঙিবেন, কাড়িয়া লইবেন, তাহাদের কিল-ঘুসি-লাথি মারিবেন, ইট-পাথরের ঘায়ে জখম করিবেন, এমনকি তাঁহাদের 'প্রেস' লেখা স্কুটার, বাইকগুলি ভাঙিয়া আগুন লাগাইয়া দিবেন, এমন ঘটনা দুনিয়ার কোথাও অতীতে ঘটিয়াছে কিনা তা জানা নাই।

এই বর্বরোচিত হামলাকে যাঁহারা লঘু করিতে চাহিতেছেন – তাঁহারা কী সর্বনাশ করিতেছেন হয়ত বুঝিতে পারিতেছেন না। কিছু ছাত্র জনসেবার শপথ লইয়া, জনগণের বড় কষ্টের টাকাতেই ডাক্তারি পড়িতেছে! জনগণ অনেক আশা লইয়া ইহাদের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। কোনও 'মাস্তানির জবাবে' ইহাদের নিকট হইতেও মাস্তানি আশা করা যায়? বলা হইতেছে – মৃতার স্বামী নাকি ডাক্তারকে না পাইয়া শুরুতে চেয়ার ভাঙিয়াছিলেন, পরে কোনও এক জুনিয়র ডাক্তারের জামার কলারও চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। মৃতার স্বামী অস্বীকার করিলেও ইহা গুরুতর অভিযোগ। তবে চিন্তা-র মোটা মাথার বুদ্ধিতে মনে হয় – কেহ জামার কলার উল্টাইয়া চলিলেই সেই কলার চাপিয়া ধরিবার প্ররোচনা জাগ্রত হয়! কলার চাপিয়া ধরা যেমন অতি গুরুতর অপরাধ, তেমনই কলার-উল্টানো আচরণও কাহারও নিকট বাঞ্ছিত নহে! যাহাই হউক, মৃতার স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা হইতে পারিত, তাহাকে গ্রেপ্তারও করা যাইত। কিন্তু, কিছু ডাক্তার নিজেদের পেশা-র পবিত্রতা ভুলিয়া 'দুষ্কৃতী' হইয়া গেলেন কেন? তাঁহাদের দুষ্কর্মের দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করিবার সময় ছাত্রাবাস হইতে ডাক্তারি ছাত্রের একটি দল চিত্র-সাংবাদিকদের ধোলাই-পেটাই করিতে একযোগে ছুটিয়া আসিলেন কী করিয়া? ঘটনার ধরনেই স্পষ্ট, ইহা পরিকল্পিত। "সুযোগ আসিবামাত্র টাইট দিতে হইবে"– এমন একটা সিদ্ধান্ত যেন আগে হইতেই প্রস্তুত ছিল! ভাল লক্ষণ হইল– মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং দায়িত্বশীল প্রবীণ চিকিৎসকরা এই ছাত্রদের চিহ্নিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

রিটায়ার্ড ব্যাঙ্কবাবু কহিলেন, এই ঘটনাকে 'দুই পেশার লড়াই' বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করা অন্যায়। হামলাবাজ জুনিয়র ডাক্তার এবং কিছু ছাত্রের দুষ্কর্মের ছবি সমস্ত সংবাদপত্র এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় দেখিয়াছেন মানুষ। লুকাইবার পথ নাই। ফেসবুক-এ মিথ্যা প্রচার করিয়াও মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাইবে না। রাজ্য সরকার দ্রুত ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের নির্দেশ দিয়াছেন। ১৪ দিনে রিপোর্ট আসিবে। যে ডাক্তার ও তিন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদের দুষ্কর্মের ছবিও সকলের সামনে। বাকিদেরও গ্রেপ্তার করিবার দাবি উঠিয়াছে। কিন্তু, নামধাম-সহ কোন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট নালিশ না থাকা সত্ত্বেও তিন চিত্র-সাংবাদিককে গ্রেপ্তারের ঘটনা দুই পেশার মধ্যে লাগাইয়া দিতেই ইন্ধন জোগাইবে। কে না জানে, পেশায়-পেশায় লড়াই বাধিলে অপরাধীরা নিরাপদ আশ্রয় পায়। এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতার ছাতার নিচে আসল-নকল, শোষক-শোষিত, সাদা-কালো, ভাল-মন্দ মিশিয়া যায়। কায়েমি স্বার্থের পক্ষে চমৎকার হইলেও সমাজের পক্ষে ইহা শুভ নহে। পুলিস সেই অশুভের ফাঁদে পা দিয়া নিজেদের অক্ষমতা ঢাকিতেছে না তো?

ব্যাঙ্কবাবু কিয়ৎ থামিয়া আবার কহিলেন, ভাবো চিন্তা, ডাক্তারি পড়া ছাত্ররা বাবা-মায়ের মেধাবী সন্তান। তাঁহাদের কত স্বপ্ন এই সন্তানদের ঘিরিয়া। কিছু উচ্ছৃঙ্খলের কারণে এখন

সকলকে ভুগিতে হইতেছে। রাজ্যবাসীর স্বপ্নের মেডিক্যাল কলেজের সুনামও নষ্ট হইতেছে। এই ভুল যুদ্ধ আর নয়। ভুলিয়ো না, মিডিয়াও মাফিয়ার থাবায় বিপন্ন, রক্তাক্ত। ইদানীং নানান অসাধু ধান্দার অর্থবানেরা পত্রিকা বা চ্যানেল খুলিতেছেন। এমন কিছু ছেলেমেয়েকে কাঁধে ক্যামেরা লইয়া যেখানে-সেখানে যখন-তখন পাঠানো হইতেছে যে, তাহাদের সাংবাদিকতার ন্যূনতম শিক্ষা, সৌজন্যবোধ, শিষ্টতা, ভদ্রতা জানা নাই। ইহারা কেহ- কেহ নিজেদেরকে 'পুলিস' ভাবিতেছে! আবার কেহ ব্ল্যাকমেল করিতেও দ্বিধা করিতেছে না বলিয়া অজস্র অভিযোগ উঠিতেছে। সাংবাদিকতার সহিত কোনও সম্পর্ক নাই এমন বহু অবাঞ্ছিত ব্যক্তি স্কুটার-বাইক-গাড়িতে 'প্রেস' স্টিকার লাগাইয়া ঘুরিতেছেন। এইসব কার্যকলাপ বন্ধ করিতে সরকার এবং প্রেস ক্লাবগুলিকে অবিলম্বে দৃঢ় ভূমিকা লইতে হইবে। সকল পেশাতেই এখন দুষ্কৃতী-উৎপাত বাড়িতেছে। সকল পেশার মানুষকেই ইহাদের বিরুদ্ধে একযোগে খাড়া হইতে হইবে। চিন্তা, সুনির্দিষ্ট দুষ্কর্মের অভিযোগ না থাকিলে তিন চিত্র-সাংবাদিককে বিনা শর্তে মুক্তি দিবার দাবি অসঙ্গত নহে।

আমরা চাইব, তদন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হউক। প্রকৃত দোষীরা চিহ্নিত হইয়া সাজা পাক। নতুন আইনেও হাসপাতালের মতো জরুরি পরিষেবার কেন্দ্রে কেবল স্বীকৃত সাংবাদিকদের প্রবেশ এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনের সুযোগ অবারিত রাখা হউক। আর, এইরকম একটি দুঃখজনক, অবাঞ্ছিত ঘটনা লইয়া সঙ্কীর্ণ রাজনীতির পাশা খেলা এবং ঘোলা জলে মৎস্য শিকারের অপপ্রয়াস এখনই বন্ধ হউক।

(প্রকাশ : ০৮.০৪.২০১৩)

শুভেচ্ছা

ভাবি এক, হয় আরেক! ভাবনা ছিল – ঘটা করিয়া সকলকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাইব! ১৪২০-কে বরণ করিতে 'এক (১) চারশো- বিশ (৪২০)' ফন্দিও ছিল মনে! ভাবিয়াছিলাম– বঙ্কিম-রবীন্দ্র-নজরুল, কিংবা শামসুর-সুনীলদের টুকলি করিয়া বেশ মাখো-মাখো করিয়া শব্দ-সাহিত্যের বঙ্গা-ঘ্যাট (মানে পাঁচন) সংক্রান্তির পাতে ফেলিব। গিন্নির নিকট হইতে কিঞ্চিৎ 'ধন্য-ধন্য' পাইলেও পাইতে পারি! কিন্তু, সব কাঁচিয়া গেল!

একে সংক্রান্তি তাহে রবিবার! ভোর হইতে সেলুনে দম ফেলিবার জো নাই। লোকের সাফ-সুতরো হইবার যেন তোড় লাগিয়াছে। বাচ্চা-বুড়া-জোয়ান! চিন্তা-র সেলুনের সামনে লাইন! সদ্য সি পি এমে যোগ দেওয়া 'টুইক্যা-মোস্তান'-ও চুল-দাড়ি ফেলিয়া আবার 'টুকন' হইতে আসিয়াছে! তাহাকে দেখিয়া বিশ্বকবির 'এসো হে বৈশাখ' মনে পড়িল। যথার্থই 'বৎসরের আবর্জনা' দূর করিতে আসিয়াছে সে! অধৈর্য হইয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর কতক্ষণ, চিন্তা? হয়ত কহিলাম -- এই ধরেন এক ঘন্টা। কেহ শধাইলেন, কী রে -- কয়জনের পরে? কহিলাম, এই তো দাদা-- একটা চুল, একটা হাফ চুল (বাচ্চার), ৩টা দাড়ি, ইহার পরেই ...। আপনার তো ডবল, মানে চুল কাটা এবং কলপ? ইত্যাদি সওয়াল-জবাব চলিতেই থাকে! কে কখন 'আমি আছি' বলিয়া কোনদিকে চলিয়া যান, মনেই রাখিতে পারি না। ফিরিয়া আসিলে লাইনের পরের জনকে চেয়ারে দেখিয়া অনেকে রাগ দেখান।

ভাবিতেছিলাম, যদি চিন্তা-র সেলুনেও অগ্রিম নাম লিখাইবার সিস্টেম করা যাইত! মানে, ডাক্তারদের চেম্বারের মতো আর কি! খুব সুবিধা হইত। ডাক্তারবাবুরা রাগ করিবেন না যেন! নাপিতের সহিত ডাক্তারের তুলনা করি নাই! চুল কাটার সহিত পেট কাটারও তুলনা করি নাই। কেবল সিস্টেমের তুলনা। জানি, ডাক্তারবাবুরা নিজেদের সহিত 'ভগবান' ছাড়া আর কাহারও তুলনা পছন্দ করেন না! তাঁহারা রাগিলে কী হয়, জিবি কাণ্ড এবং তাহ'র পরেও তো দেখিলাম! সরকারি চাকরিতেও আপন মর্জির মালিক তাঁহারা। কের চৌমুহনির চা দোকানি চুনি পাল যখন ইচ্ছা হঠাৎ স্টোভ নিভাইয়া যেমন সকলকে 'চা নাই' বলিয়া বিদায় দিতে পারেন, তেমনি ডাক্তারবাবুরাও যখন ইচ্ছা চেম্বার-হাসপাতাল সকলি বন্ধ করিতে পারেন। তাঁহারা বড়ই 'মুডি' কি না! তবে, চিন্তা-র সেলুনে ডাক্তারদের

চেম্বার-সিস্টেম চলিবে না। কারণ, বিশ্বায়নের যুগে মানুষ নিজেকে এত বেশি পরিষ্কার রাখিতে ভরসা পায় না! অপরিষ্কার থাকে, রোগ বাধায় আর ডাক্তারের চেম্বারে ভিড় বাড়ায়। রাত দুইটা পর্যন্ত সেলুন চলিবার কোনও সম্ভাবনা নাই হে চিন্তা!

কী কথা-তে কী ভাবিতেছি! আসেন, পহেলা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানাই সকলকে। সদ্‌ভাবনা বিনিময় করি! আমাদের গরিয়া, বিঝু, বৈসু উপলক্ষেও শুভ কামনায় আলিঙ্গন করি। কিন্তু, মনে যে খটকা! সকলের প্রতি শুভ ইচ্ছা হয় কেমন করিয়া? ব্যাঙের প্রতি শুভেচ্ছা, সাপের প্রতিও শুভেচ্ছা! আবার সাপ-ধরা ওঝাকেও শুভেচ্ছা? হিংস্র বাঘের শুভ হইলে ছাগশিশু বা মেষশাবকের কোনও 'শুভ' অবশিষ্ট থাকে? শহিদ সূর্যসন্তান সুদীপ্ত গুপ্তের পিতাকে শুভেচ্ছা, আবার সুদীপ্তর নিষ্ঠুর খুনিদের প্রতিও শুভেচ্ছা? শাহবাগের ডাকে লাখো ছাত্র-যুবার দুনিয়া-কাঁপানো সংগ্রামকে শুভেচ্ছা, আবার মৌলবাদের ঘৃণিত হিংস্র প্রতিক্রিয়াকেও শুভেচ্ছা? শুভেচ্ছা লাকি আক্তারকে, আবার গোলাম আজমকেও? ত্রিপুরার শান্তিপ্রিয় জনতাকেও শুভেচ্ছা, আবার খুনি অপহরণকারী জঙ্গিদের প্রতিও শুভেচ্ছা? জঙ্গি-বিরোধী সংগ্রামকেও শুভেচ্ছা, আবার জঙ্গি-সহযোগী রাজনৈতিক গডফাদারদের প্রতিও শুভেচ্ছা? কী করিয়া এইরকম শুভেচ্ছা হয়! যে শুভেচ্ছার ফুল এ দেশের আড়াই লক্ষ আত্মঘাতী কৃষকের পরিবারে এখটু সহমর্মিতার বার্তা আনে, সেই ফুলেরই মালা পরাইতে হইবে সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক এবং তাহাদের দেশীয় উমেদারদের গলেও? খটকা রে ভাই খটকা!

– কিন্তু কেন? (একেক করিয়া কাস্টমার বিদায় করিতেছি আর মাথার ভিতরে পোকার কামড় খাইতেছি! ভাবনা কোথা হইতে কোথায়!) কেন, দুনিয়া জুড়িয়া, সমাজ-সংসার ব্যাপিয়া মানুষে মানুষে এত ভেদ, এত দ্বন্দ্ব? কেন এইরকম খাদ্য-খাদক সম্পর্ক? 'শুভেচ্ছা জানাই' বলিলেই তো চলিবে না! শুভ-র সহিত যাহাদের বা যাহার কোনও সম্বন্ধ নাই, নিশিদিন মানুষেব অশুভ চিন্তাই যাহাদের জীবনে '.কেবলম'– তাহাবা মানুষের শুভেচ্ছা পাইতে পারে? না, এই বাংলা নববর্ষেও পাইতে পারে না। শুভেচ্ছা জানাই তাহাদের, যাহাবা 'শুভ কর্মপথে' পায়ে পায়ে চলে আর গাহে 'নির্ভয় গান'। শুভেচ্ছা জানাই, যাহারা সমাজের শুভ-তে আপনার শুভ দেখিতে পায়, মানুষের শুভ চায়, ত্রিপুরার শুভ চায়, স্বদেশ ভারতভূমি আর জগতের শুভ চায়। শুভ চিন্তা, শুভ শক্তির জয় হউক, অশুভের হউক বিনাশ– ইহাই তো চিন্তা শীলের সহজ সরল কামনা। যে বারণ জানে না, সে বরণও জানে না। আসুন সকলে মিলিয়া নতুন বৎসরেও বারণ কবি অশুভে। বরণ করি শুভকে। তাই, ১৪২০ বাংলা-র প্রথম সকালে যে গান গাহিতে চাই – "মুছে যাক গ্লানি/ঘুচে যাক জরা/অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা ...। এসো হে বৈশাখ, এসো এসো।"

(প্রকাশ: ১৫.০৪.২০১৩)

তেরছা নজর !

রানার-কবি সুকান্ত সেই কবে লিখিয়াছিলেন, "কত চিঠি লেখে লোকে / কত সুখে প্রেমে আবেগে স্মৃতিতে / কত দুঃখে ও শোকে।" কিন্তু, আজকাল এসএমএস, ই-মেইলের যুগে লোকে আর 'কত চিঠি' লেখে কই ! কপাল ভাল, আমাদের রাজ্যে একটি করিৎকর্মা প্রদেশ কংগ্রেস বিরাজ করিতেছে ! দুঃখে-শোকে, রাগে-বিরাগে নিজেদের চিঠি-সংস্কৃতি বাঁচাইয়া রাখিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর। নিজেরা মরিলেও (মানে— ভোটে ধরাশায়ী হইলেও) তাহারা চিঠির অভ্যাস মরিতে দিবেন না ! চিঠি মারিয়াই চলিবেন ! সর্বশেষ চিঠির প্রসঙ্গ— এম জি এন রেগা।

চিঠি-র কথা শুনিয়া গিন্নি হঠাৎ গদগদ ! হ্যাঁ-গা, মনে পড়ে আমি ইস্কুলে পড়িবার সময় একবার ফুটপাথের 'প্রেমপত্র' বই হইতে টুকলি করিয়া আমাকে ভালবাসার চিঠি লিখিয়াছিলে ? গিন্নিমুখের খোলা ট্যাপে কলকল জলের হাসিধারা থামিলে কহিলাম — হ্যাঁ, সেই ভুলেরই তো প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি ! কিন্তু, এই চিঠি সেই চিঠি নহে। ইহা দিল্লিকে চিঠি। রেগা-র কাজে ত্রিপুরা এইবারও দেশের ৩৪টি রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের মধ্যে 'সেরা' হইয়াছে। রাগে দুঃখে অভিমানে, কেন্দ্রকে এই 'ঘোষণা' বাতিল করিতে ১৬ এপ্রিল গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকে চিঠি পাঠাইয়াছে প্রদেশ কংগ্রেস।

— আবার চিঠি ? ১০ টাকার লালমোহনের মতন দুই চক্ষু বিস্ফারিত চিন্তা -গিন্নির। কহিলেন, এক চিঠিতে পাঁচ হাজার আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট বেকারের চাকরি বন্ধ। ভোটের পরেও বেকারদের বুকের সেই জ্বালা জুড়ায় নাই। কেন্দ্রে কংগ্রেসেরই সরকার। দিল্লির মন্ত্রী অফিসার এমনকি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বারে বারে ত্রিপুরার আইনশৃঙ্খলা, সরকারের আর্থিক শৃঙ্খলা, জনগণের বিপুল অংশকে উদ্বুদ্ধ করিয়া উন্নয়নযজ্ঞ অগ্রসর করিবার প্রশংসায় মুখর। স্বয়ং উপরাষ্ট্রপতি আসিয়া ত্রিপুরার পুলিস বাহিনীকে দেশের শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়া গিয়াছেন। অন্তত দুই ডজন, বিষয়ে কেন্দ্রই সেরা-র পুরস্কার দিয়াছে ত্রিপুরাকে। আর প্রদেশ কংগ্রেস কেবল ক্ষোভের চিঠি দিয়াছে। এত প্রশংসা, এত পুরস্কার বন্ধ করিতে বলিয়াছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা যাহাতে [illegible] প্রশংসা বন্ধ রাখেন, দাবি করিয়াছে। শুনিয়াছি, ভোটের আগে রেগা-র কাজ বন্ধ

রাখিতেও চিঠি দিয়াছিল কংগ্রেস। পশ্চিম জেলায় কিছু কাজ আটকাইয়াও গিয়াছিল। এখন তো ভোট শেষ। আবার চিঠি কেন?

– শুন গিন্নি, প্রদেশ কংগ্রেস কহিতেছে, ত্রিপুরায় রেগার কাজে 'ঘোর অনিয়ম' হইয়াছে। তাই শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা বাতিল করা হউক। ঠিকই শুনিয়াছ, ভোটের আগে কিঠি দিয়া রেগা-র কাজে বাধা দেওয়া হইয়াছিল। এমনকি, বরাদ্দের সব টাকাও কেন্দ্র দেয় নাই। মোট ১২৪৮ কোটি বরাদ্দের মধ্যে ৯৮৯ কোটি দিয়াছে। তাহাও সময়মতন দেয় নাই। ৩১ মার্চ আর্থিক বছরের শেষ দিনেও নাকি কিছু টাকা দিয়াছে! এত বাধা, এত অসহযোগিতার মধ্যেও ত্রিপুরায় ২০১২-১৩ বছরে মাথাপিছু ৮৬ শ্রমদিবসের বেশি কাজ দেওয়া হইয়াছে। সারা দেশের গড় কত জানো? মাত্র ৩০ শ্রমদিবস। অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে কোথাও ৫০ শ্রমদিবসের কাজও হয় নাই! আর কেবল কি এই বছর? ২০০৬ হইতে মাঝখানে ২ বছর বাদ দিলে প্রতিবছরই রেগা-তে ত্রিপুরাই সারা দেশে সেরা। গত বছরও ৮৬ শ্রমদিবসের কাজ দিয়া শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। প্রধানমন্ত্রী আর অন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কথা থাক, কেন্দ্রের বাঘা বাঘা আই এ এস অফিসাররাও কি নির্বোধ?

– অনিয়মটা তাহা হইলে কী? রেগা-র কার্ডধারীরা বছরে কতদিন কাজ করিতেছেন নিজেরাই তো জানেন! কহিলাম, গিন্নি – অনিয়মের কোনও শেষ নাই! বামফ্রন্টের জমানায় ত্রিপুরার প্রতি জনপদে জনগণের নির্বাচিত সংস্থা রহিয়াছে। গ্রাম পঞ্চায়েত, ভিলেজ কমিটি, পঞ্চায়েত সমিতি, জিলা পরিষদ, নগর পঞ্চায়েত, পুর পরিষদ সর্বত্র নিয়মিত নির্বাচন হয়। সমস্ত কাজের মতন রেগা-র কাজেও রহিয়াছে জনগণের প্রত্যক্ষ নজরদারি। আছে যথাসম্ভব স্বচ্ছতা। গ্রাম-সংসদ, ভিলেজ-সংসদে হিসাব পেশ, নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ হয় নিয়মিত। কংগ্রেসের দৃষ্টিতে এইগুলি সবই 'অনিয়ম'! এক কালে ২ টাকা মজুরির টেস্ট রিলিফের দাবিতে মিছিল হইলে কংগ্রেস সরকার বন্দুকের গুলি চালাইত। রাজপথ রক্তে ভাসিত। অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মানুষ মরিত। উহাই ছিল 'নিয়ম'। এখন গরিব মানুষ কাজ পাইতেছেন, অনাহার নাই, ভিক্ষাবৃত্তি নাই, বাবুদের বাসাবাড়িতে 'কাজের লোক' মিলে না! সবই তো 'অনিয়ম'। নির্বাচিত পঞ্চায়েতের বদলে 'উন্নয়ন (লুটপাট) কমিটি' থাকিবে, রাস্তা-ইশকুল-স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং রেগার টাকা যথেচ্ছ লুট হইবে– ইহাই কংগ্রেসের কাছে 'নিয়ম'!

– আরও আছে। বামেদের সমর্থনে থাকা প্রথম ইউ পি এ সরকারকে এম জি এন রেগা আইন চালু করিতে হইয়াছিল। "অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি"-তে কাজের গ্যারান্টি আইনের কথা ঢুকাইতে হইয়াছিল। কেন না, সত্তরের দশক হইতেই বামেরা সারা দেশে '১০০ দিনের কাজ'-এর দাবিতে আন্দোলন করিতেছিলেন। কংগ্রেস কখনও এই দাবি করে নাই।

সুতরাং, 'রেগা' নামক আইনটা হওয়াই একটা "অনিয়ম"! আর সবচেয়ে বড় 'অনিয়ম' তো বামপন্থীদের সরকার গঠন এবং ত্রিপুরার মতন দুর্বল রাজ্যে এত বছর সেই সরকার বিপুল জনসমর্থনে টিকিয়া থাকা!

– এক ভোট গিয়াছে, আরেক ভোট আসিতেছে গিন্নি। ২০১৪-তে লোকসভা নির্বাচন। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের চিঠি চলিতে থাকিবে। সেইসব চিঠি কোথায় কাহার ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত হইবে কেহ জানে না। উহারা বিধানসভা ভোটে পরাজয়ের কারণ খুঁজিতে 'ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং' কমিটি' করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু, জনবর্জিত হইবার আসল 'ফ্যাক্ট' তো 'ইনট্যাক্ট' রহিয়াছে। সেই 'ফ্যাক্ট' হইল উন্নয়ন-বিরোধিতা। ত্রিপুরার যাহা কিছু ভাল, তাহার প্রতি তেরছা নজর। এই নজরের কোনও সংশোধন নাই। ফলে 'ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি'-ও শেষতক শূন্য প্রসব করিবে। মিলাইয়া লইয়ো।

(প্রকাশ : ২২.০৪.২০১৩)

দাগ ধুইয়া দে

ইংরাজ আমলে নাকি লাটসায়েবের গাড়ি নামিলে রাস্তা ফাঁকা হইয়া যাইত। আর এখন মহামহিম রাজ্যপালের গাড়ির কনভয় আসিবার আগেই ট্রাফিক পুলিসেরা রাস্তা খালি করিতে এমন 'শ্যামের বাঁশি' বাজাইতে থাকেন, মনে হয় এই বুঝি দম ফাটিয়া মরিবেন! মোট কথা, স্বাধীন দেশেও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলিতেছে। নহিলে কি আর গত সোমবারের 'দুই খান কথা' বেমালুম উচ্ছেদ হয়! গিন্নি বেজান ঠ্যাস্ মারিলেও কিছুই করিবার নাই। একে প্রাক্তন মন্ত্রী আরবের রহমান প্রয়াত, তাহে আবার মাটির সহিত সম্পর্কহীন বড় (!) সাংবাদিকের 'মাটির মানুষ' রচনা। তাই বিনা নোটিসে চিন্তা-র কলম উৎখাত হইল। ন্যাঃ, কোনও অভিযোগ নাই। কেবল, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

রাস্তা-র কথা যখন উঠিল তখন রাস্তা-র কথাই বলি। কী যে শুরু হইয়াছে রাজ্য জুড়িয়া! প্রায় প্রতিদিন রাস্তা-রা তাজা রক্ত খাইতেছে। 'গীতাঞ্জলি'-র শতবর্ষ শেষে ববীন্দ্র ঠাকুর বাঁচিয়া থাকিলে ত্রিপুরা-র রাজ পরিবার ছাড়িয়া এখন বোধকরি কেবল রাজপথ লইয়াই লিখিতেন। আরও একবার 'এত রক্ত কেন' উচ্চারণ করিয়া মর্মভেদী জিজ্ঞাসা ছুঁড়িতেন -- 'আর কত রক্ত'? এখন জঙ্গি-সন্ত্রাস স্তিমিত। পথ-দুর্ঘটনাই যেন এই ছোট্ট রাজ্যটির নিত্য-ঘটনা হইয়া উঠিয়াছে। অকাতরে, অবলীলায় অমূল্য প্রাণের নিধন হইতেছে। উদয়পুরের মেধাবী স্কুল ছাত্রী শ্রীতমা-র মৃত্যু এখনও বিস্মৃতির কুয়াশায় ঢাকা পড়ে নাই। গত বছরের ১৮ আগস্টের ঘটনা। গত ২ মে আমতলির রামঠাকুর সেবা মন্দিরের সম্মুখে ট্রাকের চাকায় পিষিয়া গেল ১৩ বছরের নারায়ণ পাল। সেই দিনই ছয় ঘন্টার ব্যবধানে মাত্র ৬ কিলোমিটার দূরের ভুঁইয়ার মাথা-য় মারা পড়িলেন ডাক্তার ও শিক্ষিকা দম্পতি। ইহার কয়েক ঘন্টা পরে আমবাসা-গণ্ডাছড়া সড়কে দুই উপজাতি যুবককে খুন করিল একটি লরি। মদ্যপ চালক ছিল স্টিয়ারিংয়ে। ইহার সাত দিন আগে আগরতলার কল্যাণীতে পথেই জীবন্ত পিষ্ট হইলেন এক শিক্ষক দম্পতি! তাহারও আগে ...!

এইসব ভয়াবহ দুর্ঘটনা, টিভি পত্রিকার হেডিং হইতেছে। অসহ্য-দর্শন ছবি হইতেছে। আমরা দেখিয়া কিছুক্ষণ উঃ আহ্ করিতেছি। কিন্তু একটু পরেই পথে নামিয়া বাইক, স্কুটি-স্কুটার,

অটো-জিপ-বাস-ট্রাক কিংবা প্রাইভেট কার লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছি। ভিড়ের রাস্তায় যেথায় যখন খুশি হঠাৎ রিক্শা বা সাইকেলের হ্যান্ডেল বাঁয়ে-ডাইনে-পিছনে ঘুরাইয়া কেরামতি দেখাইতেছি। খোলা মাঠে হাঁটিবার ঢং-এ অলস পায়ে রাস্তা পার হইতেছি। সংগঠনের পতাকা লইয়া 'ট্রাফিক সপ্তাহ' পালন করিতেছি। মন্ত্রীর ভাষণে হাই তুলিয়া সতর্কতার শপথ লইতেছি। কিন্তু কেহ সতর্ক হইতেছি না, সচেতনও হইতেছি না।

সেলুনে চুল কাটিয়া পেট চালাইলেও চিন্তা ভাবিয়া দেখিয়াছে, কোনও দুর্ঘটনাই বিনা কারণে ঘটে না। 'দৈব-দুর্বিপাক' বলিয়া কিছুই নাই। গাড়ির সামনে 'বিড়াল-মাসি' রাস্তা ক্রস করিলে থামিয়া বা পিছাইয়া কোনও উদ্ভট নিয়ম নিয়মিত পালন করিলেও দুর্ঘটনা এড়ানো যায় না! ত্রিপুরার জনসংখ্যা বাড়িয়াছে। রাস্তা বাড়িয়াছে। সর্বত্র রাস্তাঘাট মসৃণ এবং প্রশস্ত হইয়াছে। রাজ্যের মানুষের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে যানবাহনের সংখ্যা বিপুলভাবে বাড়িয়াছে। আজকাল-এ পরিবহন মন্ত্রীর হিসাব পড়িয়াছি। গত ১০ বছরে যানবাহনের সংখ্যা ৫৮,৫৮১ হইতে বাড়িয়া নাকি হইয়াছে প্রায় আড়াই লাখ। জনসংখ্যা এই সময়ে ১৬ শতাংশ বাড়িলেও যানবাহনের সংখ্যা বাড়িয়াছে ৪০০ শতাংশের উপর! সঙ্গে বাড়িয়াছে জীবনের গতি, যানবাহনেরও গতি! আমাদের জীবনযাত্রা আর সংস্কৃতি যেন এই গতি ধারণ করিতে পারতেছে না।

কিন্তু, এইগুলিই দুর্ঘটনার কারণ? আমরা কি আরও বুদ্ধিমান হইতেছি না? শিক্ষার হারও কি অনেক বাড়ে নাই? অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক– সর্বক্ষেত্রেই কি আমাদের সচেতনতা বাড়িতেছে না? আমরা কি আরও সভ্য এবং দায়িত্বশীল হইতেছি না? এইখানেই ফস্কা গেরো, এইখানেই যেন 'হ্যাঁ' বলিতে সংশয়। আসলে, আধুনিকতার সহিত আমাদের স্বার্থপরতা, অসহিষ্ণুতা দ্রুত বাড়িতেছে। আমরা কেবল নিজের কথা ভাবিতেছি। অন্যের প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, ইচ্ছা-অনিচ্ছা-র মূল্য দিতে ভুলিয়া যাইতেছি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইঁদুর-দৌড়ে নামিয়া মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতেছি। কে কাহাকে কীভাবে টপকাইব, কী করিয়া কাহাকে ল্যাং মারিয়া সামনে পৌঁছিব– তাহারই চেষ্টায় লিপ্ত থাকিতেছি। এইজন্য ট্রাফিক আইন ভাঙিতে হইলে যতবার পারি ভাঙিব! ব্যানার্জিবাবু বলেন, এই প্রবণতা নাকি পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের কুফল, সর্বগ্রাসী ভোগবাদের পরিণতি।

বিশ্বায়ন হউক কিংবা নিঃস্বায়ন হউক, ভোগবাদ হউক কিংবা কোনও দুর্ভোগ-বাদ হউক, এ এক নির্ভেজাল আত্মঘাতী মূর্খতা। এক অন্ধকারমুখী স্রোতে ভাসিয়া চলা। আইন কঠোর করিবার পাশাপাশি সচেতনতার ক্ষুরধার অস্ত্রে মানবিক মূল্যবোধ জাগাইয়াই ইহার মোকাবিলা করিতে হইবে। সর্বব্যাপক উদ্যোগ ব্যতীত কাজ হইবে না। শ্রীতমা, নারায়ণদের রক্তাক্ত কচিমুখগুলির ছবি রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঝুলাইয়া আমাদের বিবেকের পিঠে চাবুক

মারা হউক। বাইক বা গাড়ির 'বেপরোয়া গতিতেই চালকের গৌরব'– টেলিভিশনে প্রচারিত এই সমস্ত বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ হউক। এইগুলি যে 'আত্মহত্যা' এবং 'যাত্রীহত্যা-র প্ররোচনা' সে কথা সরকারিভাবেই ঘোষিত হউক। সতর্ক ও সাবধানী হউন' চালকেরা। অতিরিক্ত যাত্রীবহন, রেষারেষি, বেপরোয়া গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হউন যাত্রীরা। ট্রাফিক আইন ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করুন। একজনের সঙ্গে দশজন প্রতিবাদী হইলে আইন ভঙ্গকারী সাহস পাইবে না। আর কত রক্ত ? এই মর্মভেদী জিজ্ঞাসা-র জবাবে আমরা, রবীন্দ্র-সান্নিধ্য-ধন্য ত্রিপুরার মানুষই তো বলিতে পারি - না, আর রক্ত নয়! শুন্-রে রাস্তা-র দল, তোদের আর রক্ত খাইতে দিব না! আয় – তোদের গায়ের রক্তের দাগ ধুইয়া দিব। তোদের বন্ধু করিব। সামনে চলিবার সাথী করিব।

(প্রকাশ ঃ ০৬.০৫.২০১৩)

বিষবৃক্ষের ফল !

বন্ধ হইবার জন্যই খোলে।

ইহারই নাম চিটফান্ড ! আর কে না জানে, যত আইন তত ফাঁক ! আইনের নানান ফাঁক-ফোকর বাহির করিয়াই চিটফান্ডের আমানত সংগ্রহ। চতুর্দিকে শিকড়-বাকড় যত ছড়াইয়া পড়ে, চিটফান্ডের বিশাল মহীরুহ ভূপাতিত হইবার কালে তত বড় ভূমিকম্প ঘটে। শেষমেশ ত্রিপুরায়ও সেই ভূমিকম্পের শুরু ?

দুরু দুরু বক্ষে প্রমাদ গনিতেছেন রাজ্যের কয়েক লক্ষ আমানতকারী এবং তাহাদের পরিবার পরিজন। সদর মহকুমা-শাসক বলিতেছেন, রাজ্যের সর্ববৃহৎ 'চিটফান্ড' সংস্থাটির অফিসে কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা হিসাবে গরমিল পাইয়াছেন। ২০ বছর পুরানো সংস্থার বিশ সহস্র এজেন্ট কহিতেছেন – রাজ্যের কোনও আমানতকারী ম্যাচুরিটির টাকা ফেরত পান নাই, এমন একটিও ঘটনা এই সংস্থার ক্ষেত্রে আজ অবধি ঘটে নাই। কোনও আমানতকারী নাকি প্রশাসনের কাছে অভিযোগও করেন নাই। এইসব শুনিয়া চিন্তা-র সেলুনে বসা বিশিষ্ট মাথাওয়ালারাও অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হিসাব কিছুতেই মিলাইতে পারিতেছেন না। রাজ্য মন্ত্রিসভা চিটফান্ড লইয়া যখন সিবি আই তদন্তের সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন যাহা করিবার সিবিআই-ই করিত। হঠাৎ রাজ্য প্রশাসনের আমলারা এত তাড়াহুড়ায় হিসাব পরীক্ষার জন্য ঝাঁপাইলেন কেন ? এতকাল কোন বশীকরণ মন্ত্রে তাঁহারা নিদ্রিত ছিলেন ? সেলুনে এমনও মন্তব্য শুনিলাম, সিবিআই আসিবার আগেই নাকি নির্দিষ্ট দুই-একজন বড় আমলা সংস্থাটির অফিস হইতে 'বশীকরণ অঙ্কের হিসাবপত্র' নিজেদের হস্তগত করিতে অতি ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন ! চিন্তা অবশ্য বিশ্বাস করে নাই। কেন না, নিন্দুকেরা কতরকম কথাই বলিয়া থাকে !

ব্যানার্জিবাবু কহিলেন, পশ্চিমবাংলার সারদা-কাণ্ডের সহিত ত্রিপুরার ঘটনা সম্পূর্ণ মিল খায় না। বাংলায় ২০০৮ হইতে শুরু হওয়া 'সারদা' ২০১১-র নির্বাচনে 'অবদান' রাখিয়া নতুন আমলেই ফুলিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রী, নেতা আর সুন্দরী তৃণ-তারকা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরকে দেখিয়া লোকে সারদায় টাকা রাখিয়াছে। ত্রিপুরায় কখনও কোনও দলের নেতা-মন্ত্রীর মুখ

দেখিয়া কেহ টাকা ঢালে নাই। কেন্দ্র ব্যাঙ্ক পোস্ট-অফিসের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সুদ কমাইয়া দিয়া এন বি এফ সি-গুলিকে জনারণ্যে চরিয়া খাইতে ছাড়িয়া দিয়াছে। আর বি আই, সেবি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান হাত উল্টাইয়া কহিতেছে 'চিটফাণ্ড' বা এন বি এফ সি আমাদের জুরিডিকশনের মধ্যে পড়ে না। কেন্দ্র কহিতেছে, রাজ্যই যাহা করিবার করিবে। আর 'চিটফাণ্ড' সংস্থাগুলি এক রাজ্যে নিবন্ধীকরণ করিয়া সাত রাজ্যে ব্যবসা করিতেছে। বিদেশ ভ্রমণ, হোটেল ব্যবসা, আবাসনের অগ্রিম বুকিং ইত্যাদি নানান রাস্তায় আমানত সংগ্রহ করিতেছে। লোকে অল্প সময়ে দুই পয়সা বেশি পাইবার আশায় টাকা জমা করিতেছে। বেকার ছেলেমেয়ে, গৃহবধূ-রা 'এজেন্ট' হইয়া কিছু রোজগারের পথ পাইয়া খুশি থাকিতেছেন। রাজ্য কহিতেছে, সাত রাজ্যে ব্যবসা করা সংস্থাকে এক রাজ্যের সরকার কী করিবে, কোন আইনে কবিবে?

তবুও, ত্রিপুরা সরকার ২০০০ সালে একটি আইন করিয়াছিল। সকল ফ্যাকড়া দূর করিয়া রুলস্ করা হইল ২০০৭-এ। কিন্তু, তাহাতেও বেড় না পাইয়া ২০১১ সালে আইন এবং রুলস্ দুইটিই সংশোধন করিয়া 'অভিযান' শুরু করা হইল। তালিকা করিয়া দেখা গেল, প্রায় ৯০টি এন বি এফ সি নানান 'অনুমতি'-র কাগজপত্র লইয়া ত্রিপুরায় রহিয়াছে। একটি অনুমতিও ত্রিপুরা সরকারের দেওয়া নহে। ইহাদের মধ্যে আবার ২৭টি ব্যবসা গুটাইয়া আগেই পলাইয়াছে। বহু মানুষের আমানত গিয়াছে। বাংলার সারদা-কাণ্ডের পর ত্রিপুরা বিধানসভায়ও বিরোধীরা হইচই জুড়িলেন। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ শুরু হইল। সর্বভারতীয় মিডিয়াতেও সেইসব কথা প্রচার করিয়া মুখ্যমন্ত্রী এবং বাম সরকারের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করিবার জোর প্রয়াস শুরু হইল। বিরোধীরা সি বি আই চাহিলেন। মুখ্যমন্ত্রী কহিলেন, আমাদের আপত্তি নাই। মন্ত্রিসভায় সি বি আইয়ের সিদ্ধান্ত হইল। ইহার পরই হঠাৎ প্রশাসনের তরফে পর পর কিছু সংস্থায় হানা এবং কিছু গ্রেপ্তার।

ব্যানার্জিবাবু আরও কহিলেন, চিন্তা—ত্রিপুরায়ও চিটফান্ডের প্রতারণা নতুন নহে। সত্তরের দশকে জয়লক্ষ্মী ফিনান্স, নাগাল্যান্ড ক্রেডিট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট, গ্লোবাল, সঞ্চয়িনী ইত্যাদি বহু সংস্থা কিছুকাল ব্যবসা করিয়া লোকের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া পলাইয়াছে। তখন মিডিয়ার এমন রমরমা ছিল না। থাকিলে তখনও ভূমিকম্প হইত। এখন মিডিয়া না থাকিলে সারদা-কাণ্ডও লোকে জানিতে পারিত কি না সন্দেহ। সারদা-র মতন সংস্থা তাই ১৮টি মিডিয়া হাউস খুলিয়া বসিয়াছিল। এই সকল সংস্থা টিকে না, টিকিবে না, জানিয়া শুনিয়াই বেশিরভাগ লোক স্বল্প মেয়াদে টাকা রাখে। কিন্তু যে করিয়াই হউক 'রোজভ্যালি' নামক প্রধান এন বি এফ সি সংস্থাটি রাজ্যের গরিব নিম্নবিত্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের এমন বিশ্বাস অর্জন করিয়াছে যে, এইসব মানুষ হঠাৎ প্রশাসনের এই সক্রিয়তাকে 'বিনা মেঘে বজ্রপাত' মনে করিতেছেন। কেন না, সন্দেহ জমা হইলে টাকা জমা বন্ধ হয়। তখন এই সব সংস্থায় ধস নামে। এজেন্টরাও তাই প্রশাসনকেই দুষিতেছেন।

যাহাই হউক, আইন আইনের পথে চলিলেই মঙ্গল। প্রশাসনের কোনও আমলা-র হঠাৎ অতি সক্রিয়তা দেখা গেলে তাহার কারণও তদন্ত করিয়া দেখিতে হইবে। রাজ্য জুড়িয়া আচমকা অস্থিরতা সৃষ্টি করিয়া কেহ ঘোলা জলে মৎস্য শিকারের ধান্দা করিতেছেন কি না– তাহাও অনুসন্ধান করা আবশ্যক। অসংখ্য আমানতকারী, যাহারা নিজেদের কষ্টার্জিত টাকা ওই সব সংস্থায় জমা করিয়াছেন, তাহারা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সকলের আগে বোধকরি তাহা-ই নিশ্চিত করা দরকার। ভবিষ্যতে এই ধরনের সংস্থাকে জন্মলগ্নেই যাহাতে থামাইতে পারা যায়, সেই লক্ষ্যে অভিন্ন একটি কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নের দাবি জোরদার করিতে হইবে।

আগে টাকা কেবল বিনিময়ের মাধ্যম ছিল। এখন 'টাকা' নিজেই পণ্য। এমনকি টাকা ছাড়াই 'টাকা' ক্রয়-বিক্রয় চলিতেছে। 'স্বপ্নের ভবিষ্যৎ' বিক্রয় হইতেছে। বীজ পুঁতিবার আগেই গাছ বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। এমনকি বারংবার সেই 'গাছ' এই হাত হইতে সেই হাতে পুনর্বিক্রয় সম্ভব করিয়া অঙ্কের হিসাবে কাল্পনিক 'টাকার পাহাড়' গড়া হইতেছে! ইহা একটি স্বপ্ন-শৃঙ্খল। একটি জোড় খুলিলেই পাহাড় ধসিবে। তাহাতে লক্ষ-কোটি মানুষের সর্বনাশ! এন বি এফ সি সেই ফাটকা অর্থনীতিরই একটি বিষবৃক্ষের ফল মাত্র। রাষ্ট্র পরিচালকেরা এই বিষবৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালিলে বিষফল হইতে দূরে থাকা জনগণের পক্ষে সহজ নহে। অথচ দূরে থাকিতেই হইবে। নহিলে ...।

(প্রকাশ : ১৩.০৫.২০১৩)

কেবল পিছায়!

সেলুনে কখনও কখনও কাহারও কানে একটু -আধটু কাঁচির খোঁচা লাগিতেই পারে। কিন্তু এ ব্যাটা কেমন কাস্টমার! কান বাঁচাইয়া চুলের প্রান্তে ক্ষুর না ঠেকাইতেই 'কান কাটা গিয়াছে' বলিয়া লাফাইয়া উঠিল! জিভে যাহা আসে উচ্চারণ করিয়া গালমন্দ জুড়িল। মিথ্যা তো মিথ্যা, তাহার উপর যেমন রুচি তেমনই ভাষা! আরে ভাই, তোমার কান আমি কাটি নাই! উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাও ক্যান? যাও—তোমার চুল কাটিব না। আধা-ছোলা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াও!

'তরোয়ালে দাড়ি চাঁছা'-র উপমা ভাবিতেছি, এমন সময় কানে আসিল মাইকের শব্দ- 'গাহি সাম্যের গান ...'। মনে পড়িল আজ নজরুল জয়ন্তী। চোখে ভাসিল তাঁহার বাবরি চুল। নাপিতের পুত কি না! মিথ্যা বলিব না, কাজি সাহেবের বাবরি কাটিবার জন্যই বোধকরি হাতের কাঁচি আপনা হইতেই কিচ্‌কিচ করিয়া উঠিল! আহা-হা, কেমন চুল! কোনও সেলুনে তাঁহার কান কাটা যাইবার কোনও আশঙ্কা থাকিবার কথা নহে। দেশ ভাগ হইলে কী হইবে! কে যেন বলিয়াছেন – 'ভাগ হয়নি কো নজরুল'! খাঁটি কথা। ত্রিপুরায়, পশ্চিমবাংলায় আজ কত অনুষ্ঠান! আর বাংলাদেশের তো 'জাতীয় কবি'। লোকমুখে শুনিলাম – সেখানে আজ আকাশে বাতাসে নজরুল আর নজরুল! আগরতলা-আখাউড়া রেল চালু হউক। বাঁচিয়া থাকিলে ট্রেনে চাপিয়া, গিন্নি-নাতি-নাতনি সমেত ৯ কন্যা আর জামাই বাবাজীবনদের লইয়া একবার নজরুল-জন্মদিনেই না হয় ঢাকা ঘুরিয়া আসিব। কিন্তু, আগরতলা-আখাউড়া রেল কবে হইবে?

পাড়ার রেল-পুলিস নাথবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম। দাদা – হইবে তো? পত্রিকায় দেখিয়াছি, শিগ্‌গিরই জমি অধিগ্রহণ হইবে? বাধারঘাট স্টেশন হইতে আখাউড়া পর্যন্ত রেলপথ নাকি মাত্র ১৫.৬৪ কিলোমিটার? কবে হইবে? নাথবাবু গোঁফের নিচে খৈনি-দাগা দাঁতে হাসিয়া কহিলেন, শুন হে চিন্তা –দিল্লির সরকারের হাতে এমন এক 'রিমোট' রহিয়াছে, তাহাতে কেবল 'রিওয়াইন্ড'-এর বোতাম। টিপিলেই সবকিছু কেবল পিছনে দৌড়ায়! ২০ তলার উপর হইতে লাফ মারিয়া নিচে পড়িবার বদলে নিচ হইতে আবার উপরে উঠিয়া যায়!

আগরতলা হইতে উদয়পুর আর সাব্রুমের রেলও পিছায়, কেবল পিছায়! ব্রডগেজ পিছায়, কেবল পিছায়! ১২-তে হইবার কথা, হইল ১৩। অবার ১৩ হইতে পিছাইয়া হইল ১৪। এখন শুনি, ২০১৪-তেও হইবে না! ২০১৫-তে ব্রডগেজ হইবে, উদয়পুর পর্যন্ত রেলও যাইবে। কেন্দ্রের হাতে টাকা নাই। ১৫ হইতে পিছাইবে না, কে বলিতে পারে! আখাউড়ার সঙ্গে রেল সংযোগও কবে সম্পন্ন হইবে কেহ জানে না!

ভাবিলাম – এইগুলি তো সবই শুনিয়াছি ' জাতীয় প্রকল্প'। ইহাতেও এই দশা? আই পি এলে শত সহস্র কোটির বেটিং আর জুয়া চলিতেছে, লক্ষ-কোটির চুরি-কেলেঙ্কারি ঘটিতেছে, দেশবাসীর ট্যাক্সোর টাকা লুণ্ঠনে দিল্লির নেতা-মন্ত্রীদের বাক্সো ভর্তি হইতেছে। রেলমন্ত্রীর চেয়ার কোনও মানবদেহের উষ্ণতায় গরম হইবার পূর্বেই খালি হইয়া যাইতেছে। চার বছরে অন্তত ৫ রেলমন্ত্রী! একেবারে জেমিনি সার্কাস! পশ্চাদ্‌পদ অঞ্চলের জরুরি রেল প্রকল্পের টাকা-তেও হাত পড়িতেছে। ঘোষিত বাজেট হইতেও টাকা কমিয়া যাইতেছে। ইহা কি অপদার্থতা? উদাসীনতা? নাকি ইচ্ছাকৃত রাজনৈতিক প্রবঞ্চনা? নাথবাবু যোগ করিলেন – সেদিন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সেফটি অফিসার বসুমাতারি সাহেব আগরতলা পর্যন্ত ট্রেন ভ্রমণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে তাঁহার নিজেরই চক্ষু কপালে! ইহার নাম ট্রেন? না আছে চলাচলের সময়-গময়, না আছে ন্যূনতম যাত্রী-নিরাপত্তা। কেন্দ্রের রিপোর্টে সমগ্র পরিষেবা কেবল পিছায়! শুধাইলাম – এই অবস্থা আর কতকাল চলিবে! নাথবাবু কহিলেন, চলিতে দিলে আরও চলিবে। এখন ২০১৫ বলা হইতেছে! কিন্তু ২০১৪-র ভোটে দিল্লিতে ইউ পি এ-র 'রিমোট সরকার' গণেশ উল্টাইলে কী পরিস্থিতি হয়, তাহারই কিছু ঠিকানা নাই। বামেদের শক্তি বাড়িলে ত্রিপুরার ভরসা কিছুটা বাড়িবে – এই কথা বলিতে পারি।

ঠিক, লাখ কথার একখানা। চলিতে দিলেই চলিবে! কিন্তু, রেল লইয়া এই টালবাহানা যে সত্যিই আর চলিতে দেওয়া যায় না! দুই বাম যুব সংগঠন ডি ওয়াই এফ আই, টি ওয়াই এফ আগস্টের ৫ তারিখ আগরতলায় সমাবেশ করিয়া গুয়াহাটি অভিযান শুরু করিবে শুনিলাম। ব্রডগেজ, সাব্রুম আর আখাউড়া রেল দ্রুত সম্পন্ন করিবার দাবিতে। ১৯৮৬-তে হইয়াছিল দিল্লি অভিযান। সেই ঠ্যালায় আগরতলায় রেল আসিয়াছে। এইবার গুয়াহাটি অভিযান। দেখা যাক, এই ঠ্যালায় জিয়ৎকালে রেলে সকলের সঙ্গে ঢাকা যাইতে পারি কি না! তাই এখন যুবক দলের সহিত পা মিলাইয়া গাহিতে চাই- 'চল চল চল / উর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল / নিম্নে উতলা ধরণীতল / অরুণ প্রাতের তরুণ দল/ চল রে চল রে চল।'

(প্রকাশ: ২৭.০৫.২০১৩)

ওষুধ দিব কোথা!

– উঃ বাব্বা, অ্যাত্তো গরম! হাতপাখার ডাঁটায় আপন পৃষ্ঠদেশের ঘামাচি-সাম্রাজ্যে আরেকবার প্রাণপণ চুলকানি মারিয়া কহিলেন গিন্নি। শব্দ হইল খস্-খস্, খসর-খসর!

অকস্মাৎ, কী ভাবিয়া জিজ্ঞাসা ছুঁড়িলেন – 'হ্যাঁগা, অ্যাত্তো গরমেও কংগ্রেস অ্যামন ঠান্ডা কেন? রাজ্যটার শহর-নগর, গ্রাম-পাহাড় জুড়িয়া একটা এতবড় উপনির্বাচন হইতেছে। কংগ্রেস কই!' কী জবাব দিব? কহিলাম– গিন্নি, কংগ্রেস ছিল, আছে, থাকিবে। উপরে নিচে ডাইনে বাঁয়ে। এই সব উপনির্বাচনে তাহাদের উৎসাহ নাই। দিল্লিতে উপ (ইউপিএ)-সরকার আছে, উপ-টৌকন (ঘুষ) আছে, আর দলের ভিতরে দিকে দিকে আছে উপ-দল! উপনির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েত, ভিলেজ কমিটি, পঞ্চায়েত সমিতি, নগর পঞ্চায়েত কিংবা জেলা পরিষদের মেম্বর? আরে ছোঃ। ভাবিতেও সময় নষ্ট! এই উপনির্বাচনে নেতাদের মন্ত্রী হইবার চান্স নাই, এমপি-এম এল এ হইবারও ব্যাপার নাই! 'জনগণের হাতে ক্ষমতা, টাকা'- এই সব কথা ভাষণে বলা যায়! বাস্তবেও কংগ্রেস নেতাদের মানিতে হইবে না কি! খামোকা ঘরের খাইয়া তাঁহারা বনের মোষ কেন তাড়াইবেন। বিধানসভা ভোটের কোমরব্যথা এখনও দিনে-রাতে গুম্-গুম্ চাগাড় দিয়া উঠে। বিশ্রাম, এখন শুধুই বিশ্রাম! এন সি সি-র প্যারেড দেখ নাই? 'বিশ্রাম' অবস্থায় পিছনে দুই হাত নিয়া, দুই পা ফাঁক করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। তখন, 'তে-চল' বলা যায়? অ্যাটেনশন (সাব্ধান) অবস্থায় ফেরত না আনিয়া অন্য কোনও কমান্ড চলে না! কিন্তু, প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা এখন নিজ-নিজ ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়া ব্যস্ত। কোনও টেন্শন নাই। তাঁহাদের 'অ্যাটেন্শন' কমান্ড দিবে কে? হাই-কমান্ডেও কিছুই হইবে না!

গিন্নি শুধাইলেন – 'সে কী, গ্রাম শহরের এত মানুষ তো ১৯ জুন ভোট দিবেন। তাহাদের মধ্যে অ-বাম সমর্থকের সংখ্যাও বিশেষ কম নহে। কংগ্রেসের মাথাব্যথা থাকিবে না? মহা-মুশকিল, এই প্রস্তর-ঘিলু মহিলাকে 'ইলু-ইলু' করিয়া বুঝাইলে কিছুই বুঝে না। প্যাচাল পাড়িতেই থাকে! আরে ভাই শুন, প্রদেশ কংগ্রেসের এখন মাথা নাই, মাথা ব্যথাও নাই! যিনি আছেন, তিনি তো বিধানসভা ভোটের বিপুল পরাজয়ে সাড়ম্বরে ইস্তফা দিয়া এখনও

'অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট'। বিরোধী নেতা-ও নাই। যিনি আছেন তিনিও 'অ্যাকটিং'! দুই চেয়ারের অন্য দাবিদারেরা ভিতরে ভিতরে 'রি-অ্যাক্টিং'! নেতারা ভোটে-নোটে যত 'মালামাল' হইতেছেন, কর্মী-সমর্থকেরা ততই দলে দলে দল ছাড়িয়া 'লালে-লাল' হইতেছেন। যে কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত আর ভিলেজ কমিটি দখলে ছিল, সেইগুলিও পদত্যাগের হিড়িকে হাতছাড়া হইতেছে। সুবল-এর মতন তরুণ-তুর্কি নেতাও কংগ্রেস ভাঙিয়া নতুন দল করিয়াছেন। সু-বলের বল যাহাই হউক, কংগ্রেস দিনে দিনে বলহীন, বীর্যহীন!

চাহিয়া দেখো, জোট-শরিক আই এন পিটি-র অবস্থা আরও করুণ! বিধানসভা ভোটে কোনও আসন জিতিতে না পারায় কংগ্রেসও আর তাহাদের পাত্তা দিতে রাজি নহে। অথচ বিজয় রাঙ্খলেরা এক কালে এত যে করিয়াছিলেন, সে কাহার জন্য! এখন উপনির্বাচনে এডিসি-র ভিলেজ কমিটির ৪১টি আসনের মধ্যে আই এন পি টি-কে কিনা মাত্র ১০ আসন? অপমান, অপমান! রাঙ্খলরা ক্ষুব্ধ। বনে-বাদাড়ে ঝোপে-ঝাড়ে লাঠি মারিয়া গায়ের জ্বালা জুড়াইতে চাইতেছেন। নাম দিয়াছেন 'আন্দোলন'! কিন্তু, সত্য হইল— কংগ্রেসের নিকট 'উপজাতি'-র অর্থ সর্বকালেই উপ-জাত (বাই-প্রোডাক্ট)! কিছু বাড়তি ভোটের সংখ্যার বেশি কংগ্রেসের কাছে তাহাদের কোনও মূল্য নাই।জঙ্গল-বন্ধুরা 'জঙ্গা' চালাইবার শক্তি হারাইয়াছে বলিয়া এখন রাঙ্খলরা পাত্তা পাইতেছেন না। আই এন পি টি সমেত সাবেক উপজাতি যুব সমিতির সমস্ত ছিন্নাংশের অনিবার্য ভবিষ্যৎ আগাম বুঝিতে পারিয়াছিলেন রতিমোহন, দেবব্রত, দিবাচন্দ্রের মতন নেতারা। তাঁহারা আগেই কংগ্রেসে ঢুকিয়া পড়িলেও দলে আজ তাঁহাদেরও কি পাত্তা আছে?

বুঝিলে গিন্নি, মোদ্দা কথা – ত্রিপুরার মানুষের একটা দোষ বাম-বিরোধীরা কখনও শোধরাইতে পারিতেছেন না। তাহা হইল, কথায় না মজিয়া কাজ দেখিবার দোষ! নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে শিখিবার দোষ! বামেরা এই দোষকেই 'চেতনা' বলিয়া থাকে। এই উপনির্বাচনের আগে সি পি এম-কে দেখ। কে বলিবে মাত্র কিছুদিন আগের বিধানসভা ভোটে ইহারাই এত বড় জয় হাসিল করিয়াছেন! কোনও বিশ্রাম নাই, আলস্য নাই। এই গরমে এস এফ আই সারা রাজ্যে শিক্ষা-শিবির করিয়া গরিব ছাত্রছাত্রীদের পড়াইয়াছে। ছাত্র-যুব-নারী-শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক সংগঠনগুলির সদস্যারা দুঃস্থ রোগীদেব জন্য সারা রাজ্যে কাতারে কাতারে আপন দেহের রক্ত দান করিতেছেন। যুব সংগঠনগুলি ব্রডগেজ লাইন, সাব্রুম আর আখাউড়া রেলের জন্য অভিযানে নামিয়াছে। সি পি এমের ডাকে খাদ্য নিরাপত্তা-সহ কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দামের জন্য সর্বশেষ পৌনে দুই লক্ষ মানুষ গণসত্যাগ্রহে গ্রেপ্তার বরণ করিলেন। অন্য দিকে, নতুন সপ্তম বাম সরকার তিন বছরেই সমস্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রূপায়ণের জন্য তৃণমূল স্তরে ত্রিবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন। এই সময় কোথায় বাম-বিরোধীরা? কোথায় কংগ্রেস?কোথায় আই এন পিটি,

এন সি টি বা তাহাদের ভোটবন্ধুরা? এই বামফ্রন্টকে মানুষের কাছে আলাদা করিয়া ভোট চাহিতে হয়? দরকার আছে? কিন্তু দেখ, তবুও গ্রামে পাহড়ে প্রতিদিন মিছিল সভা সমাবেশ, বাড়ি-বাড়ি প্রচার, পতাকা ফেস্টুনে ঝাঁপাইয়াছে কাহারা? কেবল বামফ্রন্ট, সিপিএম। পঞ্চায়েত নির্বাচনই নহে, তাঁহাদের লক্ষ্য ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে দিল্লিতে বিকল্পের সম্ভাবনা উপস্থিত করা। সর্বক্ষেত্রে জন-বিরোধী নীতি চালাইতে গিয়া ব্যর্থ, পর্যুদস্ত, অপদস্থ কেন্দ্রের উপ (ইউ পি এ) -সরকার দুর্নীতি-কেলেঙ্কারির মহাসাগরে হাবুডুবু খাইতেছে। তাহাদের বাঁচা বড় মুশকিল!

– তবে? গিন্নি মাটিতে হাত-পাখার বাড়ি মারিয়া তারস্বরে কহিলেন, তবে যে বলিতেছ কংগ্রেসের মাথাব্যথা নাই? আমি তো দেখিতেছি– কংগ্রেসের মাথায় কেবল ব্যথাই ব্যথা! এখানে বাছারা মিছামিছি ওষুধ দিবে কোথা? সারা দেশে, সর্বাঙ্গেই তো ব্যথা! আর দেখ– ভাল হইবে না বলিতেছি! ত্রিপুরার প্রদেশ-বাছাদের কাঁচা ঘুম ভাঙাইও না। একদম না! ২০১৮-র আগে তাহাদের আবার জাগিয়া উঠিতে হইবে না? এখন শুধু ঘুম!

(প্রকাশ ঃ ০৩.০৬.২০১৩)

এখনই ...

– হ্যাঁ গা, সেলুনের চেয়ারে বসিয়া আর কক্ষণও ঘুমাইয়ো না। তোমার তো বদ-অভ্যাস। কাস্টমার না থাকিলেই ...। খবরদার! গণদূত-এর ম্যানেজারের দশা হইতে কতক্ষণ! উঃ মা-গো, বিপত্তারিণী– ক্ষেমা করো মা। কী অলুক্ষুণে কথা উচ্চারণ করিলাম!

সেলুনের উদ্দেশে পা বাড়াইয়াও থামিলাম। গিন্নির সোয়ামি-প্রীতি টের পাইয়া গৌরবে চিন্তার সাড়ে আটাশ ইঞ্চি বুক সওয়া তিরিশ হইল! ধারে কাছে কেহ নাই। কিঞ্চিৎ সোহাগ করিবার বাসনায় গিন্নির গদা-মুষল দক্ষিণ হস্ত আকর্ষণের চেষ্টা করিতেই হঠাৎ বজ্রপাত! শক্তিরূপেণ সংস্থিতা নারী হুঙ্কারিলেন –'ছিঃ'। পান-চর্চিত স্ত্রী-মুখের কৃষ্ণগহ্বর হইতে 'ছিঃ'-এর সঙ্গে একখানা টুকরা-সুপারি বুলেটের মতন ছিটকাইয়া চিন্তা-র বক্ষে আঘাত হানিল! কহিলেন – প্রথমে পত্রিকা অফিসে সশস্ত্র আক্রমণ, তিন-তিনটি খুন! কী যেন? ও হ্যাঁ, 'গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ রক্তাক্ত। ভূ-ভারতে এমনকি পৃথিবী-গ্রহে সংবাদপত্রের উপর এমন ভয়ঙ্কর আক্রমণ ঘটে নাই! কী অবস্থা চলিতেছে এই রাজ্যে'! তাহার পরে– পত্রিকার খোদ মালিক-সম্পাদককেই কি না তিন খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিস গারদে পুরিল। বহুবার রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ-সফরসঙ্গী প্রবীণ সম্পাদক গ্রেপ্তার! কোনও প্রতিবাদ নাই, মিছিল নাই! সি বি আই নাই। রাজভবন অভিযান নাই! পুলিসমন্ত্রীকে বরখাস্ত করিবার দাবি নাই! তোলপাড়-তোড়ফোড় কিছুই নাই। মিডিয়া দাদা-রা কাদা হইয়া গেলেন নাকি? ছিঃ!

সেলুনে আসিয়া গিন্নির বজ্রবাক্যবহ্নির বর্ণনা শুনিয়া ব্যানার্জিবাবু কহিলেন, মিডিয়া দাদা-রা কাদা? ভাল বলিয়াছেন তোমার বজরংবলি স্ত্রী। মাড্-মেড্ মিডিয়া? না হে চিন্তা, ব্যাপারখানা মোটেই সেইরকম নহে। বরং উল্টা। অন্তত এই ঘটনায় ত্রিপুরার সংবাদ-মাধ্যম মোটের উপর ভাল ভূমিকায়। কাহাকেও ইহা লইয়া রাজনীতি করিতে উৎসাহ দেয় নাই। গ্রেপ্তার হওয়া পত্রিকা মালিক-সম্পাদক কট্টর বাম-বিরোধী হইলেও আপন সুকৃতি-কর্মে তিনি বাকি সকলের নিকট এতটাই অপ্রিয় এবং অসহনীয় ছিলেন যে, কেহই তাহার পাশে নাই। প্রথম দিকে কেহ কেহ 'গণতন্ত্রের চুতর্থ স্তম্ভ' ইত্যাদি বলিতে চেষ্টা করিলেও বেশিরভাগেরই সন্দেহ ছিল– এই ভয়ঙ্কর ঘটনার পিছনে ওই

মালিক-সম্পাদকের হাত থাকা অস্বাভাবিক নহে।

ভাবিলাম, ঠিকই তো। ত্রিপুরায় সংবাদপত্র এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন। এতটাই 'স্বাধীন' যে, প্রায়শই ইহার চূড়ান্ত অপব্যবহারের অভিযোগও উঠিয়া থাকে। এমনকি যাহারা যত বড় ক্রিমিনালই হউন না কেন, টাকা থাকিলে যখন খুশি পত্রিকা বা চ্যানেল খুলিতে পারেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কুৎসা, যথেচ্ছ ব্ল্যাক-মেলিং, লাগাতর চূড়ান্ত মিথ্যাচার, ব্যক্তি-চরিত্র হনন ইত্যাদি অক্লেশে চালাইতে পারেন। কিন্তু এইসব কারণে আজ পর্যন্ত কোনও মিডিয়া অফিসে এমন আক্রমণ বা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে নাই! জোট আমলের পাঁচ বছর বাদ দিলে প্রকাশিত সংবাদের কারণে একজন সাংবাদিক বা সংবাদপত্র কর্মীও খুন বা রক্তাক্ত হন নাই। গণদূত ভবনে একসঙ্গে তিন খুন?

ধৃত মালিক-সম্পাদক দোষী কি নির্দোষ, তাহার বিচার করিবেন মাননীয় আদালত! কিন্তু, ইতিমধ্যেই তাহার বিরুদ্ধে পুলিস যে সমস্ত সাক্ষ্য, তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করিয়াছে, তাহাতে তদন্তকারীদের ধারণা, তিন খুনের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। পুলিসকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য 'আমিই টার্গেট ছিলাম' বলা, ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা– কী না করিয়াছেন তিনি! তথ্য প্রমাণ ও সাক্ষ্য লোপাট করিবার জন্য নিহত বলরামের প্রত্যক্ষদর্শী ১৩ বছরের কন্যাকে দুধের সহিত ঘুমের ওষুধ খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া রাখিতেও তিনি দ্বিধা করেন নাই বলিয়া পুলিসের দাবি। এমনকি, পুলিসের ধারণা, গাড়ি চালক বলরামকে প্রলুব্ধ করিয়া প্রথম দুইটি খুন করাইবার কালেও তিনি সঙ্গী ছিলেন। সবশেষে বলরামকে খুন করিল কে, এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরও মারাত্মক ইঙ্গিত করিতেছে। এইগুলি যদি সত্য হয়, বুঝিতে হইবে – কথায় কথায় ছাঁটাই বা চাকুরিচ্যুতিই কেবল নহে, সংবাদ-কর্মীদের জীবনও এই গোত্রের সংবাদপত্র দপ্তরে নিরাপদ নহে।

ব্যানার্জিবাবু আরও যোগ করিলেন, সাংবাদিক, চিত্র-সাংবাদিক এবং অসাংবাদিক কর্মীদের প্রায়শই জীবনের ঝুঁকি লইয়া কাজ করিতে হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের তরফে তাহাদের কোনও জীবনবিমা নাই। বহুক্ষেত্রে নিয়োগপত্র, ন্যূনতম বেতন ভাতা-র বালাই নাই। সুশীলবাবুর মতন মালিকদের নিকট তাহাদের জীবনেরও কোনও মূল্য নাই। নিজের সাদা-কালা ধান্দা, ক্ষমতা- প্রতিপত্তি, জমি আর অর্থলোভের কারণে মুখে 'সন্তানসম' বলিলেও যে কোনও সংবাদপত্র কর্মীকে যে-কোনও সময় যূপকাষ্ঠে চড়াইতে তাহাদের বাধে না। শুনিয়াছি, শ্রমজীবী সাংবাদিকদের সংগঠন একবার সুশীলবাবুকে তাহার প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য বোনাস ও এক্সগ্রাসিয়া দিতে বলিলে তিনি মুখের উপর 'না' বলিয়া দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, 'জার্নালিস্ট' কর্মীদের প্রকাশ্যে 'জেনারেলিস্ট' বলিয়া বিদ্রূপ করিতেও ছাড়েন নাই।

সেলুনে চুল-দাড়ি কাটা চিন্তা শীল অতশত জানিবে কোথা হইতে! লেখাপড়া নাই, জ্ঞান নাই, বুদ্ধি নাই। তাই চুপ থাকিলাম। কিন্তু, এতক্ষণ চুপ থাকা নাথবাবু পত্রিকার পাতা হইতে মুখ তুলিয়া কহিলেন, শুন চিন্তা– খুনের দায়ে গ্রেপ্তার হওয়া মালিক-সম্পাদক হইলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 'বিশ্বত্রাস' হিটলার! আপাতত মিডিয়া-বিশ্বকে ঘৃণিত হিটলার-বাহিনীর তাণ্ডব হইতে রক্ষা করিতে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া আর পুঁজিবাদী ফ্রান্স-ব্রিটেন-আমেরিকা একজোটে 'মিত্রশক্তি'। সব মিডিয়ার সাংবাদিক-অসাংবাদিক শ্রমিক-কর্মচারী আর মালিক কর্তৃপক্ষ একজোট। কতদিন এই আপাত-ঐক্য থাকে লক্ষ্য রাখিবার বিষয়। কিন্তু এখনও কোনও মালিক-সম্পাদককে ওই তিন খুনের আসামি মালিক-সম্পাদকের সমর্থনে সরাসরি দাঁড়াইতে দেখিতেছি না। ইহা অতি শুভ লক্ষণ। সুতরাং মিডিয়া দাদা-রা কাদা হন নাই। আপাতত বেশি কালা-র বিপরীতে নিজেদের সাদা প্রমাণের প্রয়াসও কম গুরুত্বের নহে। এখনই সময়, ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ উঠুক, খুনি-প্রতারক-মাফিয়াদের থাবা হইতে মুক্ত হউক সংবাদ-মাধ্যম।

(প্রকাশ: ১০.০৬.২০১৩)

স্বাগতম

শান্ত আকাশে হঠাৎ হেলিকপ্টারের চক্কর! এক-দুই-তিন-চারবার। বারবার! এত নিচে, যেন লম্বা মুলিবাঁশে পাকা আম পাড়িবার মতন খোঁচা মারা যাইবে! ঘরের চালে, উঠানে, ধানখেতে যন্ত্র-ঈগলের ছুটন্ত ছায়া। বাতাসের ঝাপটায় গাছ-গাছালির মাথা দুলিতেছে। বিকট শব্দে সন্ত্রস্ত কাক-শালিকেরা দিক্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া চিৎকার করিতে করিতে পলাইতেছে। এমন ঘোর ঘনঘটায় চিন্তা-গিন্নিও রান্না ফেলিয়া ঘরের বাহিরে। শ্রীমতীর শ্রীমুখে অস্ফুটে দুইটি মাত্র শব্দ উচ্চারিত হইল, 'তিনি আসিতেছেন'!

বুঝিলাম, 'তিনি' মানে ভারতের মহামহিম রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি। দুই দিনের সফরে ত্রিপুরায় আসিবেন ২০ জুন। তাঁহার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিতেই আকাশে কপ্টারের চক্কর। ২০০৫ সালের ২৯ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের কপ্টার পালাটানায় অবতরণ করিয়াছিল। সেদিন তিনি যে বিদ্যুৎ প্রকল্পের শিলান্যাস করিয়া গিয়াছিলেন, ২০১৩-র ২১ জুন তাহারই বাণিজ্যিক উৎপাদনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করিবেন রাষ্ট্রপতিজি। চিন্তাব মনে বড়ই আনন্দ। ত্রিপুরাবাসীমাত্রই আনন্দে বিভোর। শিলান্যাসকালে অবশ্য প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়াছিলেন, তিন বছরেই প্রকল্পের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হইবে। তিন-এর জায়গায় আট বছর লাগিলেও এখন সেই অল্প-কথার ঢেকুরে কাজ নাই। ২০০৮-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে মনমোহনজির হেলিকপ্টার দ্বিতীয়বার পালাটানায় অবতরণ করে। কে বি আই ময়দানে কংগ্রেসের নির্বাচনী জনসভার নিমিত্ত। পালাটানা তখনও সেই পালাটানাতেই। কাজের কাজ তেমন কিছুই হয় নাই। ফলে রাজ্য জুড়িয়া বামেরা পালাটানা লইয়া প্রধানমন্ত্রীর নিন্দামন্দে মুখর। ২০১৩-র ভোট প্রচারে মনমোহনজি আর কোন মুখে আসেন! আসিলেনই না। শেষ পর্যন্ত এখন, ২১ জুন পালাটানায় নামিবে রাষ্ট্রপতির হেলিকপ্টার। মাত্র আট বছরে দেশের দুই 'প্রধান'-এর হেলিকপ্টার তৃতীয়বার নামিবে ক্ষুদ্র ত্রিপুরার কোনও এক অখ্যাত বনগ্রাম পালাটানায়। ধন্য পালাটানা।

শুনিয়াছি, পালাটানা চালু হইলে বিদ্যুতের জন্য ত্রিপুরার ভিক্ষা করা বন্ধ হইবে। রাজ্যে ভিক্ষাবৃত্তির মতন লোডশেডিংয়েরও অবসান ঘটিবে। তাহার পরে আসিতেছে মনারচক, উদ্বৃত্ত বিদ্যুতের নবযুগ লইয়া। চিন্তা-গিন্নির মতন কিছু অবিশ্বাসীর কোনও কিছুতেই যেন বিশ্বাস নাই! তাহারা বলিতেছেন, ২০০৫-এ শিলান্যাস সারিয়া প্রধানমন্ত্রী রাজ্য

ছাড়িতেই পালাটানা যেমন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, এইবার রাষ্ট্রপতি ফিরিবার পরেও একই দশা হইবে! ওটিপিসি-র কর্তারা অনিশ্চয়তার মেঘ এখনও সরাইতে পারিতেছেন না। তথাপি, নিন্দুকদের মুখ কালা! আমরা মেঘমুক্ত সূর্যের আশায় রহিলাম।

সেলুনে পাড়ার বর্ধনবাবু কহিলেন, দেশের প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতির প্রথম ত্রিপুরা সফর। ধন্য বাঙালি! ব্যানার্জিবাবু কহিলেন, তুমি বাঙালি হিসাবে গর্বিত হও। আপত্তি নাই। কিন্তু, তাহাতে ত্রিপুরার কী? ত্রিপুরা তো আর বাংলা নহে, কিংবা বাঙালির রাজ্যও নহে। পূর্ব বাংলা হইতে বিতাড়িত বাঙালিরা না আসিলে ত্রিপুরায় তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইত কী? শচীন-কর্তা বাঙালি ছিলেন না। জন্মসূত্রে ত্রিপুরি। কিন্তু 'বাংলাদেশের ঢোল' বাজাইয়াই তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। ত্রিপুরার কোন্ বাঙালি এমন পারিয়াছে? অথচ তিনি 'ককবরক' জানিতেন কি না, কেহ জানে না! জাদু কলিজা, হজাগিরির সুরও তাঁহাকে কতটা টানিয়াছে কেহ জানে না।

ব্যানার্জিবাবু আরও যোগ করিলেন, রাষ্ট্রপতি হইবার আগে প্রণব মুখার্জি কয়েকবারই ত্রিপুরায় আসিয়াছেন। কংগ্রেস নেতা হিসাবে। উচ্চশিক্ষিত, ভদ্র, বিনয়ী, অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। 'বামঘেঁষা' বলিয়াও তাঁহার 'সুনাম' অথবা 'দুর্নাম' রহিয়াছে। কিন্তু, 'ভুলি কেমনে, আজও যে মনে ...'। ত্রয়োদশ অর্থকমিশন ত্রিপুরাকে দশ হাজার কোটি বঞ্চনার কালে তিনিই তো কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। ত্রিপুরার অর্থমন্ত্রী এই কারণে বিশেষ প্যাকেজ চাহিতে গিয়া দিল্লিতে তাঁহারই রূঢ় ব্যবহারে ব্যথিত মনে, শূন্য হাতে ফিরিয়াছিলেন। বেকারদের চাকরি দেওয়াই নাকি ছিল বাদলবাবুদের অপরাধ! রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি ত্রিপুরার মানুষের জমা করা ১০০ টাকা হইতে মাত্র ৩৩ টাকা এ রাজ্যে বিনিয়োগ করে। ইহা বাড়াইবার দাবি কখনও কানে তুলিয়াছিলেন তিনি? লুঠেরা চিটফান্ডগুলির বিরুদ্ধে কড়া আইন করিতে ত্রিপুরা সরকারের দাবিতেও আমল দেন নাই। বুঝিলে বর্ধন, সবই হইতেছে নীতি। দল আর সরকারের নীতির বাহিরে কিছু করেন নাই প্রণববাবুও।

ব্যানার্জিবাবুর সব কথা এই মুহূর্তে কেন জানি চিন্তার মোটেই ভাল লাগিল না। প্রণব মুখার্জি আর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নহেন। তাঁহাকে এখন কোনও দলের নেতা হিসাবেও পরিচয় দিবার সুযোগ নাই। তিনি এখন দেশের সম্মাননীয় রাষ্ট্রপতি। সাংবিধানিকভাবে সর্বোচ্চ পদাধিকারী। অতীত যাহাই হউক, তাঁহার আসন্ন রাজ্য সফরে আমরা সকলেই আনন্দিত, গর্বিত। ত্রিপুরার হিতের জন্য, আরও দ্রুত উন্নতির জন্য, তাঁহার শুভেচ্ছাই আমাদের সকলের কাম্য হওয়া উচিত হইবে। সাব্রুম অবধি ব্রডগেজ রেল, আখাউড়া রেল সংযোগ, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের সুযোগ দ্রুত সম্ভব করিতে, বাংলাদেশে জঙ্গিদের বাকি ঘাঁটিগুলি নির্মূল করিতে, ত্রিপুরাতে বড় শিল্প আনিতে মাননীয় রাষ্ট্রপতিজির প্রভাব, সদিচ্ছা, উদ্যোগ আমাদের কাম্য হউক। প্রণব মুখার্জি আপনি ত্রিপুরায় স্বাগত। সুস্বাগতম রাষ্ট্রপতিজি।

(প্রকাশ: ১৭.০৬.২০১৩)

খড়মাদর্শ!

ভানুবাবুকে খুব মনে পড়িতেছে। না-না, মাপ করিবেন! কম্যুনিস্ট নেতা ভানু ঘোষ নহেন কিংবা মন্ত্রী ভানুলাল সাহা-ও নহেন। কৌতুকাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। রামায়ণের এমন ক্ষুরধার বিশ্লেষণ আর কেহ করিতে পারেন নাই। বগলের নিচে সূর্য-কে চাপা দিয়া দিনকে রাত করিয়াছিলেন হনুমান। সেই রীতি মানিয়াই যে থার্মোমিটার বগলের নিচে রাখা হয়, ভানুবাবুই তো প্রথম জানাইয়াছিলেন! আর 'দাদা-র খড়ম'-এর তো জবাব নাই! এখন আর কোনও সন্দেহ নাই যে, ত্রিপুরার 'সদ্য-প্রাক্তন' হওয়া প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সুদীপ রায় বর্মনও সেই খড়মাদর্শে বিশ্বাসী!

সেলুনে বসিয়া ভাবিতেছিলাম অন্য কথা। 'রামরাজত্ব'-কে কেন যে 'আদর্শ' মানিতে বলা হয় বুঝি না! রাম আবার স্থিতিশীল রাজত্ব করিলেন কবে! বনে আর রণেই কাটিল বেচারার রাম-জীবন। বরং 'ভরত-রাজত্ব' বলিলে অন্তত ১৪ বছরের বাত্ পাক্কা। বৃদ্ধ দশরথ এক তরুণী ভার্যার মন রাখিতে রামকে পাঠাইলেন বনে, ভরতকে দিলেন সিংহাসন। জনগণ মানিবে কেন! তুষানলের মতন জনরোষ সামাল করিয়া বুদ্ধিমান ভরত সেই সিংহাসনে নিজে না বসিয়া 'দাদা-র খড়ম' রাখিয়া চৌদ্দ বছর চালাইয়া দিলেন। ভাল-মন্দ, শান্তি-অশান্তি, প্রজাদের উপর জোর-জুলুম, উচ্ছেদ, ট্যাক্সো বসানো ইত্যাদি 'যাহা করে – সব করে দাদা-র খড়ম'! ভরত নিমিত্তমাত্র! এ হেন তীক্ষ্ণবুদ্ধির ভরত-কে কেন যে আহাম্মকদের নামের আগে বসাইয়া 'জড়ভরত' বলা হয় তাহা-ও বুঝি না!

ত্রিপুরার 'অশিক্ষিত, মূর্খ, বিত্তহীন (তাই বুদ্ধিহীন!)' গবু ভোটারেরা নির্বাচনে 'পরিবর্তন' নামক গুরুগম্ভীর স্লোগানটির উপরে এমন ন্যাদাইয়াছে যে উহার ন্যাদা-সমাধি হইয়া গিয়াছে! ডান কি বাম, বহুকাল এই স্লোগান আর কেহ দিবেন বলিয়া মনে হয় না। 'ভোটে পরাজয়ের সকল দায় আমার' বলিয়া ইস্তফা ঘোষণা করিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সুদীপবাবু। এমনভাবে নাট্যক্রিয়া সাজাইলেন যে, দলের অন্য নেতাদের বুঝি বুদ্ধিভ্রংশ হইল। তাঁহারা 'ইস্তফা' নাটকে বিশ্বাস করিলেন। আর কেহ মাথা তুলিলেন না, বা তুলিতে পারিলেন না। কে নতুন সভাপতি হইবে? কংগ্রেস কর্মীরা যখন দড়ি টানাটানিতে কেহ বীরজিৎ, কেহ

সুরজিৎ, কেহ রতনলাল, কেহ গোপাল-এর পিছনে লাইন দিতে ব্যস্ত, তখন সুদীপের মাথায় অন্য খেলা। তিনি তখন গুপ্ত-সাম্রাজ্যের স্থপতি চাণক্য আর রামায়ণের ভরত-চরিত্র পড়িতেছেন। চাণক্য-চরিত্রের এত আত্ম-বিশ্লেষণ, আত্ম-দহন তাঁহার না-পসন্দ। কিন্তু ভরত-এর 'দাদা-র খড়ম' স্ট্র্যাটেজিতেই তিনি 'ম্যাডাম-এর খড়মজোড়া' খুঁজিয়া বাহির করিলেন। সোনিয়াজিকে দিয়া শিলমোহর করাইয়া দিবাচন্দ্র রাঙ্খলকে করিলেন নতুন প্রদেশ সভাপতি। এক নম্বর খড়ম! সঙ্গে কার্যকরী সভাপতি আশিস সাহা। খড়ম নম্বর দুই! 'পাহাড়ি-বাঙালি সম্প্রীতি-'র নতুন কংগ্রেসি দোকানে ইঁহারা যেন সুদীপের হাতের সূতায় টানা জোড়-পুতুল! কার্যকরীবাবু-কে দিয়া সকল 'কার্য' সমাধা হইবে এবং সভাপতিকে দিয়া সকল 'ধার্য বিষয়' স্বাক্ষরিত হইবে। ইহারা দুইজন কাহার কথায় উঠেন-বসেন, কাহার জন্য হাসেন-কাঁদেন-বাঁচেন, কংগ্রেসের সকল কর্মী সমর্থকই বিলক্ষণ জানেন।

কিন্তু, সুদীপবাবু চাণক্য নহেন, তৃতীয় দশরথপুত্র ভরতও নহেন। এত নিরামিষ ক্ষমতাভোগে তাঁহার রুচি নাই। তাই বিরোধী দলনেতার কুর্সিটিও তিনি নীরবে রতনলালের সব কাছি-রশি কাটিয়া নিজের দখলে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সকল নৌকায় পা রাখাই হইল কাল, তাই এখন কোথাও নাই রতনলাল! তবুও না ছাড়িয়া হাল, তিনি মুচকি মুচকি হাসিতেছেন! চালাক মানুষটি বুঝাইতে চাহিতেছেন, সামনের লোকসভা ভোটে পশ্চিম আসনে কে প্রার্থী হয়, দেখিয়া লইয়ো! হইলে ভাল। জয়ের সম্ভাবনা না থাকিলেও অর্থযোগ আছে। কিন্তু, ত্রিপুরা কংগ্রেসের বর্তমান বে-তাজ বাদশা আরও কতজনকে 'প্রতিশ্রুতি' দিয়া রাখিয়াছেন রতনলাল খবর রাখেন তো?

মোদ্দা কথাখান কী দাঁড়াইল? বিধানসভা নির্বাচনে 'যাঁহার জন্য' কংগ্রেসের শোচনীয় বিপর্যয় হইয়াছে বলিয়া তিনি নিজেও ইস্তফাপত্রে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার হাত আরও মজবুত করা হইল। সভাপতি থাকায় ব্যর্থতার দায় নিতে হইয়াছিল। এখন সকল সাফল্যের কৃতিত্ব তাঁহার হইবে। কিন্তু ব্যর্থতার দায় আর তাঁহার নহে। সেই দায় দিবাচন্দ্রের, আশিস সাহা-র। অথবা তাঁহাদের নেত্রী ম্যাডামের। কারণ, ম্যাডামই তাঁহাদের মনোনয়নে অনুমোদন দিয়াছেন! একচ্ছত্র সুদীপ রায়বর্মন। প্রমাণিত হইয়াছে, বুদ্ধিতে-বিচক্ষণতায়-তেজে এবং সর্বোপরি লবি-খেলায় ত্রিপুরার কংগ্রেসে তাঁহার ধারে কাছে পৌঁছানোর যোগ্যতা আর কাহারও নাই। অন্য নেতাদের দুর্ভাগ্য হইল, সুদীপই যে যোগ্যতম এই কথাটি তিনি নিজেই কেবল বিশ্বাস করেন না, কংগ্রেসের হাইকমান্ডও বিশ্বাস করেন!

আরও একখান সার কথা আমরা আম-জনতা বুঝিতে পারিলাম। ত্রিপুরায় কংগ্রেস দল যে পথে চলিতেছিল, সেই পথেই চলিবে। শান্তি-সুস্থিতি-উন্নতির কথায়, গণতন্ত্র কিংবা মানুষের অধিকার আদায়ে কংগ্রেসের নতুন কিছুই বলিবার নাই, করিবার নাই। শীর্ষ নেতৃত্ব কেবল

নিজেদের ক্ষমতা ধরিয়া রাখা কিংবা দখল করার চিন্তাতেই মশগুল। কেবল ভোট আসিলে নোট আসিবে, জোট ভাসিবে। ক্ষুব্ধ আই এন পি টি-ও। ক্লান্ত বিরক্ত হতাশ নিচু স্তরের কংগ্রেস নেতা-কর্মী সমর্থকেরা দলে দলে বাম শিবিরে ভিড়িতেছেন। এই স্রোত থামার বদলে বেগবান হইবে। কারণ, প্রদেশ কংগ্রেসে এখন 'খড়ম-রাজত্ব' শুরু হইয়াছে!

(প্রকাশ : ০১.০৭.২০১৩)

টা-টা টরে-টক্কা

– চিন্তা হে, অদ্যকার দিনখানা বড়ই কষ্টের। ভীষণ নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত আমি। তোমার সেলুনে দুই দণ্ড বসিতে আসিলাম।

আগন্তুক আগে ছিলেন পোস্টমাস্টার। এখন কাম নাই, তাই কবি। প্রবন্ধ-টবন্ধও নাকি ছাপা হয় পত্রিকায়। এক খরিদ্দারের পিঠে বডি-মালিশের ছক্কাচাপড় মারিয়া কহিলাম, বসেন স্যার। কিন্তু ওই কষ্ট আর নষ্ট-আলু না কী সব যেন বলিলেন, ভাল বুঝিলাম না! নষ্ট-আলু তো আর কখনওই জিইয়া উঠিবে না! ফেলিয়া দিন। বিরক্ত পোস্ট-কবি কহিলেন, আরে ভাই নষ্ট-আলু জিয়াইয়া তুলিবার কথা নহে। নস্টালজিয়া। ও তোমার মাথায় ঢুকিবে না। বুদ্ধিজীবী শব্দ। ধর, সাধারণ নর-নারীর যেমন চিকনগুনিয়া, এক্রেমশিয়া হয়, তেমনি কবিদের ঘন ঘন হয় নস্টালজিয়া। আজ ১৫ জুলাই, ২০১৩। আজি হইতেই সারা দেশে টরে-টক্কা মানে টেলিগ্রাম চিরবিদায় লইতেছে। আহা-হা, 'ভরা থাক স্মৃতিসুধা, বিদায়ের...'।

খানিকটা চমকিয়াই উঠিলাম। তাই তো, টেলিগ্রাফ নামে একটা যন্ত্রও তো ছিল। অন্য সকল যোগাযোগ-যন্ত্রের সামনেই ছিল। কবে কখন ধীরে ধীরে পিছু হটিতে হটিতে একেবারে যবনিকার অন্তরালে চলিয়া গেল, টেরই পাইলাম না। ছোটবেলায় পোস্ট অফিসের এক কোণে পিতলের ছিটকিনির মতো একটা যন্ত্র দেখিতাম–সারা দিন কেবল টরে-টক্কা, টকো-টক্কর শব্দ করিয়া চলিত। এই শব্দ নাকি অক্ষর বা কথা-সঙ্কেত। পরে হাসি-কান্নার অতি সংক্ষিপ্ত মুদ্রিত বার্তা লইয়া দরজায় ডাক-পিওন ভয়াবহ গলায় হাঁক পাড়িতেন –'টেলিগ্রাম'! সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোকজনের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিত। সর্বনাশ, কী দুঃসংবাদ কে জানে! কেননা, সুসংবাদ অপেক্ষা করিতে পারে, দুঃসংবাদের যে বড্ড বেশি তাড়া! টেলিগ্রামে তাই দুঃসংবাদই বেশি আসিত। চিন্তার ইংরেজি জ্ঞান নাই। কিন্তু, টেলিগ্রামের ভাষা তখন প্রায় সকলেই জানিত। 'মাদার সিরিয়াস কাম শার্প।' কিংবা ' ফাদার এক্সপায়ার্ড'। অথবা 'মেনি হ্যাপি রিটার্নস অব দ্য ডে'- ইত্যাদি। ইলশে গুঁড়ি হরফে মাইনর পাস ঠাকুরমা পিসেমশাইকে পোস্টকার্ড লিখিতেন, 'জামাই বাবাজি, পত্রখানিকে টেলিগ্রাম বিবেচনায় অতি সত্ত্বর উত্তর পাঠাইবা।'

পোস্ট-কবি স্যার কহিয়া উঠিলেন, কী হে চিন্তাচরণ, নষ্ট-আলুতে তোমারও তালু গরম হইল নাকি। চুপ কেন! আরে ভাই, কিছুই করিবার নাই। আমেরিকার স্যামুয়েল মোর্স সাহেব প্রথমে ছিলেন ছবি-আঁকিয়ে এবং ডিজাইনার। তাঁহার সংসার দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট তখন। এই সাহেবই ১৮৩০-এর দশকে যখন টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন, তিনিও কি কল্পনা করিয়াছিলেন একদিন তথ্য-প্রযুক্তির উন্নতিতে তাঁহার এই মহান যন্ত্রটিও বাতিল হইয়া যাইবে? গ্রিক শব্দ 'টেলিগ্রাফ' মানে হইল 'দূর-লিখন'। ১৮৪৪ সালের ২৪ মে স্যামুয়েল যখন ডিসি হইতে বাল্টিমোরে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক পদ্ধতিতে প্রথম টেলিগ্রামটি পাঠান, তাহাতে তিনি ইংরেজিতে মাত্র চারটি শব্দে কী লিখিয়াছিলেন জানো? মূর্খ চিন্তা জানিবে কোথা হইতে? তাই পোস্ট-কবি স্যার নিজেই জবাব দিলেন। লিখিয়াছিলেন, 'What Hath god wrought!' ! অর্থাৎ 'ঈশ্বর কী বানাইয়াছেন!' স্যামুয়েল এই টেলিগ্রাফ যন্ত্র দিয়া যেন 'ঈশ্বর'-কে চ্যালেঞ্জ করিতেই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু, 'ঈশ্বর' আদ্যিকালের হাতুড়ি, দাঁড়িপাল্লা, খড়্গ-চক্র-গদা-তীর ধনুকে স্থবির থাকিলেও মানুষ তো থামিতে জানে না। 'ঈশ্বর'-এর হাতে বাঁশের বাঁশি আর শঙ্খ ছিল সর্বোন্নত 'যোগাযোগ-যন্ত্র'। কয়েক হাজার বছর আগে চিনে-ইজিপ্টে-গ্রিসে যেমন ড্রাম বাজাইয়া গ্রাম হইতে গ্রামে খবর পাঠানো হইত। কিন্তু মানুষ এখন লক্ষগুণ অগ্রসর। মোবাইলে, ল্যাপটপের অন্তর্জালে গোটা বিশ্ব তাহার আঙুলে। স্যামুয়েল মোর্স বাঁচিয়া থাকিলে মানুষের এই নব নব উদ্ভাবনে নিশ্চিতই খুশি হইতেন।

পোস্ট-কবি স্যার এইবার স্বদেশে আসিলেন। কহিলেন, ১৮৩৩ সালেই নাকি ব্রিটিশরা কলিকাতা হইতে হাওড়াতে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক সঙ্কেত পাঠাইতে সফল হয়। ১৮৫৩ সালে সারা দেশে টেলিগ্রাফ অফিস ছড়ায়। শুনিয়াছি, ১৮৫৭-এর সিপাহি বিদ্রোহের কালে টেলিগ্রামের মাধ্যমে ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষরা বিদ্রোহী সিপাহিদের গতিবিধির খবর জানিয়া সেই ভাবেই দ্রুত সৈন্য মোতায়েন করিতেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া বিদ্রোহী সিপাহিরা রাস্তার পাশে টেলিগ্রাফের খুঁটি দেখিলেই উপড়াইয়া ফেলিতেন। টেলিগ্রাফের ওপর এই বীর দেশপ্রেমিকরা সঙ্গত কারণেই ক্ষুব্ধ ছিলেন। এমনই হয়। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার সকল যুগেই শাসক-শোষক শ্রেণী প্রথমে কেবল নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থেই ব্যবহার করিয়া থাকে। শোষিত শ্রমজীবীরাও ভুল করিয়া আবিষ্কৃত যন্ত্রের ওপরেই রাগ করে! একই কারণে কম্পিউটারের বিরুদ্ধেও ধ্বনি উঠিয়াছিল। এখন, টেলিগ্রাফ উঠাইয়া দিবার বিরুদ্ধেও ধ্বনি উঠিয়াছে। কারণ, কর্মীদের চাকুরি হারাইবার ভয়।

কহিলাম, ঠিকই তো! উঠাইয়া দিবার কী দরকার! কত রকমের আধুনিক বিদ্যুতের বাতি জ্বলিতে দেখি। কই, কুপি বা হ্যারিকেন তো উঠিয়া যায় নাই! পোস্ট-কবি স্যার কহিলেন, ঠিক কথা। কিন্তু, টেলিগ্রাফ অফিসে এখন আর টেলিগ্রাম হয় না। সরকার শতকোটি টাকা

গচ্চা দিয়া চলিবে? ১৯৮২-৮৩ সালেও দেশে টেলিগ্রাফ অফিসের সংখ্যা ছিল ৪৫ হাজার। বছরে আয় হইত সাড়ে ৭ কোটি। এখন অফিস বাড়ি আছে মাত্র ৭৫টি। বছরে আয় ৭২ হাজার টাকা। খরচ দেড়শো কোটি প্রায়। ২০০৬-০৭ হইতে ২০১১-১২ পর্যন্ত টেলিগ্রাফে সরকারের ক্ষতি ১৪৭৩ কোটি টাকার ওপর। আগরতলার ডাকঘরে মাসে দুই-তিনশো টাকার বেশি টেলিগ্রাম হয় না। কেবল সেনাবাহিনীর চাকরিতে টেলিগ্রামের কপি এখনও ছুটি মঞ্জুরের অন্যতম শর্ত। ব্রিটিশ আমলের এই প্রথা নিশ্চয় বদল হইবে। টেলিগ্রাফের সমস্ত কর্মীকে বি এস এন এলের অন্য কাজে নিযুক্ত করিতে হইবে। চিন্তা, তোমার কথাই ঠিক। নষ্ট-আলু ফেলিতেই হইবে। আমার জন্য নস্টালজিয়া একটু থাক। জানি, টেলিগ্রাফ আর কোনওদিন টরে-টক্কা না করিলেও সে থাকিবে, এক মহান ইতিহাসের সাক্ষী হইয়া, মানবসভ্যতার জাদুঘরে। আপাতত টরে-টক্কা টা-টা!

(প্রকাশ: ১৫.০৭.২০১৩)

অক্ষয়-কীর্তি

– 'খিচু ডিম, সব ডিম, সব খিচু'!

কনিষ্ঠা কন্যা-র পড়া মুখস্থ করা কানে আসিতেই চিন্তা-গিন্নি সংশোধন করিয়া দিলেন- উহা 'খিচু' নহে কচু! প্রতিবাদী কন্যা ঘোর আত্মবিশ্বাসে কহিল– না, উহা খিচু-ই। ইশ্কুলের মিড-ডে মিলে সপ্তাহের কোন দিন কী খাদ্য, তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা মুখস্থ করিতেছি। সোমবারে খিচুড়ি, মানে 'খিচু'। মঙ্গলে ডিম-ভাত, মানে ডিম! বুধে সবজি-ভাত, মানে 'সব'। বৃহস্পতিতে 'ডিম'-ভাত। শুক্রে সব্জি-ভাত, মানে আবার 'সব'। শনিতে খিচুড়ি বা পায়েস ইত্যাদি, মানে 'খিচু'! তবে সবশেষে 'কচু' বলিতে আপত্তি নাই। কারণ, শনিবারে তাড়াতাড়ি ইশকুল ছুটি। এই অজুহাতে বেশিরভাগ শনিবার কিছুই দেওয়া হয় না। সেদিন মিড-ডে মিল না কচু! তাই ছড়াটা হইতে পারে – 'খিচু ডিম, সব ডিম, সব কচু'!

কন্যারত্নের প্রতিভা-বাণে বিদ্ধ গিন্নি হইলেন শয্যালুণ্ঠিত। চিন্তাচরণ স্তব্ধ। উপদেশ দিলাম – ইশ্কুলের স্যার-দিদিমণিরা আগে টেস্ট করিয়া না দিলে খবর্দার, মিড-ডে মিল খাইয়ো না। কখন কী বিষক্রিয়া হয় ঠিক নাই। শুন নাই? বিহারের ছাপ্রায় মিড-ডে-মিল খাইয়া ২৩টি শিশুর প্রাণ বিনাশ হইয়াছে। তামিলনাড়ুর এক ইশ্কুলে শতেক ছাত্রী অসুস্থ। ছত্তিশগড়ের আরেক ইশ্কুলে নাকি ৩৫ শিশু মরে-মরে অবস্থা। গোয়ার একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ২৩ ছাত্র-ছাত্রীও হাসপাতালে। মিড-ডে-মিল এখন 'Mid-day-kill' হইয়া উঠিতেছে! ত্রিপুরায় এখনও এমন বড় কিছু ঘটে নাই। তবে ঘটিতে কতক্ষণ! কন্যা কহিল, না বাবা, আমাদের ইশ্কুলে স্যার-দিদিমণিরা মিড-ডে-মিলের খাদ্য আগে টেস্ট করেন না। তবে তাঁহাদের সকলের জন্য এবং সকলের বাড়িঘরের জন্য মিড-ডে-মিল আগেই আলাদা করিয়া রাখা হয়! ফলে, সবদিন সব ছাত্র-ছাত্রী যে মিল পাইবে এমনও কথা নাই। তাহা ছাড়া, অনেক স্যার তো নীলকণ্ঠ! মিড-ডে-মিল-এর চাল-ডাল-ডিম ইশ্কুলে পৌঁছিবার আগেই অনেকে হজম করিতে ওস্তাদ। বিষে তাহাদের কী ক্ষতি করিবে!

ভাবিতেছি, কন্যাটি এত বে-আদপ হইল কেমন করিয়া! আগরতলা পুর এলাকার চানমারিতে

অক্ষয় কুমার প্রাইমারি ইশ্কুলের প্রধান শিক্ষক উত্তমবাবু মিড-ডে-মিলের ২০০ কিলো টাউল চুরিতে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। এই ঘটনা না ঘটিলে কন্যাটির গালে নির্ঘাত একখান শক্ত থাপ্পড় কষাইতাম। পত্রিকায় পড়িলাম – উত্তম স্যার অজয়পন্থী শিক্ষক সংগঠনের 'কেন্দ্রীয় কমিটি'-র ক্যাশিয়ার। 'চুরি বিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি ধরা না পড়ে'। প্রধান শিক্ষক মশাই ধরা পড়িয়া গিয়াছেন ছাত্র-অভিভাবকদের হাতে। 'মাসতুতো ভাই'-রা ইহাতে 'গভীর ষড়যন্ত্র'-এর গন্ধ পাইবেন তাহাতে আশ্চর্যের কী! কিন্তু, শুনিতে পাই–এই উত্তমবাবু, মধ্যমবাবু, অধমবাবুরা নাকি ছড়াইয়া রহিয়াছেন সারা রাজ্যেই। ইশ্কুলে-ইশ্কুলে! উত্তম স্যারের মতন অজয়পন্থী তো হাতে গোনা। বরং ইহাদের মধ্যে বিজয়ী বামপন্থী আর পরাজিত ডানপন্থীরাই বেশি। বিহারের ছাপ্রায় সেই বিষাক্ত মিড-ডে মিলে কীটনাশকের সন্ধান মিলিয়াছে। ত্রিপুরায় এমন ইশ্কুলের সংখ্যা কম নহে, যেথায় শিক্ষক নামধারী কিছু জীব মারাত্মক কীট-এর মতনই শিশুদের মুখের গ্রাসে উদরপূর্তি করিতেছেন। কোথাও একজন চোর, বাকিদের না দেখার ভান। কোথাও রীতিমতন চোর-চক্র! ধরা পড়িলে 'সমিতি'-র নামে ধামাচাপার চেষ্টা। শাস্তিমূলক বদলি হইলে তাহা বাতিল করিবার দরবার। কোথাও নেতা-র মনে ভয়, লোম বাছিতে কম্বল না খালি হয়! আবার কোথাও কিছু 'নেতা'-ও সরাসরি নানা দুর্নীতিতে যুক্ত বলিয়া অভিযোগ শুনিতে পাই। সর্বশিক্ষার পাকা বাড়ি বানানো, মিড-ডে-মিলের রান্নাঘর, মাঠ সংস্কার হইতে এন এস এসের কাজ, পাকা প্রাচীর বা টয়লেট নির্মাণ – ইত্যাদি কত রকমের দায়িত্ব পালনে নিত্য-স্খলনের দৃষ্টান্ত! ইহাদের ঠেকাইবে কে!

অনেকেই বুক ঠুকিয়া কহিবেন – ত্রিপুরায় মিড-ডে-মিলের দুর্নীতি অনেক কম। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই শিক্ষকরা এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট সততা ও দক্ষতা দেখাইতেছেন। না হইলে গোটা দেশের সামনে এত সাফল্য হাজির করা যাইত না। বেশ, কথাটি সত্য মানিলাম। কিন্তু, লোকে যে বাম আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষক-কর্মচারীদের আরও অনেক উপরে দেখিতে চায়। তাঁহাদের লড়াই-সংগ্রামের পাশে সাধারণ মানুষ যেভাবে সর্বস্বপণ করিয়া একদিন দাঁড়াইয়াছিলেন লাগাতার ধর্মঘটে, সেই শ্রদ্ধা, সেই সমীহ, সেই ভালবাসার উচ্চাসনটি যে তাঁহাদেরই সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। মিড-ডে-মিল কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে চালু করিয়াছে ১৯৯৫ সালে। কিন্তু, ত্রিপুরাতে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ১৯৮০ সালে মিড-ডে-মিল চালু করিয়া গোটা দেশে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা কি বিকল্প নীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অংশ নহে? এই কথা যাহারা ভুলিয়া যান, তাহারাই তুচ্ছ আত্মস্বার্থের টানে 'বন্ধু' হইতে 'দুশমন'-এ পরিণত হন।

কথাগুলি চিন্তা-র নিজের নহে। সেলুনে ব্যানার্জিবাবুদের বহুবার এইসব বলিতে শুনিয়াছি। তাঁহারা বলেন, রাজ্যে এখন সাড়ে ৬ হাজারের বেশি ইশ্কুলে প্রায় ৬ লাখ

শিশু-কিশোর-কিশোরীকে নাকি মিড-ডে-মিল খাওয়ানো হইতেছে। সাড়ে ১১ হাজার পাচক ও হেল্পার, ৫৬৪টি মহিলা স্বসহায়ক দল এই কাজে নিযুক্ত। চানমারির ছাত্র ও অভিভাবকেরা সকলের অভিনন্দন প্রাপ্য। অক্ষয়কুমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-অভিভাবকেরা সত্যই অক্ষয়-কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই রকম নজরদারি হউক না, প্রতিটি ইশ্‌কুলে! প্রতিটি পঞ্চায়েতে, ভিলেজ কমিটি, নগর পঞ্চায়েত ও পুর নাগরিক কমিটিগুলি এই নিয়মিত নজরদারিতে আন্তরিক এবং সক্রিয় ভূমিকা লইলে ক্ষতি কী? ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের দায়িত্বশীল সংগঠনগুলি হউক আরও সচেতন, জীবন্ত ও কঠোর। সরকারি বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসগুলি নিয়মিত নজরদারি ও আকস্মিক হানাদারিতে নামুক। চোরেরা যেমন কোনও 'বিশেষপন্থী' নহে, তেমনই- বিকল্প নীতির দিশারী এই ত্রিপুরায় মিড-ডে-মিল কলঙ্কমুক্ত রাখা এবং কলঙ্কমুক্ত করাও কোনও 'বিশেষপন্থী'-দের একার কাজ নহে। এই কাজ সকল শিশুর সকল অভিভাবকের। অভিভাবকেরা তাঁহাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করিলে চিন্তা-র কন্যাটিকেও আর কখনও বে-আদপ মন্তব্য করিতে হইবে না। করিলে গালে চড় কষাইব। এখন যে হাত উঠিতেছে না!

(প্রকাশ : ২২.০৭.২০১৩)

সংহতি-অভিযান

– সংহতি না হাতি! আসলে রাজনীতি।

– তাই বুঝি? বেশ, হউক রাজনীতি। তোমার কী ক্ষতি? তোমাদের ভাঙাভাঙির রাজনীতি তো নহে দাদা!

– ব্রডগেজ, সাব্রুমের রেল। গুয়াহাটি, দিল্লি যেথা খুশি যা না বা-প।

– ঢাকঢোল পিটানো সংহতি-সমাবেশ কেন? কীসের সংহতি!

চিন্তার সেলুন যেন তপ্ত কড়াই। তুমুল তর্ক! কিছু যুবক একখান পোস্টার মারিয়া গিয়াছে – 'চার দফা দাবিতে গুয়াহাটি অভিযানের সমর্থনে ৫ আগস্ট সংহতি সমাবেশে চলুন।' তর্ক ওই পোস্টার ঘিরিয়া। ঘোর বাম-বিরোধী বিশ্বাসদা নাসিকার দুই রন্ধ্রপথে প্রাবল ঘূর্ণিবাত্যা নির্গমন করিয়া বামপন্থী নাথবাবুকে আবার ঠেস মারিলেন, 'দেশের কোথাও নাই গতি, এইখানে সংহতি!'

– শুন হে বিশ্বাস, তোমাদের এত অবিশ্বাস কেন? ব্যানার্জিবাবু এতক্ষণে মুখ খুলিলেন। ভাবিলাম এইবার জমিবে। মনের পুলকে কাস্টমারের গালে কস্‌মোর ফেনা মাখাইয়া ক্ষুর হাতে লইলাম। ব্যানার্জিবাবু কহিলেন, সাব্রুমে ব্রডগেজ রেল, আগরতলা-আখাউড়া রেল বিলম্বিত হইতেছে। জাতীয় প্রকল্প, জাতীয় স্বার্থ। তবুও কুৎসিতভাবে বাজেট ছাঁটাই হইতেছে! দ্রুত কাজ সম্পন্ন হউক– এই দাবির প্রতি সমর্থন বা সংহতি যে বা যাহারাই প্রকাশ করুন, ত্রিপুরার মঙ্গল এবং সমৃদ্ধির জন্যই করিবেন। ইহা রাজনীতি হইলে খুব ভাল রাজনীতি। কিন্তু, তেলেঙ্গানাকে অন্ধ্রপ্রদেশ হইতে পৃথক করিয়া নতুন রাজ্য গঠনের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের পরে এই সংহতি-সমাবেশের গুরুত্বই কেবল বাড়ে নাই, যুবদের গুয়াহাটি-অভিযানও কার্যত 'সংহতি-অভিযান'-এ পরিণত হইয়াছে। ওহে বিশ্বাস, অন্ধ্রপ্রদেশ ভাঙিবার সিদ্ধান্ত লইয়া, ভোটের আগে তোমরা যে 'প্যান্ডোরা-বক্স' খুলিয়া দিয়াছ, তাহা কি বিশ্বাসঘাতকতা নহে? পরিণতি দেখিতেছ তো?

– প্যান্ডোরা-বাক্স? দাদা, ওটা কোন পাণ্ডবের বাক্‌সো? যুধিষ্ঠির না অর্জুন? বোকার মতোই

জিজ্ঞাসা করিলাম। ব্যানার্জিবাবু এক গাল হাসিয়া কহিলেন, প্যান্ডোরা বাক্স কোনও পাণ্ডবের নহে। গ্রিক্ পুরাণে আছে – প্রমিথিউস স্বর্গ হইতে আগুন চুরি করিয়া মানুষের জন্য মর্ত্যে আনিয়াছিলেন। দেবরাজ জিউস মানবকুলকে ঔদ্ধত্যের সাজা দিতে প্যান্ডোরা নামে এক মায়াবিনীকে একটি জাদু-বাক্স হাতে মর্ত্যে পাঠাইলেন। প্রলুব্ধ হইয়া মানুষ প্যান্ডোরার কাছে গেলেই সে ওই বাক্সটি খুলিয়া দিত। অমনি বাহির হইয়া আসিত রোগ-শোক-মহামারী-হানাহানি-দাঙ্গা! কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন এই দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার 'পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য' গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়া যে প্যান্ডোরা বাক্স খুলিয়া দিল, তাহা হইতে আবার দ্রুত বাহির হইয়া আসিতেছে 'পৃথক গোর্খাল্যান্ড', 'পৃথক বড়োল্যান্ড' 'পৃথক কার্বি আংলঙ'ইত্যাদি বিষধর সর্প। দিকে দিকে আবার বিচ্ছিন্নতাবাদী হুঙ্কার। এমনকি, ত্রিপুরাতেও এ ডিসি এলাকা লইয়া 'পৃথক রাজ্য' গড়িবার দাবিতে মাঠে নামিয়াছে আই পিএফ টি। সকলেই জানেন, এই দাবির প্রতি বড়ই নরম বিজয় রাঙ্খলের আইএনপিটি। আর আইএনপি টি-তে নরম খোদ জাতীয় কংগ্রেস!

বিশ্বাসদা ইতস্তত করিয়া কিছু একটা কহিতে যাইতেছিলেন, ব্যানার্জিবাবু না থামায় নিজেই থামিয়া গেলেন। চিন্তার মগজে হ্যালোজেন জ্বালিয়া উঠিল। মনে পড়িল, গিন্নি কেমন পরপর এক-একটা ফুলের ভিতর দিয়া সূতা টানিয়া মালা গাঁথেন। ভারতের এক-একটি রাজ্য যেন এক-একটি ফুল। গুয়াহাটি-অভিযানে বাম-যুবরা সংহতির সূতা লইয়া মালা গাঁথিয়া অন্তত কয়েকটি রাজ্যের সড়কপথে অগ্রসর হইবেন। সংহতি-অভিযান নহে?

নাথবাবু কহিলেন, পশ্চিমবঙ্গে দিদি এখন 'গোর্খাল্যান্ড' দমনে কড়া। শুনিয়া হাসিলেন ব্যানার্জিবাবু। কহিলেন, ভুল করিতেছ কেন্দ্র তেলেঙ্গানার বাক্সো খোলায় দিদি বরং মনে মনে খুশি। 'মা-মাটি-মানুষ' স্লোগানের ধার কমিয়াছে। 'সত দোষ- সিপিএম' দিয়াও আর চলিতেছে না। এখন নতুন ধ্বনি উঠিবে, 'বাংলা আর বাঙালি'। মোড়ে মোড়ে হোর্ডিংয়ে 'বাংলামি' চোখে পড়িবে। পুরাণো সুশীলেরা হঠাৎ অতিরিক্ত বাংলা-দরদি হইবেন। সব সমস্যা চাপা পড়িবে বাঙালি জাত্য ভিমানের নিচে। বাংলা ভাগ হইতে দিব না! কংগ্রেস আর বিজেপি যেমন দেশের অসংখ্য খাদ্যহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন. কর্মহীন, শিক্ষাহীন মানুষের দৃষ্টি ঘুরাইয়া উগ্র জাত্যভিমান অথবা ধর্মান্ধতায় ডুবাইয়া ভোট-বৈতরণী পার হইতে চাহিতেছে, তেমনি বাংলায় তৃণমূলও। সর্বত্র এক গোষ্ঠী বলিবে, 'রাজ্য ভাগ করো', অন্য গোষ্ঠী কহিবে, 'ভাগ হইতে দিব না'। চলিবে হানাহানি।

বিশ্বাসদা হঠৎ সোৎসাহে থুক্কু দিলেন! দাদা, বাংলায় এমনকি ত্রিপুরাতেও বামেরা 'ভাগ হইতে দিব না' বলিতেছে। ইহা তো পাল্টা-পাল্টিই হইল! ব্যানার্জিবাবু কহিলেন, হ্যাঁ – এই 'ভাগ হইতে দিব না' ধ্বনি কোনও একটি নির্দিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর নহে, কোনও একটি

জাতি বা ধর্মের নহে। বরং সমস্ত ভাষা, ধর্ম, জাতি ও সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধিমান মানুষের। ইহাই তো সংহতি। একদিকে উন্নতি আর সংহতির জন্য রেল। অন্যদিকে কেন্দ্রের দপ্তরগুলিতে লাখো শূন্যপদ পূরণের ঐক্যবদ্ধ ধ্বনি। ভাষাভিমান, জাত্যভিমান, আঞ্চলিকতা, বিচ্ছিন্নতার উর্দ্ধে দেশের সমগ্র যুব সমাজের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের পথে অভিযান। সংহতির অভিযাত্রা। রাজনীতি? হ্যাঁ, বলা যাইতেই পারে। এই দেশপ্রেমিক রাজনীতিই পরিব্যাপ্ত হউক না, সারা দেশে!

(প্রকাশ : ০৫.০৮.২০১৩)

ভাতঘুম!

– নারায়ণ, নারায়ণ! কই হে চিন্তা, খেউরি হইতে আসিলাম! ত্বরা করো। আজকাল বৈকুণ্ঠেও তোমাদের রাজ্যের সুনাম। লক্ষ্মীদেবী কহেন, শান্তির তীর্থ নাকি। তোমার সেলুনেরও দেখি নামডাক! তা ভাবিলাম, তিন ভুবনে ঢেঁকি-ভ্রমণের পথে একবার ...। নারায়ণ, নারায়ণ! ও-হো! আমায় চিনিতে পারো নাই। আমি হইলাম (বীণা বাজাইয়া গান ধরিলেন) 'হরে মুরারে ...'।

– আইজ্ঞা, আপনি নারদ! বিলক্ষণ চিনি! টিভি সিরিয়ালে কত দেখিয়াছি। তা প্রভু, চুলের কোন কাটিং দিব? বিগ-বি, স্মল-বি, সল্লু? নাকি 'মাই নেম ইজ খান'? মোগাম্বো, গজনিও আছে। ভাল ভাল কাটিং।

– আরে ভাই, 'শর্ট-কাটিং' কিছু করো! সময় নাই। ভালমন্দ আবার কী? ব্রহ্মাণ্ডে ভালও নাই, মন্দও নাই। একের নিকট যাহা ভাল, তাহাই অন্যের নিকট মন্দ। তোমার যাহাতে সুখ, অন্যের দুঃখ তাহাতেই। বুঝিলে না? এই যেমন, তোমাদের রাজ্যে এত শান্তি, ইহাতে অনেকের মনে বড় অশান্তি। নারায়ণ, নারায়ণ! শুনিলাম, তুমি বাংলার 'সুশীল ২০১১'-বাবুদের নকল করিয়া খবরের কাগজেও লেখো। বেশ বেশ! তবে, সবই আপেক্ষিক। অসার, অনিত্য। ভাল খবর সকলের কাছেই ভাল লাগিবে, এমন কোনও কথা নাই। এই যেমন দেখো ...।

নারদ ক্ষুদ্র রাজ্যেরই দুইখানা প্রভাতী পত্রিকার ১১ আগস্টের সম্পাদকীয় মেলিয়া ধরিলেন। দুইটিই 'সর্বাধিক'-এর দাবিদার। একটি 'সর্বাধিক প্রচারিত', অন্যটি 'সর্বাধিক পঠিত'। এন এল এফ টি (এন বি) গোষ্ঠীর সুপ্রিমো, পুলিসের খাতায় 'মোস্ট ওয়ান্টেড', খতরনাক উগ্রপন্থী নেতা নয়নবাসী জমাতিয়ার আত্মসমর্পন লইয়া দুই সর্বাধিকেই সম্পাদকীয় লিখিত হইয়াছে। নারদ বেদমন্ত্রের উচ্চারণে দুই সম্পাদকীয় পাঠপূর্বক কহিলেন, পুলিসের নিকট নয়নবাসীর আত্মসমর্পণের কয়েকঘন্টার মধ্যেই নিবন্ধ দুটি লিখিত হইয়াছে। অথচ এক পত্রিকা লিখিয়াছে, নয়নবাসীর কথা 'লোকে ভুলিয়াই গিয়াছিল'। তাহার 'দাঁতের বিষ ঝরিয়া গিয়াছে'। অতএব ত্রিপুরাবাসীর 'স্বস্তির কোনও কারণ নাই'। অর্থাৎ চিন্তা, দুটি বিষয় পরিষ্কার।

'মানষ ভুলিয়া গিয়াছিল' কহিলেও দুই সর্বাধিকের চটজলদি সম্পাদকীয় হইতেই স্পষ্ট, অন্তত তাঁহারা নয়নবাসীকে ভোলেন নাই। বরং তাঁহার আত্মসমর্পণে কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন, হয়ত হতাশও। পাছে শান্তি-অভিযানের আরও একটি সাফল্যে ত্রিপুরাবাসীর মনে আরও একটু স্বস্তি আসে, তাই লিখিতে হইল–'স্বস্তির কোনও কারণ নাই।' পত্রিকার অস্বস্তিটা কি স্পষ্ট নহে? নারায়ণ, নারায়ণ!

নারদ আরও কহিলেন, ওই সম্পাদকীয়তে এমনও লেখা হইল– এ টি টি এফ সুপ্রিমো রঞ্জিত দেববর্মা আগেই আত্মসমর্পন করিয়াছেন। অথচ ঘটনা হইল, গত বছর রঞ্জিত সীমান্তে ধরা পড়িয়াছেন। এখন তিনি নাসা-তে বন্দি। আদালতে বিচারও চলিতেছে। 'সর্বাধিক প্রচারিত'র সম্পাদক এমন তথ্যগত ভুল লিখিলেন কেন, কে জানে! নারায়ণ, নারায়ণ! এন এল এফ-টি (বিএম) গোষ্ঠীর সুপ্রিমো বিশ্বমোহন দেববর্মা 'এখনও আত্মসমর্পন না করিলেও' তিনি কোনও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাইতে পারিতেছেন না, ইহা সত্য। কিন্তু, ভাল খবরটি সকলের নিকট ভাল নহে। সম্পাদকীয়তে সেই কারণেই তাঁহাকে 'এখন বিষদাঁতরহিত সরীসৃপ' গালাগালিতে খোঁচাইয়া জাগাইবার চেষ্টা? নারায়ণ, নারায়ণ! ওই দিকে দেখো, 'সর্বাধিক পঠিত'-র সম্পাদকীয় নয়নবাসী জমাতিয়ার আত্মসমপর্মণকেও 'নাটক' বলিয়া দিয়াছে। জঙ্গিদের সকল আত্মসমর্পণই তাহাদের নিকট 'সাজানো নাটক'। আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা বরাবরই ইহাকে 'নাটক' বলিতেই অভ্যস্ত কিনা!

– ওহে চিন্তা, তিন ভুবনে ঘুরি। সব খবর রাখি। তোমাদের রাজ্য একদা সন্ত্রাসবাদের আগুনে কম জ্বলে নাই, কম রক্ত ঝরে নাই। কত নিরীহ শিশু, নারী, বৃদ্ধ, কত বামপন্থী জননেতা, সমাজকর্মী, বিধায়ক এমনকি মন্ত্রী পর্যন্ত খুন হইয়াছেন। কত নিরাপত্তাকর্মী শহিদ। উপজাতি অঞ্চলে সব উন্নয়ন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। তোমাদের বাম সরকার এই বীভৎসা মোকাবিলায় দো-ধারা তরবারি হাতে লইল। এক ধারে প্রশাসনিক মোকাবিলা, অর্থাৎ নিরাপত্তা অভিযান, কাঁটাতার আর বাংলাদেশের ঘাঁটি ভাঙিবার জন্য কেন্দ্রের উপর চাপ। অন্য ধারে, উন্নয়ন-কাজ আর রাজনৈতিক প্রচারে জঙ্গিদের জনবিচ্ছিন্ন করা। অনেক-অনেক মূল্যে শান্তি আসিয়াছে। 'স্বাধীন ত্রিপুরা' নহে, অখণ্ড ভারতেই গণতান্ত্রিক পথে উন্নয়নের জন্য লাগাতার সংগ্রামের ফলে আসিল রেল, হইল কাঁটাতার। বাংলাদেশেও সরকার হইল সক্রিয়। ত্রিপুরা সরকার, এডিসি, ভিলেজ কমিটি একযোগে উন্নয়নে ঝাঁপাইল। জঙ্গিরা অস্ত্র ত্যাগ করিয়া ঘরে ফিরিতে লাগিল। পাহাড়ে আবার ইস্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলিল। রাস্তাঘাট হইতে লাগিল। 'দুর্গম' শব্দটি ত্রিপুরা হইতে বহিষ্কারের ঘোষণা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরার পাহাড়ি জমিতে উগ্রপন্থা নামক বিষবৃক্ষের ফলন থামিয়া গেল। যদি তাহা না হইত, ২০০৬ সালে বাংলাদেশে ফিরিয়া গিয়া নয়নবাসী আবার সন্ত্রাসী-মহীরুহে পরিণত

হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার বা বিশ্বমোহনের ডাকে আর ওই ভুল পথে যাইতে রাজি হন নাই ত্রিপুরার উপজাতি যুবরা। ইহা কোনও 'নাটক' নহে।

– নারায়ণ, নারায়ণ! এইবার দুই 'সর্বাধিক'-এর লড়াই দেখো! একই দিনে একই বিষয়ে সম্পাদকীয়তে 'সর্বাধিক পঠিত' জঙ্গিদের সমস্ত আত্মসমর্পণকে পুরণো স্ট্যান্ড এবং স্টাইলে 'নাটক' কহিল, আর 'সর্বাধিক প্রচারিত' নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করিতে গিয়া অতীতের স্ট্যান্ড ও স্টাইল বদলাইয়া লিখিল, রাজ্যে 'যখন শান্তির পরিবেশ বিরাজ করিতেছে, হতাশ সন্ত্রাসবাদীরা একের পর এক স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আঁসিতে বাধ্য হইতেছে, তখন রাজ্য সরকার নিরাপত্তা বাহিনী এত বাড়াইতে আগ্রহী কেন?" বামফ্রন্ট-বিরোধিতার নতুন অ্যাঙ্গোল আবিষ্কার করিতে যাইয়া 'সর্বাধিক প্রচারিত' সত্য তথ্যটি অন্তত বলিবার সাহস দেখাইয়াছে।

কহিলেন নারদ, জঙ্গি মোকাবিলায় সারা দেশেই টি এস আর অতুলনীয়। ত্রিপুরা সরকারের ভূমিকা বৈকুণ্ঠেও বহুল প্রশংসিত। ত্রিপুরার পুলিসকে এজন্য রাষ্ট্রপতি সম্মানিত করিয়াছেন। কিন্তু উগ্রপন্থা দুর্বল হইলেও নির্মূল তো হয় নাই। দেশের কোনও একটি অঙ্গরাজ্যে আলাদাভাবে সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণ নির্মূল হইতে পারে কি? যদি সারা দেশে জঙ্গি সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টির জমি উর্বর থাকিয়া যায়? যদি পশ্চাদপদতা, দারিদ্র্য, বঞ্চনার কোনও হাল না হয়? তাহা ছাড়া, খবর হইল – পূর্বোত্তরের সন্ত্রাসবাদীরা একজোট হইতেছে। নাগাল্যান্ড, মণিপুরের জঙ্গিরা ত্রিপুরাকে গোপন যাতায়াতের 'পথ' করিয়াছে। তিন দিকের বাংলাদেশে অতি সক্রিয় মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদীরা। সাগরপারের ডলার-সম্রাটের অনুচরেরাও বসিয়া নাই। ত্রিপুরায় টিএসআর তথা নিরাপত্তা বাহিনী তো কখনও জনগণের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। জনগণের শত্রুরা টি এস আর-কে ভয় পাইবে বইকি! ... কাঁচি চালাও ...! নারায়ণ, নারায়ণ ...!

হঠাৎ গিন্নির ধাক্কায় ঘুম ভাঙিয়া গেল। দিনদুপুরে কখন যে চেয়ারে বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ভাতঘুম!

(প্রকাশ : ১২.০৮.২০১৩)

পিঁয়াজ

প্রসঙ্গ পিঁয়াজ। সমগ্র ভারতে অগ্নিমূল্যের হাহাকার। পিঁয়াজ-রসের জ্বালায় আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কান্দিতেছে। দেশের সেকেন্ড (হ্যান্ড) ইউ পি এ সরকার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের গন্ধ শুঁকিতেছে। কিন্তু, চিন্তা-গিন্নিকে বুঝাইবে সাধ্য কাহার! পাড়ার দোকানে গিয়া শুনিলাম ৭০ টাকা কেজি! ক্রেতা-বিক্রেতায় পাড়াযুদ্ধ চলিতেছে। আচমকা পিঁয়াজ-বর্জিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগে হৃদয় রসসিক্ত হইল। ঘরে ফিরিলাম। কিন্তু দুয়ারে শমন! গিন্নি গব্বর সিংয়ের নায় চিবাইয়া কহিলেন, 'খালি হাত! ক্যায়া সমঝ কর আয়া, কী সর্দার বহুত খুশ হোগি? শাবাশি দেগি কিঁউ! ধিক্কার -- !' শুরু হইল গৃহযুদ্ধ ...।

সকালে হাফ গামলা পান্তা ভাতের সহিত একখানা নাশপাতি সাইজের পিঁয়াজ। গিন্নির নিত্য ব্রেকফাস্ট! কিন্তু, পিঁয়াজ বিহনে তিনি এখন পান্তাতে ক্ষান্ত। পিঁয়াজের অভাবে সিঁদল শুটকিরা খুশিতে আবার পুঁটি-জীবনে ফিরিবে কি না ভাবিতেছে! পিঁয়াজ বিনা মাংস খায় কে! ফুটপাতে 'পিঁয়াজ'-এর নামে বাঁধাকপি আর আটা চলিতেছে। কাঁচা পিঁয়াজের চাক ছাড়া স্যালাড আবার কী বস্তু! সেলুনের পাশের চায়ের দোকানে পুরি-তরকারির নিত্যসঙ্গী ছিল এক টুকরা পিঁয়াজ। উধাও! হোটেলে ভাতের আগেই পাতে পড়া লেবু-লঙ্কার 'এক সাথ জিনা-মর্‌না' সঙ্গী পিঁয়াজের খণ্ডটি 'বাদা তোড়কে' কোথায় চলিয়া গিয়াছে! দিল্লিতে পিঁয়াজ নাকি ৮০ টাকা। আপেল বরং অনেক সস্তা। কিন্তু আপেলে তো পিঁয়াজের ঝাঁজ মিলিবে না, কাজও হইবে না! রবিবার হইতে দিল্লির রাজ্য সরকার নিজেই নাকি ৫০ টাকা দরে পিঁয়াজ বিক্রি শুরু করিয়াছে। লোকে দীর্ঘ লাইন ধরিয়া কিনিতেছে। মিডিয়া কহিতেছে, অক্টোবরের মধ্যে পিঁয়াজ ১০০ টাকায় পৌঁছিবে! এই বার্তা রটিতেই যাহাদের টাকা আছে, তাহারা ১০-২০ কিলো করিয়া ৭০-৮০ টাকাতেই পিঁয়াজ কিনিয়া হেঁসেলে স্টক করিতেছে। কৃত্রিম চাহিদার টানে দাম আরও বাড়িতেছে।

মনে প্রবল অশান্তি লইয়া সেলুন খুলিলাম। রিটায়ার্ড বিজ্ঞান-মাস্টার দাসবাবু আসিতেই কহিলাম– দাদা, পিঁয়াজের বিকল্প হয় না? দাসবাবু অবাক হইয়া কহিলেন– না, হয় না। শুনো চিন্তা, ইহা অমৃত-সবজি। গোটা দুনিয়ায় পিঁয়াজ অসম্ভব জনপ্রিয়। কত লক্ষ পদের

সুস্বাদু খাবার যে হয় ইহাতে, কে হিসাব করিবে! তাহা ছাড়া পুষ্টিগুণও অসামান্য। বিজ্ঞানীদের দেওয়া নাম 'আলিয়াম সেপা'। 'ফেনোলিক্স' এবং 'ফ্ল্যাভেনয়েডস' নামক দুটি বস্তুর কারণে পিঁয়াজ ব্যথা-নাশক, কোলেস্টেরল নাশক, ক্যান্সার নিবারক এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ। শুনিতে শুনিতে নিজের চুলই খাড়া। দাসবাবু মনের আনন্দে কহিতেছেন – ৭০০০ বছর আগে প্রাচীন ইজিপ্টে পিঁয়াজ ব্যবহারের প্রমাণ আছে। যে শ্রমিকরা পিরামিড বানাইতেন, তাঁহাদের নাকি বেজান পিঁয়াজ আর মুলা খাওয়ানো হইত! সেথায় লোকে পিঁয়াজ-পূজা পর্যন্ত করিত! প্রাচীন গ্রীসে অ্যাথলিটদের প্রচুর পিঁয়াজ খাইতে হইত। রোমে গ্ল্যাডিয়েটররা শরীরে পিঁয়াজের রস মাখিত। মধ্যযুগে পিঁয়াজ দিয়া পণ্য-বিনিময় চলিত, এমনকী লোকে পরস্পরকে পিঁয়াজ উপহারও দিত। ডাক্তার-বদ্যিরা মাথা ধরা, কাশি, চুল পড়া এমনকী সাপের কামড়ের জন্যও পিঁয়াজ প্রেসক্রিপশন করিতেন। ভারতে কে কবে প্রথম কোথা হইতে পিঁয়াজ আনিয়াছিলেন জানি না। তবে পিঁয়াজের কেথা যে অমৃত সমান ইহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু, এই 'অমৃত-সমান' সবজিটি কী কারণে প্রায় রাতারাতি ১৮ টাকা হইতে ৭০ টাকা হইল, দাসবাবুর সে ব্যাপারে কোনও ভাবনা নাই। তিনি বিজ্ঞানে আমোদিত হইয়া আছেন। পত্রিকায় দেখিয়াছি, আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি পিঁয়াজ চাষ হয় যে মহারাষ্ট্রে, সেথায় নাকি গত বছরের খরা এবং এবারের বৃষ্টিতে উৎপাদনের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু উহা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে! বছরের এই সময়ে পিঁয়াজের জোগান যেমন থাকে, এইবারও তেমনই আছে। সকলেই তাই এই অগ্নিমূল্যে বিস্মিত : বাজারেও সরবরাহ কমে নাই। পিঁয়াজের কোনও সঙ্কট নাই। লোকে বলে, দামের সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে কেন্দ্রের নীতি আর মজুতদার-মুনাফাখোরদের কেরামতি। কেন্দ্রের 'খাও কম, রপ্তানি করো বেশি' নীতির কারণে দেশের পিঁয়াজ এতদিন বিদেশিদের পাত আঁলো করিতেছিল। আর এই সুযোগে দেশের ভিতরে মজুতদারেরা আগাম মুনাফার অঙ্ক কষিয়া বিপুল পরিমাণ পিঁয়াজ গুদামবন্দি করিয়া রাখিয়াছিল। এখন বাজার চড়াইয়া সীমিত পরিমাণে বাহির করিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইহাদের কেশাগ্র কভু স্পর্শ করে না। লোকসভা ভোটের আগে তো প্রশ্নই উঠে না। তবে বাজপেয়ী সরকারকে কান্দাইয়াছিল পিঁয়াজ। মনমোহন সরকার সেই স্মৃতিতে সন্ত্রস্ত। পিঁয়াজ কি এখন রাজনৈতিক সবজি? ইত্যকার ভাবনা যখন ভাবিতেছি, তখন কোথায় যেন আর ডি বর্মন বাজিতেছিল, 'মণিকা– ও মাই ডার্লিং! তুমি কোথায়? 'উত্তরে কোনও মজুতদারের গুদাম হইতে এক পিঁয়াজসুন্দরীর চিক্কণ কণ্ঠ যেন গাহিয়া উঠিল- 'এখানে ...'!

(প্রকাশ ঃ ১৯.০৮.২০১৩)

বিভেদ-ল্যান্ড

মিছিল দেখিলাম। ভাষণ শুনিলাম। ত্রিপুরাবাসী হিসাবে চিন্তা-র বড় সৌভাগ্য – তেলেঙ্গানা-ল্যান্ড, বড়োল্যান্ড, গোর্খাল্যান্ড এবং তিপ্রাল্যাণ্ড – এই এতগুলি 'ল্যাণ্ডমাইন' নেতাকে একই সঙ্গে একই মঞ্চে ল্যান্ড করিতে দেখিলাম। তাঁহারা শেক্‌হ্যান্ড করিয়া, শিনা ফুলাইয়া, গলার রগ ছিঁড়িয়া হুঙ্কারিলেন, 'আদিবাসীদের ভূমি কেবল আদিবাসীদের। আর কাহারও এই ভূমিতে কোনও অধিকার নাই!' সুরটি খুবই চিনা চিনা ...!

গত ৫ আগস্ট 'দুইখান কথা'-য় প্যান্ডোরা বাক্‌সো খোলা-র বিপদ প্রসঙ্গ কহিয়াছিলাম। পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্তে কংগ্রেসের উপা সরকার কেমন করিয়া প্যান্ডোরা বাক্‌সো খুলিয়া দিয়াছে, কী পরিণতি হইবে – এই অকিঞ্চন চিন্তা-র সেলুনেও এক্‌দফা আলোচনা হইয়াছিল। ২৩ আগস্ট আই পি এফ টি-র রাজভবন অভিযানের পরে বাম-বিরোধী 'বিশ্বাসদা'ও মনে হইল একটু ঘাবড়াইয়াছেন। কহিলেন, সিপিএম সঙ্গে সঙ্গে কড়া প্রতিক্রিয়া জানাইলে খুব ভাল হইত। এত ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা, ইহাকেও খণ্ড করিতে হইবে? ব্যানার্জিবাবু গলায় ঝাঁঝ আনিয়া কহিলেন, কেন বিশ্বাসবাবু! এখন সি পি এম ছাড়া বুঝি আর কাহাকেও বিশ্বাস হইতেছে না? বিপদে পড়িলে ত্রাণ করিবে সি পি এম! আর অন্য সময় 'সি পি এম হটাও দেশ বাঁচাও'? কেন, আপনাদের প্রদেশ কংগ্রেসকে একটা কড়া প্রতিক্রিয়া দিতে বলুন না! মিনমিন করিয়া 'আমরা সমর্থন করি না' বলিলেই চলিবে? বামেরা যে কোনও রাজ্য ভাগেরই তীব্র বিরোধিতা করিতেছে। অন্যরা সকলেই চোরকে বলিতেছে চুরি কর্, গেরস্থকে বলিতেছে সজাগ থাক্! ভোট কি এতই ল্যাঠা? দেশ কিছু নয়?

– আদিবাসীদের ভূমি কেবল আদিবাসীদেরই? পৃথিবীতে কোন্ দেশের কোন্ ভূমি আদিবাসীদের ছিল না? যাঁহারা যেথায় আগে বসবাস করিতেন তাহারাই সেখানকার আদিবাসী। 'অন্যদের অধিকার নাই' বলিয়া কোন্ জাতিগোষ্ঠী কোথায় এককভাবে টিকিয়াছে? ইতিহাসের কোনও না কোনও পর্যায়ে প্রায় সকলেই বহিরাগত। এই বহিরাগতদের খেদাইতে হইলে সকলের আগে আমেরিকা-কে রেড ইন্ডিয়ানদের হাতে ফিরাইয়া দিতে হইবে। আফ্রিকা হইতে শ্বেতাঙ্গদের, ভারতবর্ষ হইতে আর্যদের তাড়াইতে হইবে! সরল মনের

সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করিতে যাহা খুশি বলিয়া দেওয়া যায়? ক্ষুব্ধ ব্যানার্জিবাবু এত কথা এক শ্বাসে বলিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

কহিলাম, দাদা–'তিপ্রাল্যান্ড' হইলে ক্ষতি কী? বাঙালিদের জন্য পশ্চিমবাংলা, অসমিয়াদের জন্য অসম, পাঞ্জাবিদের জন্য পাঞ্জাব, মণিপুরিদের জন্য মণিপুর, নাগা-দের জন্য নাগাল্যান্ড হইলে ত্রিপুরীদের জন্য তিপ্রাল্যান্ড-এ দোষ কী? ব্যানার্জিবাবু কহিলেন– স্বাধীনতার পরে দেশ পুনর্গঠনের শুরুতে এইসব রাজ্য গঠিত হইয়াছিল ভাষাভিত্তিক। কোনও জাতি বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নহে। কিন্তু, স্বাধীনতার ৬৬ বছর পরে নতুন করিয়া আর ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনও সম্ভব নহে। তাহা করিতে হইলে প্রতিটি রাজ্যকে কমপক্ষে দশ-বারো খণ্ড করিতে হইবে! ইহা সম্পূর্ণ অবাস্তব, অকল্পনীয়ও বটে। বিশেষ পশ্চাদপদ অঞ্চলের উন্নতিতে রাজ্যের অভ্যন্তরেই স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের সাংবিধানিক বিধান করা হইয়াছে। ত্রিপুরায় যেমন ষষ্ঠ তফসিলে গঠিত হইয়াছে উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ। সশস্ত্র জঙ্গিদের সাহায্য লইয়া ২০০০ সালে এই আই পি এফ টি দলই ইহাকে বন্দুকের জোরে দখল করিয়াছিল! ভুলি কেমনে ...!

–'তিপ্রাল্যান্ড' কোথায় হইবে? মৃতপ্রায় অবস্থা হইতে তেলেঙ্গানার তেল-জলের ছিটায় রাতারাতি ফণা মেলিয়া উঠা আই পি এফ টি নামক জঙ্গিসঙ্গী দলটির দাবি– "এডিসি এলাকা লইয়া পৃথক তিপ্রাল্যান্ড রাজ্য গঠন করিতে হইবে।" এই দলের জন্মদাত্রী মাতা টি ইউ জে এস কিংবা ভগিনি আই এন পি টি-ও একসময় একই দাবি তুলিয়াছিল। বাঙালিদের ক্ষেপাইয়া তুলিবার জন্য! ইহা কি ভৌগোলিকভাবেও সম্ভব? ত্রিপুরা-র মোট আয়তন ১০ হাজার ৪৯২ বর্গ কিলোমিটার প্রায়। এডিসি এলাকার আয়তন ৭ হাজার ১৩২.৫৬ বর্গ কিলোমিটার। অর্থাৎ রাজ্যের ৬৮ শতাংশ এলাকা লইয়া পৃথক 'তিপ্রাল্যান্ড' গঠনের দাবি! বাকি ত্রিপুরায় থাকিবে ৩২ শতাংশ এলাকা মাত্র। ২০১১ সালের জনগণনায় উপজাতিরা হইলেন মোট জনসংখ্যার ২৭ ভাগ। এই ২৭ ভাগের অন্তত ৭ শতাংশ এডিসি এলাকার বাহিরে বাস করেন ধরিয়া লইলে কী দাঁড়াইবে? ত্রিপুরাকে কাটিয়া দুইটি রাজ্য বানাইয়া জনসংখ্যার ২০ ভাগের জন্য ৬৮ ভাগ এলাকায় 'তিপ্রাল্যান্ড' গড়িতে হইবে? বাকি ৮০ ভাগ মানুষের জন্য ৩২ ভাগ এলাকা লইয়া আরেকটি রাজ্য? বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া এমন ভাবনা কেহ ভাবিতে পারে?

কেবল ইহাই নহে। তেলেঙ্গানা, বড়োল্যান্ড, গোর্খাল্যান্ড ইত্যাদি দাবি তুলিবার প্রাথমিক যুক্তি হইল একটানা সন্নিহিত এলাকায় একই অংশের মানুষের বসবাস। কিন্তু ত্রিপুরার উপজাতিরা একটানা সন্নিহিত এলাকায় বসবাস করেন না। এমনকি 'উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ' অঞ্চলও একটানা কোনও একটি সন্নিহিত এলাকা বা একটি জেলা

নহে। সুতরাং এই এলাকা লইয়া একটি 'পৃথক রাজ্য' গঠনও অসম্ভব। তাহা ছাড়া, তিপ্রা বা ত্রিপুরীদের আলাদা 'ল্যান্ড' করিতে চাহিলে কাঞ্চনপুরে 'চাকমা-ল্যান্ড', জম্পুই পাহাড়ে 'লুসাইল্যান্ড', উদয়পুর-অমরপুরে 'জমাতিয়া-ল্যান্ড', শান্তিরবাজারে 'রিয়াং-ল্যান্ড', বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের জন্য 'বিষ্ণুপ্রিয়া-ল্যান্ড', ছিলোমিলো কথা বলা হিন্দুস্থানি চা শ্রমিকদের জন্য 'ছিলোমিলো-ল্যাণ্ড', বাঙালিদের লইয়া 'বাঙালি-ল্যান্ড' গঠনের শ্লোগান উঠিলে দায়িত্ব কে লইবে? 'তিপ্রাল্যান্ড'-এর দাবি কি ছোলা মুরগির মতো কসাইয়ের কাটারিতে আমাদের এই সুন্দরী ত্রিপুরাকে খণ্ড খণ্ড মাংসের পিস বানাইবার জন্য?

কংগ্রেসের দোসর আই এন পি টি এখনও 'রাজ্যের ভিতর রাজ্য' দাবি ফেলিয়া দেয় নাই। কী বলিবে কংগ্রেস? জনজাতি জনগণকে আবার 'মিথ্যা-ল্যান্ড'-এর মরীচিকার পিছনে ছুটাইয়া মরিবার এই নতুন প্ল্যান সম্পর্কে কী বলেন 'মহারাণী' এবং 'মহারাজা'? কী বলেন বিজয় রাংখল? তিনি বড়ই চিন্তিত! তিনি যখন হিরো হইতে জিরো হইলেন, তখন আই পি এফ টি জিরো হইতে হিরো বনিতে চাহিতেছে। তাঁহার 'স্বাধীন ত্রিপুরা রাষ্ট্র' গঠনের সশস্ত্র যুদ্ধ ত্রিপুরার উপজাতি-অনুপজাতি মানুষ বুকের রক্ত ঢালিয়া দুর্নিবার ঐক্যের জোরে ব্যর্থ করিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদীদের 'অপারেশন ব্রহ্মপুত্র', 'বল্‌কানাইজেশন' অথবা উত্তর পূর্বাঞ্চলে 'খ্রিষ্টান রাষ্ট্র' গঠনের উস্‌কানিতে উপজাতি যুব সমিতি একদা অসম-মিজোরামের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে গলা মিলাইয়া 'বিদেশি বিতাড়ন'-এর ডাক দিয়াছিল। পরিণতি আশির দাঙ্গা। পরিণতি সন্ত্রাসবাদ। ত্রিপুরা সেই ঘনঘোর দুর্যোগ কাটাইয়া শান্তি গণতন্ত্র আর উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসরমান। উপজাতি এলাকার জমাট অন্ধকারও দ্রুত দূর হইতেছে। 'তিপ্রাল্যান্ড'-এর শ্লোগান তাহাতে বাধা দিবার নতুন লীলা-কৌশল মাত্র। জনতার ঐক্য ভাঙিতে জনবর্জিতদের নতুন ষড়যন্ত্র। ত্রিপুরাবাসী সাবধান! ঐক্যের জোরেই বিভেদের এই বিষাক্ত ফণা—পর্যদুস্ত হইবে।

(প্রকাশ: ২৬.০৮.২০১৩)

ডুবিতেছে

কত শক্তপোক্ত! কত সুবিশাল জাহাজ। তাহাও ডুবিয়া গেল! 'টাইটানিক' দেখিবার পর হইতে রুদ্রসাগরের নৌকায় উঠিতেও চিন্তা-গিন্নির ডুবিয়া মরিবার ভয়! বিদেশি ফিলিমের ডায়েটিং করা সুন্দরী ছিলিম (স্লিম) নায়িকা কাঠের টুকরা ধরিয়া সাগরে ভাসিয়া ছিলেন! গিন্নির ধারণা, তাঁহার নিজের বপুখানি ভাসাইয়া রাখিতে যে পরিমাণ কাষ্ঠখণ্ড লাগিবে, তাহা এক নৌকায় বহন সম্ভব নহে। অতএব, নৌকাভ্রমণ নৈব চ! বুঝাইলাম, গিন্নি, ডুবিবার কালে মাথায় এত হিসাব থাকে না! কাঠ, বাঁশ, প্লাস্টিক, এমনকি খড়কুটাও নাকি লোকে আঁকড়াইয়া ধরে। ইস্, কী উপমা দেই! ডুবন্ত কাহাকেও চোখের সামনে পাইলে উদাহরণ সহযোগে বুঝাইতে পারিতাম। এই তো, পাইয়াছি। কংগ্রেস নামক দলটা! টাইটানিকের মতনই সুবিশাল। কিন্তু ডুবিতেছে! কেন্দ্রে এবং রাজ্যে। কেহ দলের পাটাতন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া যত দূরে সম্ভব সরিতে চাইতেছেন। কেহ আবার ধর্মনগরের বিশ্ববন্ধু সেনের মতন খড়কুটা ধরিয়া বাঁচিতে চাহিতেছেন!

রুষ্ট গিন্নি কিঞ্চিৎ কষ্ট-কণ্ঠে কহিলেন, কংগ্রেস ছাড়া বুঝি আর উদাহরণ নাই? সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম, এই মুহূর্তে 'ডুবন্ত' শব্দটির উত্তমতর আর কোনও উদাহরণ দেখি না। সকলেই বলিতেছে, কংগ্রেসের দ্বিতীয় ইউপিএ-র মতন খারাপ সরকার দেশে আর হয় নাই! কু-নীতি আর দুর্নীতিতে উহারা অতীতের সকল রেকর্ড খান-খান করিয়াছে। দেশের অর্থনীতির হাল এত বেহাল কোনওদিন হয় নাই। মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, বেকার সমস্যার চেহারা ভয়ানক। ডলারের তুলনায় টাকা মহাপতিত। কেন্দ্রের যেসব মন্ত্রী-নেতা আর বড় পুঁজিপতিরা বিদেশি ব্যাঙ্কে ডলারে টাকা রাখিয়াছেন, তাহারা আহ্লাদিত! টাকা গোল্লায় যাক, ডলার থাকিলেই হইল! ডলার এখন স্বাধীন ভারতেরও প্রাণ-ভোমরায় পরিণত! বিদেশি ফাটকা-পুঁজি অন্য দেশে বেশি লাভের গন্ধ পাইলেই বাজার সাফ করিয়া যখন খুশি ডলার উঠাইয়া লইয়া যায়। আমাদের নাভিশ্বাস উঠে। ডলার দিয়াই বিদেশ হইতে তেল কিনিতে হয়। আমদানির সমস্ত পণ্যই আসে ডলারের বিনিময়ে। বাজারে ডলারের অভাব। অনেক বেশি টাকায় ডলার কিনিয়া সেই ডলারে তেল কিনিতে হইতেছে। এমনকি কেন্দ্রীয় সংস্থা 'ভেল'-এর নিকট হইতে ডলার-এ গ্যাস কিনিয়া রাজ্যকেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে হয়।

ভোক্তারা ডলার দেন না। টাকা দিয়া বিদ্যুতের বিল শোধ করেন। এখন গ্যাস কিনিতে ডলারের হাহাকারে বিদ্যুৎ নিগম আবারও মাশুল বাড়াইবে! কেন্দ্র নিজের হাতেও মারিতেছে, রাজ্যের হাত দিয়াও মারিবে!

গিন্নি, কেন্দ্রের যে সংস্কার নীতির ঠ্যালায় এতবড় বিপদে দেশ, প্রধানমন্ত্রী ঘোরতর সঙ্কট স্বীকার করিয়াও চিকিৎসা হিসাবে সেই সংস্কার-নীতিকেই আরও কঠোর করিতে চাহিতেছেন। যে বিষে দেহ জর্জর, সেই বিষের ইনজেকশনই লাগাইবার কথা বলিতেছেন। সকল ভর্তুকি ছাঁটাই, অর্থাৎ গরিব নিম্নবিত্তদের ঘাড় ভাঙিবার কথা কহিতেছেন। বিদেশি ফাটকা-পুঁজিকে লোভ দেখাইয়া ডলার টানিতে আরও ঢালাও লুণ্ঠনের সুবিধা এবং অর্থনীতির অবশিষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত সুরক্ষা-ব্যবস্থাও ধ্বংস করিতে চাহিতেছেন। খাদ্য-নিরাপত্তার সুযোগ হইতে দেশের প্রায় ৬০ কোটি মানুষকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। সাত মাসে আটবার পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ানো হইয়াছে। শীঘ্রই আরও বাড়িবে। রান্নার গ্যাস এমনকি কেরোসিনের দামও বাড়ানো হইবে। সমগ্র দেশটার বুকের ওপরে যেন একদল মত্ত হস্তির নৃত্য চলিতেছে। খাদ্য-নিরাপত্তা নামক তুরুপের তাস দিয়াও এইবার যে লোকসভা ভোটের বৈতরণী পার হওয়া যাইবে না, বুঝিয়া গিয়াছে কংগ্রেস।

আর রাজ্যে তো কংগ্রেসের হাল প্রকৃতই ডুবন্ত নৌকার ন্যায়। দলে দলে কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা এতদিন বামের সঙ্গো ভিড়িতেছিলেন, এখনও ভিড়িতেছেন। এখন আবার ময়দানে হাজির তৃণমূল কংগ্রেস। এক ব্যক্তির কুক্ষিগত ত্রিপুরার কংগ্রেস, এই অভিযোগে তাবড় নেতারাও তৃণমূলের দিকে বাড়াইয়াছেন পা। নিশ্চিন্ত সুদীপ দিবাচন্দ্ররা গাহিতেছেন– 'যারে যাবি যদি যা, পিঞ্জর খুলে দিয়েছি ...।' সুরজিৎ দত্ত, রতন চক্রবর্তীরা গেলে বাঁচিয়া যাইব, নিরঙ্কুশ হইব। 'উহারা হতাশ, তাই দল ছাড়িতেছেন।' পৃথক দল করিয়া সুবল ভৌমিক আগেই গিয়াছেন, এখন রতনলাল নাথ গেলেও আপত্তি নাই!

এহেন কালেই বাহুবলি বিশ্ববন্ধুর কান-ফাটানো হুঙ্কার– 'ধর্মনগর শহরের নাম পাল্টাইতে দিব না। বৈদ্যনাথ মজুমদার-এর নামে শহরের নাম করিতে চায় সিপিএম। ব্যর্থ করিব।' গিন্নি হাসিয়া কহিলেন, 'মাথায় গোবর নাকি?' কহিলাম, না গিন্নি না। বিশ্ববন্ধু জানেন, সিটুর রাজ্য সম্মেলন-স্থলের নাম 'বৈদ্যনাথ মজুমদার নগর' করা হইয়াছে মাত্র চারদিনের জন্য, প্রথামাফিক। বিশ্ববন্ধু সেন জানিয়া-বুঝিয়াই ওই হুঙ্কার করিয়াছেন। লিফলেট বিলি করিয়াছেন। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। এক, কেন্দ্রে এবং রাজ্যে কংগ্রেসের যাবতীয় কুকীর্তির দিক হইতে ধর্মনগরবাসীর দৃষ্টি ঘুরাইয়া দেওয়া। দুই, বৈদ্যনাথবাবু ত্রিপুরায় সর্বজনের শ্রদ্ধেয় হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার বসত ছিল কৈলাসহরে। বিশ্ববন্ধু ধর্মনগর আর কৈলাসহরের মানুষের মধ্যে একটি বিভাজন-রেখা টানিবার মারাত্মক কৌশল লইয়াছিলেন। কংগ্রেসি

নেতাদের এই বিভেদের রাজনীতি নতুন নহে। কিন্তু এইবারও বিশ্ববন্ধুরা ব্যর্থ। তাঁহাদের ৩১শে তথাকথিত 'বিক্ষোভ-সমাবেশ' কেন যে হইল না, কেহ তাহা জানিতেই পারিল না!

– গিন্নি, চাহিলেও খড়কুটা ধরিয়া কি আর ডুবন্তরা বাঁচিতে পারে? বাঁচে না। ইস্যুহীন, আশাহীন, ভরসাহীন কংগ্রেসের নেতারা এখন খড়কুটা হাতড়াইয়া বেড়াইতেছেন। দলের সংগঠন বাঁচাইতে, নিজেদের নেতাগিরি, দাদাগিরি টিকাইতে। কিন্তু, চারদিকে অন্তহীন সমুদ্র। জল আর জল! দূরদিগন্তেও কোনও উদ্ধারকারী জাহাজ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না! টাইটানিক ডুবিতেছে।

(প্রকাশ: ০২.০৯.২০১৩)

কী কাণ্ড! ছিঃ

চেহারার মিলে ব্যিদাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস'। আর নামে নাকি 'যমেও' টানে! বলিউডি সিনেমায় কত না জম্পেশ কহানি! আমাদের কালে 'ঝুক গয়া আশ্‌মান' তো টানা হাউসফুল দিয়াছে। আরে – সেই যে, কৌন হে জো সপ্‌নো মে আয়া .. ও প্রিয়া আ আ-।' কিন্তু, সে তো ছিল পর্দায়। জি বি হাসপাতালে নামের ভুলে কিছু ডাক্তার এ কী কাণ্ড করিলেন! মুখের বদলে মূত্রথলি কাটিয়া কহিলেন – 'কিছু হইবে না, বাড়ি যাও বৎস, কিছুদিন গেলেই সুস্থ হইয়া যাইবে'। ছি ঃ ছিঃ!

রোগী অম্পিনগরের রতন দাস। আশা করি তাহার কাটা পেট জোড়া লাগিবে। মুখের যে বায়োপসি করিবার জন্য তিনি হাসপাতালে ভর্তি হইয়াছিলেন, তাহাও সম্পন্ন করিয়া সরকার যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হইলে দোষীদের কঠোর সাজা এবং রোগীকে যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হইবে। একই সঙ্গে, অন্য রতন দাসের চিকিৎসাতেও যাহাতে কোনও গাফলতি না হয়, তাহাও দেখিতে হইবে।

রতন দাসেরা হয়ত সুস্থ হইয়া উঠিবেন। কিন্তু, জিবি হাসপাতালের গায়ে যে কলঙ্ক লেপন করা হইল, তাহা কি সহজে মুছিবে? রাজ্যের সমগ্র স্বাস্থ্য পরিষেবা আগের তুলনায় এত যে উন্নত হইয়াছে, এত যে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি বসানো হইয়াছে আই জি এম এবং সরকারি মেডিক্যাল কলেজ (জি বি) হাসপাতালটিতে, সারা রাজ্যে এত যে হাসপাতাল-স্বাস্থ্যকেন্দ্র-উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি হইতাছে, ডাক্তার-নার্স সমেত সর্বস্তরের চিকিৎসা কর্মীরা এত যে পরিষেবা দিয়া আসিতেছেন, তাহা নিশ্চয়ই এই একটি ঘটনায় মিথ্যা হইয়া যাইবে না।

এখনও সারা দেশের মধ্যে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা এই ছোট্ট রাজ্যেই যথেষ্ট সুলভ, ইহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। দুইটি মেডিক্যাল কলেজ, প্যারা-মেডিক্যাল কলেজ, একাধিক নার্সিং কলেজ, ফার্মেসি কলেজ চলিতেছে। প্রতি বৎসর ডাক্তার নার্স ফার্মাসিস্ট কর্মীরা পাস করিয়া পরিষেবায় যোগদান করিতেছেন। সকলই সত্য। তবুও কোথায় কি ফাঁক থাকিয়া যাইতেছে? কিছু দায়িত্বহীন স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকের জন্য সকলের গায়ে

কলঙ্ক লাগিতেছে। কিছু অমানবিক আচরণ, কিছু অবহেলা, কিছু গাফিলতির ফল অতি মারাত্মক হইয়া উঠিতেছে। কিছু চিকিৎসক, কিছু স্বাস্থ্যকর্মী নিজেদের মানবিক মুখ হারাইয়া ফেলিতেছেন। নিজেদেরকে কেবল অর্থ আমদানির মেশিন আর আদর্শহীন ভোগ-বিলাসী করিয়া তুলিতেছেন। ভুলিয়া যাইতেছেন – তাঁহাদের পেশাটি আর দশটি পেশা হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। এই চরম অবাঞ্ছিত বিস্মরণের মর্মান্তিক বলি হইতেছেন নিরীহ হতদরিদ্র অসচেতন রতন দাসেরা।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভুল হয়। ভুল আগেও হইত। এখনও হইতেছে। এমনকি দেশের খ্যাতনামা দামি বেসরকারি হাসপাতালগুলিতেও গুরুতর ভুল হয়। ইহার বহু উদাহরণ ও প্রমাণ রহিয়াছে। তবে সেই ভুলের তথ্য কর্পোরেট ব্যবস্থাপনার পেশাদারি প্রাচীরের বাহিরে 'আসা কঠিন'। সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় যুক্ত চিকিৎসক বা অন্য কর্মীরা সেই কর্পোরেট মানসিকতায় চলিলে ভয়ঙ্কর ভুল হইবে। কেন না, জনগণের অনেক কষ্টের পয়সায় এই সমগ্র পরিষেবাটি চলিতেছে। এমনকি, জনগণের পয়সাতেই ডাক্তার ও অন্য চিকিৎসা কর্মীরা নিজেদের ডিগ্রি হাসিল করিয়াছেন। জনগণের সঙ্গে প্রতারণা, চালাকি বা জালিযাতি না করিয়া, ভুল হইলে সরাসরি স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করাই শ্রেয়। এইরকম অবহেলা, গাফিলতি বা ভুল-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে না ঘটিতে পারে, সকলে মিলিয়া সেই ব্যবস্থাই করা দরকার। জনগণের দরদি বন্ধু হইতে পারিলে, জনগণের সন্তান হইয়া উঠিতে পারিলে জনগণ আরও বড় ভুলও সংশোধনের সুযোগ দেয়।

সেলুনে এতক্ষণ একটানা কথা বলিয়া ব্যানার্জিবাবু হাঁক পাঁড়িলেন, কী হে চিন্তা– দাড়িটা ছাঁটিবে তো না কী!

(প্রকাশ ঃ ১৬.০৯.২০১৩)

বাবু রতন চক্রবর্তীকে - ২

পরম মান্যবরেষু,

অধম চিন্তা শীলের শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করিবেন। বিধানসভা ভোটের এতদিন পরে আবার আপনাকে একখানা পত্রাঞ্জলি প্রেরণের বাসনা বড় তীব্র হইয়াছে। এখন আপনি বড় ব্যস্ত। সবুজ রঙের টিন আর ব্রাশ ধরাইয়া দিয়াছেন দিদি। ত্রিপুরার কংগ্রেসের রঙ পাল্টাইয়া তৃণমূলি-সবুজ করিতে হইবে। গুরুদায়িত্ব। এখন আর সঙ্গে সুধীররঞ্জনবাবু নাই, (অবশ্য, থাকিলে মেডিক্যাল আসন কেলেঙ্কারিতে নির্ঘাৎ জেলে পাঠাইত সি বি আই আদালত। একদিকে ভালই হইয়াছে)! তবে আছেন সুরজিৎবাবু, জওহরবাবুরা। আরও আছেন 'আসিতেছেন ও আসিবেন বাবুরা'। আপনার ব্যস্ততা তাই অসীম। টিকেট-বঞ্চনা, লাঞ্ছনা আর অশেষ অপমানের বিষপানে নীলকণ্ঠ হইয়া বসিয়া গিয়াছিলেন। তবুও ভোটে ভরাডুবির পর কংগ্রেসের সাংবাদিক সম্মেলনে আপনি না আসিয়া পারেন নাই! সেই দিন আপনার সাক্ষীগোপাল মুখখানি টিভিতে দেখিয়া চিন্তা-গিন্নি চক্ষের জল ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই।

কী বলিলেন স্যর? ১৯২০ সালে সোবিয়েত রাশিয়ার তাসখন্দে যদি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩-তে কলিকাতায় কেন ত্রিপুরার নতুন তৃণমূল কংগ্রেস গঠিত হইতে পারিবে না? আলবৎ পারে, এবং হইয়াছেও। ৯ই রাজ্যে ফিরিয়া নব্য তৃণমূল চেয়ারম্যান হিসাবে আপনার সে কী বিস্ফোরক সাংবাদিক সম্মেলন! নব্য ভাষা শুনিয়াই বুঝা গেল, আপনি কত দ্রুত নিজেকে 'আধুনিক আর যুগোপযোগী' করিয়া তুলিয়াছেন! কংগ্রেস নেতৃত্বকে 'ব্ল্যাকমেলার, প্রতারক, ঘুষের ব্যাপারী'- আরও কত কিছু কহিলেন! এতদিনে জানাইলেন, দুই দফায় কংগ্রেস নেতারা আপনাকে ৫০ লাখ ঘুষ দিতে চাহিয়াছিলেন। তা-ও একবার ঘুষের প্রস্তাব আসিয়াছিল খোদ প্রণব মুখার্জি (বর্তমান রাষ্ট্রপতি!)-র নির্দেশে অথবা তাঁহারই নিকট হইতে। ১৬ সেপ্টেম্বর আবার সাংবাদিক সম্মেলনে আপনি বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বকে কহিলেন – 'উচ্ছৃঙ্খল, এঁচোড়ে পাকা, বাচাল। মানি আর মাসল-পাওয়ারের রাজনীতি ছাড়া আর

কিছু এরা জানে না'!

সরি রতনবাবু, নতুন কিছু কহিলেন কি? কংগ্রেস নেতাদের ইত্যকার গুণের কথা আমার মতন অতি সাধারণ মানুষদেরও কিছুকিঞ্চিৎ বিলক্ষণ জানা রহিয়াছে। সে বিষয়ে পরে আসিতেছি। কিন্তু, এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি আপনি যেভাবে ব্যক্ত করিলেন, তাহার কোনও তুলনা নাই। আপনি কহিলেন, 'কংগ্রেস এবং তৃণমূলের নীতির মধ্যে পার্থক্য নাই। পার্থক্য কেবল নেতৃত্বের।' নতুন দলের নেত্রীকে 'যা দেবী সর্বভূতেষু....' টাইপের তোষামোদ করিয়া কলিকাতাতেই বহু সুচয়িত বাক্যবন্ধ ব্যবহারে উপস্থিত মুকুল- সহ সকলের বাক্-বন্ধ করিয়া আসিয়াছেন আপনি। এখানে তারই জের টানিয়া, সেই সুরবন্দনায় মনের উপলব্ধ বাণী বসাইয়া বুঝাইয়া দিলেন, আপনার যত রাগ বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। এই নেতৃত্ব বদল করিয়া 'গ্রহণযোগ্য' নেতৃত্ব হইলে কংগ্রেসই ঠিক আছে! মানে – কংগ্রেসে থাকা আর তৃণমূলে থাকা তখন একই কথা। মানে – তখন প্রয়োজন হইলে আবার কংগ্রেসে ফিরিলে ফিরিতেই পারি ...!

বাবু রতন চক্রবর্তী, আপনার কথা হইতেই স্পষ্ট, কংগ্রেস আর তৃণমূলের লড়াই আসলে কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর লড়াইয়ের বেশি কিছু নহে। নীতিতে পার্থক্য নাই। জনগণের স্বার্থ লইয়া কোনও কারবার নাই। ভাষা সংস্কৃতি রুচি, সাংগঠনিক রীতিনীতিও এক। কংগ্রেসের ভিতরের স্বার্থদ্বন্দ্ব, ব্যক্তিদ্বন্দ্ব, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তো সকলেরই অতি পরিচিত। দলে এই গালাগালি তো আবার এই গলাগলি। এই পুষ্পবৃষ্টি, তো এই ইষ্টকবৃষ্টি! কখনও মালা, কখনও তালা, কখনও আবার আতঙ্কে শুধু 'পালা-পালা-পালা'! গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে প্রকাশ্য রাজপথে কোনও কেন্দ্রীয় নেতা ধুতি হারাইয়া নাঙ্গা, আবার কোনও নেতার দাঁত ভাঙ্গা! কংগ্রেস ভবনে কখনও রক্ত ঝরে, কখনও জুতো-চপ্পল উড়ে। এক নেতা দেবদূত তো আরেক নেতা 'অমুকের পুত্'। আজ যে নেতা অতি ব্যবহার্য, কাল তাঁহার মাথায় বালতিভরা বর্জ্য! অজস্র ঘটনা, অসংখ্য কাহিনী: আর ওই দিকে পশ্চিমবাংলায় তো এখন কংগ্রেসের গোষ্ঠী-কাজিয়ার সমস্ত রেকর্ড ভাঙিতে উঠিয়া পড়িয়াই লাগিয়াছে তৃণমূল কংগ্রেস!

আপনি কংগ্রেস নেতৃত্বকে বলিয়াছেন 'প্রতারক, উচ্ছৃঙ্খল' ইত্যাদি। আর কংগ্রেস আপনাকে বলিয়াছে 'জালিয়াত'। ছিঃ ছিঃ। শুনিতে হইবেই তো দাদা! আপনার কথা সূত্রেই বলি, অভিন্ন এই সংস্কৃতির কারণ বোধকরি দুই দলের অভিন্ন নীতি অথবা নীতিহীনতা। সংগঠনে গণতন্ত্রের চিহ্নমাত্র নাই। দুই দলের হাইকমান্ডের হাসি কিংবা ক্রোধ হইল শেষ কথা। স্বার্থের দৌড়ে নেতারা হাইকমান্ডেরে মন রাখিতে শশব্যস্ত। সকলের চেয়ারই মিউজিক্যাল চেয়ার! এই আছে এই নাই! ক্ষমতার অলিন্দে সেঁধিবার টিকেট লইয়া কাড়াকাড়ি। প্রার্থী না হইতে পারিলে বিক্ষুব্ধ প্রার্থী হইয়া জওহর সাহাদের মতন জিতিবার চেষ্টা। নহিলে এই দল

ছাড়িয়া ওই দলে। কিন্তু তিতিবিরক্ত সাধারণ যাত্রীরা (কর্মী-সমর্থকরা) নৌকা ছাড়িতেছেন। কেন না তাঁহাদের ভবনায় নৌকাই যখন ডুবিতেছে তখন নৌকার এই মাথা হইতে ওই মাথায় ঘন ঘন জায়গা বদল বা ছুটাছুটিতে কী লাভ! সামনে লোকসভা ভোট। তাহার পরে রাজ্যে পঞ্চায়েতের ভোট। কী হইবে রতনবাবু? ২২টি কলেজের ছাত্র-সংসদের নির্বাচনের ১৭-১৮টিতে কোনও আসনেই বাম-বিরোধী প্রার্থী নাই! এইবার এমনকি, কোনও ভয়ভীতি, সন্ত্রাসেরও অভিযোগ নাই। লোকসভা, পঞ্চায়েতে অন্যরকম হইবে কী করিয়া? কে? দিদি নিজে এখন বাংলায় তাঁহার 'দাদা' আর 'বৌদি'কে সামলাইতে হিমশিম। ত্রিপুরায় কিছু কংগ্রেস নেতা যেমন তৃণমূলে যাইতেছেন, তেমনি দিদির নিজের ঘাঁটিতে সোমেন (দাদা) মিত্র, শিখা (বৌদি) মিত্র, তাপস পাল, শতাব্দী রায়েরা তৃণমূল ছাড়িয়া যাইতেছেন কংগ্রেসে। কী ট্র্যাজেডি!

সত্যই রতনবাবু, কত সত্যই না চাপা রাখিয়া 'রাজনীতি' করিতে হয় আপনাদের। কই আগে তো কখনও বলেন নাই যে, কংগ্রেস নেতারা ব্ল্যাকমেলার, প্রতারক? টাকা আর পেশিশক্তিতে তাঁহারা রাজনীতি করেন? বরং আট বছর 'কংগ্রেস মুখপাত্র' হিসাবে এই নেতাদের কত তোয়াজ করিয়াছেন! জোট আমলে কংগ্রেসের টাকা আর পেশিশক্তির এত ভয়াবহতা মানুষ দেখিল, কই আপনি তো কখনও প্রতিবাদ করেন নাই? বরং মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন, 'সি পি এম মিথ্যা প্রচার করিতেছে', এমনই বলিয়া গিয়াছেন। যে দলের সর্বোচ্চ সারির নেতারা আপনার মতন রাজ্য নেতাকেও টিকেটের দাবি ছাড়িতে লক্ষ লক্ষ টাকার ঘুষ দিতে চান, তাঁহারা কোটি-কোটিতে অন্য দলের সাংসদ কিনিবেন, পর পর কেলেঙ্কারিতে সেই দলের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা জেলে যাইবেন, তাহাই তো স্বাভাবিক। কই, কখনও তো মানুষকে সতর্ক করেন নাই এ সম্পর্কে? এখন কেন গন্ধীপোকের এক ডানায় দুর্গন্ধ দেখাইয়া আরেক ডানার 'সুগন্ধ' প্রচার করিতেছেন?

ক্ষমা করিবেন বাবু রতন চক্রবর্তী। আমি অতি মূঢ়মতি, চুল-দাড়ি চাছিয়া খাই। ভুল হইলে নিজগুণেই মার্জনা করিবেন। আপনি বিদ্বান সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ। জোট আমলে সংস্কৃতিমন্ত্রী ছিলেন। গানও নাকি ভালবাসেন। 'স্ত্রী' ছবিতে হেমন্তবাবুর গাওয়া ওই বিখ্যাত গানখানি খুব মনে পড়িতেছে। অদ্যকার পত্রে ইহাই সমাপ্তি সঙ্গীত হউক না। 'খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার/ এই তোমাদের পৃথিবী/ এর বাইরে জগৎ আছে/ তোমরা মানো না/ তোমরা নিজেই জানো না ...।' ইতি – আপনার গুণমুগ্ধ . ।

(প্রকাশ : ২৩.০৯.২০১৩)

ডি-গ-বা-জি

ডিগবাজি বড় বিষম কলা। খাইতে চমৎকার। দেখিতে চমৎকার! বাল্যকালে একবারও ডিগবাজি খান নাই – এমন শর্মা নাই। ঘরের মেঝেতে. বিছানায়, বারান্দায়, উঠানে, পুকুরে, মাঠে-ময়দানে – আমাদের ডিগবাজি প্র্যাকটিসের ঠেলায় বড়দের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইত। তবে, বড় হইয়া রাজনীতির দাদা-দিদিদের অত্যাশ্চর্য ডিগবাজির কলাকৌশল দেখিয়া ধরিয়া লইয়ছি, ইঁহারা আলবৎ মায়ের পেটে থাকিতেই ডিগবাজি প্র্যাকটিস শুরু করিয়াছিলেন!

ডিগবাজি কোথায় নাই? মস্ত উকিলবাবু খুনের মামলায় আসামিকে চরমতম সাজা দিতে জবরদস্ত সওয়াল করিলেন। মুগ্ধ বিচারপতিও। এক ঘন্টা পর একইরকম আরেক খুনের মামলায় আসামিকে বেকসুর খালাস দিতে আরও চমৎকার সওয়াল সেই একই উকিলবাবুর! বিস্মিত বিচারপতির জিজ্ঞাসা – একটু আগে যাহা বলিলেন, এখন আপনি নিজেই তাহার উল্টা বলিতেছেন – ব্যাপার কী? উকিলবাবুর সহাস্য যুক্তি, 'ইয়োর অনার, এই এক ঘন্টায় আমার জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটিয়াছে'!

থানাবাবুদের মধ্যেও ডিগবাজি। শুনি তাঁহারা বড় বদরাগী, কড়া! আবার উপযুক্ত মলমে বড় মোলায়েম। অভিযোগ গ্রহণের সময় মরা মাছের চোখে তাকান, আবার মধু-গন্ধে অভিযুক্তের পকেটের পানে লক্‌লকান। কিছু পাইলে আসামি ধরেন। দ্বিগুণ পাইয়া ছাড়েন। তিনগুণে কেস খালাস। চারগুণে অভিযোগকারীকে ফাঁসান। ডিগবাজি! বুদ্ধিজীবী সুশীলবাবুরা তো অনেকেই এই বিদ্যার সাগর! এক পক্ষে এক বাক্য, তো পরের বাক্যটি ওই পক্ষে! একদল বুদ্ধিজীবী আরও ভয়াল। ইহারা সমর্থনের ভঙ্গিতে বিরোধিতা করেন, বিরোধিতার ভঙ্গিতে সমর্থন করেন। আবার আপন স্বার্থে টান পড়িলে 'জনস্বার্থে' সুড়ুৎ করিয়া ডিগবাজি খান! অতএব, ডিগবাজি এখন কেবল 'বিচিত্রগামী' নহে, রীতিমতন 'সর্বত্রগামী'। প্রায় সর্বত্রই তাহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আসন পাকা হইয়াছে।

রাজনীতিতে দলবদল নামক ডিগবাজি দেখিতে দেখিতে ভারতীয় জনতা ক্লান্ত। কত নাম দিয়াছে লোকে! আয়ারাম-গয়ারাম, কেনারাম-বেচারাম ইত্যাদি। 'দলত্যাগ-বিরোধী আইন'– যখন যে দলের হাতে, সেই দলের ইচ্ছাতেই চলে। আমাদের রাজ্যেও দলবদলের

ডিগবাজিতে আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। তবে অধুনা আবার তৃণমুলি হওয়া— রতন চক্রবর্তী যত চেষ্টাহ করুন, হরিনাথ দেববর্মার রেকর্ড ভাঙিতে পারিবেন না! দলবদলের পদক তালিকায় দ্রাউকুমার, দেবব্রত কলই, রতন চক্রবর্তী, সমীররঞ্জন, জওহর, সুরজিৎদের বহু পিছনে ফেলিয়া হরিনাথই এখনও শীর্ষে!

এখন দেখিতেছি, বামেরাও 'দলবদল'- এর প্রবল উৎসাহদাতা। ভোট? ভোট আগেও ছিল। আগেও কংগ্রেস বা অন্য দল ছাড়িয়া মানুষ বামেদের দিকে আসিত। আসিবারই কথা। 'ঠিক মানুষ' ভুল শিবিরে রহিয়াছেন বলিয়াই তো তাঁহাদের জয় করিবার নিরন্তর নিরলস কর্মকাণ্ড বামেদের। কিন্তু, দলত্যাগের বড়-বড় আসর বসাইয়া, রক্তগোলাপ আর রক্তপতাকা বিতরণের এই দুর্বিষহ প্রদর্শনী কেন দৃষ্টিসহ করিয়া তোলা হইতেছে? হয়ত, পরিস্থিতি বদলাইয়াছে। অথবা, সংসদীয় রাজনীতিতে এই সব আসর-বা প্রদর্শনী অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু, এইসব আসরে-আসরে এক সর্বগ্রাসী অসর-সর্বস্বতার ছায়াবিস্তারও কি অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে না?

টেপ রেকর্ডার, ভিডিও ক্যামেরা, টিভিতে লাইভ সম্প্রচার— এত কিছুর প্রচলনেও জাতীয় নেতারা একবার বলেন, আবার অস্বীকার করেন। ডিগবাজি! স্ট্রিং অপারেশনে টিভিতে ঘুষ দেওয়া-নেওয়া দেখিলেন। পরদিন নেতার সফাই — 'ওইটা জাল ভিডিও'। ডিগবাজি! আট বছর আগে প্রধানমন্ত্রী আসিয়া কহিলেন — ত্রিপুরার জাতীয় সড়ক চার লেন হইবে। এখন প্রধানমন্ত্রীর ৮ বছর বয়স বাড়িয়াছে। অনেক কিছুই মনে থাকে না! হাই-প্রোফাইল ডিগবাজি! সবশেষে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদ্য পাস করা অর্ডিন্যান্স লইয়া কংগ্রেস সহসভাপতি রাহুল গান্ধির 'নন-সেন্স' সাংবাদিক সম্মেলন। সুপ্রিম কোর্টের রায় হইতে 'অপরাধী' সাংসদ ও বিধায়কদের তিন মাস ছাড় দিতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ক্যাবিনেটে পাস করা অর্ডিন্যান্স। সংসদেও আলোচিত। সমালোচিত। সারা দেশ জানে। কেবল রাহুল গান্ধি যেন হঠাৎ কোনও ভিন গ্রহ হইতে অসিয়া, দেখিয়া শুনিয়া খেপিয়া জনসমক্ষে 'সব নন্‌সেন্স' বলিলেন! ডিগবাজি! আসল কারণ এই অর্ডিন্যান্সে সুপ্রিম কোর্ট ক্ষুব্ধ। কংগ্রেস আরও ডুবিবে। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় থাকা দলের প্রধানমন্ত্রীর রাহুল-ভজনা! আনুগত্যের ডিগবাজি! কংগ্রেস মুখপাত্র অজয় মাকেন এক ঘন্টা আগে সাংবাদিক সম্মেলনে অর্ডিন্যান্সের কঠোর সমর্থক। এক ঘন্টা পরে তীব্র বিরোধী! কহিলেন, রাহুলের কথাই কংগ্রেসের কথা! ডিগবাজি, নাকি 'এক ঘন্টায় জ্ঞানবৃদ্ধি'?

অতএব, ত্রিপুরার অস্নাতক শিক্ষক পদের চাকুরিতে 'টেট' ছাড় লইয়া একই কংগ্রেস দলের নতুন ডিগবাজি খুবই ক্ষুদ্র বিষয়! কেবল বিধানসভা ভোটের আগে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ মন্ত্রীকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির সেই চিঠির কথা ত্রিপুরার বেকার ছেলেমেয়েরা কোনওদিন

ভুলিবেন না। 'এই পাঁচ হাজার অস্নাতক শিক্ষক পদে সি পি এম তাহাদের ক্যাডার নিয়োগ করিবে। কোনওমতেই এই চাকুরিতে টেট ছাড় দেওয়া চলিবে না'। ভোটের পরে, এই কিছু দিন আগেও সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি জোর গলায় তাঁহার আগের বক্তব্যেই অটল থাকিলেন। এখন কংগ্রেস বলিতেছে, 'টেট ছাড়ে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। আইন চালু হইবার আগে ইন্টারভিউ দিয়া থাকিলে টেট লাগিবে না– ইহা আইনেই আছে!' চিন্তা-গিন্নি পত্রিকার উপরে ঝাঁপাইয়া কহিলেন, আরে আরে – এ কী শুনি মন্থরার মুখে! ডিগবাজি, না জ্ঞানবৃদ্ধি? দুইজনে কোরাসে জয়ধ্বনি করিলাম – 'শাব্বাশ কংগ্রেস'!

(প্রকাশ : ৩০.০৯.২০১৩)

এই উৎসবে ...

তিনি আসিতেছেন।

তাই গৃহেও স্ত্রী-শক্তি জাগরিত! ফলত চিন্তা-র উজাগর নিশি-যাপন! দাবি আর দাবি। জামা জুতা গয়না শাড়ি সালোয়ার! ডেপুটেশন, সেলুনে যাইবার মুখে চৌকাঠ-অবরোধ! অনশন, সত্যাগ্রহ ইত্যাদি। দাবিসমূহের 'যৌক্তিকতা' প্রাণপণে স্বীকার করিলেও হেথায় মুখের কথায় কেহ ফিরিবার পাত্রী নহেন। কনিষ্ঠা কন্যার দাবি – 'লুঙ্গি ডান্স' জামা। ইহা কী বস্তু কে জানে! চিন্তা-গিন্নির কেবল একখানা 'বেশরম' শাড়ি চাই। বেচারা কোনও এক রণধীর কাপুরের ছবির দিকে চাহিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেছেন। স্ত্রী-শক্তির ভয়ঙ্করতম অস্ত্র! মহা-প্রহরণ! দশভুজার অন্তত একটি হস্তে 'অশ্রু' নামক এই অস্ত্রটি দেবাদিদেব কেন যে ধরাইয়া দেন নাই, তাহাই রহস্য। 'ওয়াটার অব ইন্ডিয়া'-র মতন একটি অশ্রুঘট গুঁজিয়া দিলেই চলিত!

বাজারে সবই আছে। কেবল পকেটে মূল্য নাই। সেলুনেও ভিড় নাই। সকলেই পার্লারে ছুটিতেছে। শেভিংয়ের ফোম্ নাই শুনিয়া পড়ার গাঁজারসিক 'ব্যোম ভোলা'-ও খিস্তি মারিয়া গিয়াছে। ব্যানার্জিবাবু আসিয়া কহিলেন, ওহে চিন্তা, পূজার বাজার শেষ? তোমার গৃহ তো মহাশক্তির আধার। নবরত্নের মতন নয়টি কন্যা আর গিন্নি। দশভুজা যেন সাক্ষাৎ দশরূপা! তাহাদের সন্তুষ্টি বিধান কর। ফল মিলিবে। কহিলাম, দাদা – আমি অতি মূঢ়মতি, কী জানি মহিমা। তবে, দুর্গাপূজা যদি নারীশক্তির আরাধনাই হয় – তবে নারীদের উপর অত্যাচার এত বাড়িতেছে কেন – বুঝি না। এত ধর্ষণ, গণধর্ষণ, স্ত্রী-ধনের জন্য স্ত্রীকে পোড়াইয়া মারা, নতুবা আত্মঘাতী হইতে বাধ্য করা, এত গার্হস্থ্য হিংসা কেন? যাহারা ধুমধামে পূজা করিতেছেন, তাহাদের মধ্যেই বধূ-নির্যাতনকারী, কেহ ধর্ষণকারী, কেহ হত্যাকারী! কেন? ব্যানার্জিবাবু কহিলেন, শুনো হে, দেবী দশভুজা ওই যে অসুরটি-কে বধ করিতেছেন, সে আর কেহ নহে, এইসব সামাজিক অসুখেরই প্রতীক। দুর্গার দশ হাত হইল সমাজের দশজন। অর্থাৎ সকলে মিলিয়া ওই অসুর রূপী সামাজিক ব্যাধির বিনাশ করিতে হইবে।

ব্যানার্জিবাবুর কথা শুনিতে মন্দ লাগিল না। কিন্তু মনে হইল কোথায় যেন গোড়াতেই

গলদ। নারীশক্তির-র আরাধনা করিলেও সমাজ, শাস্ত্র, রাষ্ট্র আসলে কি নারী-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে? নারীর মর্যাদা স্বীকার করে? করিলে নারীকে দরকার মতো কখনও 'দেবী' কখনও 'নরকের দ্বার' বলিতেন না শাস্ত্রকারেরা। শুধু পূর্ণ-মানুষ হিসাবেই নারীকে সমান মর্যাদা দিতেন। মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গাকে 'শক্তিরূপেণ সংস্থিতা' বলিয়া পূজা করিলেও চালাকিটা এই নাপিতের বেটাও বুঝিতে পারে। বিপদকালে দরকার মতো 'দুর্গাদেবী'-কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন কে? ব্রহ্মা, একজন পুরুষ। যে দেবতারা তাঁহাকে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাজাইয়াছেন তাঁহারাও সকলেই পুরুষ! অর্থাৎ 'নারীশক্তি'-র আড়ালে আসলে পুরুষশক্তিরই জয়গান। যেন 'নারীশক্তি' আপনা হইতে কোনও শক্তি নহে। চাঁদের মতনই তাহার নিজের কোনও আলো নাই! চালাকি নহে?

আবার শুনি – গিরিরাজের কন্যা পার্বতী বৎসরে একটিবার কৈলাসের পতিগৃহ হইতে মর্ত্যের পিতৃগৃহে পুত্রকন্যা সমেত আসেন, তাহাও মাত্র তিনদিনের জন্য। তখনই হয় পার্বতী বা দুর্গাদেবীর পূজা। সেথায়ও নারীর সেই বহু-পরিচিত দুইটি জীবন! বিবাহের আগে আর বিবাহের পরে। বিবাহের আগে পুরুষ-পিতার অধীনে। রূপে-গুণে-জ্ঞানে নারীকে শৈশব হইতে যৌবনে সাজাইয়া তোলার পর্ব, পরের ঘরের তরে। কিংবা আরেক পুরুষের দাসীবৃত্তির জন্য। কেন না, বিবাহের পরে স্বামীর অধীনে গৃহস্থালি, পতিসেবা হইতে পুত্র-কন্যা মানুষ করাই নারীর 'পরম কর্তব্য'। কিছুটা রকমফের হইলেও – সেই ট্র্যাডিশন আজও চলিতেছে সমানে, ঘরে ঘরে। সেথায় নারী নামক 'পূর্ণ মানুষ' কই? স্বাধীন নারীর মর্যাদা কোথায়?

ব্যানার্জিবাবু কহিলেন, কী ভাবিতেছ চিন্তা? কন্যাদের কথা? তাহাদের বিবাহের কথা? কহিলাম, দাদা – নারীর বিবাহের অপর নাম কি স্বামীর দাসত্ব? ব্যানার্জিবাবু কহিলেন, খুবই কঠিন প্রশ্ন তোমার চিন্তা। উত্তর হাঁ, আবার না-ও। এঙ্গেলস সাহেব দেখাইয়াছেন, পুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিশ্চিত করিতেই 'বিবাহ' প্রথার সৃষ্টি। তাহার আগে বিবাহ ছিল না। ভবিষ্যতে সম্পত্তির (উৎপাদনের উপকরণসমূহের) সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইলে বিবাহ উঠিয়া যাইবে, এই কথা কিন্তু বলা যায় না। তবে বর্তমান ধরনে হয়তো থাকিবে না। নারী-পুরুষ তথা স্ত্রী আর স্বামীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা-সম্মান-ভালবাসা, সমঝোতা আর সহমর্মিতার দরদি সম্পর্কে বিবাহ সার্থক হয়। বিবাহের অর্থ 'দাসত্ব' নহে, নারী-পুরুষের বিকাশে দুইজনের নিরন্তর বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা। বিবাহ একটি সামাজিক শৃঙ্খলা, কিন্তু কদাপি কাহারও জন্য শৃঙ্খল নহে। মুশকিল হইল, বর্তমান শাসক শ্রেণীর যত্নলালিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, শিক্ষা-দীক্ষা, পারিবারিক পরিবেশ – কোথাও নারীর পূর্ণ-মানুষ হইয়া উঠিবার সুযোগ অবারিত নাই। জন্মের পর হইতে নারীকে 'পুরুষের জন্য দরকারি অর্ধ-মানুষ' বিবেচনার চক্রব্যূহে বাঁচিতে হয়। বড় হইতে হয়। ক্রমে নারী

নিজেও নিজেকে 'উন-মানুষ' ভাবিতে শুরু করে। পুরুষের পেশিশক্তির কাছে নিজেকে হীন ভাবিয়া আত্মপীড়নে অভ্যস্ত হয়। পিতা-র, ভ্রাতা-র দাসত্বের পর বিবাহে পতিগৃহে আরও বড় 'দাস'-এ পরিণত হইতে হয় বেশিরভাগ নারীকে।

– শুনো চিন্তা, একদিনে সমাজ বদল হয় না। কিন্তু, প্রতিটি পরিবারে শিক্ষিত সচেতন পিতা-মাতা কন্যাসন্তানকে পূর্ণ-মানুষ হিসাবে গড়ার যত্ন লইতে পারেন। পরিবারের সকলে পুরনো মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়া সর্বক্ষেত্রে কন্যা ও পুত্র সন্তানের সর্বসম মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ব্রতে অগ্রণী হইতে পারেন। এমনকী, যুগ যুগ বঞ্চনার কারণে সর্বক্ষেত্রে কন্যাসন্তানকেই অগ্রাধিকার দিবার ন্যায্য দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করিতে পারেন। জানি, বলা যত সহজ, করা তত নহে। তবুও, এইবারের দুর্গোৎসবেই এই সচেতন প্রয়াস শুরু হউক। ধীরে ধীরে পাড়ায়-পাড়ায়, গ্রামে-শহরে-পাহাড়ে এই প্রয়াস সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপক হইয়া উঠুক। চল চিন্তা, আমরা আমাদের শুভকামনা জানাই সকলকে। শান্তিতে-আনন্দে, শুভচেতনার নবদীপ্তিতে উদ্ভাসিত হউক আসন্ন শারদোৎসব।

(প্রকাশ : ০৭.১০.২০১৩)

টাকা-শয্যা!

মঞ্চে উৎসব-গীতি তখন সাঙ্গ হইবার পথে।

হঠাৎ মিডিয়ার জগঝম্পে প্রবল শব্দ উৎপন্ন হইল। ডায়লগ ভুলিয়া যাওয়া সেনাপতিরা কোথা হইতে মঞ্চের পাটাতনে বীরদর্পে ধপাস করিয়া লাফাইয়া পড়িলেন। টিনের তরোয়াল উঁচাইয়া ভীষণ হুঙ্কার ছাড়িতেই কাড়া-নাকাড়া বাজিল। অদ্ভুত আলো বিদ্যুৎবেগে জ্বলিতে-নিভিতে লাগিল। যুদ্ধ-যুদ্ধ-যুদ্ধ! সি পি এমকে এতদিনে বাগে পাওয়া গিয়াছে। হোক লোকাল কমিটির সদস্য। কান টানিয়া মাথা আনিব! সমর আচার্য হইতে সমর চক্রবর্তী, তাহার পরে মানিক সরকারও। 'এইবার যাইবা কই দাদা'! দুর্নীতি, ঘোর দুর্নীতি। বামমার্গী চুনোপুঁটিরাও যদি 'কোটিপতি' হইয়া এইরকম টাকার বান্ডিলে শয়ন করিতে পারে, তাহা হইলে বড় নেতা-মন্ত্রীদের কী হাল – জনগণ অনুমান করুন। চল্ রে সৈন্যদল, শিনা ফুলাইয়া বল্ –'বামফ্রন্ট সরকার নিপাত্ যাক্।' কিন্তু – অকস্মাৎ, এ কী হইল! একেবারে সরাসরি বহিষ্কার? সাসপেন্ডও নহে! অভিযুক্তকে সময় দেওয়া হইলে আমরাও 'সময়' লইয়া সম্মুখ-সমরের সময় পাইতাম। যুদ্ধটা মাঠেই মরিয়া গেল। কী যে বেরসিক এই সি পি এম নেতারা! ছিঃ!

বেচারা সমর আচার্য। লোকে শিকারি না হইয়াও বন্দুক হাতে মরা বাঘের উপর বুটসুদ্ধ পা রাখিয়া ফটো তোলাইয়া থাকে! শখ করিয়া ঘোড়ার পিঠে বসিয়া ছবি তোলায়! শিশু-পুত্রকে সেনা কমান্ডারের পোশাক পরাইয়া ফটো বাঁধায়! আর ইনি কি না কপালে-বুকে-পেটে 'পরের টাকা' রাখিয়া নিজের মোবাইলেই ছবি তোলাইলেন! এখন 'শখ-এর জরিমানা' দিয়া পার্টি হইতেই বহিষ্কৃত! চিন্তা-গিন্নি ফোড়ন কাটিলেন, 'বেচারা' বলিতেছ কেন? এই কিম্ভূত শখের ভূত মাথায় না চাপিলে কে তাহাকে চিনিত? এখন দেশজোড়া মানুষ এই গুণধর সমরকে চিনিয়াছে। দেশ-বিদেশের কত নামী-দামি টিভি চ্যানেলে তাহার টাকা-শয্যার ছবি দেখাইয়া যে যেমনভাবে পারিতেছে মনের রঙ মিশাইয়া 'খবর' প্রচার করিতেছে! যোগেন্দ্রনগরের সমর আচার্য এখন তাজমহলের পরে পৃথিবীর নবম আশ্চর্য এবং দ্রষ্টব্য!

কহিলাম, গিন্নি – মিডিয়াকে এত দোষ দিও না। এমন একটি চমকদার কাণ্ড পাইলে তাহারা

ছাড়িবে কেন? তবে কোন মিডিয়া ন্যাদামাখা ন্যাজের ছবি দেখাইয়া ইহাকেই 'হাতি' বলিবে, আর কে কেবল 'শুড়' দেখাইয়া বলিবে – 'হাতি দেখিতে দমকলের পাইপের মতন'–ইহা তো ওই মিডিয়ার 'পলিসি'! গোটা হাতিটাকেই দেখাইয়া 'হাতি' বলিবার মতন মিডিয়া দুর্ভাগ্যজনকভাবে কম। এই দেখো না, ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ হইতে বৈদ্যনাথ মজুমদারের মতন সি পি এম নেতারা তাঁহাদের সর্বস্বই পার্টি ও জনগণের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। 'খাই-খাই' রাজনীতির যুগে এত বড় বিরল দৃষ্টান্ত কয়টা মিডিয়ায় গুরুত্ব পাইয়াছে? এখনও হাজার হাজার বাম কর্মী আদর্শে অবিচল থাকিয়া কৃচ্ছ্রসাধনের জীবন যাপন করিতেছেন। মিডিয়ায় তাঁহাদের লইয়া কয়টি 'স্টোরি' লেখা হয়? ইহার জন্য দুঃখ করিয়ো না। টাকা-শয্যার এই ছবি দুর্গোৎসবের আগে সি পি এম নেতাদের হাতে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা উৎসব সাঙ্গ হইবার অপেক্ষা করিতেছিলেন। মিডিয়ায় প্রচারিত না হইলে বিভাগীয় কমিটির জরুরি বৈঠক ডাকিয়া ওই 'কীর্তিমান'লোকাল কমিটি সদস্যকে এত দ্রুত বহিষ্কার করা হইত কিনা– সেই সংশয় তো জনগণের মনে জাগিতেই পারে। সকল ভালরও যেমন মন্দ থাকে, তেমনই সকল মন্দের সঙ্গো কিছু ভালও আসে। অন্তত এই রাজ্যে সি পি এমের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের কাছে এই ঘটনা নতুন করিয়া আত্মোপলব্ধির সুযোগ আনিয়া দিল, সন্দেহ নাই। শুধু, দেশ বিদেশের বড় মিডিয়ার চরম দায়িত্বহীনতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম! ইহারা কোনওরকম যাচাই না করিয়া একটি বিচ্ছিন্ন মনোবিকৃতির ঘটনাকে যে পরিমাণ 'হাইলাইট' করিল, তাহার পিছনে এক ধরনের অন্ধ বাম-বিদ্বেষই উদাম হইয়া গিয়াছে।

– কী কহিলে গিন্নি? টিভিতে গোছা-গোছা টাকার ছবি আগেও অনেক দেখিয়াছ? তা – মন্দ বলো নাই। কংগ্রেস নেতারা কীভাবে সরকার টিকাইতে কোটি কোটি টাকা ঘুষ দেন, সংসদের ভিতরেই সেসব টাকার বান্ডিল দেখাইয়া ফাঁস করিয়াছেন বি জে পি সদস্যরা। আবার বি জে পি-র সর্বভারতীয় সভাপতি নিজেই টাকার বান্ডিল ঘুষ নেন – সেই ছবিও তো সকলেই দেখিয়াছে। টু-জি স্পেকট্রামের ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা এক জীবনে গুনিয়া শেষ করা যায় না! অথচ কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতা-মন্ত্রীরা এইভাবে শত-সহস্র-লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতিতে অভিযুক্ত! অনেকেই কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত। যোগেন্দ্রনগরের সমর আচার্য কংগ্রেসকর্মী হইলে তাঁহার এই বিকৃতবাসনা-প্রসূত টাকা-শয্যার খবর যে তেমন গুরুত্ব পাইত না, সবাই জানে। কারণ, এই দলের খোদ প্রধানমন্ত্রীর নামও কয়লা খাদান কেলেঙ্কারিতে এখন সরাসরি যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। দুর্নীতির পরিমাণ মাত্র ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি!

মুশকিল হইল, সমর দুর্নীতি বা চুরি করিয়াছেন এমন কোনও প্রমাণ কিন্তু জনসমক্ষে আসে নাই। তবে এমন নৈতিকতো-বিরোধী বিকৃত শখ যাহার, তিনি নিশ্চয় আরও বহু কাণ্ড করিয়াছেন। এহেন আদমিরা সি পি এমের পার্টি-সদস্য হন কী করিয়া, কাহার প্রভাবে

লোকাল কমিটিতেও ঠাঁই পান, কেন পার্টি নির্দেশ অমান্য করিয়া ঠিকাদারেরা এখনও পার্টির লোকাল কমিটিতে থাকিতে পারেন – এইসব প্রশ্নও প্রাসঙ্গিক বই কী! কিন্তু, বাম-বিরোধী সেনাপতিদের টার্গেট তো সমর নহেন, টার্গেট সিপিএম! হুঙ্কারদাতাদের একজন তো ২০০৮ নির্বাচনের সবচেয়ে ধনী প্রার্থী। আইনি ঘোষণা মতন তখনই ছিলেন ১৮ কোটির মালিক। ১৫ লাখে একটি 'টাকা-শয্যা' হইলে, প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক এবং বর্তমান গ্রামীণ কংগ্রেসের এই সেনাপতি ইচ্ছা করিলেই অন্তত ১২০ টি টাকা-শয্যায় একসঙ্গে ঘুমাইতে পারেন। রাজ্যে কংগ্রেসের প্রকৃত কর্ণধার বর্তমান বিরোধী নেতাও কম যান কি? দুই বিধানসভা ভোটের মাঝখানে তাঁহার সম্পত্তি ২০ শতাংশ কী করিয়া বাড়িল, তাহার ব্যাখ্যা আজও ভোটারদের অজ্ঞাত। আর, বর্তমান তৃণমূলের হুঙ্কারদাতা সহ-সেনাপতিটি এত কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত এবং কলঙ্কিত যে, কংগ্রেসের মতন কেলেঙ্কারি-শোভিত দলও তাঁহাকে বহিষ্কার না করিয়া পারে নাই। এই সেনাপতিরা নিজেরাই এক-একজন চালুনি! ইহারা সুচের পিছনে 'ছিদ্র' দেখাইতে আসিলে রাজ্যবাসী পাত্তা দিবেন না। দেনও নাই। কিন্তু রাজ্যের বাহিরে বহু লোক হয়ত পাত্তা দিবেন, বিভ্রান্ত হইবেন, সি পি এমের ভাবমূর্তিও কিছুটা হয়তো প্রশ্নের মুখে পড়িবে।

শুনো গিন্নি. আসল কথা হইল – বামেরা বাদে বাকি সব দলে মহাসাগর চুরি করিলেও নেতারা 'নেতা'ই থাকেন! সিপিএম অন্তত দেখাইল – দলটি এখনও নেতা-কর্মীদের কোনও দুর্নীতি বা অনৈতিকতায় প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু, ইহাও সত্য, কমিউনিস্ট কর্মীরা সন্ন্যাসী নহেন, সমাজ-বহির্ভূতও নহেন। সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারে থাকিলে এমনিতেই বেনো জল ঢুকিয়া যায়। ঢুকিয়াছে, ঢুকিতেছেও। সেই বেনো জল পরিশুদ্ধ করিবার কাজটি সহজ নহে। তাহার উপর আবিশ্ব পচনের এই নষ্ট সময়কালে নানান রোগ-জীবাণুর বিরুদ্ধে যে লড়াই চলিতেছে, 'সমর-কাণ্ড' তাহাকে নিশ্চিতই আরও শক্তিশালী করিবে। 'শহিদ পার্টি কর্মী' সমর (বাবুল) আচার্যকে সকলে ধিক্কার দিলেও নাপিত চিন্তাচরণ এই কারণেই তাহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছে।

(প্রকাশ: ২১.১০.২০১৩)

এখনও, এখানেও!

ভোর-সকালে চিল-চিৎকারে ঘুম ভাঙিল। নির্ঘাত কোথাও বিধ্বংসী আগুন লাগিয়াছে!

ধড়মড়াইয়া উঠিয়া বসিতেই দেখি, হারমোনিয়াম টিপিয়া চিন্তা-গিন্নি এবং তাহার কনিষ্ঠা কন্যারত্নটি ঊর্ধ্বপানে হাঁ করিয়া আছেন। তারস্বরে রবীন্দ্র-শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতে করিতে 'যুদ্ধের গান' গাহিতেছেন, 'আলু আমার আলু ওগো, আলু ভুবনভরা ...!" অতি কষ্টে সঙ্গীতমর্দিনী দুই আলু-দরদিনীকে থামাইয়া কহিলাম – মূর্খ সুর-ত্রাসিনীগণ, উহা আলু নহে 'আলো'। হায় হায়, ওগো রবিঠাকুর, অপরাধ নিয়ো না। জগতের রবিপ্রেমীগণ, ক্ষমা করিয়ো। ইহারা অবুঝ ...! অমনি কন্যা হঠাৎ মৃগী রোগীর মতো মাথা ঝাঁকাইয়া গাহিতে লাগিল – "দে দে পেঁয়াজ দে, পেঁয়াজ দে, পেঁয়াজ দে রে, দে দে পেঁয়াজ দে ...!"

কী হ্যাপা! আলো-র বদলে আলু, 'প্যায়ার'-এর বদলে পেঁয়াজ! বুঝিলাম, আলু-পেঁয়াজের চলতি বাজারদর বিশ্বাস করিতে যাইয়া ইহাদের মাথায় কিঞ্চিৎ ছিট্ দেখা দিয়াছে। কে বিশ্বাস করিতে বলিয়াছে? যাহা অবিশ্বাস্য, তাহা বিশ্বাস করিয়ো না। দেশ জুড়িয়া বাজারে যাহা চলিতেছে – সবই মায়া! মহামায়ার খেলা! তিনি পরীক্ষা করিতেছেন! কেন্দ্রের সরকার নিমিত্তমাত্র! দীপাবলি আসিতেছে। আলোর উৎসব হইবে। অন্তরে -বাহিরে অন্ধকার দূর করিবার জন্য ঘরে ঘরে আলো জ্বলিবে। সেলুনের খদ্দের এক পুলিসদাদা অতি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন, 'আলোর উৎসব' না করিয়া এইবার 'আলু-উৎসব', 'পেঁয়াজ-কাঁচা মরিচ উৎসব' করিলে সকলের উপকার হইত। 'আলোর উৎসব'-এ মজুতদার কালোবাজারির হৃদয়ে কস্মিনকালেও আলো জ্বলিবে না। তাহাদের অন্ধকার দরকার! ঘনঘোর অন্ধকার!

সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া ব্যানার্জিবাবু কহিলেন, অন্ধকার দরকার আরও অনেকের। যুক্তিবাদীরা জানাইয়াছেন, সোনামুড়ার ধলিয়াইজলায় লোকের বাড়ির শৌচালয়ের জলও আসিয়া মিশিয়া থাকে। মশা মাছিরা বড় আনন্দে ডিম পাড়ে। সেই জলার নোংরা জলই 'পাগলি মাসি' বা 'পিসি'-র নামে ' জলপড়া' করিয়া খাইলে সমস্ত রোগ এমনকী ক্যান্সারও সারিবে? এমনই 'স্বপ্নাদেশ'? তাহা হইলে সারা দেশে এত চিকিৎসা-গবেষণা, এত মেডিক্যাল কলেজ, এত হাসপাতাল, এত ডাক্তার-নার্স, এত ওষুধ, স্বাস্থ্যখাতে এত বরাদ্দ কেন? বুঝি না। সব

উঠাইয়া দিয়া জলার জলপড়া বিলি করিলেই চলে! এই যুগেও এত কাঁচা ধাপ্পায় কেহ বিশ্বাস করিতে পারে! এই জঘন্য বুজরুকিতে যাহাদের যশ-অর্থ-সম্পদ-সহ নানা প্রাপ্তি ঘটে, স্বভাবতই তাহাদের দরকার অন্ধকার। লোকের মনে এই যুগ যুগ সঞ্চিত অন্ধকারের নামই অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার। ইহা জিয়াইয়া রাখিতে পারিলে লাভ কেবল স্থানীয় ওই দুই যুবক কিংবা নিরীহ কিছু মোম-ধূপকাঠি বিক্রেতারই নহে, লাভের আসল ক্ষীর খাইবার লোকেরা রহিয়াছেন রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষ সারিতে। নহিলে সমস্ত আইন ফাঁকি দিয়া চ্যানেলে-চ্যানেলে ভাগ্যগণনা, কোটি কোটি টাকার রত্ন-পাথর আর তাবিজ-কবচের ব্যবসা, বশীকরণের ধর্মতত্ত্ব প্রচার চলিতে পারিত না। মন্ত্রীর, সরকারি পদাধিকারী ও রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা মন্দিরে মসজিদে, গুরুদ্বারে গিয়া ভোটের আগে ভেকধারী হইতেন না। ধর্মগুরুর 'স্বপ্ন'-এর ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উদ্যোগে 'গুপ্তধন'-এর জন্য সরকারি খোঁড়াখুঁড়ি চলিতে পারিত না! স্বাধীনতার ৬৬ বছর পরেও হে বিবেকানন্দ – ইহা কোন্ ভারত!

– দেশ তো দেশ, আমাদের এই রাজ্যেও এ কোন অন্ধকার! খোয়াইয়ের গণকিতে পরপর তিন আত্মহত্যার ঘটনায় 'ভূতের পুজা' হইতে থাকিলে এই প্রশ্ন মনে জাগিবে না? বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের পতাকাবাহীদের নেতৃত্বে ছয়টি বামফ্রন্ট সরকার তিরিশ বছর পার করিয়াছে। এখন সপ্তম। রাজ্যের বহির্পটে উন্নতি-অগ্রগতির এত উজ্জ্বল ছবি। কিন্তু অন্তর্পটে কী অগ্রগতি ঘটিল? এখনও অন্ধ বিশ্বাসে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত জনতাকে লেলাইয়া নিরীহ মহিলাকে 'ডাইনি' অপবাদে হত্যা করা যায়! এখনও গ্রামাঞ্চলে জলপড়া-থালপড়া-বাটিচালা-র রমরমা। এখনও ওঝাদের ঝাড়ফুঁকের এত দাপট! সাংস্কৃতিক আন্দোলন কি কেবল গান-বাজনা আর নৃত্যের প্রদর্শনীতে ঘুরিবে- ফিরিবে? বিজ্ঞান-মনস্কতা ও যুক্তিবাদের তৎপরতা সমাজ পরিবর্তনের বৃহত্তর সংগ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া কবে কোথায় সাফল্য পাইয়াছে?

– দুর্বলতা কোথায়? গলদ কোথায়? কাগজে (ডেইলি দেশের কথা) পড়িলাম, বিশালগড়ের বটলিং প্লান্টে গ্যাসের সঙ্কট। গ্যাসবাহী বুলেট আসিতে পারিতেছে না। সব বুলেট-গাড়ি চুরাইবাড়ির ওইদিকে থামিয়া রহিয়াছে। কেন? চুরাইবাড়ি হইতে বিশালগড় পর্যন্ত ১৪টি থানা ও ফাঁড়ির পুলিসেরা গাড়িপিছু দুইশো টাকা কালীপূজার চাঁদা আদায় করিতেছেন। গাড়ি-পিছু ২৮০০ টাকা! অর্থাৎ, থানায়-থানায় কালীপূজা আরও জোরদার! ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পুলিস সরকারি উর্দি গায়ে রাস্তায় পূজার চাঁদা তুলিতেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইহা প্রহসন নহে? ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ রাষ্ট্রের কোনও ধর্ম নাই। হিন্দু-আচার ছাড়া অন্য রাজ্যে কোনও মুখ্যমন্ত্রী কিছু উদ্বোধন করেন না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও নন। কিন্তু, ত্রিপুরায় তো বামপন্থী বায়ুমণ্ডল। এখানে কোনও উদ্বোধনে নারকেল ভাঙা না হইলেও শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, পূজারিণী-বেশী মেয়েদের অভ্যর্থনা এখনও বহাল! মনের ভিতরে কোথায় যেন

কাঁটার খোঁচা লাগে! আর থানায় থানায় কালীপূজা বন্ধ করিতে কেবল সরকারি নিষেধাজ্ঞায় কাজ হইবে? ইহার সহিত জনচেতনা এবং বিপুল জনমত গঠনের সংগঠিত ও শক্তিশালী প্রয়াস কই? সরকারি ইশকুলে-কলেজে হিন্দু দেবী (সরস্বতী)-র পূজা এখনও বহাল। তবে, ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়াই উহা করা হয় এখন। প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বাহ্যত সরকারিভাবে যুক্ত হন না। ইহা কিছুটা হইলেও অগ্রগতি। কিন্তু যথেষ্ট নহে মোটেই।

ব্যানার্জিবাবু কহিলেন, সামগ্রিকভাবে সমাজজীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ, বিজ্ঞানমনস্কতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ফেলিয়া রাখিয়া বামপন্থার শিকড় মজবুত হইতে পারে না! আর বামপন্থার শিকড় মজবুত না হইলে – দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িকতার যে নতুন বিপদ আবার বিষধর ফনা তুলিয়া সম্মুখে হাজির, তাহার গতিরোধে ত্রিপুরার যোগ্য ভূমিকা গ্রহণও সহজ হইবে না। আলু-পেঁয়াজ-কাঁচা মরিচ-সহ সমস্ত নিত্যপণ্যের অবিশ্বাস্য মূল্যবৃদ্ধির পিছনে যাহারা, জনগণের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধনেও তাহাদেরই হাত। তাই দুইয়ের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ।

এতক্ষণ সবই শুনিলাম। আপাতত ব্যানার্জিবাবুর ভাষা চুরি করিয়া চিন্তা শীলের তরফেও শুভকামনা – 'সামনের আলোর উৎসব দীপাবলি-তে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার জয়ধ্বজা আরও উর্ধ্বে উড্ডীন হউক! মানবতার মহামন্ত্র ধ্বনিত হউক গোটা উপমহাদেশে।'

(প্রকাশ: ২৮.১০.২০১৩)

কই কারে!

দুঃখের কথা কারে কই! আরে দাদা– দেহটা বুড়া হইয়াছে তো কী, মনটা তো বুড়া হয় নাই। হৃদয়ের প্রেম-টেমও একেবারে ফিনিশ হয় নাই। সারা দিনের খাটুনির পর রাত্রে খাওয়া দাওয়া সারিয়া গিন্নিকে যখন একটু-আধটু সোহাগের কথা বলিতে যাই, অমনি বজ্রবঙবলি গিন্নি খ্যাঁকাইয়া উঠিয়া কহেন, 'বন্ধ করো তোমার রাইতের কথা!'

হলপ করিয়া বলিতে পারি, এই খ্যাকানি শুনেন নাই এমন বান্ধব স্বামীকুলে কমই আছেন। কারণও আছে। অভিজ্ঞ গিন্নিরা নববধূদের গোড়াতেই মনে হয় এই বলিয়া ট্রেনিং দেন, 'শুন হে বাছা, স্বামীদের রাইতের কথা কস্মিনকালেও পুরা বিশ্বাস করিতে নাই। উহারা দিনে কঠিন, রাইতে কোমল। দিনে হুজুর, রাইতে জো-হুজুর! সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত। খবর্দার, বিশ্বাস করিয়ো না। ঠকিবে।' নববধূরা নিজেদের নবত্ব ঘুচিলে প্রাচীন হইয়া পর-প্রজন্মের নবীনাদেরও এই গোমর শিখাইয়া যান। সুতরাং, ট্র্যাডিশন চলিতেই থাকে!

বহুকাল দেখিতেছি, ভোটের আগে কংগ্রেসি রাজনীতির ব্যাপারীরাও ভোটারদের মন জয় করিতে কত রঙ্গের কথা বলেন। কত প্রলোভন দেখান। ভোট ফুরাইতেই বেবাক ভুলিয়া যান। 'রাইতের কথা' ভাবিয়া কেহ কিছু মনে করে না। কিন্তু, এইবার বিষম গোল বাধাইয়াছে বেকার ভাতা-র ছাপানো ফরম। বিধানসভা ভোটের আগে কয়েক লক্ষ ফরম ছাপাইয়া কংগ্রেস দল বেকারদের মধ্যে বিলি করিয়াছিল। বেকারভাতা পাইবার 'আবেদনপত্র'। বেকাররা দিন রাত্র ছোটাছুটি করিয়া, মার্ক-শিট, অ্যাডমিট কার্ড, কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে নিবন্ধীকরণের নথি, পিআরটিসি, রেশন কার্ড, বিধায়কের শংসাপত্র আরও কত কী জেরক্স করিয়া, গেজেটেড অফিসার দিয়া প্রত্যয়িত করাইয়া, পূরণ করা ফরমের সহিত গাঁথিয়া কংগ্রেস নেতাদের নিকট জমা দিয়াছিলেন। ভোট মিটিয়াছে প্রায় আট-নয় মাস হইল। কংগ্রেস তো স্বভাবগুণে তখনই ভুলিয়া গিয়াছিল। বেকারেরাও 'কী আর করা যাইবে' ভাবিয়া ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ, বিলোনিয়ার এক পুরান কাগজের ব্যবসায়ী লাল মিয়াঁর গুদাম হইতে ৫ নভেম্বর বাহির হইয়া পড়িল গোছা গোছা 'আবেদনপত্র'। চাকুরি প্রার্থী যুবক-যুবতীদের পূরণ করা হাজার হাজার বেকার ভাতা-র ফরম। লাল মিয়াঁ

কহিলেন, সাড়ে তিন টাকা কিলো দরে এই সব ফরম তাহার এজেন্টরা বাজে কাগজের সহিত ক্রয় করিয়াছে। এইগুলি দিয়া এখন ঠোঙা বানানো হইবে! পিঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা, চিনি, চা-পাতা, ডাল হইতে সিদল শুঁটকি পোঁটলা করিতে এইসব ফরম কাজে লাগিবে! অপমানিত , প্রতারিত, ক্ষুব্ধ বেকারের দল ছুটিয়া আসিয়া গোছা গোছা ফরম হাতে লইয়া বিক্ষোভ করিলেন, বিলোনিয়ায়।

দাদা, কী দেখিলাম চর্মচক্ষে! আজকাল-সমেত দুই তিনটি সংবাদপত্র ও একটি চ্যানেল এই খবর সচিত্র প্রচার করিলেও বাকিরা সকলেই নাক ডাকিয়া ঘুমাইলেন। তাহারা কেহই ইহা-কে খবরই মনে করিলেন না। কেহই ছাপাইলেন না। টিভির পর্দায় দেখাইলেন না। পরদিন না। তাহার পরের দিনও না, অদ্যাবধি না! কী যেন বলে ইংরাজিতে? ও-হ্যাঁ, খবর 'ব্ল্যাক-আউট' করিলেন। এইসব 'নিরপেক্ষ' মিডিয়ার চেহারা দেখিয়া লোকে ধন্য ধন্য করিবে না তো কী করিবে!

এই ঘটনায় কংগ্রেস কী বলিবে যেন খুঁজিয়াই পাইল না! বিলোনিয়ার যুব কংগ্রেসের এক স্থানীয় নেতা সব দোষ চাপাইলেন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসিদের ঘাড়ে! সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কয়েকদিন সময় লইয়া আবিষ্কার করিলেন, – 'সব সি পি এমের চক্রান্ত।' তবে দুই নেতাই জানাইলেন, বিলোনিয়ার ওই আট হাজার বাদে বাকি সকল 'আবেদনপত্র'-ই আগরতলার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সযত্নে রক্ষিত আছে! শুনিয়া ঠোঁট-কাটা চিন্তা গিন্নি কহিলেন, বাহ্বা বাঃ! রক্ষিত থাক্। সাড়ে তিন টাকা কিলো-তে পোষায়? সময়ে ভাল দর পাইতে গোলবাজারের বুদ্ধিমান বড় ব্যবসায়ীরা যদি আলু-পেঁয়াজ গুদামে মজুত রাখিতে পারেন, কংগ্রেস নেতারা নির্বুদ্ধির কাম করিবেন কেন! প্লাস্টিক বন্ধ হইতেছে। কাগজের ঠোঙার কদর বাড়িবেই বাড়িবে। কয়েক মাস পরে এইসব ফরমের প্রতি কিলো তিনগুণ দামে বিকাইবার সম্ভাবনা! সুতরাং রক্ষিত থাক্ ...!

কহিলাম, মশ্করা রাখো গিন্নি। সিরিয়াস ম্যাটার! এই সকল আবেদনপত্র কংগ্রেস ভবনে সযত্নে রক্ষিত কেন, ইহা একবার ভাবিয়া দেখ। গিন্নির জবাব – এত ভাবাভাবির কী আছে! সহজ ব্যাপার। ইলেক্শনে কংগ্রেস তো আর জিতে নাই। ২০১৮-তে জিতিলে এই বেকারদের ভাতা দেওয়া হইবে। এই জন্যই ...। কহিলাম, আরে বুদ্ধিমতী – বেকার ভাতা দিলে তো আর কংগ্রেস দিবে না। দিবে সরকার। কেন্দ্রের সরকার দিলে ভোটের পরেও সহজেই দিতে পারিত। কারণ কংগ্রেস দলই কেন্দ্রে। কিন্তু রাজ্যের বুদ্ধিমান কংগ্রেস নেতারা কেন্দ্রকে বাঁচাইয়া রাজ্যের 'মুখ্য সচিবের নিকট' আবেদন করিয়া ওই ফরম ছাপাইয়াছিলেন। কেন্দ্রের মন্ত্রীরাও ভোট-প্রচারে আসিয়া এই উদ্যোগে সমর্থন দিয়া গিয়াছেন। কংগ্রেস জিতে নাই ঠিক আছে। কিন্তু মুখ্যসচিব তো আছেন। তিনি কোনও দলের নহেন। তাঁহার

উদ্দেশে লিখিত আবেদনপত্র তাঁহার নিকট না পাঠাইয়া এখনও কংগ্রেস ভবনে 'রক্ষিত' কেন? ভোটের আগে না হয় নেতারা সময় পান নাই। ভোটের পরেও তো পাঠাইতে পারিতেন! গিন্নি, মনে করিয়া দেখ, ভোটের পর কংগ্রেসের কোনও নেতাকে একবারের জন্যও বেকার ভাতা-র কথা আর বলিতে শুনিয়াছ? কংগ্রেস কর্মীদের কত মিছিল, কত হুঙ্কার শুনিলাম। বেকার ভাতা-র জন্য একটি মিছিল করিয়া এই সকল ফরম কংগ্রেস নেতারা মুখ্য সচিবের কাছে জমা দিতে পারিতেন না?

আসলে ভোট শেষ, কংগ্রেসের বেকার-দরদও শেষ। ভোট শেষ, কংগ্রেসের কর্মচারী-দরদ শেষ। কেন্দ্রীয় হারে বেতন ভাতা-র দাবিও শেষ। ভোট শেষ, ইহাদের উপজাতি-দরদও শেষ। কেবল লোভ দেখাইয়া আর টোপ দিয়া মানুষকে (ভোটারকে) সঙ্গে টানিতে চান কংগ্রেস নেতারা। ১২৮ বছরের কংগ্রেস, স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই কংগ্রেসের আজ এই যে হাল, ইহার জন্য দায়ী ইহাদের ভ্রষ্ট নীতি। লোভ-কেই ইহারা এখন জগৎ সংসারের অনিত্য চালিকাশক্তি মনে করিতেছেন। ভাবিয়া দেখ গিন্নি, মানুষকে কত ছোট করিয়া দেখিতে ইহারা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

প্রায়ই খবরে পড়ি, চাকুরি জুটাইয়া দিবার লোভ দেখাইয়া কিছু প্রতারক বেকারদের টাকা হাতাইয়া ধরা পড়িতেছে। এই যে, চাকুরির লোভ দেখাইয়া টাকা হাতানো, বিবাহের লোভ দেখাইয়া ধর্ষণের পর ছুঁড়িয়া ফেলা, অতিরিক্ত লাভের লোভ দেখাইয়া চিটফান্ডের প্রতারণা, বেকার ভাতা-র লোভ দেখাইয়া যুবক-যুবতীদের ভোট-লুটের চেষ্টা এবং এই জাতীয় সমস্ত কদর্য কাণ্ডকারকানা – এইসবই কি একই মনোভাবের প্রকাশ নহে? ভোটের আগে নোট বিলি, মদ বিলি, মোবাইল-টিভি-ফ্রিজ বিলির অভিযোগও নতুন নহে। ১৯৮৮-র ভোটের আগে ঋণ-মেলার লোভ। সেই হইতে ২০০৮ ভোটের আগে চাকরি-মেলার প্রতিশ্রুতি এবং ২০১৩-তে বেকারভাতা – সবই যে কেবল প্রতারণার দিনপঞ্জি লিখিয়া চলিয়াছে! গত লোকসভা ভোটের আগেও বছরে এক কোটি চাকবির প্রতিশ্রুতি ছিল কংগ্রেসের। ভোটের পরে কেন্দ্র সরকার নিজের সব দপ্তরে চাকরি বন্ধ রাখিয়াছে। রাজ্যগুলিকে শূন্যপদ পূরণে বাধা দিতেছে। এই ভ্রষ্ট নীতি, প্রতারণার ক্ষমা হইতে পারে? বারে বারে ত্রিপুরার সচেতন নির্বাচকমণ্ডলী কংগ্রেসকে সাজা দিতেছেন। কিন্তু ইহাদের সংশোধন যে দূর অস্ত! 'রাইতের কথা' ছাড়া কোনও সম্মানজনক পথে জনগণকে জয় করিবার মনোভাবে ইহারা আর বিশ্বাস করেন না। গিন্নি, বড় দুঃখে কহিতেছি, ইহাদের 'রাইতের কথা'-য় আমরাও যে আর বিশ্বাস করিতে পারি না। এই দুঃখের কথা কারে কই!

(প্রকাশ: ১১.১১.২০১৩)

লবণ-গুজব

সেলুনে বহুদিন পবে ব্যানার্জিবাবু। বিডবিডাইযা কহিলেন—কী যুগ বে ভাই। লবণেব সঙ্কট নাই। তবু সঙ্কটেব গুজব। গুজবে নির্মিত সঙ্কট এই যাত্রায কোনও গজব কবিতে না পাবিলেও গোটা বাজ্যটাকে কেমন ঝাডা দিযা গেল, দেখিলে তো চিন্তা?

হ দাদা, দেখিলাম। গান্ধীজি লবণ-সত্যাগ্রহ কবিযাছিলেন। এইবাব দেখিলাম লবণ-অসত্যাগ্রহ। অর্থাৎ, সত্য আগ্রহ নাই, সত্য চাহিদা নাই তবুও লোকে লাইন দিযা লবণ কিনিতেছে। ১৬ টাকাব প্যাকেট ৩০ ৪০ টাকায কিনিতেছে আব কোথায কোথায নাকি '১৫০-২০০ তেও নাই' বলিযা নিজেবাই গুজব প্রচাব কবিতেছে। পাডাব মুদি দোকানি গদু সাহা-কে দেখিলাম – প্রথমে ১৬, তাহাব পবে এদিক ওদিক চাহিযা ২০ ২৫, আবও বাদে ৩০ ৪০ টাকা দবে স্টক খালি কবিতেছে। এখন সবকাব কঠোব হইযা ক্রেতাদেব নিকট হইতে নালিশ আহ্বান কবায বেচাবা গদু বডই গলদ্দ। সকল ক্রেতাকে বাস্তা হইতে ডাকিযা আনিযা অনাবশ্যক কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা কবিতেছে চকোলেট বিডি এমনকী ক্ষেত্রবিশেষে সিগাবেট পর্যন্ত অফাব কবিতেছে।

- শুন চিন্তা, গুজবে দাঙ্গা হয়। যুদ্ধ হয়। পবমাণু অ[illegible] বাসাযনিক অস্ত্র মজুতেব গুজব ছডাইযা আমেবিকা যুদ্ধ বাধাইল ইবাকে। খুন কবিল প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে আগে গুজব বাতাসে ছডাইত, ওযাইল্ড ফাযাব – অর্থাৎ বনেব আগুনেব মতন লাফাইযা বিস্তৃত হইত। এখন গুজব ছডায উপগ্রহে, মোবাইলে, ইন্টাবনেটে, ফেসবুক-টুইটাবে, টিভি-তে। বিদ্যুতেব বেগে। পিছনে ধাওযা কবিযা গুজবেব ফানুস ফাটানো বডই কঠিন তাহাব আগেই সর্বনাশ ঘটিযা যাইতে পাবে চোব যেমন পলাইবাব কালে নিজেই 'চোব চোব' চিৎকাব কবিযা দৌডায, তেমনি 'গুজব-গুজব' বলিতে-বলিতে সচেতন শিক্ষিত মানুষেবাও নিজেদেব অজান্তেই মুখে-মুখে মুখবোচক গুজব ছডাইযা দেন।

- দাদা, গুজব এইভাবে ছডাইযা যাইতে পাবে কেন? চিলে কান নিযাছে শুনিযাই চিলেব পিছনে ছুটিবাব আগে লোকে একবাব কানে হাত দিযা দেখিবে না? ব্যানর্জিবাবু কহিলেন – যথার্থ জিজ্ঞাসা চিন্তা। কিন্তু ভাবিযা দেখ – গুজব মানে তো মিথ্যা। কিন্তু যে কোনও

মিথ্যা-ই কি রটানো সম্ভব? রটিতে হইলে 'মিথ্যা'-রও যোগ্যতা চাই। শক্তি চাই। বিশ্বাসযোগ্য মিথ্যাই শক্তিধর গুজব হইবার যোগ্যতা রাখে। আবার, মিথ্যার বীজ কেবল বিশ্বাসযোগ্য হইলেই গুজবের ফসল ফলে না, ক্ষেত্রটা তৈরি থাকিতে হইবে। বাজারে জিনিসপত্রের অভাবনীয় মূল্যবৃদ্ধির রাহাজানি চালিতেছে সারা দেশে। মানুষ দিশাহারা। এই অবিশ্বাস্য মূল্যবৃদ্ধি না ঘটিলে, দেশজোড়া পিঁয়াজের দাম পনেরো দিনে ২৫ টাকা হইতে ৮০ টাকা হইতে না পারিলে, লবণের গুজবে জনগণ পাত্তাই দিত না। 'পশ্চিমবঙ্গের আলু না পাইয়া বিহার লবণ আটকাইয়া দিয়াছে' – এমন মিথ্যা প্রচারটি দারুণ বিশ্বাসযোগ্য ছিল বলিয়াই ইহা গুজব হইতে পারিযাছে। মানুষ ভাবিয়াছে – দেশে যা কাণ্ড ঘটিতেছে, সব কিছু হওয়া সম্ভব। কিছুই আর অসম্ভব নহে।

ব্যানার্জিবাবু পকেটে ভাঁজ করিয়া রাখা 'আজকাল ত্রিপুরা'-র ১৬ নভেম্বরের প্রথম পাতা বাহির করিয়া কহিলেন – আহা, কী ছবি! শাবাশ আজকাল! এই দেখ চিন্তা, গুদামে সারি সারি লবণের বস্তার নীরব ছবি। আর কিছু লাগে না। এক ছবিতেই গুজব-গ্যাসের বেলুন ফটাস! আবার বলি – শাবাশ! চিন্তা, তুমি লবণ সত্যাগ্রহের কথা কহিলে। লবণ বড বিষম দায়। লবণ ছাডা চলে না। বিনা লবণের ব্যঞ্জন মুখে তুলিয়া গল্পের রাজা বুঝিয়াছিলেন- ছোট রাজকন্যার 'লবণের মত ভালবাসা' কী মহার্ঘ ভালবাসা! কোনও এক কালে নাকি ত্রিপুরায় এক কিলো লবণের বিনিময়ে শোষক মহাজনেরা সরল অজ্ঞ জনজাতির কৃষকের এক কানি জমি গ্রাস করিত।

চিন্তা, তোমার মনে আছে? সারা জীবন বিরোধী দলে থাকা কম্যুনিস্টরা ত্রিপুরায় প্রথম সরকারে আসে ১৯৭৭-এ, প্রথম কোয়ালিশনে। হঠাৎ, বাজার হইতে লবণ উধাও! চারিদিকে হাহাকার। লোকে ভাবিতে লাগিল, না – কম্যুনিস্টরা বিরোধী দলেই ছিল ভাল। সরকার চালানো ইহাদের কম্মো নহে। বড বাণিজ্যপতি, মজুতদার, কালোবাজারি আর বড় ঠিকাদাররা সকলেই কংগ্রেস-দরদি। ইহারা কম্যুনিস্টদের সরকার চালাইতে দিবে না। কিন্তু, আজ সেই পরিস্থিতি নাই। ৭টি বাম সরকারে ত্রিপুরাবাসী অভ্যস্ত। জনগণকে সঙ্গে লইয়া সরকার চালানোর কাজেও বামেরা যথেষ্ট অভিজ্ঞ, দক্ষ। মন্ত্রী- এম এল এ-দের সঙ্গে জনগণের সম্বন্ধ, সরকার আর জনগণের মধ্যে সম্পর্কের ধারণা আমূল বদলাইয়া গিয়াছে। কোনও গুজব ছড়াইয়া গজব করা সহজ নহে। এমনকী ১৯৮০-র মতন দাঙ্গাও ঘটানো প্রায় অসম্ভব প্রমাণিত।

জিজ্ঞাসা করিলাম, দাদা – সঙ্কটের গুজব বিহারে, আসামে এখনও বহাল। সরকার মোকাবিলা করিতে পারিতেছে না, পত্রিকায় দেখিলাম। ত্রিপুরায় কেন গুজব স্থায়ী হইল না? এইখানে কি প্রশাসন বেশি তৎপর? নাকি বড় বাণিজ্যপতি মজুতদার, কালোবাজারিরা

সকলেই এখন বাম-দরদি? ব্যানার্জিবাবু অট্টহাস্য করিয়া কবিলেন, না হে চিন্তা, না। বামফ্রন্টের বিপুল গণভিত্তি, জনগণের জাগ্রত চেতনা, সক্রিয় গণতান্ত্রিক নজরদারিকে ইহারা ভয় পায়। তাই 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট' কবিবার পথে হাঁটিবার ঝুঁকি নিতে চাহে না। কিন্তু, মনে রাখিও – সুযোগ সুবিধা অনুকূল বুঝিলে উহারা ফণা তুলিতে চেষ্টার কসুর করিবে না। এই যাত্রায় গুজবে কোনও বড় গজব না হইলেও একটা শিক্ষা কিন্তু হইয়া গেল। সর্বদিকে সদা সতর্ক না থাকিলে, ছোট ছোট গুজব একত্র হইয়া বড় গুজবের জন্ম হইতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রের গুজব রাজনৈতিক ক্ষেত্রের গুজবে পরিণত হইলে, ছোট ছোট বানকুড়ালি বড় ঝড়ে পরিণত হইলে, গুজবেও কিন্তু গজব নামিতে পারে।

(প্রকাশ: ১৮.১১.২০১৩)

বোমা!

পত্রিকার হেডিং পড়িয়াই গিন্নির দুই চক্ষের ডিম জম্পুইয়ের গাছ-পাক্না কমলার মতন খসিয়া পড়িবার জোগাড়। আতঙ্কে দেহ কাঁপিতে লাগিল। হেডিংয়ে লেখা – 'বোমা লইয়া অপেক্ষায় মানিক দেব, মমতা বাজো আসিবামাত্র ফাটাইবেন'। গিন্নি কহিলেন, সাড়ে সর্ব্বোনাশ। অধ্যাপক মানুষ অধিক ক্রোধে কী করিয়া বসিবেন ঠিক নাই। বলি, সুব্রজিৎ দত্ত, রতন চক্রবর্তীরা কী করিতেছেন হ্যাঁ? পুলিসের বম্ব স্কোয়াড পাঠাইয়া এক্ষুনি বোমাটি নিষ্ক্রিয় করা যায় না?

তাঃ হা রে আমার পোড়া কপাল, ক্যামনে বুঝাই। কহিলাম, ক্ষান্ত হও। বৃথা উতলা হইও না গিন্নি ইহা শব্দবোমা নহে, জব্দবোমা। হাটে হাঁড়ি ভাঙিয়া জব্দ করিবার জন্য ক্ষুব্ধরা ফাটাইয়া থাকেন। তৃণমূলের প্রদেশ সভাপতি ছিলেন মানিক দেব। কিছুমাত্র না জানাইয়া রাতারাতি তাহাকে শূন্যে ছুঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে। কংগ্রেসের প্রাক্তন নেতা। তৃণমূলেও কেন তাহাকে অপদস্থ করিয়া 'প্রাক্তন' করা হইল, এই সুপ্ত কারণটিও নাকি গুপ্ত রাখা হইয়াছে। স্বাভাবতই তিনি ক্ষুব্ধ এখন তৃণমূল নেত্রীর উপস্থিতিতেই জব্দবোমা ফাটাইবার অপেক্ষায়

– কাহাকে জব্দ করিবেন? গিন্নির জিজ্ঞাসায় কহিলাম, তাহা তো জানি না। হইতে পারে খোদ দিদিকে, অথবা মুকুল রায়কে। কিংবা রতন চক্রবর্তী বা সুব্রজিৎ দত্তকে। ইঁহারা সকলেই এই সেইদিনও ছিলেন জাঁদরেল কংগ্রেস নেতা। এখন কংগ্রেসে 'প্রাক্তন' এবং তৃণমূলে 'বর্তমান'। কেহই বোমা-র হুমকিতে ডরাইবার পাত্র নহেন। রতন চক্রবর্তী খয়েরপুরে অনেক স্ব দলীয় বোমা হজম করিয়াও টিকিয়া ছিলেন। আর যৌবনকাল হইতেই অভিজ্ঞ সুরজিৎ এইসব বোমা-টোমা থোড়াই কেয়ার করেন! তবে, ডর বোধহয় একটাই। যেই পথে মানিক দেবকে 'বর্তমান' হইতে রাতারাতি 'প্রাক্তন' করিয়াছেন, সেই পথেই না হঠাৎ এক ফাইন মর্নিংয়ে তাঁহারাও তৃণমূলে 'প্রাক্তন' হইয়া যান।

হ্যাঁ গিন্নি, তৃণমূলেও সেই প্রবল শক্তিশালী কংগ্রেসি গণতন্ত্রই বহাল। হালে ইহার নাম 'ম্যাডামতন্ত্র'! দিল্লিতে কংগ্রেসের ম্যাডাম, কলিকাতায় তৃণমূলের ম্যাডাম। দলে কার কখন

মাথা যাইবে কেহ জানেন না। সুপারির উপরে পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া থাকা! পিঁড়ি কেবল নড়েচড়ে। ইদিকে-ওইদিকে পিছলায়! স্থির রাখা দায়! মানিক দেব, অরুণ ভৌমিকেরা নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ (!) কামড়াকামড়ি করিতে থাকিলেও এই রাজ্যে তৃণমূলের চেরাগ ছিল তাঁহাদেরই হাতে। গোড়া হইতেই লাগিয়া থাকা দুলাল দাস নিজের নাক কাটিয়া মানিক- অরুণদের যাত্রাভঙ্গ করিয়া থাকিলে এখন খুব সুখে আছেন মনে হইতেছে কি?

গিন্নি হঠাৎ ক্ষেপিয়া গিয়া কহিলেন, ম্যাডামতন্ত্রে তোমাদের এত গাত্রদাহ কেন মিস্টার? ম্যাডামরা কি কিছু খারাপ চালাইতেছেন? কহিলাম, না না গিন্নি, অতি চমৎকার। দেখিতেছ না, দুই 'ম্যাডাম'-এর তাফাল-এ পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ কেমন তেঁল-কড়াইয়ে ফুটিতেছে। ম্যাডাম-ম্যাডাম করিয়া 'আম'-পাবলিক কেমন 'ম্যাড' হইয়া উঠিয়াছে। দিল্লির ম্যাডাম তো আমাগো দেশের এমন হাল করিয়াছেন যে, এখন কোনও দিকেই হালে পানি পাইতেছেন না। আর, কলিকাতার ম্যাডাম ক্রমেই বাংলা রক্ষায় এত ব্যস্ত যে, তাঁহার 'দিল্লি চলো' স্বপ্নের কথা আর তেমন শুনা যাইতেছে না। সার কথাখানা শুন গিন্নি। ম্যাডাম মিস্টারে কিছু যায় আসে না আসল কথা নীতি। পাঁচ ম্যাডাম-এর নীতিতে দুনিয়ার ম্যাডমদের নাম খারাপ হইতে বসিয়াছে। গিন্নি শুধাইলেন – পাঁচ ম্যাডাম মানে? পার্শ্ব-দেশের দুই, দিল্লি-কলিকাতার দুই। মোট হইল চার। আরেকজন কে? সভয়ে কবিলাম – গিন্নি, যাহা বলিব সত্য বলিব! জানই তো, হস্তী নিজেকে দেখিতে পায় না। পঞ্চমজন – অপরাধ নিও না – ! 'ম্যাডামতন্ত্র' কী বস্তু, নিজগৃহেই দিবানিশি টের পাইতেছি কী না ... !

যাহা বলিতেছিলাম, কলিকাতা-ম্যাডাম আর দিল্লি-ম্যাডামের দলের উৎপত্তি এক, বিপত্তি এক, নিষ্পত্তিও একই হইবে। কারণ, তঁহাদের নীতিও এক। ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট নিজেরা নিজেদের উৎখাতের ব্যবস্থা না করিলে দিল্লির ম্যাডামের বদলে কলিকাতার ম্যাডাম আসিয়া কিছু করিতে পরিবেন বলিয়া মনে হয় না। চাহিয়া দেখ গিন্নি, ত্রিপুরায় কংগ্রেসকে ভাঙিতেছে তৃণমুল। কিন্তু সি পি এম ছাড়িয়া কেহ তৃণমূলে যাইতেছে কি? একজনও নহে। রামনগরের এক যুবককে 'ডি ওয়াই এফ কর্মী' সাজাইলেও ডি ওয়াই এফ তাহাকে স্বীকার করে নাই। কংগ্রেসের রাজ্য ও স্থানীয় নেতাদের একটা বিক্ষুব্ধ অংশ (মূলত সুরজিৎ-সমর্থক) তৃণমূলে যোগদান করিতেছেন ঠিক। সাধারণ কংগ্রেস সমর্থক ভোটাররা কিন্তু তৃণমুলে না গিয়া বরং সিপি এমেই ভিড়িতেছেন বেশি। রহস্যটা কী? বামফ্রন্ট সরকারের জনগ্রহণযোগ্যতা আর কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস হারানো, এই দুই কারণ ছাড়া আছে আরেকটি বড় কারণ। শুনিতে থাকো –।

– গিন্নি, যে-সব কংগ্রেস নেতা তৃণমূলে যোগ দিতেছেন, কিংবা ধরো তৃণমুল যাঁহাদের কোলে টানিতেছে, তাঁহাদের বড় অংশই কিন্তু জনবন্দিত থাকা দূর, রীতিমতন জননিন্দিত।

বনমালীপুরের 'বনমালী' হইয়া মন্ত্রিত্ব হারানো নেতা. দুর্নীতি আর কলঙ্ক যাঁহার অঙ্গের ভূষণ, তিনিও এখন প্রদেশ তৃণমূলের মাথায়! জোট আমলে ঐতিহাসিক (!) ফটিকরায় উপনির্বাচনে জববরদস্তি জিতাইয়া আনা এক হোটেল-মালিককে মন্ত্রী করা হইয়াছিল। বিধানসভায় তিনি বলিতে উঠিলেই স্বদলীয় নেতা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সমীররঞ্জন বর্মন নাকি বাম বিধায়কদের উদ্দেশে ঠাট্টা করিয়া কহিতেন – 'চুপ! এইবার টের পাইবেন আমাদের গণতন্ত্রের মহিমা'! সেদিনের সেই ধর্ষিত গণতন্ত্রের কলঙ্কিত প্রতীক সুনীলচন্দ্র দাস সম্প্রতি তৃণমূলের নেতা! ইঁহাদের শ্রীমুখ দেখিয়া কংগ্রেসের সাধারণ সমর্থকরা-তৃমমূল হইতেও মুখ ঘুরাইবেন – ইহাই স্বাভাবিক।

গিন্নি কহিলেন, শেষ বিচারে কী দাঁড়াইল? ত্রিপুরায় সবল হইবার বদলে আরও দুর্বল হইতেছে বাম-বিরোধী শিবির। অন্য দিকে কমিবার বদলে শক্তি বাড়িতেছে বামদের। ঠিক কি না?

(প্রকাশ : ০২.১২.২০১৩)

পথের দাবি

– বুঝিলে চিন্তা? শরৎচন্দ্র চাটুজ্জে বাঁচিয়া থাকলে তাঁহার 'পথের দাবী' উপন্যাসের সেই বিপ্লবী নায়কের নামটা নির্ঘাত এফিডেবিট করয়িাই বদলাইয়া ফেলিতেন। আহা, কত সাধে নাম দিয়াছিলেন 'সব্যসাচী'!

শরৎভক্ত ইন্দুবাবুর ইঙ্গিত কিঞ্চিৎ মালুম করিয়া অর্বাচীন প্রশ্ন করিলাম, আচ্ছা দাদা, যাঁহার দুই হাতই সমান চলে তাঁহাকেই তো সব্যসাচী বলে। কিন্তু, দুই হাতের সহিত যাঁহার মুখও সমানে-সমানে চলে তাঁহাকে এক দমে কী বলিব? ইন্দুবাবু কহিলেন, কেন – সব্যসাচী দত্ত! গ্যাঁজার কল্কিতে একবার দম দিলে হয় 'এক দম'। আর, পর পর দুইবার দম নিলে 'দম-দম'। কলিকাতার দমদম আর এই 'দম-দম' এক নহে। দমদমের তৃণমূলি বিধায়ক আগরতলায় দলের সভায় ভাষণ ছাড়িতে গিয়া এমন গিয়ারে চড়িলেন যে, তাঁহাকে সেই 'দম-দম দেওয়া রক্তচক্ষু রাজা' মনে হইল! তিনি ত্রিপুরার চারবারের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে অশালীন হুমকি ছুঁড়িয়া কহিলেন, ত্রিপুরায় তৃণমূলের কোনও কর্মী বাধা পাইলে দমদম বিমানবন্দরে মানিকবাবুকে নামিতেই দেওয়া হইবে না। পত্রপাঠ আগরতলায় ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। কারণ, দমদম বিমানবন্দরটা তাঁহার এলাকার (রাজত্বের) মধ্যে পড়ে! এমন অ-সব্য(ভ্য), দেশবিরোধী যাঁহার হুমকি, তাঁহার নাম যদি সব্যসাচী হয়, শরৎচন্দ্র তাঁহার দেশপ্রেমী বিপ্লবী নায়কের নাম আর কি সব্যসাচী রাখিয়া দিতে পারিতেন?

সেলুনের এক কোণে এতক্ষণ চুপ থাকা ব্যানার্জিবাবু নিরাসক্ত কণ্ঠে কহিলেন, শুন ইন্দু – এমন 'সব্যসাচী'-দের আমরা তো জোট আমলে ত্রিপুরায় অনেক দেখিয়াছি। ইহাদেরও দুই হাত সমান চলিত। এক হাতে ডান্ডাবাজি, আরেক হাতে লুটপাট। সঙ্গে সমানে চলিত মুখ। 'কম্যুনিস্টদের দুরমুশ করিতেছি' কিংবা 'এমন নিশ্চিহ্ন করিব যে দুরবিন দিয়াও দেখা যাইবে না।' তাহাদের গডফাদার-মুখ বলিতেন, 'আমি যেদিকে যাইব, কোথাও লাল যেন না দেখি। কেন না, লাল রঙ আমার চোখে একদম সহ্য হয় না।' তখন এইসব 'সব্যসাচী'-দের দলের নাম ছিল কংগ্রেস। এখন তাঁহারা তৃণমূলকে উজ্জ্বল (!) করিতেছেন।

ইন্দুবাবু যোগ করিলেন, হুমকির রাজনীতি। সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক

অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহারা দেশের যেথায় যখন খুশি অবাধে যাতায়াত করিতে পারিবেন। দেশের যেথায় খুশি বাস করিতে পারিবেন। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন বাম নেতা কর্মীবা আক্রান্ত হইতেছেন,খুন হইতেছেন। তাই বলিয়া ত্রিপুরার কোনও বামপন্থী বিধায়ক কি বলিবেন যে, আগরতলা বিমানবন্দরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে বিমান হইতে নামিতেই দিব না? বাংলায় কংগ্রেস কর্মীরাও তৃণমূলিদের হাতে আক্রান্ত। এই কারণে অসমের কোনও কংগ্রেস বিধায়ক কি মমতাকে 'অসমে ঢুকিতে দিব না' বলিয়া হুমকি দিতে পারেন? দিল্লিতে শীলা-সরকার হটাইয়া বিজেপি-র সংখ্যালঘু সরকারও যদি হয়, মমতাকে একইরকম কারণে কি দিল্লি বিমানবন্দর হইতে ফেরতের হুমকি দেওয়া যাইবে? এইসব হুমকি সংবিধান বিরোধী, দেশবিরোধী নহে?

ইন্দুবাবু থামিতে রাজি নহেন। কহিলেন, তৃণমূলের সব্যসাচীর হুমকিটি খুবই উস্কানিমূলক এবং অবাঞ্ছিত। কেন না, ত্রিপুরার কোথাও কোনও তৃণমূল কর্মী আক্রান্ত হইয়াছেন বা কোনও 'বাধা' পাইয়াছেন এমন ঘটনা নাই। কোনও অভিযোগ কেহ শুনে নাই। গায়ে পড়িয়া ঝগড়ার চেষ্টা। নেত্রীর লাইনটাই কি এমন? 'বাংলার আলু আর কোনও রাজ্যে যাইতে দিব না' আর 'মানিককে ঢুকিতে দিব না' - একই সুর নহে? পথও এক। সিঙ্গুর-এ 'টাটা কে ঢুকিতে দিব না' বলিয়া অবরোধ, হিংসা, উত্তেজনা। তাহার পর টাটা-র ন্যানো পাইল গুজরাট। টাটা কে তৃণমূলের টা-টার নিটফলে বঞ্চিত বাংলা। রাজনৈতিক মুনাফা ঘাসফুলের। শুন চিন্তা, প্রধানমন্ত্রী কোনও দলের নহেন, দেশের। লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে তাঁহাকে বাধা দিলে গোটা ভারত অপমানিত হইবে। আমেরিকার বিমানবন্দরে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বরেণ্য বিজ্ঞানী এ পি জে আবদুল কালামের পোশাক আশাক তল্লাশিতে সমগ্র ভারত ক্ষুব্ধ হয়। তেমনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে দমদম বিমানবন্দরে বাধা দিবার হুমকিও সমগ্র ত্রিপুরাবাসীকে অবমাননার সামিল। যাঁহারা এহেন সব্যসাচীকে ত্রিপুরায় আনিয়াছিলেন বা পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কি উচিত নহে ত্রিপুরাবাসীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা?

এইবার ব্যানার্জিবাবু ঝপাৎ করিয়া ইন্দুবাবুর কথার ফাঁকে নোঙর করিলেন। কহিলেন, শুন রে ভাই – ত্রিপুরায় এখন দুই দলের কুস্তি চলিতেছে। কংগ্রেস ভাঙিতেছে। তৃণমূল বেশ কিছু নেতা সঙ্গে পাইলেও সাধারণ কংগ্রেস সমর্থকদের পাইতেছে কম। তৃণমূলের আড়াই হাজারি 'সমাবেশ' ইহার প্রমাণ। পাল্টা শক্তি দেখাইয়া 'আইন অমান্য' করিল কংগ্রেস। বেড়-জালে মাছ ভিড়াইতে দুই দলই বুঝাইতে চাহিতেছে, 'আমরাই প্রকৃত বাম-বিরোধী, উহারা নকল।' দুই দলের নেতারাই প্রবল চিৎকারে, চিত্তাকর্ষক শব্দবাণে 'সর্বদিকে চরম ব্যর্থ' বামফ্রন্টকে বিদ্ধ করিতে চাহিতেছে। সাধারণ মানুষের স্বার্থ, ত্রিপুরার সমৃদ্ধির পথ, তফসিলি জাতি-উপজাতি-ওবিসি-সংখ্যালঘু এবং মহিলাদের উন্নতিতে আরও কী করা

যাইবে, বেকারদের কর্মসংস্থানের কী রাস্তা, নারী নির্যাতন-পণপ্রথা-গার্হস্থ্য হিংসার বিরুদ্ধে কী করিয়া ব্যাপকতম সামাজিক প্রতিরোধ গড়া যাইবে, দ্রব্যমূল্য রোধ কীভাবে হইবে – এই সমস্ত আসল বিষয়ে তাঁহাদের কোনও কথা নাই। লোকে ধন্দে পড়িতেছে। বামেরা সর্বক্ষেত্রে চরম ব্যর্থ? কংগ্রেস সমর্থকেরাও ভাবিতেছেন, কোনটা সত্য? যাহা দেখিতেছি তাহা? নাকি নেতারা যাহা বলিতেছেন, উহা?

চিন্তা-র মনে হইল, কংগ্রেস আর তৃণমূল – দুই দলেরই এই যখন চেহারা – তখন ত্রিপুরায় ইহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিবে কে? আর শরৎভক্ত ইন্দুবাবুরও দুঃখ পাইবার কিছু নাই। তৃণমূলের কোনও এক সব্যসাচীর জন্য 'পথের দাবী'-র সব্যসাচীর নাম বদল হইবে কেন? বরং জনগণ পথে নামিয়া তৃণমূলের নেতাটিকেই এফিডেবিট করিয়া নিজের নাম বদল করিতে বলিলে সঠিক হইবে। তখন ইহাই হইবে পথ-এর দাবি। কেন না তিনি ওই নামের যোগ্য নহেন।

(প্রকাশ: ০৯.১২.২০১৩)

গন্ধ!

কই হে চিন্তা, ক্ষুর-কাঁচি বাক্সে ঢুকাও। দিল্লি যাইতে হইবে। সেথায় গিয়া একটা লম্বা ধর্ণা দাও, কিংবা আন্না-র মতন অনশন। কী দাবি তুলিবে জানো না বুঝি! আরে ভাই নাপিতের বেটা, টের পাইতেছ না — দিল্লির রাজনৈতিক বাতাসে কেমন ত্রিপুরা-ত্রিপুরা গন্ধ! কেহ তালি বাজাইতেছে, কেহ গালি দিতেছে। সবই হইতেছে ত্রিপুরার নামে! নেতাদের দিল্লি যাতায়াত যত বাড়িতেছে, ততই বিমান কোম্পানিগুলি ফ্লাইটের ভাড়া বাড়াইতেছে। আর কিছু না পাও, বিমানভাড়া কমাইবার দাবিতে যন্তর মন্তরে বসিয়া পড়। অতি তুরন্ত লাইম লাইটে আসিবে!

সেলুনে দাসবাবুর ঠেস্-কথা শেষ হইতেই সকলে হাসিতে লাগিলেন। কাস্টমারের গালে সাবান মাখিতে মাখিতে সবিনয়ে কহিলাম, দাদা — কখনও দিল্লি যাই নাই। গিন্নির বড় সখ। কন্যারত্নরাও ছাড়িবে না। সকলে মিলিয়া একবার ঘুরিয়া আসিলে মন্দ হয় না। কেবল বিমানভাড়াটা যদি আপনি ব্যবস্থা করেন —। দাসবাবু না দমিয়া কহিলেন, ওরে বাপ্‌রে। তোমার পরিবার-রচনা-সমগ্র দিল্লি যাইতে পারিলে তো আস্ত একখানা সংসদ-অভিযানই সম্ভব! আপাতত তাহার প্রয়োজন নাই। এখন কেবল ধর্না।

'ধর্ন ধর্না — তৃণমূলি ধর্না / মুকুলিত-রতনিত-বিজেপিত বর্ণা!'

— দাদা গো, হেঁয়ালি ছাড়িয়া একটু বুঝাইয়া বলেন। চিন্তা-র কাতর অনুরোধে দাসবাবু সিরিয়াস হইলেন। কহিলেন, ইন্ডিয়া-টু-ডে-ম্যাগাজিন সারা দেশে তাহাদের মতন করিয়া সমীক্ষা চালাইয়া ত্রিপুরাকে 'শ্রেষ্ঠ জনমুখী প্রশাসন'-এর পুরস্কার দিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশের হাত হইতে সেই শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। মনে রাখিয়ো, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই ম্যাগাজিনটি বাজার অর্থনীতির ঘোর সমর্থক। অতএব, স্বভাবতই বামপন্থার কট্টর সমালোচক। বাংলার তৃণমূল সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতার প্রশংসায়ও তাহারা পঞ্চমুখ। এহেন ইন্ডিয়া টু-ডের বিচারেও ত্রিপুরার বাম সরকারের প্রশাসন দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ? তৃণমূল কংগ্রেসের গোঁসা তো হইবেই। লোকসভা নির্বাচনের পাঁচ মাসও নাই। এই সময় ইন্ডিয়া টু-ডে এইটা কী করিল। এখন এই প্রসঙ্গে দেশের তাবৎ মিডিয়া লিখিতেছে, আগেই আরও ১৭টি নানান ক্ষেত্রে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সরকারের বিচারে ত্রিপুরা সমগোত্রীয় রাজ্যগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দখল করিয়া পুরস্কৃত হইয়াছে। ত্রিপুরা লইয়া মাতামাতি! সুতরাং, দিল্লির যন্তর মন্তরে ধর্না দিয়া, রাষ্ট্রপতিকে স্মারকলিপি পেশ করিয়া তৃণমূল তুমুল প্রতিবাদ করিয়াছে। ত্রিপুরার রতন চক্রবর্তীদের সঙ্গে মুকুল রায় হইতে বাংলার প্রায় সকল তৃণমূলি সাংসদ দিল্লি-ধর্নায় যোগ

দিয়াছেন। প্রশ্ন তুলিয়াছেন, কীসের ভিত্তিতে কেমন বিচার করিয়া ত্রিপুরাকে এত পুরস্কার?

– 'মুকুলিত রতনিত' বুঝিলাম। 'বিজেপিত বর্ণা' কেন? একজনের বর্ণ গেরুয়া, আরেকজনের সবুজ। মিলিত হইয়া 'গেরুবুজ' হইতে পারে। হয় নাই। দাসবাবু কহিলেন, চিন্তা – রাজনীতি অতি বিষম বস্তু। এখন তো আরও জটিল। মাথা খাটাও। কয়েকদিন আগে, ত্রিপুরায়-প্রথমবার সি পি এমের কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন গিয়াছে। চার রাজ্যের নির্বাচনে পরিষ্কার, লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের হাল আরও খারাপ হইবে। বি জে পি 'মোদি-র গুজরাট'-কে 'মডেল' ঘোষণা করিয়া কেন্দ্রের গদি চাহিতেছে। আগরতলায় কেন্দ্রীয় কমিটির পরে সি পি এমের ঘোষণা, কেন্দ্রে বিকল্প নীতির সরকার গড়িতে হইবে 'ত্রিপুরা মডেল'-এ। বেচারা কংগ্রেসের তো এখন আর কোনও 'মডেল' নাই। তাহাদের সব সরকারই জনতার চক্ষে 'চোড়েল'! ফলে দুইটি মডেল সামনে। গুজরাট অথবা ত্রিপুরা। তৃণমূলের বাংলা কাহারও কাছে 'মডেল' নহে। এই জ্বালা কি প্রাণে সয়? কিন্তু, আক্রমণের লক্ষ্য 'মোদির গুজরাট' নহে, লক্ষ্য 'মানিকের ত্রিপুরা'! অর্থাৎ 'ত্রিপুরা মডেল'-কে কলঙ্কিত করিয়া ডুবাইতে পারিলেই 'গুজরাট মডেল' ভাসিয়া উঠিতে পারিবে! চিন্তা, ভুলিয়ো না -- চার রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফলের পর 'মোদি'-র প্রশংসায় একটু বেশিই উচ্ছ্বসিত ছিলেন ত্রিপুরার তৃণমূল নেতারা। তৃণমূলে নেত্রীই সব, আর কেহ কিছু নহেন, ঠিক। কিন্তু, জল উপর হইতে নিচে গড়ায়। নিচে ঘোলা জল নামিলে, উপরে ঘোলানোর উৎসটি বুঝিতে পারা যায়। বগি ডাইনে ঘুরিলে ইঞ্জিন যে আগেই ডাইনে ঘুরিয়াছে, তাহা বলিয়া দিতে হয় না। লোকসভা ভোটের আগে আবার এই 'বি জে পি-প্রীতি' দেখিয়া তৃণমূলকে 'বিজেপিত বর্ণা' বলিলে ভুল হইবে?

শুধু কি তাই? দিল্লির যন্তর মন্তরে ত্রিপুরাকে লইয়া আরও একটি ধর্না হইল আই পি এফ টি-র। ইহারা ঐক্যবদ্ধ ত্রিপুরাক দুই ভাগ করিয়া, এডিসি এলাকা লইয়া পৃথক 'তিপ্রাল্যান্ড' গঠনের দাবি তুলিলেন। জঙ্গিদের সহিত এই দলের গোপন মাখামাখির খবরটি গোপন নাই। 'স্বাধীন ত্রিপুরা' দাবির বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতি জনবর্জিত। এখন নতুন রঙে, নতুন ঢঙে 'তিপ্রাল্যান্ড'! ওহে চিন্তা, তৃণমূল আর আই পি এফ টি-র দুইটি পৃথক ধর্না দেখিতে-শুনিতে পৃথক বিষয়ে হইলেও মূল উদ্দেশ্য মনে হইতেছে একই। ত্রিপুরা-কে থামানো, দুর্বল করা। 'মডেল ত্রিপুরা'-কে দুর্বল করিতে পারিলে বিজেপি-র 'মডেল গুজরাট' নিরঙ্কুশ হইবে। তাই, লোকসভা ভোটে *বিজেপি আর তৃণমূলের বোঝাপাড়া (প্রকাশ্যে বা গোপনে) যেমন অসম্ভব নহে, বাংলায়* ভোটপ্রচারে আসিবেন না -- এই কথা আগাম জানাইয়া মোদিও কি সেই ইঙ্গিতই দিলেন না? তেমনি ত্রিপুরায় জঙ্গালবন্ধু-সমেত আই পি এফ টি-র সহিত সেই বোঝাপড়া প্রসারিত হইলে অবাক হইয়ো না।

বিস্তারিত শুনিয়া কহিলাম, ত্রিপুরার বন্যা থামাইতে বাম-বিরোধীরা যদি দিল্লিতে বাঁধ গড়েন, তাহা কি বুদ্ধির কাজ? ইহাতে তো ত্রিপুরার প্রতিই সকলের দৃষ্টি আরও বেশি আকৃষ্ট হইতেছে। এ তো দেখিতেছি 'মরা মরা' বলিতে বলিতে 'রাম রাম' উচ্চারণের পুনরাবৃত্তি!

(প্রকাশ: ২৩.১২.২০১৩)